

স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য

সম্পাদক

আবদুল মান্নান ভলিবি



বাংলা সাহিত্য পরিষদ

স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য

২৫ বছর পূর্তি

৫ম জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন

ও গুণীজন সম্বর্ধনা

স্মারক

১৩ মার্চ ২০১০

বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, ইস্কাটন, ঢাকা

সম্পাদক

আবদুল মান্নান ভলিব



বাংলা সাহিত্য পরিষদ

স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য



২৫ বছর পূর্তি

৫ম জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন

ও গুণীজন সম্বর্ধনা স্মারক ২০১০

প্রকাশনার

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

১/ বি গ্রীনওয়ে, মগবাজার ঢাকা-১২১৭

ফোন : ০২-৯৩৩২৪১০, ০১৭১১৫৮১২৫৫

প্রকাশকাল

১৩ মার্চ ২০১০

প্রকাশনা উপকমিটি

আব্দুল

আবদুল মান্নান তালিব

সদস্য সচিব

শরীফ আবদুল গাফরান

সদস্য

আসাদ বিন হাফিজ

সোলায়মান আহসান

নাসির হেলাল

তৌফিকুর রহমান

মুখা আলীউদ্দিন

খালিদ সাইফ

নাজমুস সাঈদাত

বাংলা সাহিত্য পরিষদ
পঁচিশ বছর পূর্তি
পঞ্চম জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন-২০১০
বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ

কেন্দ্রীয় কমিটি

আহ্বায়ক

আবুল আসাদ

যুগ্ম আহ্বায়ক

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মাহবুবুল হক

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সদস্য সচিব

সাইফুল্লাহ মানছুর

সদস্য

অধ্যাপক ফজলে আজিম

হাসান আবদুল কাইউম সেলিম

মোঃ আব্দুল হান্নান

আবদুল কাদের মিয়া

খন্দকার আবদুল মোমেন

হামিদুল ইসলাম

সাজ্জাদ হোসাইন খান

জয়নুল আবেদীন আজাদ

এনামুল হক মল্ল

ডা. স. ম. রফিক

আ. জ. ম. ওবায়দুল্লাহ

শেখ আবুল কাশেম মিঠুন

মজিবুর রহমান মল্ল

আসাদ বিন হাফিজ

সোলায়মান আহসান

শাহ আলম নূর

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

হাসান আলীম

মোশাররফ হোসেন খান

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

আবেদুর রহমান

গোলাম মুর্তুজা

ইকবাল কবির মোহন

শরীফ আবদুল গোফরান

ড. মোজাফ্ফের হাসান তাদনান

হাসান মুর্তাজা

ইব্রাহীম মন্ডল

অধ্যাপক মাহফুজ চৌধুরী

নাসির হেলাল

তৌহিদুর রহমান

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

আমিনুল ইসলাম

আবদুর রহীম খান

হারুন ইবনে শাহাদাত

আমিনুল ইসলাম

ইবরাহীম বাহারী

নূরুজ্জামান ফিরোজ

জোবায়ের আল মামুন

ডা. ইয়াকুব আলী বিশ্বাস

সৈয়দ হামিদ হোসেন

উপকমিটিসমূহ

অভ্যর্থনা উপকমিটি

আহ্বায়ক

জয়নুল আবেদীন আজাদ

সদস্য সচিব

হাসান মূর্তাজা

সদস্য

রাফে সামনান

রেদওয়ানুল হক

আবদুল্লাহ আল মামুন

আফসার নিজাম

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপকমিটি

আহ্বায়ক

মজিবুর রহমান মঞ্জু

সদস্য সচিব

আবেদুর রহমান

সদস্য

ইবরাহীম বাহারী

আবদুল্লাহ আল মামুন

শাহাদাত হোসাইন

সেমিনার বাস্তবায়ন উপকমিটি

আহ্বায়ক

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

সদস্য সচিব

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

সদস্য

মোঃ আব্দুল হান্নান

আমিনুল ইসলাম

আবদুর রহীম খান

শহীদুল ইসলাম

প্রকাশনা উপকমিটি

আহ্বায়ক

আবদুল মান্নান তালিব

সদস্য সচিব

শরীফ আবদুল গোফরান

সদস্য

আসাদ বিন হাফিজ

সোলায়মান আহসান

নাসির হেলাল

তৌহিদুর রহমান

মৃধা আলাউদ্দিন

খালিদ সাইফ

নাজমুস সায়াদাত

প্রচার উপকমিটি

আহ্বায়ক

সোলায়মান আহসান

সদস্য সচিব

হারুন ইবনে শাহাদাত

সদস্য

শরীফ আবদুল গোফরান

সরদার ফরিদ আহমদ

শাহীন হাসনাত

রফিক মুহাম্মদ

আহমদ বাসির

রেদওয়ানুল হক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপকমিটি

আহ্বায়ক

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

সদস্য সচিব

শিল্পী আমিনুল ইসলাম

সদস্য

শেখ আবুল কাশেম মিঠুন

শাহ আলম নূর
হাসান আখতার
এস. এম. রাজ্জাক
শিল্পী গোলাম মাওলা
হাসনাত আবদুল কাদের
হাসিনুর রব মানু
শাহজাহান কবির সাজু
আ. ন. ম. মণিউর রহমান
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
মুস্তাগিছুর রহমান মুস্তাক
আহসান হাবিব খান
মু. ইকবাল হোসাইন
শহীদুল হক খোকন
হুসনে মোবারক
আবু শাকের মু. ইউনুছ

কবিতা পাঠের আসর উপকমিটি

আহ্বায়ক

সাজ্জাদ হোসাইন খান
সদস্য সচিব
হাসান আলীম
সদস্য
সোলায়মান আহসান
কামরুন্নেসা মাকসুদা
আবিদা শিকদার
শরীফ আবদুল গোফরান
ওমর বিশ্বাস
জাকির আবু জাফর
মনসুর আজিজ
মৃধা আলাউদ্দিন
নাজমুস সায়াদাত
রেদওয়ানুল হক
আফসার নিজাম
আহমদ বাসির

পুরস্কার উপকমিটি

আহ্বায়ক

মাহবুবুল হক
সদস্য সচিব
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সদস্য
তৌহিদুর রহমান
জোবায়ের আল মামুন

চিকিৎসা উপকমিটি

আহ্বায়ক

ডা. মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন
সদস্য সচিব
ডা. ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
সদস্য
ডা. মোস্তাক আহমেদ
ডা. আবিদ জাফর

আপ্যায়ন উপকমিটি

আহ্বায়ক

আবেদুর রহমান
সদস্য সচিব
নাসির আহমদ ফয়সাল
সদস্য
মোঃ ইসমাইল
আসাদ জামান

শৃঙ্খলা উপকমিটি

আহ্বায়ক

ইবরাহীম বাহারী
সদস্য সচিব
আবু তাহের বেলাল
সদস্য
শফিকুর রহমান রঞ্জু
ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল্লাহ

সূ চি প ত্র

■ স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য- আবুল আসাদ ৭ ■ বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ- আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ১৭ ■ বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা- আবদুল গফুর সিদ্দিকী ২৪ ■ স্বাধীনতার প্রথম পাঠ- সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা শিরাজী ২৭ ■ পলাশীর পর- মুহম্মদ আবু তালেব ৩১ ■ বাংলা সাহিত্যে পলাশীর রক্তপলাশ- শাহাবুদ্দীন আহমদ ৩৩ ■ বাংলাদেশের স্বাধীনতার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত- মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ৪১ ■ বাংলার মূল আরবী : অর্থাৎ বঙ্গ ও বাংলা শব্দের মূল আরবী- আনিসুল হক চৌধুরী ৪৮ ■ সেন আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য - ড. কাজী দীন মুহম্মদ ৭৬ ■ বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব- শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট ৮০ ■ আমাদের ভাষাসমস্যা- ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৯১ ■ বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান- এস. ওয়াজেদ আলী ৯৯ ■ পুঁথি সাহিত্য : আমাদের সাহিত্য ভাষার বুনিয়াদ- আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১০৩ ■ বাঙ্গালীর মাতৃভাষা- খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী ১১৩ ■ বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়- গোলাম মোস্তফা ১১৬ ■ মুসলমানী বাঙ্গালা- ডক্টর মুহম্মদ এনায়েত হক ১৩৭ ■ বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি : দেশীয় দালাল শ্রেণীর উত্থান- ড. কাজী আবদুল মান্নান ১৪৭ ■ আধুনিক কাব্য-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৬ ■ বড়র পিরীতি বলির বাঁধ- কাজী নজরুল ইসলাম ১৬৯ ■ ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা- আবুল ফজল ১৭৭ ■ হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : সাংস্কৃতিক বিভেদ- আব্দুল মওদুদ ১৮০ ■ আমাদের ভাষা ও সাহিত্য- তসদু্ক আহমদ ১৯২ ■ রাষ্ট্র-ভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা-সমস্যা- কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৬ ■ সাহিত্যে স্বাভাব্য কেন?- মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ২০৩ ■ নয়া সাহিত্যের বুনিয়াদ- মুজিবুর রহমান খাঁ ২১০ ■ আধুনিক সাহিত্যের ভাষা- মোহিতলাল মজুমদার ২১৪ ■ বাংলা সাহিত্যে ইসলাম- সৈয়দ আলী আহসান ২৩৬ ■ আমাদের বাংলা- আবুল মনসুর আহমদ ২৪৭ ■ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি- মনিরউদ্দিন ইউসুফ ২৬১ ■ যেসব বসন্তে জন্মি হিঁসে বঙ্গোবাণী- মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ২৭৯ ■ মধুসূদনের কাছে আমরা অনেক বেশি ঋণী- এবনে গোলাম সামাদ ২৮৩ ■ বাংলাদেশের অভ্যুদয়- অধ্যাপক আবদুল গফুর ২৮৭ ■ ‘ভাষা সৃষ্টির দু’টি তত্ত্ব ও ‘পিজিন-ক্রিয়োল’-ভাষা পরিচয়- ডক্টর এস.এম. লুৎফের রহমান ২৯৮ ■ কাজী নজরুল ইসলাম : কেন বড় কবি- আবদুল মান্নান সৈয়দ ৩২৫ ■ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা- আবদুল মান্নান তালিব ৩৩২ ■ হাজার বছরের বাংলা কবিতা : একটি আলোচ্য- অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৩৪৮ ■ বাংলা সাহিত্যে পলাশী ট্রাজেডি- আবদুল হাই শিকদার ৩৭৪ ■ সাম্রাজ্যবাদের মোহ ও বুদ্ধিজীবী মহল- কাহমিদ- উর-রহমান ৩৮৫ ■ আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ ও মুসলিম লেখকদের ভূমিকা- শরীফ আবদুল গোফরান ৩৯৪ ■ বাংলা সাহিত্য পরিষদের একটি সভা- আল মাহমুদ ৪০৭ ■ সাহিত্য আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য পরিষদ- মাহবুবুল হক ৪১১ ■ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি থেকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ- মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ৪১৭ ■ প্রকাশনা জগতে বাংলা সাহিত্য পরিষদ- নাসির হেলাল ৪২৫ ■ বাংলা সাহিত্য পরিষদের পঁচিশ বছর - খালিদ সাইফ ৪৬০

স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য

আবুল আসাদ



বাংলা সাহিত্য পরিষদ এবার সাহিত্য সম্মেলনের শ্লোগান হিসেবে 'স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য' খিম গ্রহণ করেছে। যুক্তি এই যে, স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা রক্ষা উভয়ের জন্যেই সাহিত্যের সংগ্রাম প্রয়োজন। বিষয়টা অনেকের কাছে সহজপাচ্য নাও হতে পারে। কারণ অনেকের কাছে সাহিত্য মাটির স্পর্শবিমুখ মনের উপলব্ধিজাত নিরংগা একটা অশরীরী বিষয়। এ যেমন কোনো সীমার বাঁধন মানে না, তেমনি এর কোনো জাতীয়তাও নেই। এঁদের এই অভিমত ঠিক নয়।

জীবন অখণ্ড। অখণ্ড জীবনে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন ক্ষেত্র মাত্র। এই ক্ষেত্রগুলো নিজেরা বিভাজ্য হলেও জীবনের সাথে এদের সম্পর্ক অবিভাজ্য। সবই জীবনের জন্য, জীবনকে ঘিরে। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা তার লক্ষ্য উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সহিত বিষয়ী এক হয়ে যাওয়ার আনন্দ।' আবার তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ।' এই সৌন্দর্যের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি পেয়েছেন সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রাকে অর্থাৎ ফ্যাক্টসকে অধিকার করে আছে। আর ফ্যাক্টস হলো বাস্তবতারই উপকরণ; জীবনের সাথে সম্পর্কিত ত্রুড় বা নিরেট নির্দিষ্ট বিষয়। তাই সাহিত্য আকাশচাষী নয়, মাটির এক বাস্তবতা। সাহিত্যের যুগধর্ম বিচার করতে গিয়ে প্রথম চৌধুরীও এই কথাই বলেছেন। তার মতে, আজকের 'নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।' এস ওয়াজেদ আলী সাহিত্যের সৌন্দর্যকে একটু ভিন্নভাবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, আনন্দ দেয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি না। সেখানে এস ওয়াজেদ আলী বলেছেন, 'উচ্চতম আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠতম উপকরণের সাহায্যে বিমল আনন্দের পরিবেশন—এই হলো সাহিত্যিকের কাজ।' লক্ষণীয় এস ওয়াজেদ আলী আনন্দের আগে 'বিমল' শব্দটি বিশেষণ হিসেবে যোগ করেছেন। এস ওয়াজেদ আলীর এই সংজ্ঞায়ন থেকে শুধু সাহিত্যের একটি বিশেষিত ধারাই নয় এর লক্ষণগত বা বৈশিষ্ট্যগত দিকও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আর একটি কথা, তিনি সাহিত্যকে একক দৃশ্য বা একক এক চরিত্রের ক্যানভাস বলতে নারাজ।

সাহিত্যের মধ্যে পাত্রভেদে স্বতন্ত্র স্বকীয়তার সমাহার অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে, 'পৃথিবীতে মানুষ হলো রাম কিংবা রহিম কিংবা রবার্টস, যেমন ফুলের মধ্যে আছে গোলাপ কিংবা বেলা কিংবা গন্ধরাজ। সাধারণ মানুষ কিংবা সাধারণ ফুল বলে

কোন একটা জিনিস পৃথিবীতে নেই। তবে ফুলের মধ্যে যেমন কতগুলো গুণ পাওয়া যায় তেমনি মানুষের মধ্যেও কতগুলো গুণ পাওয়া যায়। গোলাপকে যদি বলা হয় তোমার বিশেষত্ব বর্জন কর, ফুলের সাধারণ বিশেষত্ব প্রকাশ কর। সে কাজ সে কখনো করতে পারবে না। কোনো মানুষকেও সেইরকম যদি বলা হয় তোমার বিশেষত্ব বর্জন করে সাধারণ মানুষের বিশেষত্ব প্রকাশ কর। সে কাজও সে কখনও করতে পারবে না। এই হলো জীবনের রীতি। সাহিত্যিক যদি তার সাধনা সার্থক করতে চায় তাহলে নিজেকে তাকে চিনতে হবে এবং প্রকাশ করতে হবে।

সাহিত্যিক বা সাহিত্যের এই প্রকাশ তার নিজস্ব, স্বতন্ত্র। ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এটা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও সে একই কথা। এখান থেকেই বেরিয়ে আসে জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়।

এই জাতীয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে এস ওয়াজেদ আলী তার সংজ্ঞায়নে সাহিত্যের 'আনন্দ'র আগে 'বিমল' শব্দ বসিয়ে সাহিত্যকে যে আলাদা একটা রূপ দিয়েছেন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে একটা বিতর্কেরও সৃষ্টি করা হয়েছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের স্বাধীনতার অজুহাত তুলে অনেকেই সাহিত্যে শ্রীলতা ও অশ্রীলতার বিভাজন আঁকাকে সাহিত্যকে শৃঙ্খলিত করার নামান্তর বলেছেন। তাদের মতে, সাহিত্য যে উপলব্ধি ও ভাবের প্রকাশ, তাকে লাগাম পরালে সাহিত্য হবে না। আনন্দের কথা এই অভিমত সাহিত্য জগতে পনের আনা ক্ষেত্রেই হালে পানি পায়নি। কাজী মোতাহার হোসেন সুস্পষ্ট কণ্ঠেই বলেছেন, 'সাহিত্যের ভিতর সুরুচির বা নীতির মাপকাঠি ব্যবহার করিতে অনেকেই আপত্তি করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে সাহিত্য নীতি-দুর্নীতির বাহিরে। ইহাতে কেবল রসার্থেই রস-চর্চা, সাহিত্যে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নাই, অতএব এ ক্ষেত্রে নৈতিক হিতমূলক আদর্শের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এ মতবাদ অতি ভয়াবহ।' তাঁর মতে, 'মানুষের প্রচেষ্টায় মানুষের জন্যই যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা যদি মানবহিত এবং মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির দিক নির্দেশ না করে তবে বড়ই আক্ষেপের কথা।' সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার যে, মানুষ ভাল হবে, মানুষ ভাল করবে এটাই স্বাভাবিকতার দাবি। সুতরাং মানুষের সাহিত্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করবে, এটাও স্বাভাবিক।

জাতীয় সাহিত্য নিয়ে এটাই ভাবার কথা। আরও ভাবার কথা হলো, ব্যক্তি সাহিত্য চিন্তা থেকে জাতীয় সাহিত্যের দাবি স্বতন্ত্র না হলেও রূপ তার ভিন্ন। জাতীয় সাহিত্য অনেকটা সাইনবোর্ডের মত, প্রকাশ্য। প্রকাশিত বলেই, দৃশ্যমান বলেই অন্য জাতীয় সাহিত্যের দাবির সাথে বিরোধপূর্ণও হতে পারে। জাতিতে জাতিতে যেমন বিরোধ থাকে, তেমনি জাতীয় সাহিত্য আরেক জাতীয় সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বীও হতে পারে। সম্ভবত এই কারণে সাহিত্যের জাতীয় ভূমিকার বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। জাতীয় সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

বলার লোকেরও অভাব নেই। অপেক্ষাকৃত সবল জাতি দুর্বল জাতির সাহিত্যকে গ্রাস করার একটা পন্থা বা কৌশল হিসেবেও এই শ্লোগান তোলে। যাতে দুর্বল জাতির সাহিত্য তার স্বকীয়তা রক্ষা করতে না পারে। সবল জাতি তার স্বার্থের বাহন হিসাবে যোগাড় করা বিভীষণদের দ্বারাও এই কোরাস গাওয়ায়। এরপরও জাতীয় সাহিত্য একে অন্যের থেকে আলাদাই আছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলাদা। এই আলাদা করার কাজ বাংলা সাহিত্যের গুরু বা অগ্রজরাও করে রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের একজন গুরু নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই ধরা যাক। দৃষ্টান্ত নেয়া যায় তার গল্পগুচ্ছ থেকে। বুদ্ধদেব বসু ‘গল্পগুচ্ছে মানব জীবন বিশ্ব-প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত’ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু গল্পগুচ্ছের মানব জীবন কি তাই? গল্পগুচ্ছ আমরা যে জীবনচিত্রগুলো পাই তা কি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাংলার জীবন চিত্র? বিশ্বপ্রকৃতির মতো উদার মুক্তভাবে কি তা চিত্রিত? তা নয়। গল্পগুচ্ছের ৯১টি গল্পের পাত্র-পাত্রী কারা? সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী বিষয়বস্তুর নিয়ামক হয়ে থাকেন। অতএব গল্পের পাত্র-পাত্রীর বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ ৯১টি গল্পের একটিতেও কোন মুসলিম পাত্র-পাত্রী প্রধান চরিত্রে নেই। মণিহারী, দুরাশা, ক্ষুধিতপাষণ, সমস্যা পূরণ, রীতিমত নভেল, দালিয়া, প্রভৃতির মত মুষ্টিমেয় গল্পে মুসলিম চরিত্র কোন উদ্দেশ্যে এসেছে পাঠকরা তা জানেন। ব্যতিক্রম, বলা যায়, কাবুলিওয়ালা ও মুসলমানীর গল্প। কিন্তু কাবুলিওয়ালা বিদেশী। আর মুসলমানীর গল্পের ‘হবিব খাঁ’ একটা পার্শ্ব চরিত্র। অথচ সেই সময়ের অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানরা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ। অতএব কোন সাহিত্যিক যদি অখণ্ড বাংলার জীবনচিত্র আঁকতে চায়, তাহলে এই ৫৪ ভাগকে বাদ দিয়ে তা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য এই ৫৪ ভাগকে বাদ দিয়েছে। আমি বিশ্বকবিকে দোষ দিচ্ছি না, বরং প্রশংসা করতে চাই এই বলে যে, তিনি যা করেছেন সেটাই বাস্তবতা। আগেই বলেছি, সাহিত্য আসে উপলব্ধির আনন্দ অথবা বেদনা থেকে। আর এই আনন্দ, বেদনা আসে মুখ্যত স্বজন, স্বজাতির সাথে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকে। হিন্দু সমাজ ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ-বেদনার উৎস। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, তার আগের ও পরের সব কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। এমনকি তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা সমাজ চেতনার দিক থেকে কিছুটা সমাজবাদী সাম্যবাদী ছিলেন এবং সেই হেতু জাতীয়তার উর্ধ্বে থাকার কথা তাঁদের। কিন্তু তাদের সাহিত্য কাঠামো তাদের নিজস্ব জাতীয় চিন্তাকে ভিঙাতে পারেনি। এটাই সাহিত্যের একটা বড় সত্য। ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চিন্তার অনুশাসনও এটাই। এই ইতিহাস ঐতিহ্য যে একান্তভাবেই ধর্মাশ্রয়ী, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। বাংলা ১৩২২, ইংরেজি ১৯১৫ সালে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে ‘অসামান্য

কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তির অধিকারী বলে অভিহিত করেছেন, সেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

“আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এমনই একটা গুণ আছে যে এখানে ধর্মভাববর্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এ পর্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্মভাব ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র গোধূলি গগণের লোহিত মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহারা জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহারা সাহিত্যের আদর্শ পুরুষ; কবিশঙ্কর রত্নাকর, মহর্ষি ঐশ্বর্যায়ন, কবিকুল-রবি কালিদাস, ভবভূতি যাহারা জাতীয় সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক; আর সর্বোপরি চতুর্মুখ ব্রহ্মা যাহারা শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা অনাচার যেন প্রবেশ না করে— তৎপক্ষে সর্বদাই প্রবর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যিক, আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে কিছুই অসম্ভব নহে, অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।” (জাতীয় সাহিত্য, পৃ : ১০২, ১০৩, ১০৪)।

স্যার আশুতোষ এখানে যে জাতীয় সাহিত্যের জয়গান করেছেন, জাতীয় সাহিত্যের যে পক্ষের কথা বলেছেন, হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অলক্ষ্য, অগোচরে হলেও এ থেকে কখনই দূরে সরে যেতে পারেননি। জাতীয় সাহিত্যের এটাই শক্তি।

মুসলিম জাতির ক্ষেত্রেও এটা সত্য হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কতকটা আশুতোষের মতই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আর এক গুরুজী ড. শহীদুল্লাহ বলেছেন, ‘মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য তাহার ধর্ম তাহার প্রতিবেশীকে বুঝাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদেরকে ইসলামের মহত্ত্ব, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে।’ আশুতোষ ও ড. শহীদুল্লাহ দুজনেই ধর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু দুই ধর্মের। যা সাহিত্যের দুই ধারাকে চিহ্নিত করে। ড. মুহম্মদ এনাযুল হক অবশ্য বলেছেন, ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য শুধু হিন্দুর নয়, এমনকি শুধু মুসলমানের সাহিত্য নয়; এ সাহিত্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত বাঙালীর সাহিত্য।’ ড. মুহম্মদ এনাযুল হকের এ কথা ঠিক। কিন্তু সেটা একটা

যুগের সমগ্র সাহিত্যের পরিচয়-বিচারে। চোখ মেললেই দেখা যাবে এই সময়ের মধ্যে সাহিত্যের সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র ধারা বহমান। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কথায় এ সত্যটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর ভাষায় ‘কত দেশপ্রচলিত ধর্মকথা বাংলায় প্রকাশ করিল, কত মর্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল। মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর ‘রামায়ণ আছে, মুসলমানের জঙ্গনামা আছে। হিন্দুর ‘মহাভারত’ আছে, মুসলমানের ‘কাসাসোল আখিয়া’ আছে। হিন্দুর ‘মহাজন পদাবলি’ আছে, মুসলমানের ‘মারফতী গান’ আছে। হিন্দুর ‘বিদ্যাসুন্দর’ আছে, মুসলমানের ‘পদ্মাবতি’ আছে।” মধ্যযুগের এই বিভাজন কি শেষ হয়ে গেছে? না শেষ হয়নি। শেষ হবার নয়। দৌলত কাজী, আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীরদের আরও সরব, সচেতন, সক্রিয় উত্তরসূরী হলেন আধুনিক যুগের কবি নজরুল ও কবি ফররুখ। তাদের সাথে আছেন কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী, বেনজীর আহমদ, তালিম হোসেন ও আল মাহমুদরা। প্রবন্ধ ওকথাসাহিত্যে আছেন আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার জয়েনউদ্দিন, শহিদুল্লাহ কায়সার, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মাহফুজউল্লাহ, ড. এস. এম. লুৎফর রহমান প্রমুখ। এদের অনেকে সাহিত্যের চরিত্র-চিত্রণে সমাজবাদী ও কিছু আবেগগত বিদ্যুতি থাকলেও এদের সাহিত্য কাঠামো জাতীয়তার সীমা লঙ্ঘন করেনি। আজ বাংলাদেশে সাহিত্যের উত্তর-আধুনিকতার যে ধারা মাথা তুলছে, তাতে নতুন প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুল ও ফররুখের নতুন উত্থানের আগমনী গান আমরা শুনতে পাচ্ছি।

অতএব জাতীয় সাহিত্য ছিল, আছে এবং থাকবে। এই জাতীয় সাহিত্যই বিশ শতকের সাত দশক জুড়ে আমাদের স্বাধীনতার সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। আঠারশ’ সাতান্ন সালের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর হতাশা কবলিত মুসলিম জাতির জীবনে ঘোর অমানিশা নেমে আসে। এই অমানিশার মধ্যে জাতিকে জাগাবার, জাতিকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছাবার দায়িত্ব সাহিত্য এবং সাহিত্য সেবকরাই পালন করে। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হবার মাত্র ছয় বছরের মাথায় ১৮৬৩ সালে কলকাতায় মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি বা মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য সমিতির লক্ষ ছিল, এক, মুসলিম জাতির উদীয়মান প্রজন্মের মনে দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা। এবং দুই, সকল স্তরের মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক সমাবেশের ব্যবস্থা করা। এই উদ্যোগে ছিল নতুন পর্যায়ে মুসলমানদের উত্থান ও নতুন সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু ঘটনা। মুসলিম সাহিত্য সমিতি শুরুর দিকে রাজনীতিতে মাথা দেয়নি, কিন্তু প্রয়োজন তাদেরকে রাজনৈতিক ভূমিকায় নিয়ে আসে। ১৮৮৯ সালে মিউনিসিপাল নির্বাচনে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের আইন বাতিল হলে

মুসলিম সাহিত্য সমিতি এর প্রতিবাদ করে। প্রতিকারের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে দাখিলকৃত এক স্মারকলিপিতে তারা বলে, 'সরকারের উচিত ইলেকশন নয় সিলেকশনের মাধ্যমে কাউন্সিলগুলো গঠন করা, যাতে সরকারের অধীন সকল জাতির ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হয়।' ১৯০৬ সালে মুসলমানদের রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন হওয়ার আগে প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য এবং সাহিত্য সেবীরাই মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম করে এসেছে। বৃটিশ পিরিয়ডে মুক্তির পক্ষে এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে লিখার অপরাধে ৩৫টি সাহিত্যকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়। যার মধ্যে কবি নজরুলেরই রয়েছে ৩টি গ্রন্থ, প্রলয়শিখা, যুগবাণী ও বিষের বাঁশী এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রয়েছে একটি অনল প্রবাহ কাব্য। মুসলমানদের রাজনৈতিক দল গঠিত হবার পরও সাহিত্য, সাহিত্যিক এবং সাহিত্য পত্রগুলোই জাতিকে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানোর দায়িত্ব পালন করে। ১৯০৫ সালে 'নবনূর' সাহিত্য প্রতিকায় 'স্বদেশী আন্দোলন' শিরনামে মৌলভী মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ বৃটিশ শিক্ষা-নীতির তীব্র সমালোচনা করে লিখেন, "ইংরেজ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত বহাইয়াছেন।...যে শিক্ষা উত্তরোত্তর শিক্ষার্থীকে হীনবল করিতে থাকে, যে শিক্ষা তাহাকে রাজনীতি চর্চা হইতে বিরত থাকিতে অনুশাসিত করে, তাহা কোনক্রমেই পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে। Political Education বা রাজনীতির শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটা অঙ্গ। কিন্তু এই শিক্ষা যথাযথ দান করিয়া আমাদেরকে Politically বড় করা ইংরেজের অভিপ্রেত নহে, তাই আমাদের শিক্ষা হইতে তিনি রাজনীতির অংশটা বাদ রাখিতে চাহেন।... দেশের শাসনকার্যে ন্যায্য দখল পাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছেন, আমাদের এ চেষ্টা চাপিয়া রাখা অভিপ্রেত তো আছেই, অতঃপর আমাদের উচ্চশিক্ষার পথরোধ করিতেও তাঁহাকে পথ দেখিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিধান এই পথের একটা চাল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।... যে রাজশক্তি আমাদের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাহা আমাদের রাজনীতি অনুশীলনকে চাপিয়া রাখিতে চায়, আমাদের দেশের শাসন কার্যে আমাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, আমাদের ভালমন্দ আমাদেরকে বিবেচনা করিতে নিষেধ করে। (নবনূর, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)।

জাতির জন্যে সাহিত্যের এই সংগ্রাম স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত চলেছে অবিরামভাবে। ১৩৩৪ সালে সপ্তগাত্রে 'মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা' শীর্ষক নিবন্ধে সাহিত্যিক ইয়াকুব আলী চৌধুরী লিখেন :

“ভারতীয় জাতি গঠনকারী হিন্দুগণ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মুসলমানগণ অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক, তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল মাত্র স্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল চিন্তাতেই নিবদ্ধ। অঞ্চল দেশকে তাঁহারা ভালবাসেন না, কিংবা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর মঙ্গলকর কোন কর্মচেষ্টাও তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।...

“ভারতীয় মুসলমানগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রকাশে একান্ত সাম্প্রদায়িক, ইহা অতি বড় সত্য কথা।... স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার বুঝিয়া পাইবার জন্যই দিনরাত তাহারা সংগ্রাম করিতেছে, সাম্প্রদায়িক বিশিষ্ট সুবিধার জন্যই রাষ্ট্রীয় জীবনের মাথা হইতে পা পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনের অধিকার চাহিতেছে। এই যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও হিন্দুদিগের নিকট হইতে পৃথক করিয়া অধিকার বুঝিয়া লইবার চেষ্টা, ইহা মুসলমানদিগের আত্ম প্রকাশের স্বাভাবিক ক্রিয়ামাত্র। ইহার মধ্যে গভীর সত্য ও প্রেরণা আছে। কোনো হীন ও সাময়িক স্বার্থ লোভের চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই।...

“এক একটি পরিবারে যাহা ঘটে, এক একটি জাতির জীবন ও রাষ্ট্রীয় সুখ-দুঃখ তাহারই বৃহত্তর বিকাশ মাত্র।... দেখা যায়, কনিষ্ঠ সহোদর আপনার অধিকার যখনই ভালভাবে বুঝিয়া না পায়, তখনই জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে তাহার সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইবার দাবি উপস্থিত করে...

...সহোদর যেমন সহোদরের সঙ্গে বিরোধ করে আপনার অস্তিত্ব ও অধিকারের জন্য, মুসলমানের পক্ষেও তেমনই হিন্দুর সঙ্গে কলহ করা বিচিত্র নহে। হিন্দুর স্বার্থপরতা হইতে ইহার জন্ম, মুসলমানের আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকাশের চিন্তা হইতে ইহার উৎপত্তি।” (সপ্তপাঠ, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশাঢ়, ১৩৩৪)

প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন সাহিত্যিক আবুল ফজল। ‘বঙ্গ-মুসলিম নারী-জাগরণ’ শীর্ষক নিবন্ধে (সপ্তপাঠ, পৌষ, ১৩৩৬) তিনি বলেন, ‘... দেশে রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি আন্দোলন চলিতেছে। মুসলমানের এই আন্দোলন হইতে দূরে থাকার অর্থ নিজের পায়ে নিজের কুঠারাঘাত। ভারতবর্ষ একদিন বৈদেশিক নাগপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইবেই। আজ মুসলমান এই আন্দোলনে যোগ না দিলে, সেই দিন সেই আন্দোলনে মুসলমান ছেলে কি অন্যের অর্জিত মুক্তি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে? সেই দীনতা কি তাহার রক্তের আছে?’

সাহিত্যিক আবুল ফজল ঠিক কথাই বলেছেন। এই দীনতা মুসলিম রক্তে নেই। নেই বলেই তারা তাদের স্বাধীনতা হিন্দু জাতির হাত দিয়া গ্রহণ করেনি, নিজের হাত দিয়ে অর্জন করেছে। এভাবেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জন হয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৭ সালের পর শুরু হয় আরেক স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামও শুরু হয় ভাষার স্বার্থ সাহিত্যের স্বার্থ অবলম্বন করেই। এর প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যিকরাই। ভাষার অধিকার নিয়ে প্রথমে আওয়াজ তুলেন মওলানা আকরম খাঁ, কবি ফররুখ আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ এবং ড. শহীদুল্লাহ প্রমুখ। সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন তমুদ্দুন মজলিশই প্রথম ভাষার অধিকার নিয়ে আন্দোলনে নামেন। এই আন্দোলন শহীদের রক্তে স্নাত হয় ১৯৫২ সালে। সবাই একমত, ১৯৭১ সালে আমাদের যে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়, ১৯৫২ ছিল তার যাত্রা শুরুর মাইলফলক। এই স্বাধীনতা

সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এই আন্দোলনের পথ রচনা করেছেন কবি, সাহিত্যিক সাংবাদিকদের কলম। ৪৭-উত্তরকালে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ দেশবাসীর মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয় চেতনা যেমন উদ্দীপ্ত হয়, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাব-পীড়িত সরকারের শোষণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। আমাদের কাব্য প্রবন্ধ ও কথা সাহিত্যে এর প্রমাণ মিলে। সংবাদপত্রের কলামে এই প্রতিবাদ এবং জাগরণের আওয়াজ আরও স্পষ্ট। এখানেও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখসহ অগণ্য সংগ্রামী কলম আমাদের স্বাধীনতার পথ রচনা করেছে। এদের হাতে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নেই বটে কিন্তু এই কলম-যোদ্ধারাই যে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি অস্ত্রের যোদ্ধা তার প্রমাণ ইতিহাস।

আমরা আজ স্বাধীন। কিন্তু ৪৭-এ যেমন ভারত বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশের কাছ থেকে স্বতন্ত্র আবাসভূমি আদায় করার পর আমরা বৈরিতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছিলাম, তেমনি আজও আমরা নতুন এক বৈরিতার মুখোমুখি। আমাদের এক প্রতিবেশী আকারে, শক্তিতে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। আমাদের উপর তাদের শোণ দৃষ্টি পড়েছে। আমাদের ভূমি আমাদের স্বাধীনতাকে তারা যথেষ্ট ব্যবহার করতে চায়। সম্মত না হলে তারা সেই গল্পের নেকড়ে মত আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আশা রাখে। এই বিপদ যে কল্পনা নয়, অমূলক আশঙ্কা নয়, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ যেমন হায়দারাবাদ, জুনাগাড়, মানভাদার, গোয়া, দমন, দিউ, কাশ্মির এবং সর্বশেষ সিকিমের ভাগ্য তারই প্রমাণ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই আগ্রাসনকে সহজ ও সফল করার জন্যে ভারত তার জাতীয় সাহিত্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। অথবা তাদের সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাদের রাজনীতির অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম বাংলার উপন্যাস ও গল্পে ভারত বিভাগ এবং বাংলাদেশের অস্তিত্ব একটা বড় বিষয়। অনুদা শঙ্করের সেই বিখ্যাত কবিতা ‘তোমরা সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ কর’ যে কথা বলেছে, বলতে চেয়েছে, সেই কথা পশ্চিম বাংলার উপন্যাস-গল্পে ভূরি ভূরি দেখা যাবে। তাদের সব কথার সার কথা হলো, ভারত বিভাগ একটা বড় ভুল। এই ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাসের বাস্তবতা আড়াল করে, উপেক্ষা করে, স্থান বিশেষে বিকৃত করে ভারত বিভাগ ‘ভুল’ হওয়ার এই তত্ত্ব দাঁড় করেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবি রবীন্দ্রনাথের ‘এ ভারত ভূমি নাহিক তোমার, নাহিক আমার একা, হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছায়া, মুসলমানের রেখা,... কাকের, যবন টুটিয়া গিয়াছে, ছুটিয়া গিয়াছে ঘৃণা, মোসলেম বিনা, ভারত বিফল, বিফল হিন্দু বিনা...’ কবিতা উদ্ধৃত করে তার পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসে দেশ বিভাগের দুঃখে অনেক কান্না কেঁদেছেন। বদ উদ্দেশ্যেই ইতিহাসের দিকে তিনি চোখ ফিরাননি। কেন ১৯১৬ সালের লান্দোপাণ্ডা

বার্থ হলো, কেন কিভাবে অসহযোগ আন্দোলন বার্থ হলো, কিভাবে বার্থ হলো চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাণ্ট, কেন হিন্দুরা ১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্টের একটি বর্ণণা সংশোধনে রাজি হলো না, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস শাসিত ৬টি প্রদেশে কেন মুসলমানদের সাথে গরু-ছাগলের মত আচরণ করা হলো, কেন ১৯৪৭ সালে বাংলাকে অখণ্ড রাখার উদ্যোগকে বার্থ করা হলো, এমন হাজারো প্রশ্নের একটিরও জবাব সুনীলের উপন্যাসে নেই। নেই তার কারণ, ইতিহাসের সত্য প্রকাশিত হলে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের আচরণ নগ্ন হয়ে যায়, প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতা আর কিছু নয় মুসলমানদের এবং বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনেই বেঙ্গল প্যাণ্ট টুকরো টুকরো হয়ে যায়, অন্যায় নেহরু রিপোর্টকে মুসলমানদের উপর চাপাবার চেষ্টা করা হয় তাঁর চোখের সামনেই এবং ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর কংগ্রেস শাসিত ৬টি প্রদেশে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতনও তাঁর সামনে ছিল, কিন্তু কিছুই বলেননি তিনি। এরপর তাঁর ঐ কবিতার কি মূল্য থাকে। সুনীল তার উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন, ‘র্যাডক্লিফ বোয়েদাদে সেই আনন্দের দিনের উপর যবনিকা পড়ে গেছে।’ এর অর্থ হলো, মুসলমানরা নিজেদের কাদার ব্যবস্থা করে সুনীল বাবুদের ঐ আনন্দের দিন অব্যাহত রাখবে, এটাই সুনীল বাবুরা চেয়েছিলেন। মুসলমানরা তাতে রাজি হতে পারেনি নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই। র্যাডক্লিফ রোয়েদাদ সুনীল বাবুদের নিরানন্দ দিয়েছে বটে কিন্তু মুসলমানদের দিয়েছে স্বাধীনতা, দিয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলাদেশ।

সুনীল বাবুরা আজ এসব কথা বলছেন কেন, কেন তারা এসব কথা নিয়ে তৈরি করছেন পূর্ব-পশ্চিমের মত বড় বড় উপন্যাস? তৈরি করছেন, সন্দেহ নেই, আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যেই এবং আমাদের বিভ্রান্তির সুযোগে এ কথা আমাদের মনে তারা ঢুকিয়ে দিতে চান যে, দেশ বিভাগ ভুল ছিল। এরপরে তাদের কথা, ভুল যখন ছিল, তখন ভুলের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন ভুল সংশোধন করে তাদের সাথে মিলে যাওয়া। সুনীল বাবুদের এই চাওয়া আমরা মেনে নিলে আমাদের স্বদেশ, স্বাভাব্য ও আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ কিছুই থাকে না। সুনীল বাবুরা এটাই চান। এই লক্ষে ভারতের রাজনীতি এবং ভারতের জাতীয় সাহিত্য আজ এক হয়ে গেছে।

ওদের যখন এই আয়োজন তখন আমরা কি করছি? আমাদের সাহিত্য কি করছে? বাংলাদেশের তসলিমা নাসরীন ‘লজ্জা’ উপন্যাস লিখলেন কি করে? তসলিমার ‘লজ্জা’ উপন্যাস সুনীলের পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাসের এক নির্লজ্জ সত্যায়ন। শুধু তসলিমা নয়, সুনীলদের ছড়ানো বিভ্রান্তি আরও জায়গা করে নিয়েছে আমাদের মধ্যে। তা না হলে আমাদের জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠান থেকে সুনীলের পূর্ব-পশ্চিম উপন্যাস নিয়ে বাংলাদেশে সিনেমা তৈরির ঘোষণা আসে কি করে? অজ্ঞতা-বিভ্রান্তির কোন পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি, এটা তার একটা প্রমাণ।

অজ্ঞতা থেকেই আসে বিভ্রান্তি। ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই আসছে আমাদের এই বিভ্রান্তি। কোন জাতির জীবনে অজ্ঞতা অত্যন্ত মারাত্মক। মার্কিন জাতির অন্যতম জনক টমাস জেফারসনের ভাষায়, ‘কোন জাতিই যুগপৎ অজ্ঞ ও স্বাধীন ছিল না এবং তা থাকতেও পারে না (If a nation expects to be ignorant and free, it expects what never was and never will be) উক্তিটি অত্যন্ত মারাত্মক। এই মারাত্মক অবস্থারই শিকার আমরা। আমরা যদি আমাদের অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি দূর করতে না পারি, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা থাকবে না। টমাস জেফারসনের উক্তিটি আমাদের জন্যে এক হুশিয়ারি।

আবারও বলি, পশ্চিমবঙ্গের সুনীল বাবুরা দেশপ্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের ভূখণ্ডগত বা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ আরও বাড়িয়ে নেবার জন্যে যখন আমাদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তখন আমরা বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা কি করছি, আমাদের সাহিত্য কি করছে? আমাদের উপন্যাসের তালিকা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও সুনীলের পূর্ব-পশ্চিমের মত ইতিহাস সচেতন জাতি সচেতন একটা উপন্যাসও আমরা পাব না, রবীন্দ্রনাথ ও অনুদাশঙ্করের উল্লেখিত কবিতার সমান্তরালে কোন কবিতা আমাদের কাব্য তালিকায় আমরা দেখব না। তাহলে আমাদের জাতীয় সাহিত্য জাতির প্রতি কি দায়িত্ব পালন করছে? না, প্রয়োজনীয় কোন দায়িত্বই পালন করছে না। তাহলে সুনীলরা এবং বিভীষণ তসলিমারাই কি জিতে যাবে? এই প্রশ্নই আজ খুব বড় হয়ে উঠছে। এর জবাব দিতে হবে আমাদের কবিদের, আমাদের কথাসাহিত্যিকদের এবং নাটক ও কলাম-লেখকদের। অজ্ঞতা ও অবহেলার আত্মঘাতি ঘুম থেকে তাদের জেগে উঠতে হবে। ঢাকাকে শুধু বাংলা ভাষার রাজধানী বললে চলবে না, তার রাজসুলভ স্বকীয়তা, শক্তি ও একটা নিরাপদ সাম্রাজ্য থাকতে হবে। এমন অর্জন আপনাতেই ধরা দেয় না। স্বাধীনতা অর্জনের মতোই স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়টি সংগ্রাম-সাপেক্ষ। মহান অর্জনের এই সংগ্রাম সফল করার জন্যই আজ আবার প্রচারে আসতে হবে নতুন সুধাকর, নবনূর, মোহাম্মদী, সওগাত, নবযুগকে। কলম হাতে এগিয়ে আসতে হবে নতুন আকরম খাঁ, মাওলানা মনিরুজ্জামান সাহিত্যরত্ন ইসলামবাদী, মুন্সি রিয়াজুদ্দিন, মুন্সি আবদুর রহীম, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস ওয়াজ্জেদ আলী, নজীবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, গোলাম মোস্তফা, আবুল ফজল এবং মানিক মিয়াদেরকে। বেগবান করতে হবে স্বাধীনতার জন্যে সাহিত্যের সংগ্রামকে এবং উচ্চ কণ্ঠে বলতে হবে আমরা হারিনি, আমরা হারবো না। বাংলা সাহিত্য পরিষদের ২৫ বছর পূর্তির এই সাহিত্য সম্মেলনের একান্ত আকুতি এটা, আহ্বান আবাহন এটাই।

বঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ



বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্তমান সাহিত্যিক জাগরণ এই সম্প্রদায়ের প্রগতির পরিচায়ক ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বৈচিত্র্য এবং সম্পদ বৃদ্ধির একটি প্রধান চিহ্ন। বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু বাঙ্গালী হিন্দু কিম্বা বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য নয়, ইহা উভয়েরই সম্মিলিত সাহিত্য। উভয় জাতি এই সাহিত্যকে আপন ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দিয়া সৌষ্ঠবশালী করিয়া না তুলিলে এই সাহিত্য যে নিতান্তই একদেশদর্শী হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ তাহাদের সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দিয়া এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট না করিলে আজ মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যকে শুধু শাক্ত হিন্দুদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় এত উন্নত অবস্থায় পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না।

আমি বিশ্বাস করি, মুসলমানদের বর্তমান সাহিত্যিক জাগরণ অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে সম্প্রদায়ালী এবং বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রীসম্পন্না করিয়া তুলিতেছে। একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমানেরা আপন জাতীয়, ধর্মীয়, সংস্কৃতি ও সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অপ্রতুল ও অনুমেয় মূর্তি ধারণ করিবে। যাঁহারা মুসলমানদের বর্তমান সাহিত্যিক প্রগতির পরিপন্থী, তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের মিশ্রতার মুখোঁস পরিয়া তৎপ্রতি শত্রুতাই সাধন করেন মাত্র; কেন না তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে একটি ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইহাকে ইহার স্বাভাবিক স্ফূরণের ও সম্প্রসারণের বৈচিত্র্য হইতে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য আমি ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের মিশনারী-রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যকেও-তাহা যতই অকিঞ্চিৎকর হউক-অগ্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করি না। নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ হইলেও তাঁহারা আধুনিক যুগের বিচিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রধানত এই প্রকারের খেলালের বশবর্তী হইয়াই আমি আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক জাগরণকে মোটেই সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি দিয়া দেখি না বা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া মনে করি না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, মুসলমানগণ আজ স্বীয় ধর্ম বা সম্প্রদায় বুদ্ধিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ দেখি না। অষ্টাদশ শতকে মিশনারীরাও কি সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বুদ্ধিতে

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন নাই? তাহাতেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষতির চেয়ে উপকারই হইয়াছে অধিক। আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারী সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্যিক ও ধর্মীয় বুদ্ধিতে তফাৎ বিস্তর। মিশনারীরা সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের সেবা করেন নাই; কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানেরা আজ আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। ইহারা আপন সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন বলিয়াই আজ হয়ত কতকটা তাঁহাদের স্বীয় আপনত্ব বা বৈশিষ্ট্য এই সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। ইহাকে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন? মুসলমান আপন বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। দুনিয়ার কোন জাতিই জাতি হিসাবে আপন বৈশিষ্ট্য ছাড়াইয়া বাঁচিতে পারে না-বাঁচেও নাই। সুতরাং মুসলমানের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? আর যাহারা মুসলমানদের সাহিত্যিক জাগরণকে বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মেহেরবানী করিয়া একটিবার বিচারের দৃষ্টিকোণ ফিরাইয়া লউন এবং উদার দৃষ্টিতে অঞ্চল বাঙ্গালা সাহিত্যকে দেখিতে থাকুন, দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, উজ্জ্বল-বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবি ফল অমঙ্গলজনক নয়, মঙ্গল-প্রসূ। মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণে বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের কোন কোন কেন্দ্রে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমার এই আশ্বাসবাণীতেও যে বিদূরিত হইবে, তেমন বোধ হয় না। এই জন্যই বাঙ্গালী মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের বিশ্লেষণ ও তৎপ্রসঙ্গে প্রতিবেশী আতঙ্কিত জনগণের আশঙ্কার কারণ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

মুসলমানেরা আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের যেদিকটি সর্বাপেক্ষে প্রতিবেশীদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা প্রধানত ভাষা-সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে দ্বি-বর্ণিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে অসার নহে। কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান লেখক (আমি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যিক বলিলাম না) আজ যেন কোমর বাঁধিয়া কাজে-অকাজে বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত বা অপ-প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুলেখকদের অদ্ভুত সংস্কৃত শব্দের আমদানী অত্যাচারে বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কচকটির জ্বলুমে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীলদের লেখায়ও বাঙ্গালা ভাষার সেই দুর্দশা উপস্থিত হয় এবং আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের দোষের প্রতি যেমন উদার, মুসলমানদের দোষের প্রতি তেমন অসহিষ্ণু। এই জন্যই তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষা দ্বি-বর্ণিত হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী-সংস্কৃত নহে।

কারণে অকারণে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃতির আমদানীতে যদি ভাষার প্রতি জুলুম করা না হয়, তবে আরবী বা ফারসীর আমদানীতে কেন তাহা ঘটে, তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আসিয়া পড়ে। এখানেই প্রশ্ন উঠে, সাহিত্য ত সাহিত্যই, তাহার আবার জাতের বলাই কেন? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যে জাতিধর্মের গণ্ডী আমি স্বীকার করি না, কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য মানি। অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি একটি পুষ্পরূপে কল্পনা করা যায় তবে বলিতে পারি, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য তার একটি দল বা পাপড়ী মাত্র। আর বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি বিশ্বের সার্বজনীন সাহিত্যের একটি দলরূপে কল্পনা করা হয়, তবে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য এই পুষ্পদলের অপরূপ বর্ণচ্ছটার একটি। আমার মনে হয় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য আজ পর্যন্ত প্রকৃত সংজ্ঞালাভ করে নাই বলিয়াই অপরের জন্য ইহার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সাহিত্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার জন্যই গোলযোগের সৃষ্টি অস্বাভাবিক নহে। এতৎসম্বন্ধে আমার ধারণা একরূপ সুস্পষ্ট। আমার মতে বঙ্গীয় মুসলমান তাহার ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার লইয়া যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের যে-অংশে মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়া উঠে, তাহাই ‘মুসলিম সাহিত্য’। এই সাহিত্য অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে পৃথক নহে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে, রূপে, রসে মুসলমান ব্যতীত অপরের সংস্কৃতিগত সাহিত্য হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক শব্দ ও ভাবের স্পষ্ট ছাপ বহন করিলেও, ভাষায় এই সাহিত্য পুরাদস্তুর বাঙ্গালী, প্রাণের ক্ষুরে এই সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার ভিজা মাটির সম্বোধন গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। কথায়, এই সাহিত্য ইমানে ইসলামী, অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রাণের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীতে, বিশেষ করিয়া প্রেরণায়, গোটাটি হউক বা না হউক পনের আনি বাঙ্গালী।

আমি প্রধানত এইরূপ মুসলিম সাহিত্যেরই পক্ষপাতী। কেন না মুসলিম সাহিত্য বলিতে আমার মনে যে-সাহিত্যের অপরূপ মূর্তি রূপায়িত হইয়া উঠে, তাহা এইরূপ। বঙ্গীয় মুসলমানদের এইরূপ সাহিত্যই আমার ধর্ম-বিশ্বাস সুদৃঢ় করে আমার জাতিগত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করিয়া তোলে, বাঙ্গালী হিসাবে আমার প্রাণে অনন্ত প্রেরণা জাগায়; রূপে, রসে, বর্ণে গন্ধে আমাকে মাতাইয়া তুলিয়া আমার নিজের সহিত পরিচিত করিয়া দেয়। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী মুসলমানের এইরূপ সাহিত্যই অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য সেই সময়ের অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যে যে-বৈচিত্র্যের আমদানী করিয়াছিল, তাহা প্রধানত

এইরূপ। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেটি আমার চোখে বড় করিয়া দেখা দিয়াছে, তাহা হইল প্রাচীন মুসলমান বাঙ্গালী কবিদের ইসলামী ভাব ও চিন্তাধারায় অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন। বিরাট প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য মুসলমানদের নিকট ইত্যাকার নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

অধুনা বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য বলিতে এদেশের মুসলিম রচিত-তাহা যে প্রকৃতিরই হউক-বাঙ্গালা সাহিত্যই বুঝায়। কি কারণে জানি না, বঙ্গীয় মুসলমানদের দ্বারা রচিত আধুনিক প্রকৃতির ছাগতন্ত্রী সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন সাহিত্য আজকাল এদেশে মুসলিম সাহিত্য নামে পরিচিত হইতেছে। আমি কিন্তু এই নামীয় সাহিত্যের অধিকাংশকে মুসলিম সাহিত্য বলিতে নারাজ। কেন না, আমার মতে শুধু মুসলমান কর্তৃক রচিত হইলেই সে-সাহিত্য ‘মুসলিম সাহিত্য’ হয় না। যে-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অভাব যে-সাহিত্যে বর্তমান, তাহা মুসলমান কর্তৃক রচিত হইলেই মুসলিম সাহিত্য নয়। পক্ষান্তরে, যে সাহিত্যে তাহা পূর্ণমাত্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান, তাহা মুসলমান কর্তৃক রচিত না হইলেও মুসলিম সাহিত্য। আধুনিক মুসলমান লেখকদের মধ্যে পনের-আনি লেখকের লেখা ইসলামী বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের এইরূপ দীনতা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে শুভ বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহাতে বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য চিন্তার বৈচিত্র্য ও ভাবের সমৃদ্ধির দিক হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে।

মুসলমানদের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য আজকাল ইসলামী বৈশিষ্ট্য হইতে এরূপ অধিকমাত্রায় বর্জিত হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয়? উত্তর-ভারতের উর্দু সাহিত্য এবং প্রাচীন বাঙলার মুসলিম সাহিত্য সাধারণত ইসলামী আদর্শ-অনুসারী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এই সাহিত্যের স্রষ্টাগণ ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও ইহাদের অধিকার বিশেষ শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। আমার বিশ্বাস, ইসলামের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার মুসলিম লেখকদের প্রাণের গভীর যোগ ছিল বলিয়া এবং উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের সেই যোগ আজ পর্যন্ত নিবিড় বলিয়া, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও উর্দু সাহিত্য সাহিত্যিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও ইসলামী ভাব ও আদর্শে এতখানি অনুপ্রাণিত। আধুনিক বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান লেখকের সহিত ইসলাম ও ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের নিবিড় যোগ আছে কিনা তাহা বলা কঠিন। বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী মুসলিম লেখকগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও মনে প্রাণে ইসলামী ভাবাপন্ন নহেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাদের এই জাতীয় অবদান হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে এই দীনতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে, বাঙ্গালার মুসলমান লেখকদের সহিত ইসলামের সম্বন্ধকে

সুনিবিড় করিয়া তুলিতে হইবে। তবে সম্প্রতি অমানিশার পর প্রভাত-আলোর বর্ণচ্ছটার ন্যায় বঙ্গীয় মুসলিম গগনে একটি গুডলক্ষণ দেখা দিয়াছে, ইহাই আশ্বাসের বিষয়। বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে এখন বহুপূর্বের সংস্কার-আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার মুসলমানদের সহিত ইসলামের যোগ নিবিড় হইবে বলিয়া মনে হয়। এই যোগ যতই ঘনিষ্ঠ হইবে ততই বাঙ্গালা সাহিত্য ইসলামী ভাবাপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানদের একটি অভিযোগের কথাও মনে পড়ে। সম্প্রতি বাঙ্গালার মুসলমান সন্দেহ করিতেছেন, এদেশের হিন্দুগণ মুসলিম সংস্কৃতির সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ ও ভাষাকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিয়া মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ভিত্তির সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ, সে-কথা আমি মোটেই অস্বীকার করি না। হিন্দু ‘হরিনাম’ না করিয়া ‘কালিমা’ উচ্চারণ করিবেন, এমন চিন্তা করা শুধু অশোভন নহে, বরং একান্তই অস্বাভাবিক। আমরা যখন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে-সকল প্রতিভাবান হিন্দু দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ছাপ তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে থাকিবেই। কেন না তাঁহারা স্বীয় ধর্মীয় ও সংস্কৃতির গুণী ছাড়াইয়া সাহিত্য রচনা করেন নাই-পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা জোর করিয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে আমাদের ক্ষক্ষে যতটা চাপাইতেছেন না, আমরা তাঁহাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞাতসারে ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের আদর্শ ও ভাবকে বরণ করিয়া লইতেছি।

আমাদের লেখকদের মধ্যে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত আদর্শ একান্তই দুর্বল। প্রধানত এই কারণেই আমাদের লেখকেরা অপর সংস্কৃতির জোরাল প্রকাশের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইতেছেন। সরল জাতীয় ও ধর্মীয় আদর্শ বুকে লইয়া প্রতিভার দ্যোতিতে ভাস্বর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে না পারিলে, মুসলমানদের এই অভিযোগ অরণ্য-রোদনে পর্যবসিত হইবে। আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, প্রতিভাবান হিন্দু-সাহিত্যিকগণই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রধানত তাঁহাদের প্রতিভায় আজ বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতীয় ভাষার যে কোন সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং বিশ্বের দরবারেও ইহা স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? আমি ইসলামী আদর্শ ও ভাবপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন আতঙ্কিত নহি, হিন্দু আদর্শ ও ভাববহুল সাহিত্য সৃষ্টিতেও তেমন শঙ্কিত নহি। আমরা চিন্তা, ভাব ও আদর্শে মুসলমান হইতে

পারিলে, হিন্দুসাহিত্য দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার কোন কারণ আমাদের নাই। হিন্দুগণ আমাদের ফরমায়েশ মত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আমাদের নিয়মিতভাবে পরিবেশন করিয়া যাইবেন, এইরূপ আশা করা প্রকৃতির বিপরীত ও বাতুলতা মাত্র। বাঙ্গালায় মুসলমান যতদিন পর্যন্ত বাঙ্গালার অবয়বে ইসলামী মস্তিষ্কপূর্ণ হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি না করিবেন, এবং যে-পর্যন্ত তাঁহার সেই সৃষ্টি স্জন-মহিমায় মগ্নিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুর বিরুদ্ধে অনৈসলামিকতার অভিযোগ আনিয়া কোন প্রতিকারের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে অভিযোগ যখন একবার উত্থাপিত হইয়াছে, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী মুসলমান এখন স্বীয়-জাতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সজাগ হইয়া উঠিতেছেন। মুসলমানদের এই আত্মপ্রবুদ্ধ চৈতন্যকে অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ভাবী মঙ্গলের পূর্বলক্ষণ বলিয়া মনে করি। ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন সম্পদে সম্পদশালী হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা করি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি একজন এইরূপ আশাবাদী। সেই কারণেই বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ে জাগরণে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার মনে নিরাশার চেয়ে আশার আলোকই অধিক প্রতিফলিত হয়। এতৎসত্ত্বেও মুসলমানদের সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ কম নহে। বড়ই আফসোসের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন, যাহারা মনে করেন যে ইসলামী আওতায় থাকিয়া ইসলামী আদর্শ লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি করা চলে না বা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। ইহাদের মতে ইসলামে উদারতা ও সহিষ্ণুতার গণ্ডী ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ ইসলামী আবহাওয়া সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে। এইরূপ ধারণা ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা পোষণকারীর অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইহার মূলে কোন সত্য দেখিতে পাই না। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় মগ্নিত হইয়া ইসলামী আওতায় বাস করিয়া মৃতনব্বী, হারীরী, আবু-আলাঅল মায়ারী, ইবন খলদুন, তরবী, সযুতী, আবুল ফারেজ, অল্‌ইদ্রিসী, আবু-রোশদ, ইমাম গজ্জালী, আল-খারিজমী, আল-কিন্দী, আল-বিরুনী, ফিরদৌসী, রুমী, নেজামী, জামী ও সাদী প্রভৃতির ন্যায় কবি, লেখক, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক প্রভৃতি ব্যক্তি যদি ইসলামী সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান লেখকগণ কেন ইসলামী আওতায় ভীত, তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অতি সহজ। এখনও খ্রীষ্টানী বা হিন্দু আওতায় থাকিয়া খ্রীষ্টানী বা হিন্দু আদর্শ লইয়া যদি বিশ্বের সেরা সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে, তবে ইসলামী আওতা ও আদর্শ কি দোষ করিয়াছে, বুঝা যায় না। এখনও কি ইক্বাল ইসলামী আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হইয়া ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যান নাই? ফলকথা, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ইসলামী মস্তিষ্কযুক্ত প্রতিভাবান পুরুষের আবশ্যক। তাহা না হইলে এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টা চলে নাই, তেমন নহে। এ প্রচেষ্টা কতখানি সবল বা দুর্বল, সে সমালোচনা করার সময় এখনও আসে নাই। মীর মশাররফ হোসেন ‘বিষাদসিঙ্ঘ’র মধ্যে দিয়া বাঙ্গালার পান্সীযোগে মুসলিম পরিবার বন্দরে আজও অফুরন্ত রসের বেসাতী বিলাইতেছেন। ইসলামী বিষয় লইয়া ইসলামী আওতায় থাকিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারা যায় কিনা, ‘নূরনবী’ ও ‘শান্তিধারা’র মধ্য দিয়া এয়াকুব আলী চৌধুরী তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। ফারসী পোষাকে ফারসী ভাব বুকে লইয়া বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য কেমন সম্ভ্রান্ত ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, অসংখ্য বাঙ্গালা গজল ও বহু কবিতায় নজরুল ইসলাম তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বুক ইসলামের প্রাচীর সম্পদে কতখানি সম্পদশালী, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অজ্ঞাত তথ্যের দ্বার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় উদ্ঘাটন করিয়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আমাদিগকে ‘বঙ্গে সুফী-প্রভাব,’ ‘বঙ্গে ইসলাম-বিস্তার’ ও ‘আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য’ উপহার দিয়াছেন।

ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন, তাঁহাদের পক্ষে আরবী ও ফারসী ভাষার ইসলামী ভাবদ্যোতক বহু শব্দের ও নামের প্রয়োগ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে এইরূপ ইসলামী শব্দ ও নাম লিখিতে গেলে কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে একটি সার্বজনীনভাবে পালনীয় নির্দেশ থাকা আবশ্যিক! আজ পর্যন্ত মুসলমান লেখকগণ কোন সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে এই সমস্ত শব্দ ও নাম লিখিতেছেন না। অথচ ইসলামী সাহিত্যে ইহার আবশ্যিকতা অত্যন্ত বেশী। যতদূর মনে পড়ে, প্রায় একযুগ পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার বিশ্বাস, বর্তমানে এক মাত্র মুসলমানদের দ্বারাই একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে। তজ্জন্য এই বিষয়ে মুসলমান বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে চরম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামী শব্দের যেরূপ অপলিখন-প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে, তাহা দেখিলে আমার ন্যায় আনাড়ীর মনেও ভারী দুঃখ হয়। এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যিক। নতুবা মুসলমানদের বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষা ঘটিত দুর্দশা যে ধীরে ধীরে শুধু চরম সীমায় পৌছিবে তেমন নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত ইসলামী শব্দাবলীর অভিধান রচনার কাজও চলিবে না।

(জন্ম : ১৮৬৯ এবং মৃত্যু ১৯৫৩, চট্টগ্রাম)

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

আবদুল গফুর সিদ্দিকী



অধুনা “বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” শীর্ষক বহু প্রবন্ধ, সাহিত্য বিষয়ক সভাসমিতিতে পঠিত এবং মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনা করেন কিম্বা আলোচনায় অগ্রসর হয়েন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেবল সাহিত্যের একটা দিকই দেখিয়া থাকেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েন না। মাত্র দুই চারিখানি পুস্তক কিম্বা দুই একখানি মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে প্রকাশিত দুই চারিটি প্রবন্ধ, তাঁহাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশেষত প্রবন্ধ লেখক মহোদয়েরা প্রবন্ধ রচনার পূর্বে অথবা প্রবন্ধ রচনার সময় বঙ্গ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ভাবিয়া দেখা বোধ হয় আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। একরূপ হওয়া যে নিতান্তই অবাস্তব, চিন্তাশীল পাঠক মাঝেই বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। এখন— বিংশ শতাব্দীর এই মিলনের যোগে, কেবল একতরফা ডিক্রি না দিয়া, দেশের কল্যাণার্থ ও দেশবাসীর কল্যাণার্থ হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ—সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, যদি কেহ তাহা অস্বীকার করেন তবে তিনি এক মহা ভ্রমে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই।

মুসলমান সম্প্রদায় যে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী, সে কথা এখন আর নূতন করিয়া বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। তাহারা বর্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষায় বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা পচাত্তর হইলেও, বহুদিন হইতে পৃথকভাবে তাহারাও সাহিত্য সাধনা দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ পর্যন্ত যে সকল পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে—প্রায় সাড়ে নয় সহস্র।

“বঙ্গ সাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, মুসলমান সাহিত্যিককে বাদ দিয়া হিন্দু সাহিত্যের কথা বলিলে চলিবে কেন? ইহাতে দেশের ও জাতির যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন? হিন্দু সাহিত্যই কি কেবল বাঙ্গালীর সাহিত্য? হিন্দু কি কেবল বাঙ্গালী?

এই শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখক মহোদয়েরা কেবল যে মুসলমানদিগকে ও মুসলমানদিগের সাহিত্যকে বাদ দিয়া প্রবন্ধ রচনায় অগ্রসর হয়েন, তাহা নহে। তাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যের আর একটা দিক্ সম্বন্ধেও চিন্তা করেন না। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহারা পণ্ডিত-শিরোমণি বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে সকল সাহিত্যেরই দুইটি দিক আছে। সেই দুইটি দিকের একটি সাধারণ দিক্ আর একটি অসাধারণ দিক্।

বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী সাহিত্যের এই সাধারণ দিককেই পল্লীসাহিত্য এবং অসাধারণ দিককেই ‘সহরের’ সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে এই পল্লী সাহিত্যকে আট-পৌরী সাহিত্য এবং ‘সহরের’ সাহিত্যকে পোষাকী সাহিত্য আখ্যা প্রদান করিতে পারেন।

আমাদের এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না যে, সাহিত্যের ‘পোষাক দিক’ হইতেছে, ‘সহরের’ খোষ-মেজাজী বাবু মিঞাদিগের কীর্তি এবং আট-পৌরী হইতেছে, গল্পী-গ্রামের ‘অন্নাভাবে’ শীর্ণ ও চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ ব্যক্তিদিগের প্রাণের উচ্ছ্বাস।

যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সাহিত্যিক বন্ধুগণ মুসলমান সাহিত্য ও পল্লী-সাহিত্যের বিষয় অবগত হইতে না পারিবেন, আমাদের মনে হয় ততদিন “বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার সময় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে না। যতদিন সহরের সাহিত্যের অনুপাতে পল্লী-সাহিত্য সংগৃহীত না হইবে, ততদিন তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে না, এবং যতদিন তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইবার মত যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হস্তগত না হইবে, ততদিন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে না।

যে পল্লীবাসী দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ, অধুনা ‘সহরের’ খোষ-মেজাজী বাবু মিঞা আমরা তাহাদিগের সেই প্রাণ মাতান ও আবেগভরা সাহিত্যকে বাদ দিয়া “বঙ্গসাহিত্যের গতি এবং তাহার পরিণতি” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া, বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু এ কার্য্য যে আমাদের পক্ষে নিতান্তই গর্হিত, কোনক্রমেই কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

তিন বৎসর পূর্বে, ১৩২৩ বাঙ্গালা সালের মাঘ মাসে, বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকড়া গ্রামে সাহিত্যিকদের যে সম্মেলন হইয়াছিল সেই সভায় আমি আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম—

‘যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সাহিত্যিকদিগের অন্তরে পল্লীসাহিত্য সংগ্রহের ও মুসলমানী সাহিত্য আলোচনার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠিবে, ততদিন বঙ্গের—তথা বাঙ্গালী জাতির জাতীয় উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হইবে না।’

‘সাহিত্য ক্ষেত্রে ও সাহিত্যিক মহলে আর ‘সখে’ দল গড়িলে চলিবে না। এখানে কথা ও কার্য এক করিতে হইবে। ‘মাতৃসেবক’ ও মাতৃমন্দিরের সেবক বলিয়া দেশের ও দশের নিকট পরিচিত হইবে, অথচ সেবকের যাহা কর্তব্য-সেবকের যাহা করণীয়, তাহা করিবে না; এই ভাবের মাতৃসেবকের এখন আর আদৌ আবশ্যক নাই। কখন ঝাঁটা সোনার আবশ্যক। নীহারী সোনা দ্বারা গিনী সোনার অলংকার প্রস্তুত কার্য এখনও চলে নাই; এখনও চলিবে না।’

‘যদি মাতৃ-ভাষাকে, বিশ্ববাসীর সম্মুখে বড় করিয়া, নিজে বড় হইয়া, জাতির গৌরবশ্লাঘা বাড়াইতে চাও, তাহা হইলে সরল মনে ও সরল প্রাণে ঝাঁটা সেবকরূপে ভাষা-জননীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যদি পার নিজে ধন্য হইবে এবং দেশ ধন্য হইবে।’

‘কিন্তু ঝাঁটা সেবক হইতে হইলে কেবল ‘সহরের’ ‘পোষাকী সাহিত্য’ লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে চলিবে না। মুসলমানী সাহিত্য ও পল্লীর আট-পৌরী সাহিত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। এ কার্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, ভাষা জননীর দক্ষিণ দিক পঙ্গু ও অচল হইয়া যাইবে।’

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে মুসলমানী-বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ সংগ্রহ, মুসলমানী সংবাদ-পত্রের ইতিহাস সংগ্রহ ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের আঙুলিয়া দরবেশদিগের জীবনকাহিনী সংগ্রহ কার্যে আমাকে অনেক সময় ব্যয় করিতে হইতেছে। কিন্তু তথাপি আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সাধ্য এই কার্যে সময় ব্যয় করিতে কৃত সংকল্প হইয়া, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা এই চারি জেলায় ‘পল্লী সাহিত্য সংগ্রহে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যদিও আমি এই কার্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই কিন্তু আমার আশা হইতেছে যে বিভূ কৃপায় শীঘ্রই আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইব।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা সন্ধান করিলে শত শত লোকের- শত শত পল্লী সাহিত্যিকের সন্ধান পাইবেন। যদি আপনারা ভাষা ও সাহিত্যের কীর্তিমান সন্তানরূপে জগৎবাসীর নিকট পরিচিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া, ভূতপূর্ব ছোট, বড়, মাঝারী সকল কবি ও সকল সাহিত্যিকের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার করিতে হইবে এবং এ কার্যে ক্লাস্ত হইলে চলিবে না, ভাল মন্দের বিচার করিলেও চলিবে না। কারণ বিচারের সময় এখনও আসে নাই; সে সময় বহু দূরে ও বহু পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে।

(জন্ম : ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ। ১৮৭২ এবং মৃত্যু ৩ আশ্বিন ১৯৬৬।)

স্বাধীনতার প্রথম পাঠ সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা শিরাজী



স্বাধীনতা! মানুষের জীবনে চির ইঙ্গিত অমূল্য ধন এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা যারা হারায়, তারা সব হারায়। শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, তমদ্দুন, কালচার, মনুষ্যত্ব এ সবই স্বাধীনতার অঙ্গাভরণ। স্বাধীনতা হারাইয়া কত দিগ্বিজয়ী জাতি, কত মনীষা সম্পন্ন দেশ, কত স্বর্ণপ্রসূ সূজলা সুফলা ভূমি ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে, নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতার শক্তি প্রচণ্ড! স্বাধীনতার আবেহায়াত পান করিয়া কত মরুচারী বর্বর সভ্যতার সোনার আলোকে আপন জনপদকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতা মানুষের আত্মার শক্তি, জাতির জীবন প্রবাহ, দেশের প্রাণবায়ু।

স্বাধীনতা-পূর্ব আমাদের দেশে সবই ছিল। দিবসে আকাশে সূর্যোদয় হইত, রাত্রিতে চাঁদের আলোয় দিগাঞ্চল ঝলমল করিয়া উঠিত, শিক্ষিতরা উচ্চ চাকুরীর মর্যাদায় প্রভু-তোষণ ও পরিজন-পোষণ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করিয়া বাহাদুর সাজিত। অশিক্ষিতরা ভাগ্যের লিখা বলিয়া নিত্য দিনের দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনাকে চির পরিচিত বলিয়া বরণ করিয়াছিল। ধর্ম প্রচারকরা দুনিয়ার নশ্বরতা ও আখেরাতের লোভনীয় আকর্ষণকে দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষের সামনে পেশ করিয়া সওয়াব হাসেল করিত। পীর মুর্শেদরা আল্লাহ নামের মাহাত্ম্য ও মাধুর্যের বয়ান করিয়া হাশরের ময়দানে সামিয়ানার স্নিগ্ধতার দিকে সকলের মন আকর্ষণ করিয়া ফিরিত। হাজার সুন্নতের বয়ান করিতে ওহোদ-বদরের সুন্নতের কথা বলিবার ফুরসতও জুটিয়া উঠিত না। হানাফী মোহাম্মদীর দলাদলি, কত বাহাস, কত তর্ক, কত ফতোয়া, কত ভোট, কত উকিল মোক্তার, ডাক্তার মায়-মস্ত্রী, মেম্বর পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের দেশে ছিল। পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদ্দৌলার নিহত হওয়ার ব্যথা উপশম করিবার জন্য ইংরেজ আমাদের দেশে দেলদুয়ারের নবাব, ঢাকার নবাব, পশ্চিম গাঁওয়ের নবাব, ধনবাড়ীর নবাব, জলপাইগুড়ির নবাব, রতনপুরের নবাব, শায়েস্তাবাদের নবাব, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবাব, বর্ধমানের নবাব, ইত্যাদি কত নবাব দ্বারা আমাদের নবাবী গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করিয়াছিল। দারোগা, সাবরেজিস্ট্রার, ম্যারেজ

রেজিস্ট্রারীর ‘কাজী’ পদবী আমাদের কাছে খানিকটা মাত করিয়া রাখিয়াছিল। আচকান, পা-জামা, লালটুপির বহর আমাদের মুসলমানীতে উদ্ভুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীতে ধুতি, শার্ট, ব্যবহার করিয়া অফিসে দরবারে, সভা-সমিতিতে ‘মৌলবী সাহেব’ সাজিবার আগ্রহ পুরাপুরি আমরা এখনোয় করিয়াছিলাম। ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ছিল ছেলেদের নেশা। বিদ্যাসাগরী বিদ্যায় সেকেলে সাহেবের সদৃশ পুরাপুরি আমাদের কাজ কর্মে প্রকাশ পাইত।

বিদেশীরা আমাদের রক্ষক। পাহারার কাজ তাহাদের। ম্যানচেস্টারের কাপড়, লিভারপুলের লবণ, জার্মানীর সুই, জাপানের কলকজা আমাদের সকল কাজে যোগান দিত। কোন কিছুই ভাবনা ছিল না। পরাধীনতার সেই একান্ত ভাববিহীন আরাম-পিয়াসী মনের আকাশ জুড়িয়া বসিল একখন্ড কালো মেঘ, যাহার সূচনা হইল ১৯২০ খৃষ্টাব্দের খেলাফৎ ও জালিয়ানওয়ালাবাগে জালেমদের পৈশাচিক জুলুমের প্রতিক্রিয়ার সেই মেঘ শুধু পানিবর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বজ্র ফেলিয়াছে, বিদ্যুৎ চমকাইয়াছে। সেই ঝড়ের দিনে রঙ্গিন শাড়িতে ভূষিতা বধু স্বামীকে ঘরের বাহিরে আসিতে দেয় নাই; গোলামীর ঘৃণা-সিক্ত রুটির অপূর্ব স্বাদ অনুভব করিয়াছে, ছেলেদের চাঞ্চল্যকে চোখ রাঙ্গাইয়া শান্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছে। সেদিনের ঝড়ো হাওয়ার হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় মুকুটের সাধ সাধনা কম করে নাই। কিন্তু ইংরেজদের ফাঁসির দড়িতে ঝড় বাঁধা পড়ে নাই, কারাগারে ঝড় আবদ্ধ হয় নাই, বন্দুকের গুলীতে ঝড় স্তব্ধ হয় নাই, ঝড় চলিয়াছে। ভাল ছেলেরা লেপ মুড়ি দিয়া কল জড়াইয়া খাটের নীচে পেতৃক প্রাণ রক্ষা করিবার কলা-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। কিন্তু দুষ্ট ছেলেরা ঘরের বাহিরে ঝড় দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে। বায়রন, কীটস, শেলী, গ্রে শেলফে বন্ধ করিয়া, বিদ্যাসুন্দর ও মেঘনাদবধ দেবরাজে আটকাইয়া, হেগেল, কান্ট, ইমামনকে আলমারিতে তুলিয়া শয়ন প্রদীপ ফুঁ-দিয়া নিভাইয়া দিয়া ঝড়ের ডাকে দুষ্ট ছেলেরা আরামের বন্ধন কাটিয়া ঘরের বাহির হইয়াছে। সাগরের ডাকে পাহাড়ের পাথর ফাটাইয়া ঝরনার ধারা যেমন করিয়া নামিয়া আসে তেমনি করিয়া এই ‘দুষ্ট’ ছেলেরা বাহির হইয়া আসিল। বিপদের মেঘে দশ দিক অন্ধকার, একেবারে সূচিভেদ্য অন্ধকার! সেই অন্ধকার আকাশের বন্ধ চিরিয়া বিদ্যুৎ আলোকে একটি কথা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল-স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। রক্তে লাগিল উৎসাহের আগুন, মগজে লাগিল প্রলয়ের মত্ততা। যাত্রা শুরু হইল, স্বাধীনতার আহ্বানের যাত্রা।

‘অনল প্রবাহে’র আগুন ঢালা পথে ‘অগ্নিবীণা’র প্রলয় শিখা জ্বালাইবার জন্য ডাক আসিল। সে ডাকে কত মায়ের আদুরে দুলাল আঁচল ছাড়িয়া সাড়া দিল, কত স্বামী নববধূর বাহুবন্ধন এড়াইয়া পথে ছুটিল। কত ভ্রাতা স্নেহময়ী বোনের অশ্রুজল ঝরাইয়া পথে নামিল। স্বাধীনতার ডাক সে কী সহজ! তাকে তো এড়ানো যায় না, সে ডাকে সাড়া না দিয়া উপায় নাই। হাকিম হইবার, বড় চাকুরী করিবার, মটর লঞ্চে বিহার করিবার, প্রাসাদবাসী সাজিবার আশায় যাহারা গুটি গুটি করিয়া শিক্ষার ডিগ্রি কুড়াইবার জন্য হাত তৈয়ার করিতেছিল তাহাদেরও চোখের সামনের সে মোহবিস্তারী সোনার পর্দা মুহূর্তে উড়িয়া গেল। কি ভয়ঙ্কর! মুরব্বীরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল-ছেলেরা পথে বাহির হইল। স্বাধীনতার পথে, আজাদীর পথে। পদে পদে বিপদের পাথরে ঠোঁকর খাইয়া পা আটকাইয়া যাইতে চায়, কিন্তু চলাতো থামে না। পথের দু’ধারে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো ইংরেজের সৈন্য, ইংরেজের নফর, ইংরেজের গুপ্তচর। ইংরেজ জানিত, এই দুষ্টদের ঠাণ্ডা না করিলে তাহার নিস্তার নাই, আর ইংরেজের তকমা আটা মোসাহেবের দল জানিত, এই দুষ্টরা জয়ী হইলে আমাদের রক্ষা নাই। উভয়েই প্রাণপণ করিয়া এই স্বাধীনতার পথযাত্রীদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। ইংরেজের কত অস্ত্র, কত সেপাই, কত মোসাহেব। উচ্চ ডিগ্রিধারী বড় কর্মচারী হইতে গাঁয়ের চৌকিদার পর্যন্ত ইংরেজের। অন্যদিকে ইংরেজের তহশীলদাররা ছোট বড় জমিদার, তালুকদার, জোতদাররূপে ইংরেজের সহায়। সবাই মুখে টিটকারি, হাতে মেসিন-গান, বুকে বুলেটের টোটোর মালা লইয়া আগুয়ান। বেয়নেট, লাঠি ও হ্যাণ্ডকাপ হাতে ইংরেজের দারোগা পুলিশ সন্ত্রস্ত। আর এদিকে ইংরেজের বলা ‘বখাটে’ ‘দুষ্ট’ ছেলেরা নিরস্ত্র নিঃসম্বল অবস্থায় স্বাধীনতার শক্তিমান শত্রুদের সম্মুখীন।

ইংরেজ জ্বালাইয়াছে বারুদের আগুন আর আজাদির সত্যসেনারা জ্বালাইয়াছে নিজেদের চর্বি দিয়া মশাল। সেই মশালের আগুনে ঘুমন্ত জনগণের মোহ টুটিয়া গিয়াছে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আকুল আবেগ লইয়া স্বাধীনতার সৈনিকদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অধীনতার অন্ধকার রাত্রি মুক্তি যোদ্ধাদের নিষ্কলুষ হৃদয়ের ধারায় রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে। রক্ত রাঙ্গানো পথ বাহিয়া স্বাধীনতার সোনার রথ উষার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। অধীনতার অন্ধকার রাত্রি মুক্তি যোদ্ধাদের নিষ্কলুষ হৃদয়ের ধারায় রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছে। রক্ত রাঙ্গানো পথ বাহিয়া স্বাধীনতার সোনার রথ উষার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে— আসিয়াছে প্রভাত, মুক্তির প্রভাত। মানুষের হৃদয় বাগিচায় মনুষ্যত্বের ফুল কুসুমদল প্রস্ফুটিত হইল।

স্বাধীনতা যখন আসিয়াছে, দারিদ্র্য, দুঃখ, অকাল মৃত্যু এত থাকিবার নয়। যদি আজও তাহা বিলুপ্ত না হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে এ আলোক আজিও সর্বত্র পৌছায়নি। স্বাধীনতার মাহাত্ম্যই এই যে, তাহার স্পর্শে মৃত্যু দূরে চলিয়া যায়, মুষ্টিমেয়ের অভিজাত্য, ঐশ্বর্য, বহুজন্যের মৃত্যুর কারণ হয় না। ছলনা, চাতুরী, হিংসা, ঈর্ষা, মিথ্যা, সূর্যালোকে কুয়াশা মিলাইবার মত মিলাইয়া যায়। ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের ষড়যন্ত্রে অগণিত জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতির চির অবসান হইয়া থাকে। স্বাধীনতা যে জাতি লাভ করিয়াছে তাহার চিন্তায় স্বাধীনতা, বাক্যে স্বাধীনতা, কর্মে স্বাধীনতা, কিছুতেই ব্যাহত করিতে পারে না। যে একবার বৈদেশিক শাসন, শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষার বেড়া জাল ছিন্ন করিয়াছে, তাহাকে আবার শিকল পরানো সহজসাধ্য নয়। মানুষ সব ছাড়িতে পারে, সব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য স্বাধীনতার মূল্য অমূল্য যাহা নিজের বুকের তাজা রক্তের বদলে ক্রয় করিতে হয়। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি দেশের সকলের জন্য, সব মানুষের জন্য। সকলের সমকল্যাণই দেশের কল্যাণ। এই সর্ব কল্যাণ সাধনের পথে যাহারা ব্যবধান, বিভেদ সৃষ্টি করে, তাহারা স্বাধীনতার শত্রু, মানুষের শত্রু, দেশের শত্রু। কথার জাল বুনিয়া, তর্ক করিয়া, যুক্তির বহর চালাইয়া সময় কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না হইলে জাতি সংগ্রামমুখর হইয়া উঠিবেই-তাহাকে-তাহাকে কিছুতেই দাবাইয়া রাখা যায় না। ইহাই স্বাধীনতার প্রথম পাঠ। স্বাধীন দেশের হে স্বাধীন সূর্য! তোমার আলোকে এই পাঠ পড়িলাম।

পলাশীর পর মুহম্মদ আবু তালেব



বর্ধমান শহরের ‘বাস্তাসী কা বাগ’ থেকে ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইট জানান যে, বর্ধমানের রাজা মিসরী খান, দূদার সিং, ফকীরগণ ও বীরভূমাগত এক সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ অবস্থানের উপর ভীষণ আক্রমণ চালায়। বর্ধমান ও সঙ্গতগোলার মধ্যবর্তী নদীর তীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অতঃপর ১৭৬৪ সালেও পদচ্যুত নবাব মীর কাসিমের পক্ষে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের এক বিরাট বাহিনী বস্ত্রারে সম্মিলিত হয়। ১৭৬৪ সালের ১২ই মে তারিখে হুগলীর ফৌজদার বাদল খান ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর সাহেবকে যে চিঠি লেখেন, তাতেও এই ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

‘তিনি জানতে পেরেছেন যে, বর্তমান মাসের ৩রা তারিখে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহ, পাটনার গভর্নর রাজা বেনী বাহাদুর, মীর কাসিম, সমরু, হিম্মত গীর এবং অন্যান্য শত্রু-সেনাপতিগণ কামান, রকেট ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রসহ তাঁদের কাছ থেকে প্রায় দুই অথবা তিন ক্রোশ দূরে পাঁচপাহাড়স্থিত মেজর কারনাকের ছাউনি আক্রমণ করেন। দুই সৈন্যদল সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত তুমুল গোলা ও ছোট অস্ত্রযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবং শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়।’ বিখ্যাত ঐতিহাসিক গুলাম হুসাইনের ‘সীয়ারুল মুতা আখেরীন’ গ্রন্থেও এ কাহিনী লিপিবদ্ধ হ’য়েছে। তাতে আছে—‘রাজা বেনী বাহাদুর ও বেনারসের রাজা বলবন্তসিংহ মন্ত্রী পাশেই অবস্থান গ্রহণ করেন। রোহিলা-প্রধান এনায়েত খানের নেতৃত্বে তিন হাজার ভাড়াটিয়া রোহিলা সৈন্যও ছিল। তার পাশেই ছিল সন্ন্যাসী বা ফকীরনেতা হিম্মত গীরের অধীনস্থ পাঁচ হাজার ফকীর সেনা। তারা তাদের গুরুর মতই অর্ধনগ্ন ছিল। গোসাই তাঁর সেই অর্ধনগ্ন সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে ইংরেজ বাহিনী এমন তীব্রভাবে সে আক্রমণ প্রতিহত করে যে, তাদের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধে অনেকেই হতাহত হয়।’

এর পরেই নবাব মীর কাসিমের ভাগ্যবিপর্যয়। ভাগ্যান্বেষী নবাব সুদীর্ঘ
বারো বছর ধরে ফকীরের বেশে সুদূর রাজপুতনার ধূসর মরুবক্ষে,
বুন্দেলখণ্ডের পথে-প্রান্তরে, মধ্য-ভারতের গিরি-গহ্বরে, ঝাড়-জঙ্গলে দেশের
নামে, স্বাধীনতার নামে, মানবতার নামে, ধর্মের নামে, কত মানুষের কাছে কত
আবেদন-নিবেদন করলেন, কত অশ্রুবিসর্জন দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল
না। অবশেষে জন্মভূমি থেকে দূরে দিল্লীর শাহ জাহানাবাদের অন্তর্গত এক
অখ্যাত পল্লীতে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন
(রবিউসসানী, ৩০, ১১৯১ হিজরী, মুতাবিক ৭ই জুন, ১৭৭৭ ঈ)।

এককালের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বাংলা-বিহার উড়িষ্যার
মহাসম্মানিত নবাব মীর মুহম্মদ কাসিম আলী খানের দেশ উদ্ধারের সকল
প্রচেষ্টা, প্রজ্ঞার ও দেশের কল্যাণ কামনা ও সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান
হয় এবং অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁর শেষ অঙ্গাবরণ দিয়ে তাঁর অন্তিম শয়ন-শয্যা
রচিত হয়।

(জন্ম : গোয়ালখালি, খুলনা। ১ এপ্রিল ১৯২৮।)

বাংলা সাহিত্যে পলাশীর রক্তপলাশ শাহাবুদ্দীন আহমদ



বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় বা জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ নাটক শতীন সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলাহ'র একটি সংলাপ ছিল এমনি : 'রাজা রাজবল্লভ, শক্তিমান রায়দুর্লভ, ভাগ্যবান জগৎশেঠ! বাংলা শুধু হিন্দুরও নয়, বাংলা শুধু মুসলমানেরও নয়; মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। অপরাধ যা করেছি তা এই মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই করেছি; আঘাত যা পেয়েছি তা এই মিলিত হিন্দু-মুসলমানের কাছেই পেয়েছি; পক্ষপাতিত্বের অপরাধে আমি অপরাধী নই! তাই মুসলমান বলে আপনারা আমার প্রতি বিরূপ হবেন না।'

যদিও মূলত এটি সিরাজউদ্দৌলার বক্তব্য নয়, নাট্যকার শতীন সেনগুপ্তের বক্তব্য তবু এটা সত্য যে, সুব বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে পলাশীতে সিরাজউদ্দৌলার তথা বাংলাদেশের তথা উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ এবং জগৎশেঠ তাদের অন্যতম ছিলেন। আর এ কথাও সত্য সংলাপটিতে সিরাজের কণ্ঠে যে আকুতি ফুটে উঠেছে তাও মিথ্যা নয়। সিরাজ-বিদ্রোহী ঐতিহাসিকরা সিরাজ-চরিত্রকে যতই কলুষিত করার চেষ্টা করুক তাতে ইংরেজের হাতে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা তুলে দেয়ার ষড়যন্ত্রের কলঙ্ক মুছে যায় নি। সে জন্যে নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন—

কীর্তিনাশ! বৃথা নাম, বৃথা অভিমান!

পার ভূমি মানবের কী কীর্তি নাশিতে?

নাশিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে

রাজবল্লভের কীর্তি; পার কি নাশিতে

সেই পৃষ্ঠা হতে সেই কলুষিত নাম?

সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপ পার কি লিখিতে?

এই উক্তি ধৃত 'পলাশীর যুদ্ধ'ই বাংলা সাহিত্যে 'পলাশী'র উপর লেখা প্রথম মহাকাব্য। কিন্তু এই নাটকে নবীনচন্দ্র সিরাজউদ্দৌলার প্রতি যেমন উদারতা প্রদর্শন করতে পারেন নি তেমনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর মত তিনি ব্রিটিশের ভারত অধিকারকে 'বিধিকৃৎ' বলে মনে করেছিলেন। এই কাব্যটিতে তিনি লিখেছিলেন :

শুন, বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ

বিধিকৃৎ, ব্রিটিশের রাজ্য-নিদর্শন!

বলা বাহুল্য হিন্দুদের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাওয়ার চেয়ে মুসলিম রাজত্বের অবসানটা ছিল বেশী স্বস্তির। তাঁদের অনেকের লেখা দেখে মনে হয় মিত্রশক্তি হিসেবে সেদিন বৃটিশ তাঁদের রাজ্য উদ্ধার করে দিয়ে গেলো। আমরা ঈশ্বরচন্দ্র-হেমচন্দ্র থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু লেখক কবির সেজন্যে ইংরেজের প্রতি অসামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখেছি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তো রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি এমন মাতৃভক্তির শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখিয়েছেন যে মনে হয় তিনি তাঁদের হিন্দু দেবী শ্রীদুর্গার পূজা প্রশস্তি গাইছেন। একটি গানে তিনি লিখেছেন—

ওমা কুইন্ তোমার, ইন্ডিয়া ধাম্,

রুইন করো না কো!

যদি সোনার ভারত, খাস্ কোরেছ্,

বাস করে, মা, থাকো থাকো!

শাস্ত্রে বলে পরামর্শে,

আপন চক্ষে বোণাবর্ষে,

ভূমি এলে ভারতবর্ষে,

হর্ষে রবে সব।

চারিদিকে উঠবে শুধু জয় জয় জয় রব।

প্রজাগণে কোলে টেনে,

ছেলে বলে ডাকো ডাকো।

বঙ্গবাসী আমরা যত;

অনুরত অনুরত,

অবিরত করি কত,

শুভ বাসনা।

জয় জয় ভিক্টোরিয়া, মুখে বোষণা।

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ]

আর এক স্থানে শ্রীগুপ্ত লিখেছেন—

ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাই রে।

এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগান গাইরে। [যুদ্ধ শান্তি : সম্পাদনায় : মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা]

আর বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দ মঠ’ -এ সন্ন্যাসীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে ‘চতুর্থ খণ্ড’ এর প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন : ‘সকলে বলিল, ‘মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।’ গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাতে দলবদ্ধ লইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বত্র লুণ্ঠিয়া

লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, ‘মুই হেঁদু’।

দলে দলে ব্রহ্ম মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল। অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগর রক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠ সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে ঘার রক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, ‘আসুক, সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।’ মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর কোরানশরিফ বেবাক্ কি বুটো হলো; মোরা যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে করিতে নাবনম। দুনিয়া সব ফাঁকি।’

পলাশী যুদ্ধের সোয়াশ বছর পর বঙ্কিমের এই বানানো ইতিহাসের মধ্যে হিন্দু মানসিকতার যে রূপ ফুটেছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মানসিকতার সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য নেই। বিশেষ করে ‘আনন্দমঠ’ এর চতুর্থ খণ্ডের ‘অষ্টম পরিচ্ছেদ’ -এ মুসলিম রাজত্ব অবসানে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের অনন্ত আনন্দের কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই আনন্দের কারণ কি? বঙ্কিমচন্দ্র তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে তার উদ্ধৃতির আবশ্যক মনে করছি। কারণ পলাশী যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কার লাভ ক্ষতি বেশী হ’ল বঙ্কিমের এই বক্তব্যে তার প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিম লিখছেন : ‘সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত। এমত সময়ে চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন, সত্যানন্দ আজ মাঘী পূর্ণিমা।’

সত্য। চলুন- আমি প্রবৃত্ত। কিন্তু হে মহাশয়! আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্কটক করিলাম- সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

মিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, ‘তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য নাই। অনর্থক প্রাণি হত্যার প্রয়োজন নাই।’

সত্য। মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয় নাই- এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইবে না- তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, ‘হে প্রভু! যদি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে? তিনি বলিলেন, ‘না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।’

এরপর এক দীর্ঘ বক্তৃতায় চিকিৎসক (আসলে বঙ্কিমচন্দ্র) সত্যানন্দকে (আসলে সমস্ত হিন্দু যুবশক্তিকে) বোঝালেন- ‘সনাতন ধর্মকে পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার আবশ্যিক। এখন এ দেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই- শিক্ষায় এমন লোক নাই; আমরা লোক শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত; লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এ দেশীয় লোক সুশিক্ষিত হইয়া বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপিত হইবে। যত দিন না তা হয়; যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান গুণবান আর বলবান না হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে, ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে- নিষ্কটকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।’

সত্যানন্দ চিকিৎসক মহাপুরুষকে যখন অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধকার্যে কেন নামানো হলো যদি ইংরেজদের রাজ্য স্থাপনই সবার অভিপ্রায় হয়, এই প্রশ্ন করলে মহাপুরুষ (বঙ্কিমচন্দ্র) জবাব দেন : ‘শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়; এমন শক্তিও কাহারও নাই।’

সুস্পষ্টভাবে এখানে মুসলমানদের শত্রু বোঝানো হয়েছে আর ইংরেজদের মিত্র। মুসলমানের রাজত্ব মানে শত্রুর রাজত্ব। অতএব পলাশীর যুদ্ধ ছিল মুসলমানের সঙ্গে মিত্র-শক্তি বৃটিশ-হিন্দুর যুদ্ধ। সে জন্যেই রাজা রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ, উমি চাঁদ, জগৎশেঠরা বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি বরং প্রতিপক্ষেরা স্বাধীনতা যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধে যে কৌশলী ছদ্মবেশী যুদ্ধ করেন তাঁরা তাই করেছিলেন। অতএব পলাশীর বেদনাদায়ক ইতিহাস মুসলমানের পতনের ইতিহাস, হিন্দুর উত্থানের ইতিহাস। ‘পলাশীর যুদ্ধ’ -এ নবীনচন্দ্র তাই এ কথা বলতে ঘিধা করেন নি-

ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন!

আজি হতে যবনেরা হ’ল হতবল’

কিবা ধনী মধ্যবিত্ত, কিবা দীন-হীন,

আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে-সকল।

অর্থাৎ সিরাজের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যে বা গুণ-কীর্তনের জন্যে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ লিখিত হয় নি। পলাশীর যুদ্ধ লিখিত হয়েছিল তাঁর স্ব-জাতির স্বার্থোদ্ধারের জন্য। সুকুমার সেন তার ‘বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ -এ লিখছেন : ‘নবীনচন্দ্র

প্রত্যক্ষভাবে সিরাজউদ্দৌল্লাহর সমর্থন করেন নাই। কেননা তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানা ছিল- ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। আর সরকারী চাকরির খাতিরে ক্লাইভের বিরুদ্ধে কিছু বলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করিয়া নবীন চন্দ্রকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

তবু ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নবীনচন্দ্রের মনে যে একটি বেদনার অস্পষ্ট আঘাত হেনেছিল তা বোঝা যায় রাজবল্লভের নামের বিশেষণে ‘কলুষিত’ শব্দ ব্যবহার করায়। বলেছি অধিকাংশ হিন্দু, সব হিন্দু নয়, মুসলিমদের শত্রু মনে করত না। আর ইংরেজের ভারত অধিকারকে হিন্দুরা প্রথমে আশীর্বাদ ভাবলেও তাদের প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল গোষ্ঠীরা অনতিবিলম্বে বুঝতে সমর্থ হয়েছিল যে ইংরেজ তাদের অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেনি। ইংরেজ যে ভারতে হাতীর মত মশার ঝুঁড় বসিয়ে ভারত থেকে রক্ত শুষতে শুরু করেছে শিক্ষিত দেশপ্রেমিক হিন্দুরা অনতিবিলম্বে তা বুঝতে শুরু করে। তারা দেখতে পায়-

‘১৮৩৪ থেকে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে কাপড় রফতানী বাড়ল ১০ লক্ষ থেকে ৫১০ লক্ষ গজেরও উপর। ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানী কমে গেল- ত্রিশ বছরে (১৮১৫-১৮৪৪) সাড়ে বার লক্ষ থেকে তেষষ্টি হাজারে। ১৮১৫ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে রপ্তানীকৃত ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য নেমে এল ১৩ লক্ষ ডলার থেকে মাত্র এক লক্ষ ডলারে অর্থাৎ ১৭ বছরে ক্ষতির পরিমাণ ১২ থেকে ১৩ গুণ। অন্য দিকে একই সময়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে পাঠান বস্ত্রের মূল্য বেড়ে গেল ২৬ হাজার ডলার থেকে ৪ লক্ষ ডলারে। অর্থাৎ বর্ধিত লাভের হার ষোল গুণ। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ যে দেশ থেকে সুতীবস্ত্র রপ্তানী হ’ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, ১৮৫০ সালের মধ্যে সে দেশ আমদানী করতে লাগল ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বস্ত্রের এক-চতুর্থাংশ। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের সেই আমদানী ৫২০০ গুণ বেড়ে গেলো। বিদেশী শ্রমশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে বাংলার তাঁতীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেলো। একইভাবে একটির পর একটি শ্রমশিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। সুতীবস্ত্রের মত রেশমী বস্ত্র, পশমী বস্ত্র, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, কাচ ও কাগজ সব কিছুই একই পরিণতি ঘটল। শ্রমশিল্পের ধ্বংসের সাথে সাথে চাষের উপর পড়ল অস্বাভাবিক চাপ। কারুকাকারেরা শ্রমশিল্পী থেকে বিভাড়িত হয়ে কাজ নিল নীল চাষী মজুরের। নতুবা গ্রহণ করলো ভিক্ষাবৃত্তি। অভাব অনটন আর অন্নাভাবে দেশ দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে লাগলো। ১৮৫১ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে মোট ৬ টি দুর্ভিক্ষে মোট ৫০ লক্ষ এবং ১৮৫৭ সালে থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে মোট ১৮টি দুর্ভিক্ষে দেড় কোটি লোক মারা গিয়েছিল।’ [মেসবাহুল হক : পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ]

এই অবস্থায় বেশ কিছু হিন্দু-মনীষীর টনক নড়ল। হিন্দু লেখকদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিহারী লাল, নিখিলনাথ রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এর মত ঐতিহাসিক। সিরাজউদ্দৌলার চারিত্রিক দোষত্রুটির উর্ধ্বে তাঁর দেশপ্রেমিক চরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন হল এবং ‘পলাশীর যুদ্ধ’ যে শুধু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে ট্রাজেডি নয় বরং গোটা ভারতের সমস্ত মানুষের জন্যে ট্রাজেডি সেই ইতিহাস উদঘাটিত হল। এখন থেকে বৃটিশবিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠল পলাশী – যার নায়ক সিরাজউদ্দৌলা।

বঙ্কিম-মানসিকতার উল্টো মেরুর বাতাস বইতে শুরু হল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ১৯০৬-এ ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক লিখলেন। ভূমিকায় লিখলেন : ‘বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ-চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন।’

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে ঐ সব ঐতিহাসিকের সংগৃহীত উপাদান নিয়ে তাঁর নাটক নির্মাণ করেন; কিন্তু বৃটিশ সরকার এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয় ১৯১১ সালের ৮ই জানুয়ারী।

কিন্তু ইতোমধ্যে সিরাজউদ্দৌলা হয়ে ওঠেন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রতীকী আদর্শ। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতায় নজরুল লিখলেন ‘বৃথাই গেলো সিরাজ-টিপু-মীর কাসিমের প্রাণ বলিদান।’ আর ‘কাগুরী হুশিয়ার’ কবিতায় লিখলেন :

কাগুরী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রাস্তর;

বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর।

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাकर।

উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর।

১৯৩৮-এ প্রকাশিত হল নজরুলের অবিস্মরণীয় কয়েকটি গান নিয়ে শচীন সেনগুপ্তের নাটক ‘সিরাজউদ্দৌলা’। তার শেষ গানটি ছিল ‘পলাশী’ কে নিয়ে :

হায় পলাশী!

‘এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ককালীমা রাশি!

হায় পলাশী!!’

আত্মঘাতী স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুমকুম।

তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশী কুসুম।

তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ -সকাশ

সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি।

বস্তুত সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশী পরস্পর জড়িত বা সম্পৃক্ত একটি বিষয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে অতিমর্মান্তিকতায় পলাশীর যুদ্ধ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু স্বধর্মীদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার এমন জঘন্য ঘটনা ইতিহাসে খুব কমই আছে। স্বার্থপরতা কত অন্ধ হলে মানুষ এমন বিশাল আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে পলাশীর যুদ্ধ সম্ভবত তার একমাত্র উদাহরণ। এই বেদনার বিদ্রোহ থেকে তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শচীন সেনগুপ্তের পরে সিকান্দার আবু জাফর ৪ অঙ্কে ১২ দৃশ্যে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নামে আর একটি নাটক লেখেন ১৯৫১-এ। শচীন সেনগুপ্ত তার নাটকের ভূমিকায় লিখেছিলেন : ‘আমি এই (সিরাজ) চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছি, সিরাজের মতো উদার স্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর মতো তেজস্বী, নিষ্ঠুর, সত্যপ্রিয় তরুণের পক্ষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বয়স যদি তাঁর পরিণত হত, কূটনীতিতে যদি তিনি পারদর্শী হতে পারতেন, তবে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শাসক হিসেবে হয়তো বড় হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অন্তরের দয়া-দাক্ষিণ্যই তাঁকে তাঁর জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়। অধিকাংশ বাঙালীর চরিত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য। সিরাজ ছিলেন ঝাঁটি বাঙালী। তাই তাঁর পরাজয়ে বাংলার পরাজয় হল। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীও হল পতিত।’

আর সিকান্দার আবু জাফর তাঁর নাটকের ভূমিকায় লিখলেন : ‘ধর্ম ও নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা মানবীয় সদগুণগুলিকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারীগণ ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের যে পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ ও মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।’

পলাশীর যুদ্ধের মর্মান্তিক কাহিনী একটি মহাকাব্য নবীনচন্দ্রের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ আর তিনটি নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে; আর আছে নজরুলের কয়েকটি গানের মধ্যে। অথচ এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মহাকাব্য বা মহাউপন্যাস লেখা যেত সে উপন্যাস বা মহাকাব্য লিখিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র ‘মীর কাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ কাহিনীকে অবলম্বন’ করে ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাস লিখেছিলেন। সেটা পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাস। সেখানে বঙ্কিমের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সিরাজউদ্দৌলার প্রতি তাঁর তেমন সহানুভূতি ছিল না। বঙ্কিম লিখছেন : ‘মীর কাসেম কিস্তিত মৃদুতর স্বরে কহিলেন, ‘আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি— আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, ‘রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।’ কেন

আমি তাহা করিব; যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব- অনর্থক কেন পাপ কলঙ্কের ভাগী হইব। আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি-বা মীর জাফরও নহি।’

এটা মীর কাসেমের কথা নয়, বক্শিমের কথা। অতএব সিরাজউদ্দৌলাকে নিয়ে বা পলাশীর পটভূমি নিয়ে মুসলিম-বিদ্বেষী বক্শিম উপন্যাস লিখতেন এমন চিন্তা করা কঠিন। আর তিনি লিখলেও তা ‘আনন্দমঠ’ এর মত নিম্নরুচির নিম্নস্তরের আর একটি উপন্যাস হয়তো হত। অন্যদিকে নবীনচন্দ্র ‘পলাশীর যুদ্ধ’ নামে যে মহাকাব্য রচনা করেন তাতে উদ্ধৃতিযোগ্য দু’ একটি চিন্তাকর্ষক পঙ্ক্তি ছাড়া মহাকাব্যের মহিমা নেই। স্বয়ং অনুন্নত সংকীর্ণ চিন্তা কিন্তু সাহিত্য-জ্ঞানী বুদ্ধিমান বক্শিম ‘পলাশীর যুদ্ধ’ কাব্যকে মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এবং হেমচন্দ্রের ‘বৃত্রসংহার’-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন সময়কালের আধুনিকতার জন্যে নবীনচন্দ্রের পক্ষে খুব বেশী কল্পনানির্ভর হওয়া সম্ভব না হওয়াতে ‘যথেষ্টাঙ্গমে বিচরণ করিয়া আপনার অভিলাষ মত’ কাব্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। তিনি লিখেছিলেন- ‘পলাশীর যুদ্ধের ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদের মত সামান্য মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এ স্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। ‘বৃত্রসংহার’ ও ‘পলাশীর যুদ্ধ’ -এর তুলনামূলক আলোচনায় বক্শিম বৃত্রসংহারে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও নাটক আছে বলেছিলেন আর বলেছিলেন পলাশীর যুদ্ধে আছে ‘গীতিকাব্য’। উভয় কাব্যে সংঘাত নেই বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি নবীনচন্দ্রকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন-

ইংরেজীতে বায়রনের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্য, বাঙ্গালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেই তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্য। তাঁহাদিগের হৃদয়, নিরুদ্ধ ভাব সকল আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ যখন ছোটে তখন তাহার বেগ অসহ্য।’

কিন্তু সেই নবীনচন্দ্র যে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ রচনায় ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ -এর সাফল্য লাভ করতে পারেন নি তা বলা বাহুল্য। কারণ যে জাতি, প্রেম, কবিত্ব ও কল্পনা শক্তি মহাকাব্য রচনার মূল প্রেরণা নবীনচন্দ্রের সেই জাতি-প্রেম ও কল্পনা কবিত্বের শক্তি ছিল না। কেননা পলাশী যুদ্ধে যে জাতি পরাজিত হয় সে জাতি ছিল প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতি। সুতরাং তাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক গভীর আবেগ উদ্দীপ্ত মহাপ্রেরণা হতে পারে সেখানে তার উপস্থিতির অভাব স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় যে জাতির কবির দ্বারা এই মর্মান্তিক ঘটনার উপর অমর কাব্য লিখিত হওয়া উচিত ছিল বা সম্ভব ছিল তাদের মধ্য থেকে সেই কবির জন্য হলেও তাঁরা সেই কর্মটি সম্পন্ন করার আন্তরিক ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেননি অথবা চঞ্চল ঝঞ্ঝাফুল্ল কাল ছিল তাঁদের একগ্রতা ও ইচ্ছার প্রতিকূল।

(জন্ম : বশির হাট, ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত। ২১ মার্চ ১৯৩৬, মৃত্যু ২০০৭।)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত মোহাম্মদ আবদুল মান্নান



রাষ্ট্র কখনো সাগরের বুকে একটি দ্বীপের মতো হঠাৎ জেগে ওঠে না। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখারও একটি পুরাতত্ত্ব থাকে, তার একটি অতীত থাকে। বর্তমান জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হলো পূর্বপুরুষদের সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা। সেই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত হয় বর্তমান স্বাধীনতার শিকড়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটেছে এ পাললিক জনপদের মানুষদের নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। এই সংগ্রামের রয়েছে এক বিশ্বয়কর ধারাবাহিকতা ও অসামান্য বহমানতা। সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরব-পতাকা হাতে এই ভাটি অঞ্চলের সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াই করেছেন আর্থ আত্মসনের বিরুদ্ধে। তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এই জনপদ বিবেচিত হয়েছে উপমহাদেশের বিশাল মানচিত্রে আর্থপূর্ব সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থলরূপে। এ এলাকার জনগণের অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নিকট-অতীতে এ লড়াই তীব্র হয়েছে ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরের বর্ণহিন্দুদের সাথে। আর্থরা তাদের অধিকার বিস্তৃত করে নানা ঘোরাপথে যখন এ বদ্বীপে উপনীত হলো, তখন থেকে একেবারে হাল আমলের বাংলাদেশের জনগণের আধিপত্যবাদবিরোধী লড়াই পর্যন্ত এ জাতির সংগ্রাম ও সংস্কারের মূলধারা রচিত হয়েছে অভিনু প্রেরণার এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

এ অঞ্চলের মানুষের বংশধারায় বহু-বিচিত্র রক্ত প্রবাহের মিশেল ঘটেছে। সেমিটিক দ্রাবিড় রক্তের সাথে এসে মিশেছে অস্ট্রেলয়েড, মঙ্গোলীয়, এমনকি আর্থ-রক্তের ধারা। এ প্রবাহ এমনভাবে মিশে গেছে যে, নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় কাউকে এখন আর স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। চেহারার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এলাকার গরিষ্ঠ মানুষের মিল রয়েছে তাদের জীবনদৃষ্টিতে। জীবনদৃষ্টির অভিনুতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তাদের জীবনের অভিনু লক্ষ্য এবং একত্রে বসবাসের ও জীবনধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বাসনা ও প্রতিজ্ঞা। অভিনু বোধ ও বিশ্বাসের ডিঙিতে জন্ম হয়েছে তাদের একটি জীবনচেতনা ও আচরণরীতি। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের সংগ্রামে এই জীবনচেতনাই নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নির্মাণ করেছে তাদের ইতিহাস। এভাবে এ

এলাকার মানুষের বোধ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত নিরন্তর সংগ্রামের ধারাকে অবলম্বন করেই তাদের একটি পরিচয় নির্মিত হয়েছে। এ পরিচয়ই তাদের জাতিসত্তার ভিত্তি।

বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মানবিক আদর্শকে অবলম্বন করে। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণে অসমর্থ হলো। বৌদ্ধ সংস্কৃতির পতনের সাথে সাথে সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, সামাজিক নিপীড়ন, বিচারবুদ্ধির স্বৈচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক অনাচারে ডুবে গেল। এ সময় ইসলাম তাদের জীবনে নতুন প্রেরণা ও আশাবাদ সঞ্চার করলো। এ এলাকার বিপন্ন নর-নারী ইসলামের মধ্যে খুঁজে পেল তাদের আত্মরক্ষার বিশ্বস্ত অবলম্বন। ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রেরণা, উদার অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন মানবিক আবেদন, ইসলামের প্রচারশীলতা ও ইহলৌকিকতা, এর সাংগঠনিক বুনিয়াদ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি এবং এর সাম্যাভিত্তিক বিধিবদ্ধ সামাজিক সংবিধান এই এলাকার মানুষকে সুদৃঢ় কাঠামোর ওপর মেরুদণ্ডবান জনগোষ্ঠীরূপে দাঁড় করিয়ে দিল। ইসলাম এলো একটি পূর্ণ বিকশিত সংস্কৃতি নিয়ে এবং সেই সংস্কৃতি তাদেরকে আর্থ-আত্মাসনের মুখগহ্বর থেকে বের করে এনে তাদের নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় জীবনক্ষেত্রে জাগ্রত, সচেতন ও সক্রিয় করে তুলল। ফলে এ এলাকার মানুষেরা আর্থ-আত্মাসনকে সাফল্যের সাথে প্রতিহত করল এবং ইসলাম বৌদ্ধ সংস্কৃতির মতো বিলুপ্ত হয়ে গেল না, জনগণের অস্তিত্বের গভীরে ঠাঁই করে নিয়ে টিকে থাকল।

কে এম পানিক্কর দেখিয়েছেন যে, ইসলামের আগে আর্থ-আত্মাসনের মোকাবিলায় যে দুটো সংস্কৃতি জনগণের সংগ্রামকে শক্তি যুগিয়েছে, প্রকৃতিগতভাবে সেগুলো কতটা আনুভূতিক ব্যাপার। ফলে আর্থ-সংস্কৃতির সাথে নিজেদের পার্থক্যটাকে জৈন ও বৌদ্ধরা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। এই দুটো সংস্কৃতি ক্রমশ আর্থ-সংস্কৃতির গ্রাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম আর্থ-সংস্কৃতির মোকাবিলায় শুধু আত্মরক্ষা করতেই সমর্থ হলো না, ভারতীয় সমাজকে আপাদমস্তক দু'ভাগে বিভক্ত করে স্পষ্ট দু'টি জাতিত্ব সৃষ্টি করল। (এ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান হিন্দি)

ইসলাম এদেশের সামাজিক অচলায়তন গুঁড়িয়ে দিল এবং নৃতত্ত্বের তথাকথিত প্রাচীরও অপসৃত করল। ফলে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী বংশ ও বর্ণচেতনার অবসান ঘটলো। গোড়াপত্তন হলো জীবনদৃষ্টি, বিশ্বাস ও আদর্শের ঐক্যের ভিত্তিতে এক নতুন জনগোষ্ঠীর। জেগে উঠলো এক নতুন জাতিসত্তা। ইসলাম এসে এখানে সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করেছে এবং বংশ ও রক্তভিত্তিক গোষ্ঠী-ধারণাকে সমূলে উচ্ছেদ করে বিশ্বাসের ঐক্যকে সামাজিক ঐক্যে রূপান্তরিত করেছে। এই প্রক্রিয়ায়ই বর্ণাশ্রমের এই দেশ- আদিবাসী ও বৌদ্ধদের এই দেশ-

মাত্র কয়েকশ’ বছরে একটি নতুন জাতির দেশরূপে গড়ে উঠলো। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ভিত্তিমূলে রয়েছে এদেশে ইসলামের অভ্যুদয়কালে যারা বাস করতেন, তাদের সাথে বিদেশাগত মুসলমানদের রক্তের অবাধ মিশ্রণ। স্থানীয় অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুসলমানদের সংখ্যা এদেশে দ্রুত বেড়ে গেল এবং এদেশের জন-কাঠামোর রূপ বদল ঘটলো পুরোপুরি। ফলে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় উজ্জীবিত একটি নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটলো এখানে। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারাও তাদের অনড় বর্ণাশ্রম ও জাতিবৈষম্য নিয়ে মুসলমানদের পাশাপাশি বাস করতে থাকলো পৃথক ও স্ততন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে। ইসলাম তাদের গ্রাস করল না, তাদের জন্যও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করল। মুসলিম শাসনের শুরু থেকে শত শত বছর বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ অভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস ও আলাদা জীবনচরণের মাধ্যমে ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পাশাপাশি বাস করেছেন। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনে এই স্বাতন্ত্র্যচেতনা বড় ধরনের কোন সংঘাত সৃষ্টি করেনি। বাঙলায় সাড়ে পাঁচশ’ বছরের মুসলিম শাসনের মাঝখানে মাত্র একবার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের অমাত্য, ভাটুরিয়ার জমিদার গণেশ, পনেরো শতকের গোড়ার দিকে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেছিলেন চার বছরের জন্য। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, গণেশের এই স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব ছিল ‘হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা’। এই ঘটনার একশ’ বছর পর বোল শতকের শুরুতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্য মুসলিম সালতানাত ধ্বংসের চেষ্টা করেন। সে সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য হলো : ‘তিন শত বছরের মধ্যে বাঙালি ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই।... চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল।’ (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্য যুগ)

ব্রিটিশ শাসনকে ঘিরেই হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের স্তরে স্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এ আমলের ঘটনা প্রবাহকে নিম্ন ক্রমানুসারে সাজানো যেতে পারে :

এক. ইংরেজরা ১৬৩৪ সালে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি লাভের পর কলকাতা ও কাসিম বাজারে যেসব দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করে, তারা সবাই ছিল হিন্দু। এই বাণিজ্যিক যোগসূত্রের মধ্যে দিয়ে একটি ষড়যন্ত্রমূলক ইঙ্গ-হিন্দু মৈত্রী গড়ে ওঠে। মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বর্ণহিন্দু মিত্রদের সহযোগিতা নিয়েই ইংরেজরা এদেশের রাজনীতির দিকে হাত বাড়াতে থাকে।

দুই. ব্রিটিশ শাসন হিন্দুদের কাছে ছিল নিছকশাসক বদলের ঘটনা। ইংরেজদের আস্তা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত

হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা ইংরেজ শাসনে তাদের জাতিসত্তা বিপন্ন দেখতে পায়। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরামহীন, আপসহীন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়ে 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা' রূপে চিহ্নিত হয়।

তিন. হিন্দুরা ইংরেজদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। মুসলমানদের সংগ্রামে হিন্দুদের কোন সহানুভূতি ছিল না।

চার. ইংরেজদের জুনিয়র পার্টনাররূপে একের পর এক শোষণ-সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে বর্ণহিন্দুরা এগিয়ে যায়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তা ছিল মুসলমানদের প্রতি আক্রমণাত্মক। অন্যদিকে মুসলিম আমলের রাজধানী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অন্ধকারে তলিয়ে যায়। মুসলমানদের ভাগ্য মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

পাঁচ. কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজরা প্রশাসনিক কারণে বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ভাগ করে। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠন করলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দুর এই প্রশাসনিক বিভাজনকে 'বঙ্গভঙ্গ' আখ্যায়িত করে একে 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা সর্বত্র সম্মানের আশ্রয় ছড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগকে বিবেচনা করেছিল তাদের 'ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত' রূপে।

ছয়. হিন্দুদের তুষ্ট করার জন্য ইংরেজরা 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাংলার মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়, অন্যপক্ষে হিন্দুরা খুশি হয়। তারা করজোড়ে ইংরেজদের বন্দনা গায় 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা' রূপে।

সাত. মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন এবং তারা এটাকে 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গভঙ্গ' নামে অভিহিত করেন।

আট. বঙ্গভঙ্গের ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের জাতি-স্বাতন্ত্র্যচেতনার ভিত্তিতে তাদের স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক মঞ্চরূপে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মুসলিম লীগ ৪০ কোটি মানুষের অঞ্চল ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু ৯ কোটি মুসলমানের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি বা রক্ষাকবচ দাবি করে। তাদের দাবি কংগ্রেস শিবিরের পাশাপাশি প্রাচীরে মাথা কুটে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ফলে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে পৃথক মুসলিম আবাসভূমির দাবিতে সংগ্রামে লিপ্ত হয় মুসলিম লীগ। সে আন্দোলনে বাংলার মুসলমানগণ সংগ্রামে, সাহসে ও ত্যাগে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

নয়. উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বেঙ্গল প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে নতুন করে বঙ্গভঙ্গের দাবি ওঠে। অন্যদিকে বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখার জন্য চেষ্টা চালায় মুসলমানরা। অখণ্ড বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অংশ বানানো যাবে না-বিবেচনা করে বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র স্বাধীন অখণ্ড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। মুসলিম লীগ হাই কমান্ড তাতে সম্মত হলেও গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেলের কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অনমনীয় রায় দেয়।

দশ. সবশেষে ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা নিজেদের ঘর-বাড়িতে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, এ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। তাদের ধারণা ছিল, পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটবে তার ফলে দুই জাতিভেদের মৃত্যু হবে। এটি তারা শুধু মনেই করেননি, প্রচারও করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাঙালি হিন্দুরা এ আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন, কিন্তু একাত্ম হলেন না বাঙালি মুসলমানদের সাথে।

বস্তুত, ব্রিটিশ শাসনের আগে-পরের সমস্ত ঘটনাই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিজাত পার্থক্যের ভেতর দিয়ে বাঙালি জীবনের দুটি বিপরীত স্রোতধারাকে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে দ্বিজাতিভেদের বিলোপ হলে এ আন্দোলনে শরীক হয়ে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা গড়ার সংগ্রামে ওপারের বাঙালিদের যোগদানে বাধা ছিল কিসের?

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাঙালিরা নিজেদেরকে বাঙালি মানেন এবং এপার আর ওপার নিয়ে বাঙালি এক অবিভাজ্য অখণ্ড সত্তা বলে তারা প্রচারও করেন। কিন্তু সেখানেও তারা স্বাধীন বাংলাদেশের জাতিসত্তায় আত্মস্থান নন। তাদের আস্থা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে ওপার বাংলার শ্রেষ্ঠ বাঙালিরা অনেক আগেই নিজেদের জাতীয়তা ভারতের 'মহামানবের সাগরতীরে' নির্ধারিত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই সর্ব ভারতীয় জাতীয়তারসে সিক্ত, যার মূল প্রস্রবণ তাঁর নিজের ভাষায়ই হলো উপনিষদ। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে দিল্লীর অধীনে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশে তারা আত্মশীল; কিন্তু অখণ্ড বাংলাদেশ কিংবা অখণ্ড বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে তারা বিশ্বাস করেন না।

এখানে একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকবোধ কাজ করে এবং তা বিভিন্ন সময় স্থলভাবেই প্রকাশও পেয়েছে। তা হলো, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বাংলাভাষীরা পূর্ববাংলার সাথে মিলিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাথে

মিলিত হলে সেখানে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগুরু। (ড. অতুলসুর তাঁর ‘দুই বাংলা কি এক হবে’ নামক বইয়ে এই বিপদের কথা কিছু দিন আগেও প্রকাশ করেছেন।) সাতচল্লিশের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সময়ও তাদের অনেকে এ হিসাবটা করেছিলেন। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়ালো? ওপারের বাঙালিরা দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করে এসে এপারের সাথে মিলিত হতে রাজি নন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে। আর এপারের বাংলাদেশের বাঙালিরাও পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিলিত হয়ে দিল্লীর জোয়ালের নিচে নিজেদেরকে জুড়ে দিতে রাজি নন হিন্দু অধীনতার ভয়ে। ওপার আর এপারের বাংলাভাষী লোকদের নিয়ে এক দেশ এ জন্যই কখনো হলো না।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় জাতি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল, সেটাকে রক্ষা করাই বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করে। এটাকেই তারা নিজেদের ভৌগোলিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রাম বলেও গণ্য করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ নিজেদের এক ইঞ্চি জায়গাও একে অপরকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ভারতের বন্ধুত্বের আশায় মুজিব সরকার বেরুবাড়ি হস্তান্তর করেছিলেন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে। কিন্তু তার বিনিময়ে তিন বিঘা করিডোরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য আজো সংগ্রাম করছে বাংলাদেশের মানুষ। ব্রিটিশ ভারতের প্রাচীন রাজধানী এবং ভারতীয় বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল কলকাতা বন্ধরকে নাব্য করার উচ্ছ্রাস ফারাঙ্কায় বাঁধ দিয়ে আন্তর্জাতিক নদীর পানি থেকে বঞ্চিত করা হলো এপারের বাঙালিদের। তার বিরুদ্ধে ওপারের ভারতীয় বাঙালিরা প্রতিবাদ করলেন না। বরং এত বড় অন্যায়েকে সমর্থন করলেন। গঙ্গার পানির অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে বৈঠক করতে বাংলাদেশের নেতা হিসেবে ভারতে গেলেন আমাদের নৌবাহিনী প্রধান। কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলো তাঁকে ‘ডিক্রি নৌকার মাঝি’ বলে কটাক্ষ করল। এভাবে তারা দিল্লীর অধীনে নিজেদের বড়ত্ব জাহির করল এবং আমাদের স্বাধীন সত্তার প্রতি তাচ্ছিল্যও দেখাল।

এর পেছনে কোন্ মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে? ফারাঙ্কার পানি, কাঁটাতারের বেড়া, আঙ্গুরপোতা-দহগ্রাম, দক্ষিণ ভালপটি, এগুলোর কোনটাই বাংলাদেশের জন্য ছোট ইস্যু নয়। এসব ইস্যুতে ওপার বাংলার আর এপার বাংলার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। দুয়ের মনোভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। এপার আর ওপারের এই পার্থক্যটি চিরন্তন। “এ প্রভেদ মনের, মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের, কর্মের, নামের, নিশানের, ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের, খোরাকের, পোশাকের, আদবের, লেহাঘের, কায়দা-কানুনের, জীবনবোধের, জীবনধারণের, জীবন দর্শনের ও জীবন

সাধনার।” ভাষা এক হলেই যে জাতিসত্তা সব সময় এক হয় না, তার প্রমাণ একই ভাষাভাষী বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের জনগণের জীবনদৃষ্টিজাত মনস্তত্ত্ব। হাজার বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যে লালিত একটি সুচিহ্নিত জীজনদৃষ্টিই বিকশিত করেছে এ এলাকায় মানুষের জাতিসত্তাকে। এই সত্তাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রসত্তা। নিজস্ব পরিচয়, ভাব ও গৌরব নিয়ে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ একটি শক্ত মেরুদণ্ডবান জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলরূপে। আমাদের জাতিসত্তার এই ভিত যতদিন অটুট থাকবে, আমরা আমাদের মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব ততদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হব। এই ভিত্তি নষ্ট হলে এদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হারিয়ে যাবে। একটি স্বাধীন অস্তিত্বের ভিত্তিতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হচ্ছে বলেই বাংলার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ মাথা উঁচিয়ে, তর্জনী নাচিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন, ‘ঢাকা এখন শুধু বাংলাদেশের রাজধানী নয়, বাংলাভাষারও রাজধানী।’ এই স্বাধীন অস্তিত্বের অহঙ্কারেই বরণ্য ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমদ নিজের বুকে আঙ্গুল ঠুঁকে আপন জাতিসত্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলতে পারেন, ‘বাংলা সাহিত্যে এখন আমরাই ডমিনেন্ট করবো।’

ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন জাতির রাজধানীর মেজাজ নিয়ে শত বছর ধরে বেড়ে ওঠা ঢাকা শহর শত বছরের পরাধীনতার গ্লানি ঝেঁড়ে ফেলে মর্যাদা নিয়ে আবার মাথা তুলেছে এই ‘আমরা’র স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে অবলম্বন করে। অন্যদিকে ‘নাবিক বণিক লোফার’ ইংরেজ আর তাদের দালাল, বেনিয়া ও মুৎসুদ্দীদের ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে এবং ঔপনিবেশিক রাজধানীরূপে বেড়ে ওঠা কলকাতা এখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে একটি নির্জিত শহররূপে দিল্লীর অধীনে দ্রুত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে কোন বাঙালি কবি-সাহিত্যিকের কণ্ঠে এমন প্রত্যঙ্গী উচ্চারণ আর শোনা যায় না। সেখান থেকে ভেসে আসে ছুবন্তপ্রায় বাঙালিদের এক ধরনের আর্ত-চিৎকার।

বাংলার মূল আরবী : অর্থাৎ বঙ্গ ও বাংলা শব্দের মূল আরবী আনিসুল হক চৌধুরী



বাংলা ভাষায় অনেক আরবী শব্দ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষায় অনেক আরবী শব্দের সাক্ষাৎ মিলে। ইহা সকলে না জানিলেও আমরা অনেকই জানি। কিন্তু আরব দেশ, আরব জাতি ও আরবী ভাষার সহিত আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের এই বাঙ্গাল আখ্যায়িত বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষার যে কি এক সুগভীর রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহা প্রদর্শনের ও প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক ও সত্যের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া থাকিলেও তৎসমুদয় সকলের গোচরীভূত করিবার জন্য তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা এষাবৎকাল করা হয় নাই বলিয়াই বাংলার ও আরবের উক্ত রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতার কথা আমাদের কাহারও জানিবার সুযোগ হয় নাই। বাংলার ও আরবের উক্ত ঘনিষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টা করা হইলে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতাম যে, আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ বাঙ্গাল আখ্যায়িত বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষা মূলত আরব দেশ, আরব জাতি ও আরবী ভাষার সহিত এক অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাৱশ্যকীয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত রহিয়াছে। বাংলার ও আরবের এই ঘনিষ্ঠতার পরিচয়ের মাধ্যমেই মাত্র বাংলার ও বাঙ্গাল আখ্যায়িত বাঙ্গালী জাতির সত্য পরিচয় যে কি হইতে পারে তাহা জানা যাইতে পারে, এমন সত্যের প্রতি বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুইটির মূলে যে আরবী শব্দ রহিয়াছে তাহাই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুইটি যে মূলত আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রথম সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় পাণিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলির এক উল্লেখ হইতে। শ্রীপৱেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তাহার “বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে পাণিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি আর্যাবর্তের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করিতে আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তের বাহিরে অবস্থিত যে ‘কালক বন’-এর উল্লেখ করিয়াছেন সেই ‘কালক বন’ই বঙ্গ দেশ। এই কালক বন শব্দটির মধ্যে বন শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় ধরা পড়িলেও কালক শব্দের কোনও অর্থই বাংলা ভাষায় বুজিয়া পাওয়া যায় না। তবে উক্ত ‘কালক’ শব্দে কি বুঝিতে হইবে এবং উহার অর্থই বা কি হইতে পারে তাহার দিক

নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ভাষ্যে রহিয়াছে :

‘Thousands of years ago, the inhabitants of India spoke and understood Arabic. Arabic was disfigured into various forms and gave rise to the hundreds of languages we now find in India. The founder of Arya Samaj movement, Swami Dayanand, has stated in his book, Satyarth Parkash, that Kurus and Pandwas discussed confidential matters in Arabic. The words for mountains, rivers, towns, heaven, earth names of relations, names of posts, exclamations of happiness, bedding and coverings, house, etc. are all in Arabic. The only difference arise in most cases that if the words are read from right to left they sound Arabic and if they are read from left to right they sound Sanskrit.’ (Page-10, A. H. Vidyarthi, Arabic : The Mother of all languages; Sanskrit : Its incognito offspring, The Islamic Review, Vol XL VII No.1. January, 1959.)

অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর আগে ভারত বর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। আরবী ভাষাকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে এবং উহা হইতে শত শত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, যাহা বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে দেখিতে পাই। আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কুরু ও পাণ্ডবগণ তাহাদের গোপন বিষয়সমূহ আরবী ভাষায় আলোচনা করিতেন। পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্ণ, পৃথিবী, আত্মীয়-স্বজনের নামসমূহ, পদসমূহের নামসমূহ, সুবের উল্লাস, বিহানা, চাদর, বাড়ী ইত্যাদি সকল কিছুই ছিল আরবী ভাষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল এই যে, শব্দগুলি যদি ডান দিক হইতে বাম দিকে পড়া হইত তাহা হইলে আরবী ধ্বনি হইত আর তাহাই যদি বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়া হইত তবে সংস্কৃত ধ্বনি হইত।

উপরে উদ্ধৃত এই ভাষ্যে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত পতঞ্জলির “কালক বন” কথাটির ধ্বনি মূল ও অর্থও তাই আরবী ভাষাতেই অনুসন্ধানযোগ্য। উক্ত ‘কালক বন’ কথাটির “কালক” শব্দটির সহিত আরবী “কানক” শব্দের ঐক্য ও সাদৃশ্য রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। আরবী কানক (কাংক) শব্দের অর্থ গঙ্গা নদী। আর বন শব্দের মধ্যেও গঙ্গা শব্দের অস্তিত্ব রহিয়াছে বিধায় বঙ্গদেশ বুঝিতে গঙ্গা নদীকেও বুঝিতে হইবে। ঐতদ্ধ্যতীত প্রাচীনকালে বঙ্গদেশকে যে শুধুমাত্র

গঙ্গা নামেও অভিহিত করা হইত তাহাও নিম্নের ভাষ্য হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে- Ganges : In these lines the author uses the name (Ganges) in three different ways for a region, for the river, and for a port on the river, (Page-235, the periplus of the Erythraean sea-translation from original Greek language by Lionel casson, Princeton University press, New Jersey.U.S.A.)

শ্রী পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তাঁহার বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত গ্রন্থে পতঞ্জলির উল্লিখিত ‘কালক বন’কে বঙ্গদেশ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া বঙ্গদেশ যে প্রকৃতপক্ষেই গঙ্গা নদীরই দেশ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। গঙ্গাকে আরবীতে বলা হয় কাংক। কিন্তু ইংরেজীর মত আরবীতেও অনুসারবোধক ভিন্ন অক্ষর নাই বিধায় ইংরেজীর মত আরবীতেও “ন” অক্ষর যোগ করিয়া অনুসারবোধক শব্দ লিখিত হইয়া থাকে। যেমন বাংলায় লিখিলে যাহা হয় কাংক। আরবীতে লিখিলে তাহাই লিখিতে হয় কান্করূপে। সুতরাং পতঞ্জলির উল্লিখিত ‘কালক বন’ কথাটির কালক শব্দটি যে উক্ত আরবী কান্ক শব্দেরই বিকৃতি তাহা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। আরবী কান্ক শব্দটির এই রূপ ব্যবহার এতদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম শব্দেও দৃষ্ট। যেমন আরবী, কান্ক সাত (অর্থাৎ গঙ্গার কিনারা)> কান সাত> কানসাট (রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম।) আরবী কান্ সাত> কানকসাট> কনকসাট> কনক সার (মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরের একটি স্থানের নাম।) ইত্যাদি।

অতঃপর কালক বন কথাটির “কালক” শব্দের মূল ও অর্থ যেহেতু আরবীতেই ধরা পড়িতেছে সেহেতু ‘বন’ শব্দটির অর্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ মূল আরবী শব্দটিও অনুসন্ধানযোগ্য। অনাবাদী বন জঙ্গল ও মরুভূমির স্থানকে আরবীতে বলা হয় বাদিয়। তাই বাংলা ভাষায় যাহা বন আরবীতে তাহাই ‘বাদিয়’। এতদেশের বিভিন্ন স্থানের নাম শব্দেও এই আরবী বাদিয় শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন- আরবী “বাদিয়” (অর্থাৎ অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান)> বাদা; বাদিয়> বাদ্দা> বাডডা; বাদিয়> বাদিয়ার বাজার> বৈদ্যের বাজার; বাদিয়> বাদিয়ার অঞ্চল> দিয়ার অঞ্চল (রাজশাহীতে) ইত্যাদি। সুতরাং পতঞ্জলির উল্লিখিত কালক বন শব্দটি যে মূলত আরবী “কান্ক বাদিয়” শব্দেরই বিকৃতি মাত্র তাহা সহজেই ধরিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষা যেহেতু ডান দিক হইতে বামে পড়িতে ও লিখিতে হয় সেহেতু পতঞ্জলির উক্ত কালক বন অর্থাৎ উপরিউক্ত আরবী “কান্ক বাদিয়” কথাটিকেও আরবীর সীতিতে ডান দিক হইতে পড়িলে ও লিখিলে হয়-বাদিয় কান্ক (অর্থাৎ গঙ্গার অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান)।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, গঙ্গা নদীর বদ্বীপ অঞ্চল ছিল এক অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান। গঙ্গার ‘অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান’ কথাটির আরবী হইতেছে ‘বাদিয়াতু কানক’ (কাংক)।

আরবী বাদিয়াতু বা বাদিয় = অর্থাৎ অনাবাদী বন জঙ্গলময় স্থান।

আরবী কানক>কাংক = অর্থাৎ গঙ্গা নদী।

উক্ত বাদিয়াতু বা বাদিয় কানক (কাংক) হইতেই হইয়াছে বানক (বাংক)। আর এই আরবী বানক (বাংক) হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বঙ্গদেশের “বঙ্গ” নাম শব্দটি। যেমন-বাদিয়াতু কানক (কাংক) বাদিয় কানক (কাংক>বানক (বাংক)> বঙ্গ (বংগ)> বঙ্গ।

উল্লেখ্য যে, “প্রাকৃত উচ্চারণ মতে দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত ক, গ, চ, ত, দ, প, য়, লোপ পায়।” (পৃষ্ঠা-৯ বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।)। সঙ্গত কারণেই বাদিয়াতু কানক (বাংক) কথাটির “বা” ও “কা” শব্দ দুইটির দুই “i” (আ) স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত দ, য়, ত, ক বর্ণ চারটি লোপ পাইয়া উপরে উল্লিখিত বানক (বাংক) শব্দটির রূপ লাভ করিয়াছে।

এই বানক (বাংক) শব্দটির অস্তিত্ব বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া নাম শব্দেও ধরিতে পারা যায়। যেমন-বাদিয় কানক>বানক (বাংক)+উড়া (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার “উড়” বন্দরের নামানুসারে “উড়া”)=বানকুড়া (বাংকুড়া)> বাঁকুড়া। বাঁকুড়া লিখিতে “বাঁ”-র উপরে “ন” প্রতিপাদক চন্দ্রাবিন্দু দিয়াই বাঁকুড়া শব্দটি লিখিত হইয়া থাকে।

আর উক্ত বানক (বাংক) শব্দ যে বনক (বংক>বঁক) হইয়া> বংগ (বঙ্গ) শব্দের রূপ লাভ করিয়াছে তাহার অস্তিত্বও বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বগুড়া নাম শব্দেও ধরা পড়ে। যেমন-বাদিয় বনক> বানক (বাংক)> বনক (বংক)+উড়া (প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার “উড়” বন্দরের নামানুসারে “উড়া”)=বনগ (বংগ)+উড়া> বনগুড়া> বঁগুড়া> বনগুড়া>বঁগুড়া> বগুড়া। এতদ্ব্যতীত উক্ত বনক (বংক) শব্দের অস্তিত্ব ও বাংলাদেশের যশোহরের বক (বনক> বঁক) চর নামক একটি স্থানের নামেও ধরা পড়ে। “গাঙ্গেয় বদ্বীপের আর এক নাম ছিলো বক দ্বীপ। বক দ্বীপের অপভ্রংশ বকচর। মুড়লীর (অর্থাৎ যশোহরের) পাশেই আজো বকচর নাম নিয়ে টিকে আছে একটি ছোট জনপদ।” পৃষ্ঠা-৪৬ সাপ্তাহিক ‘রোববার’, ১২ জুন, ১৯৮৮, ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫, ঢাকা, যশোহর নামের ইতিহাস, আমিরুল আলম খান)।

সুতরাং উপরিউক্ত আরবী বাদিয় কানক শব্দ হইতেই বানক> বনক> বনগ> বংগ (বঙ্গ) নামটি যেমন উদ্ভূত হইয়াছে তেমনি উহার মধ্যে গঙ্গা নদীর নাম ও স্থানীয় ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থাও বিবৃত হইয়াছে বিধায় বঙ্গদেশের বঙ্গ নাম শব্দটি যে মূলত আরবী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নির্দিষ্টায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। উক্ত বানক (বাংক)

শব্দটি R.C. Mozumdar সম্পাদিত, History of Bengal, Vol. I.-এর ১২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত VANKA শব্দেও দৃষ্ট হয়। “The Vanga (Vanka of Mahaniddesa, 1, 54) may not refer to the famous Janapada in Bengal, but to Bangka near Sumatra.”

তবে ইহাতে Vanga (Vanka) শব্দটিকে আমাদের এই বঙ্গদেশের নাম শব্দরূপে বিবেচনা না করিয়া ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার স্থানীয় একটি ভিন্ন নাম বলিয়া যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সঠিক হয় নাই। কেননা থাইল্যান্ডের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতকে অর্থাৎ ৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গদেশ হইতে থাইল্যান্ডের আনাম-এ গমন করিয়া সেখানের রাজাকে পরাজিত করিয়া সেদেশের রাজা হইয়াছিলেন এবং তাহার নিজের দেশ বঙ্গদেশ-এর নাম অনুসারে তাহার সেই রাজ্যের নামও যেমন রাখিয়াছিলেন বঙ্কলঙ্ক অর্থাৎ বঙ্গ বা বাঙ্গলা। তেমনি কোনও বঙ্গবীর বঙ্গদেশ হইতে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় গমন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেখানে একটি স্থানের নামও নিজের বঙ্গদেশ-এর নামানুসারেই রাখিয়াছিলেন Bangka (বন্ক>বঙ্গ), ইহা সহজেই ধারণা করা যায়। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার উক্ত Bangka (বন্ক>বঙ্গ) নাম শব্দটি যে প্রকৃত পক্ষেই আমাদের এই বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ-এরই বঙ্গ নাম শব্দ তাহা নির্দিষ্টায় নিশ্চিতভাবেই বলিতে পারা যায়, এমন কি থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজধানী ‘ব্যাংকক’ নাম শব্দটিও বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম শব্দ বংক বা বাংক হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াও উপরে বর্ণিত সঙ্গত কারণেই ধারণা করিতে পারা যায়।

আরও উল্লেখ্য যে, Dr. J. P. Wade আসামের মূল ইতিহাসের কথায় প্রাচীনকালে আসামে প্রচলিত বাখা (Bakha) নামক যে বাংলা ভাষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেই বাখা (Bakha) শব্দটির সহিত উপরে বর্ণিত বান্ক (বাংক, বংক) শব্দটির এক্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বিধায় আসামের উক্ত ‘বাখা’ (Bakha) শব্দটিও উপরিউক্ত বান্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা যায়। যেমন-বান্ক> বান্কা> বাঁকা> বাখা (Bakha)।

“The original history of Assam exists in two distinct languages. The first is termed the “Bailoongh” or “Ahum” being the language of the race of swurgededeo, the conquerors of Assam. The other is termed the “Bakha” being a dialect of the Bengalees. “(Page-1. An Accaount of Assam. Dr.J. P. Wade)

এই সত্য হইতে সহজেই ধারণা করা যায় যে, বর্তমানে আসামে আসামী বাংলা নামে যে বাংলা ভাষার প্রচলন রহিয়াছে তাহাও মূলতঃ আমাদের পূর্ব বাংলারই ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অতঃপর উপরে বর্ণিত বঙ্গ শব্দটির মত বাঙ্গালা নাম শব্দটিও যে মূলতঃ কেমন করিয়া আরবী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এতদস্থলে আলোচিত হইতেছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক ও স্থানীয় বিবরণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তিস্থলের ভূমি ছিল এক জঙ্গলপূর্ণ অনাবাদী স্থান। গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তিস্থলের অনাবাদী ভূমির আরবী হইতেছে বাদিয়াতুল কানকেল্ আলিয়াহ্ এই বাদিয়াতুল কানকেল্ আলিয়াহ্ হইতেই হইয়াছে বানকালিয়াহ্। আবদুর রউফ (অহীদ) রচিত তাওয়ারিখে বাংলা শিরোনামের একটি গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায়ও এই বাংকালিয়াহ্ (বাংকালিয়া) শব্দটির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বাদিয়া কানক আলিয়াহ্ (বাংকালিয়াহ্) হইতেই বান্গালা (বাঙ্গালা) নামটি উৎপন্ন হইয়াছে।
যেমন—

বাদিয়াতুল—অর্থাৎ অনাবাদী বনজঙ্গল পূর্ণ স্থান।

কানক—অর্থাৎ গঙ্গানদী।

আলিয়াহ্ অর্থাৎ নদীর উজান স্রোতের ধারা

গঙ্গানদীর উজান স্রোতের উৎপত্তিস্থলের অনাবাদী ভূমির আরবী হইতেছে বাদিয়াতুল কানকেল্ আলিয়াহ্। ইহা হইতেই হইয়াছে, যেমন-বাদিয়াতুল কানকেল্ আলিয়াহ্> বাদিয়া কানক আলিয়াহ্> (উল্লিখিত দুই স্বরবর্ণের মধ্যস্থিত দ, য, ক লোপ পাইয়া)> বান্ক+আলিয়াহ্ (উজান স্রোতধারা)> বান্কালিয়াহ্> বান্কাল্যাহ্>বান্কালা (বাংকালা> বাঁকালা)> বান্গালা> বাংগালা) বাঙ্গালা> বাংলা।

আর আলিয়াহর (অর্থাৎ উজান স্রোতধারার) বঙ্গ-ই যে বাংকালা (বাঁকালা>বাঙ্গালা> তাহা নিম্নে উদ্ধৃত একটি প্রাচীন গ্রাম্য গানের দৃষ্টান্ত হইতেও বোধগম্য হইবে। যথা :

পদ্মা মেঘনার ভাটির লগে

সাইগরেতে যাই,

বাঁকালা আলের বঙ্গ, (আমরা)

গুন টানি হাল বাই।

ক্ষেতের ধানে মন না টানে

বাইন্যা হইবার চাই,

সেইনা চাইয়া নাও ভাসাইয়া

উজান ও ভাইটাই।

জাহাজ বানাই ভাটিতে যাই

ক্ষেতে বান্ধি চাল

বাদ কাইটা বসত আইটা (বসত কইরা)

মারিরে গয়াল ।

আরে-হাতি বান্ধে পাতার বান্ধে

বান্ধেরে জাঙ্গাল,

গাঙ্গের পাড়ে হাঙর মারে

বাঘাইয়া বাঙ্গাল ॥ (সংগ্রহ)

উক্ত গানটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে যে বলা হইয়াছে “বাঁকালা আলের বঙ্গ” তাহাতেই ধরা পড়ে “আলের বঙ্গ” অর্থাৎ (আরবী) আলিয়ার বঙ্গই বাকালা অর্থাৎ বাঁকালা> বানকালা> বানগালা (বাঙ্গালা)> বাংলা । (আরবী বাকালা) আলিয়াহুর অর্থাৎ উজান স্রোতের উৎপত্তির স্থলবর্তী নিম্নবঙ্গই বান্কালা (বাঁকালা)> বাঙ্গালা দেশ । সাগর সংলগ্ন বরিশালের “বাকালা” নামে একটি স্থানের নাম শব্দেও উক্ত বানকালা> বাঁকালা শব্দটির বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ মিলে । এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা শব্দটি যে প্রাচীনকালে বান্কালা (বাংকালা)-রূপেই ব্যবহৃত হইত নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভাষ্যেও তাহার পরিপূরক প্রমাণ মিলে :

“১৮৯০ খৃষ্টাব্দের Gournal Asiatique-এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়, ঘোড়াঘাট, গোঁড়, বাঙ্গালা নামগুলি লেখা হয়েছে যথাক্রমে ‘কোড়াকাত’, কোঁড় এবং বাঙ্গালা (বান্কালা)-রূপে ।” [বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ), ২য় খণ্ড, শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, এম. এ. অধ্যাপক, বিশ্ব ভারতী, পৃষ্ঠা-৩ ॥]

Gournal Asiatique, Febrier-Mars, 1890, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে No. 050-JOA, Series-8 নং অনুসন্ধানযোগ্য ।

উক্ত বানকালা (বাংকালা) ও বাঙ্গালা শব্দ আবার বিভিন্নকালে বিভিন্ন বিকৃত রূপও লাভ করিয়াছে । নিম্ন বর্ণিত ভূ-চিত্র (Map)-সমূহেও এই বিকৃত রূপ পরিলক্ষিত হইবে ।

১. Map of Gerard Mercator (1612)-Bacola(<Bancola) Bicanapur, Bicanpor, Bacala, (<Bancala)>Bacalaur>Bacanaur>Eicanapur>Bicanpur>Bikrampur.

২. Map reproduced by Bernier-original Map, Paris Edition (1670)-Bacola, Bengala, Bengola.

৩. Map of Mogulistan of Indostan by H. Moll (1709) Bengola, Bengall.

৪. Map of Bengal (1770) by Thos Kitchin, courtesy British Museum-Bacala (<Bancala), Bengulla.

মৌলিক আরবী নাম শব্দ যে কিরূপে ও কত প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে উপরের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই এবং সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়িতেছে। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিম্নবর্ণিত ভাষ্যেও উক্ত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে— “But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a sanskrit look,... In the formation of these we find some words which are distinctively Dravidian. An investigation of place-names of Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speaker, mostly Dravidian, all over the land before the establishment of the Aryan tongue.” (Origin and development of Bengali language.)

অনুরূপভাবে শ্রী ভূদেব চৌধুরীও তাহার ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন— “ভাষাতত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, আর্যভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা.....কতকটা ‘দ্রাবিড় ভাষা বলিত।’ (জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।) কিন্তু সে সকল আর্যদের ভাষার উল্লেখ্য কোনো পরিচয় আজ আর বুঝে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র কয়েকটি প্রাচীন স্থান ও বস্তুর নামে বাঙালীর সেই প্রাচীনতম ভাষার ঐতিহ্য অল্প বিস্তার সন্ধান পাওয়া যায়।” (পৃষ্ঠা-১১, দ্বিতীয় অধ্যায়, ইতিহাসের সন্ধান, তৃতীয় সংস্করণ)।

উপরের উদ্ধৃত ভাষ্যে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে ভাষাকে ও যাহাদিগকে দ্রাবিড় নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন সে ভাষা যে প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা ও সে দ্রাবিড় জাতি যে সেমিটিক আরব জাতিরই একটি ভিন্ন শাখা তাহা নিম্নে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে :

ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের উল্লিখিত দ্রাবিড় ভাষা ও দ্রাবিড় জাতির মূল যে সেমিটিক তাহা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের তামিল ভাষা ও অক্ষরের ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায়। তামিল ভাষার এমন কি অক্ষরের মূলও যে সেমিটিক (Semitic) তাহা ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ ও The Indian History Congress কর্তৃক প্রকাশিত এবং K. A. Nila Kantha Shastri কর্তৃক সম্পাদিত “Comprehensive History of India”, Vol II (325 B. C.-A. D. 300) গ্রন্থের একুশ অধ্যায়ের ৬৭১ পৃষ্ঠার Frederick Bodomer-কৃত “Loan of Languages” গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠার দৃষ্টান্ত দিয়াও বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই উক্ত তামিল ভাষার অক্ষর সেমিটিক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বাংলা ভাষার অক্ষরও সেমিটিক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে

উল্লেখও যে, নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান তাহার ‘বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস’ গ্রন্থে অনেক শব্দ সম্পদের উদাহরণ দিয়া প্রদর্শন ও প্রমাণ করিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের তামিল ভাষার সহিত বাংলা ভাষার যত ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তেমন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই সত্য হইতে অপর একটি সত্যও প্রকারান্তরে ধরা পড়ে যে, তামিল ভাষা ও অক্ষর যেহেতু মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আর বাংলা ভাষা ও অক্ষরও যেহেতু মূলতঃ সেমিটিক আরবী ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে সেহেতু তামিল ভাষার সহিত বাংলা ভাষার উপরিউক্ত ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে পারিয়াছে। ইহা হইতে তামিল ভাষা ও অক্ষরের মত বাংলা ভাষার অক্ষরও যে ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই বা পূর্বেই মূল সেমিটিক আরবী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, তাহাও ধারণা করা যায়।

আর একই মূল সেমিটিক আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও এবং তামিল ভাষার সহিত বাংলা ভাষার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য ও সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেও তামিল ভাষা ও বাংলা ভাষা যে দুইটি আলাদা ভাষা হইয়াছে, তামিলের মত একই দ্রাবিড় ভাষা হইতে পারে নাই তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ভাষ্য হইতে স্পষ্ট হইবে :

“বেদ সংহিতায় তাহারাই (অর্থাৎ বাঙ্গালীরাই) দস্যু বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাদের (অর্থাৎ বাঙ্গালীদের) ও দ্রাবিড় ভাষীদের ভাষা একরূপ দূর সম্বন্ধ যে, ঐ উভয় জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াও একত্র সংসৃষ্ট ছিল এমন বোধ হয় না, তবে ঐ উভয়ে আর্থবংশীয় নহে, কোন তুরানি (অর্থাৎ আরব) বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মাত্র বলিতে পারা যায়। (পৃষ্ঠা-৪৯, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, ৮ই চৈত্র, ১৮০৪ শকাব্দ + ৭৯ = ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ)। দ্রাবিড় বলিতে যেমন সেমিটিক জাতিকেই বুঝিতে হইবে তেমনি সেমিটিক বলিতে আরব জাতিকে ও আরবী ভাষাকেই যে বুঝিতে হইবে তাহা বিখ্যাত ঐতিহাসিক Philip K. Hitti-র নিম্নবর্ণিত ভাষ্য হইতেও স্পষ্ট হইবে :

“Arabia was the cradle land of the Semitic race. Where was the original home of this people? Different hypothesis have been worked out by various scholars : There are those who considering the broad ethnic relationship between Semites and Hermites hold that Eastern Africa was the original home. Others influenced by Old Testament traditions, maintain that Mesopotamia provided the first abode; but arguments, in favour of the Arabian peninsula considered in their cumulative effect seem most plausible.”(Page-19 History of the Arabs.)

আরবের বাহরাইন ও কুয়েতের ফাইলাকা দ্বীপে দিলমুন, তিলমুন, দিলমান নামে আখ্যায়িত দ্রাবিড় জাতির ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বকালের যে সমুদয় প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও দ্রাবিড় সেমিটিক জাতি যে প্রকৃতপক্ষে আরব জাতিরই অন্তর্ভুক্ত একটি আরবী ভাষাগোষ্ঠী তাহা বলাই বাহুল্য। আর আরবের উক্ত দিলমুন, তিলমুন ও দিলমান নামে আখ্যায়িত জাতিই এতদ্দেশ্যে কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্তীর ভাষায় দামিল, দক্ষিণাত্যের ভাষায় তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন, “In the formation of these (words) we find some words which are des-
tinctively Dravadian. An investigation of place names of Bengal.....is sure to reveal the presence of Non-Aryan speaker, mostly Dravadian, all over the land.....” তাহাতে দ্রাবিড় বলিতে আরব জাতি ও আরবী ভাষার কথাই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

উপরন্তু ইতঃপূর্বে যে উল্লিখিত হইয়াছে “Thousands of years ago the inhabitants of India spoke and understood Arabic...the words for mountains, rivers, towns, heaven, earth, names of relations....etc. are all in Arabic. অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের লোকেরা আরবী ভাষা বলিত ও বুঝিত।.....পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয়দের নাম.....ইত্যাদির সকল শব্দই ছিল আরবী। এমতাবস্থায়, এতদ্দেশ্যের বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটিও যে আরবী হইতেই মূলতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ থাকিতে পারে না।

সে যাহা হউক, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির উল্লিখিত ধ্বনি মূল ও অর্থ হইতে সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির মধ্যে গঙ্গা নদীর এই বদ্বীপ অঞ্চলের গঙ্গা নদীর “গঙ্গা” নাম শব্দটি যেমন বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনি গঙ্গা নদীর বদ্বীপের একটি অংশে উক্ত ভূমির উর্ধ্বভাগ এবং অপর একটি অংশে নিম্নভূমির নিম্নভাগও রহিয়াছে বিধায় বঙ্গ ও বাঙ্গালা শব্দ দুইটি দ্বারা একটি দেশের দুই প্রকার স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থাও বিধৃত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গ শব্দ দ্বারা বঙ্গদেশের উক্ত ভূমির ও বাঙ্গালা শব্দের দ্বারা বাঙ্গালা দেশের নিম্নাঞ্চলের ভূমির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের তথা বাঙ্গালা দেশের এই দুই প্রকার স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থাও বিধৃত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গ শব্দ দ্বারা বঙ্গদেশের উক্ত ভূমির ও বাঙ্গালা শব্দের দ্বারা বাঙ্গালা দেশের নিম্নাঞ্চলের ভূমির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের তথা বাঙ্গালা দেশের এই দুই প্রকার স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই বঙ্গ ও বাঙ্গালা নামে একই দেশের দুইটি নাম শব্দেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাই একই দেশের দুইটি নাম শব্দ একই অর্থ প্রকাশ না করিয়া দুইটি পৃথক অর্থই প্রকাশ করিতেছে। “But

Bang and Bangala are mentioned separately in several inscriptions of South India and Tariq-E-Ferojshahi of Sahams-i-Siraj Afif.....”(Page-19, History of Bengal, Vol. 1, Hindu period, R.C. Mazumdar.) অতএব, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটিকে কোন অর্থহীন নিরর্থক শব্দ বিবেচনা না করিয়া বরং বঙ্গ ও বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার পরিচয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ শব্দরূপেই গণ্য করিতে হইবে। আর ইহা হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটি প্রকৃতপক্ষেই আরবী শব্দ হইতে উদ্ভূত এতদেশের অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দুইটি নাম শব্দ যাহা ইতঃপূর্বে আবিস্কৃত হয় নাই।

বঙ্গ ও বাঙ্গালা শব্দের মত আরও অনেক বাংলা শব্দ মূলত আরবী হইতে উদ্ভূত হওয়ার কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। বাংলাদেশ শুধুমাত্র একটি নদীবহুল দেশই নহে, নদীর সহিত সংযুক্ত সাগর পাড়ের দেশও বিধায় বহির্বিষয়ের সহিত বাংলাদেশের যোগাযোগের রহিয়াছে বিস্তৃত সামুদ্রিক জলপথ। আর বর্তমানের মত সুগম স্থলপথ অতীতে ছিল না বলিয়া সামুদ্রিক জলপথই ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের ও যাতায়াতের একমাত্র স্বাভাবিক ও সহজ পথ। অতীতের সেই সামুদ্রিক জলপথে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত আরব শেখদের (Gulf Sheikhs) এক চুক্তির ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের অধিকার না হারাইবার পূর্ব পর্যন্ত অতি প্রাচীন কাল হইতে সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরবদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরব নাবিক ও বণিকগণ যেমন সামুদ্রিক জলপথে পৃথিবীর সর্বত্রই গমন করিয়াছে তেমনি সুবিধাজনক স্থানসমূহে উপনিবেশ, এমন কি স্থায়ী বসতিও স্থাপন করিয়াছে। ফলে সামুদ্রিক জলপথেই আরব বণিক ও নাবিকগণ অতি প্রাচীনকালে অনাবাদী প্রাচীন বাংলাদেশে আগমন করিয়াও উপনিবেশ ও স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়, যাহা এই পুস্তকে বিস্তারিতভাবেই বিবৃত করা হইয়াছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষা সৃষ্টির মূলেও তাই উক্ত আরব বণিক ও নাবিকদের মুখে প্রচলিত আরবী ভাষাই সক্রিয় ছিল বুঝিতে পারা যায়। নিম্নের উদ্ধৃত ভাষ্যেও এ সত্যের পরিপূরক নিদর্শন মিলে। “Arabian language was understood and spoken in almost every sea port of any note.” (Page-120, Ancient India, Robertson) অর্থাৎ প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক বন্দরেই লোকজন আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাংলার নাম শব্দ দুইটি ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের এবং পার্শ্ববর্তী দেশ আসাম, নেপাল, ভূটান, সিকিম, তিব্বত প্রভৃতির নাম শব্দও আরবী ভাষা হইতে উদ্ভূত হইতে পারিয়াছে বুঝিতে পারা যায়, যাহা নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে। যেমন—

১. ঢাকা-

(ক) “.....in the 4th century B. C. when Guptas ruled this country, Dhaka was known as “DEVAKA” (Page-101, Glimpses of old Dhaka, S.M. Taifoor)

(খ) “পূর্ব বাংলাকে (মগ-ফিরিস্দিদের লুটপাটের) মহাবিপদ থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি (সুবাদার ইসলাম খাঁ) উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যভাগে রাজধানী স্থাপনের সংকল্প করেন। তার দক্ষতর এবং উজির আমলাদের নিয়ে রাজমহল পরিত্যাগ করে পূর্ব বাংলার পথে যাত্রা করলেন।.....তিনি রাজধানী করার পক্ষে অনুকূল একটি স্থানের সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে চলতে শুরু করলেন। এখন যেখানে ঢাকা নগরী অবস্থিত তার বিপরীত দিকে এসে তিনি থেমে গেলেন। তিনি যুদ্ধ হলেন স্থানটি দেখে।.....তিনি সাথে সাথেই এখানে রাজধানী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।” (Romance of an Eastern Capital, F. B. Bradely Burt, বঙ্গানুবাদ প্রাচ্যের রহস্য নগরী, রহিমুদ্দিন সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা-৮০-৮১)। এখানকার ঢাকা নগরীর বিপরীত দিকে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে যে স্থানটির কথা উপরের উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে সে স্থানটি যে ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে অবস্থিত বিক্রমপুরের বর্তমান বেতকা তাহা বেতকা নাম শব্দটির সহিত বর্তমানের ঢাকা নাম শব্দটির ধ্বনিগত, অর্থগত ও ঐতিহাসিক ঐক্য সূত্রেও ধরা পড়ে। যেমন মূল (আরবী) বাদিয় কানক (অর্থাৎ গঙ্গা নদীর অনাবাদী ভূমি) > বাদ্যাকা > বাদকা > বেতকা (প্রকৃত উচ্চারণে) বাদাকা > দাবাকা [...” imitial guttarals of the two words being interchangeable....”(Page-276, Journal of the Asiatic society of Bengal, Part-1, Nos III-IV, 1890] > দবাকা (DEVAKA) > দ্বাকা > দাকা > ডাকা > ঢাকা।

আদি বা মূল ঢাকা কোথায়?

উল্লেখ্য যে, ঢাকা, দবাকা, বাদাকা, বাদকা বা বেতকা নামেও ঢাকা শহরে বা ঢাকার সন্নিকটে আর কোনও স্থানের নাম যেহেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেহেতু উক্ত বেতকাই যে আদি বা মূল ঢাকা তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাহার ভারত সন্ধানে নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতের দিল্লী নামটি পূর্বেরকার ৭টি স্থান পরিবর্তন করিয়া বর্তমান স্থানে আসিয়াছে। একই প্রকারে মূল ঢাকার আদি স্থান বেতকার স্থান পরিবর্তন করিয়া বর্তমান স্থানে ঢাকা শহরের নতুন করিয়া পত্তন হইলেও সেই আদি বা মূল নামই বহাল রহিয়াছে। সম্ভব কারণেই বর্তমান ঢাকায় বা ইহার সন্নিকটে বেতকা, বাদাকা, দবাকা, দ্বাকা, ডাকা বা ঢাকা নামে কোন স্থানের পরিচয় মিলে না। এই সূত্র ইতঃপূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই।

২. সোনার গাঁ ও সোনার বাংলা-

(ক) 'It may be that Sonargaon itself was regarded as a part of the Vikrampur bhaga in those days' (Page-33, The History of Bengal, Vol. I. R. C. Mozumdar.)

(খ) Originally Sonargaon was a part of the Buddhist kingdom of Bikrampur. For about a century before muslim conquest it became an independent kingdom under another line of Buddhist kings represented by Pals, Chandras and Devas dynasties...Many iconographical articles and other finds of Buddhist times have been discovered from Sonargaon." (Page-XIV, Glimpses of Old Dhaka, s. M. Taifoor.)

সোনার বাংলা নামের কারণ

অতীতে বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলার সভ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া বাংলার নাম হইয়াছিল বিক্রমপুর বাংলা। (বিক্রমপুরের ইতিহাস, শ্রী যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত)। সেই বিক্রমপুর বাংলাই পরে সোনার বাংলা নাম পায়। কারণ উপরের ইংরেজী উদ্ধৃতির ভাষ্যে বিক্রমপুরের যে সোনার গাঁ-র কথা উল্লিখিত হইয়াছে বিক্রমপুরের সেই সোনার গাঁকে কেন্দ্র করিয়াই আবার এক সময়ে বাংলার সভ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। বিক্রমপুরের সেই সোনার গাঁ-র অবস্থান যে বিক্রমপুরের বর্তমান সোনারং গ্রামেই ছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত আলোচনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে :

(গ) মহারাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ) বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে বিক্রমশীলা মহাবৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন যাহার নিদর্শন আজ পর্যন্তও সেখানে অর্ধ মাইলব্যাপী ছড়াইয়া রহিয়াছে। সেই বিক্রমশীলারই প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন পরবর্তী কালে জ্ঞানতাপস শ্রী জ্ঞান অতীশ দীপংকর (১০৪২ খৃঃ)। উক্ত বিহারকে কেন্দ্র করিয়া আরও ৩৯টি বৌদ্ধ বিহার, সংঘারাম বা দেউলও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি। সেই সমস্ত কেন্দ্রে বৌদ্ধ মূর্তি সরবরাহ করিবার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণের একটি কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছিল সোনারং গ্রামের প্রধান বৌদ্ধ বিহারে। তাই সোনারং গ্রামে তো বটেই, এমন কি অতীশ দীপংকরের জন্মভূমি বজ্রযোগিনী, আউটশাহী, বালিগাঁও, আবিরাপাড়া, বেজগাঁও প্রভৃতি গ্রামে খনন কার্যের দ্বারা অনুসন্ধান চালাইলে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের অনেক নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আদি বা মূল সোনার গাঁ কোথায়?

সূতরাং বিক্রমপুরের বর্তমানে সোনারং গ্রামই যে অতীতের আদি বা মূল সোনার গাঁ তাহাতে আর সন্দেহ কি! ইহা ছাড়া সোনার গাঁ নাম শব্দটির ধ্বনিগত

বিশ্লেষণেও এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যেমন—(আরবীতে) শাতিল কাংক (অর্থাৎ গঙ্গা নদীর কিনারা)> সাতুল কাংক> সালুত কাংক> সানুট কাংক (এই সানুট কাংক শব্দটিকেই ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সানকট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।)> সানুর কাংক> সানুর গান্গ (গাঙ্গ)> সোনার গান্গ (গাঙ্গ)> সোনার গাঁ (গাঁ শব্দের উপরের চন্দ্রবিন্দুই নির্দেশ করে যে, সোনার গাঁ শব্দটির গাঁ শব্দটির পরে ন বা অনুস্বার ছিল বলিয়াই গাঁ শব্দটির উপরে চন্দ্রবিন্দু দিতে হইয়াছে। সুতরাং সোনার গান্গ (গাংগ) শব্দ ইহতেই যে সোনার গাঁ শব্দটি বৃৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা নির্বিধায় বলিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত একই সোনার গান্গ (গাংগ) শব্দটি ইহতে সোনারং শব্দটিও গঠিত হইয়াছে। যেমন—সোনার গান্গ (গাংগ)>সোনার গাং> সোনা রাং (প্রাকৃত উচ্চারণে “গ” শব্দটি লোপ পাইয়া)> সোনারং। সঙ্গত কারণে নিঃসন্দেহে ও সুনিশ্চিতভাবেই বলিতে পারা যায়, বিক্রমপুরের বর্তমান সোনারং গ্রামই প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক আদি বা মূল সোনার গাঁ। এই সোনারং গ্রামেই বিক্রমশীলা মহাবৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধদের অন্যান্য নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যাহা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব, আদি বা মূল সোনার গাঁ-এর পরিচয় যে একমাত্র বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামেই রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। পানাম ও মোগরাপাড়া গ্রামে বর্তমানে যে সোনার গাঁ রহিয়াছে উহার ধারে কাছে কোথাও সোনার গাঁ নাম শব্দের চিহ্ন মাত্রও নাই। তবে অতীতে যেখানেই রাজকর্ম পরিচালনা করা হইত উহাকেই সোনার গাঁ নামে অভিহিত করা হইত বলিয়া উক্ত পানাম ও মোগরাপাড়াও কোনও এককালে রাজধানীর কার্যস্থল বিবেচনায় সোনার গাঁ নাম পায় বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়। ঐতিহাসিক ব্রাডলি বার্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে অতীতে সোনার গাঁ-এর পরিধি ৭০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সেই ৭০ মাইলের মধ্যে যে কোন্‌ও স্থানকেই যে, সোনার গাঁ নামে অভিহিত করা যাইত তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। উক্ত পানাম ও মোগরাপাড়াও এইরূপেই সোনার গাঁ নাম পায়।

৩. চিটাগাং (চট্টগ্রাম)—

(আরবী) শাতিল কাংক (অর্থাৎ গঙ্গা নদীর কিনারা)> সাতিল গাংগ> চাটিল গাং> চাটি গাং (চাটি গাঁ, চাট গাঁ,)> চিটাগাং (ইংরেজীতে)। বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে ডঃ এম. এ. রহিম তাহার ‘সোস্যাল এণ্ড কালচারাল হিস্টরি অব বেঙ্গল’ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাই আরবের শাতিল আরবের অনুকরণে শাতিল গাংগ নামটিও আরবদেরই দেওয়া বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়।

৪. আরাকান-

(আরবী) ইরাক হইতে> (আরবী বহুবচনে) ইরাকিন (অর্থাৎ ইরাকীদের)> ইরাকান> এরাকান> আরাকান।

“ইরাককন হইতে আরাকান নামের উৎপত্তি।” (বঙ্গ নামের প্রাচীনতা, শ্রী বিজয় চন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা-৪৩২, নব্য ভারত কার্টিক, ১৩১৭, ৭ম সংখ্যা)। নিম্ন বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনায়ও এই সত্যের নিদর্শন মিলে। ৭৮৮-৮১০ খৃষ্টাব্দ কাল মধ্যে আরব বণিকদের একটি জাহাজ বর্তমান রামরী দ্বীপের নিকট ডুবিয়া যায় এবং আরোহী মুসলমানগণ প্রাণে রক্ষা পাইয়া আরাকানে বসতি স্থাপন করে বলিয়া ডঃ আবদুল করিম তাহার ‘চট্টগ্রামে ইসলাম’ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুসলমানগণ হয়ত আরবের ইরাকেরই অধিবাসী ছিল অথবা ইসলাম পূর্ব কালেও ইরাকীদের বসতি আরাকানে ছিল। তাই তাহারা ইরাকের নামানুসারেই আরবী ভাষায় ইরাকিন (অর্থাৎ ইরাকীদের) নামকরণ করিয়াছিল। আর উহা হইতেই আরাকান নাম হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা করা যায়।

৫. আসাম-

প্রাচীনকালে সিরিয়ার আর এক নাম ছিল ‘আলসাম’ [Syria-(Siam) Arabic-EL SHAM, (Page-1274, Funk and Wagnal's new International Dictionary of English language.)]। এই আলসাম যেমন, আবদুল সালাম হইয়া থাকে আবদুস সালাম অর্থাৎ আরবী ভাষার রীতিতে স-এর পূর্ববর্তী ল বর্ণ লোপ পাইয়া যেমন ল-এর পরবর্তী স-এর দ্বিত্ব হয়, ঠিক তেমনি আলসাম শব্দের ল বর্ণ লোপ পাইয়া ল-এর পরবর্তী স-এর দ্বিত্ব হইয়া আলসাম শব্দটি হইয়াছে আসসাম (Assam)> আসাম। ইংরেজীতে Assam শব্দটি লিখিতে যে দুইটি ss ব্যবহৃত হয় উহাতেও এই সত্য ধরা পড়ে।

প্রাচীনকালের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সিরিয়ার আরবী ভাষী বণিক ও নাবিকগণ বঙ্গদেশের ব্রহ্মপুত্র নদী পথে আসাম ও তিব্বত অতিক্রম করিয়া চীনদেশে গমনাগমন করিত। তখন চীনদেশের পীত নদীর (বর্তমান হোয়াং হো নদীর) সহিত ব্রহ্মপুত্র নদীর সংযোগ ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক টয়েনবিও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সিরিয়ার উক্ত বণিক ও নাবিকগণই সিরিয়ার সেই প্রাচীন নাম আলসাম নামেই এতদ্দেশেও আলসাম> আসসাম> আসাম নামকরণ করিয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

৬. নেপাল-

নেবাল (আরবী শব্দ অর্থ টিলা)। নেবাল হইতেই হইয়াছে> নেপাল।

৭. ভুটান-

ওয়াতান (আরবী শব্দ অর্থাৎ স্বদেশ) হইতেই হইয়াছে> ভুটান। যেমন- ওয়াতান> ওতান> বোতান> বুতান> ভুটান।

৮. সিকিম-

সেখেম (আরবী শব্দ)> সিখিম> সিকিম। (In gaza strip-Nablus.....is the largest city on the west Bank-its ancient name of Shekhem. -Los Angeles Times, U. S. A.)

৯. তিব্বত-

তোয়াবেত (আরবী শব্দ অর্থাৎ উচ্চ স্থান)> তাবেত> তেবত> তিব্বত।

বাংলা ভাষার মূল আরবী

বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাঙ্গালা নাম শব্দ দুইটির মূল যেহেতু আরবীতেই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িতেছে, বাস্তব-ভিত্তিক অনেক তথ্যের সত্য প্রমাণের দ্বারা যাহা ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে সেহেতু বাংলা ও বঙ্গ ভাষাটাও যে মূলতঃ আরবী ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহা সহজেই ধারণা করা যায়, বিশেষতঃ আরবী ভাষার যে বিশাল ও বিস্তৃত শব্দ ভাণ্ডার রহিয়াছে তথা একটি আরবী শব্দের যে স্থলে শত সহস্র প্রতিশব্দ আরবী ভাষায়ই রহিয়াছে উপরন্তু যে কোনও একটি স্বরবর্ণের ক্ষীণতম পরিবর্তনও আরবীতে যে স্থলে বিভিন্ন শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন সাধিত হয় তদবস্থায় বাংলা ভাষাটাও যে প্রাচীন আরবী ভাষার নানা কালের নানা পরিবর্তনের ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অনায়াসেই ধারণা করিতে পারা যায়। আরবী ভাষার স্বরবর্ণের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলা ভাষায়ও রহিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ নামক গ্রন্থেও এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলে। ‘স্বরবর্ণের খেলালের আর একটা দৃষ্টান্ত.....দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।.....সাধারণতঃ বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে।’ (পৃষ্ঠা-৯২, ৯৩)

‘বাংলা ভাষাটা ভঙ্গীওয়াল ভাষা। বাংলায় এ, ও, উ এই তিনটি স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দ বানানোর কাজে লাগে তা নয়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভঙ্গী তৈরী করে।’ (পৃষ্ঠা-৯৯)

‘কিন্তু একথাও জেনে রাখা ভাল, খাস বাংলায় এমন সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না।’ (পৃষ্ঠা-১০৮) ‘বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা বলে চেনাই যায় না।’ (পৃষ্ঠা-৯৮)

প্রসঙ্গত আসামের বাংলা ভাষার কথাও উল্লেখ্য। আসামের বাংলা ভাষা যে পূর্ব বাংলারই বাংলা ভাষা তাহা Dr.J.P. Wade-এর An Account of Assam গ্রন্থের বরাত দিয়া পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই

সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে। ‘কিন্তু অনতি প্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাইনে। সেই সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নাই বললেই চলে।’ (পৃষ্ঠা-৯. বাংলা ভাষা পরিচয়) সুতরাং বাংলাদেশের বাংলা ভাষার মত আসামের বাংলা ভাষার মূলও আরবীতেই রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদি যাদ্রীরা চলে এসেছে তারই প্রভাবে সেই স্বৈতকায় পিজল কেশ বিপুল শক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলি ক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তীকালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রং মলিন হয়েছে। কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়েনি। এই ভাষা আজো আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।” (পৃষ্ঠা-৯ ভূমিকা বাংলা ভাষা পরিচয়)। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমি যে বহুদূর পশ্চিমের আরব দেশ ও আরবী ভাষা তাহা বলাই বাহুল্য। “হাজার হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। আরবী ভাষাকে নানা প্রকারে বিকৃত করা হইয়াছে এবং উহা হইতে শত শত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে যাহা বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে দেখিতে পাই। পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্ণ, পৃথিবী, আত্মীয় স্বজনের নামসমূহ, পদসমূহের নামসমূহ, সুখের উল্লাস, বিছানা, চাদর, বাড়ী ইত্যাদি সকল কিছুই আরবী ভাষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল এই যে, শব্দগুলি যদি ডান দিক হইতে বাম দিকে পড়া হইত তাহা হইলে আরবী ধ্বনি হইত আর তাহাই যদি বাম দিক হইতে ডান দিকে পড়া হইত তবে সংস্কৃত ধ্বনি হইত।” ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত এই ভাষ্যে তাহা ধরা পড়ে।

কবি রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, “সুনীতি কুমার বলেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কোনো এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই জন্ম কথাটা ঠাটে নয়। যে জিনিস অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভ সীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিশ শতকের বাঙ্গালী আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।” (পৃষ্ঠা-৫৩, বাংলা ভাষা পরিচয়)।

ডঃ সুকুমার সেন তাহার বাংলা সাহিত্যের কাহিনীতে বলিয়াছেন, ‘....চর্যাগানের আবিষ্কারের কলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উর্দ্ধতম সীমা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া পৌছিল।’.....ডঃ সেন মহাশয়ের মতে বাংলা ভাষা মোটামুটি হাজার বছরের প্রাচীন। সর্বিনয়ে বলিতে চাই, যেন মহাশয়ের এই অনুমান বিচারসহ হয় নাই। বাংলা ভাষা ইহা হইতেও বহু প্রাচীন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে।’

(পৃষ্ঠা-৪১০, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, শ্রী সুধীর কুমার মিত্র, ২য় সংস্করণ।)

সঙ্গত কারণেই ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনও বলিয়াছেন, ‘বৌদ্ধ দোহা ও গান কখনই বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গদি রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহাদের সহিত হিন্দীর সাদৃশ্যই বেশী। যে সকল শব্দ বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পার্শ্ববর্তী প্রাদেশিক ভাষান্তলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বিবিধ ভাষাবিদ পণ্ডিতদের এই মত, ডঃ সিলভান লেভী, ডঃ ব্লক ও ডাঃ ফ্রীয়ারসনের কতকটা এইমত। যদি এ-কথাও প্রমাণিত হয় যে, এই সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষার দোহা লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইহা মনে করাই বেশী সঙ্গত যে, তাহারা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন; নতুবা তাহাদের লেখার টীকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন?’ (পৃষ্ঠা-৯৬২, বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিক বঙ্গবাণী পত্রিকার ১৩৩২ সনের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রখ্যাত অধ্যাপক বিজয় চন্দ্র মজুমদার, স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বৌদ্ধগান ও দোহা সম্পর্কে যে সুবিজ্ঞ ও সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠকের অবগতির সুবিধার জন্য এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হইয়াছে। তা পাঠে পাঠক নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিন্তাবেই জানিতে পারিবেন, বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষার ভাষা প্রকৃতপক্ষে বাংলা নহে, বরং হিন্দী।

সে যাহা হউক, ‘প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গ ভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তখনকার বাংলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই।’ (পৃষ্ঠা-১৯, বিশ্বকোষ, ১৩১৪ বাংলা; অষ্টাদশ ভাগ)। এতদসত্ত্বেও সেই প্রাচীন বাংলার যে ধারা বিভিন্ন কালের বিভিন্ন পরিবর্তনের ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও আজ পর্যন্ত আমাদের লোক ভাষা ও সাহিত্যে যে রূপে ধরা দিতেছে তাহা উইলিয়াম কেরীর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকা হইতেও জানিতে পারা যায়। “Multitudes of words originally persian and Arabic are constantly employed in common conversation, which perhaps ought to be considered enriching rather than corrupting the Bengali language.” অর্থাৎ সাধারণ আলাপ আলোচনায় মূলগতভাবে বহু সংখ্যক পার্সী ও আরবী শব্দ অপরিবর্তনীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, যাহা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করা অপেক্ষা বরং সমৃদ্ধ করে বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

আর হালহেড বলেন, “At present those Persons (the Bengalees) are thought to speak the compound idiom with the most elegance who mix with the pure Indian verbs, the greatest number of Persian and Arabic nouns” অর্থাৎ বর্তমানে ঐ লোকেরা (বাঙ্গালীরা) অত্যন্ত মার্জিত রূপে খাঁটি ভারতীয় ক্রিয়ার সহিত বহু সংখ্যক পার্সি এবং আরবী মিশ্রিত বাগধারা উচ্চারণ করে বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, হালহেড যে শব্দগুলিকে খাঁটি ভারতীয় ক্রিয়াবাচক শব্দ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, ঐ সকল শব্দ যে ভারতীয় ক্রিয়াবাচক শব্দ নহে, বরং প্রকৃতপক্ষেই আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দ তাহা “আল মুন্জৈদ” ও “আল কামুস” শিরোনামের দুইটি আরবী অভিধান হইতেও প্রমাণ করা চলে।

যেমন-

আরবী	ক্রিয়া	অর্থ	বাংলা
১. (যাহাবা)	”	(যাওয়া)	যাওয়া
২. (আশ-এ)	”	(কাছে থাকা বা আসা)	আসা
৩. (বশা)	”	(উপর হইতে নিচে পড়া)	বসা
৪. (জালা)	”	(গতি, চলা)	চলা
৫. (সুমা)	”	(কানে শুনা)	শুনা
৬. (সোওয়া)	”	(সেটান লগা বা বরাবর হওয়া, কাজের শেষ)	শোয়া
৭. (শুমান)	”	(আবৃত্ত করা, গোপন করা, দৃষ্টি বন্ধ করা)	ঘুমানো
৮. (উতা)	”	(উচ্চ হওয়া, ফল প্রকাশ হওয়া)	উঠা
৯. (দওয়ার)	”	(পুনঃপুনঃ জোরে ঘুরা)	দৌড়
১০. (গুছাল)	”	(গোসল গো সান (স্নান অর্থে))	স্নান

আরবী	(বিশেষ্য)	অর্থ	বাংলা
১. (বাত)	”	(কোন বস্তুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়া) ভাত (ভাতের দিকে ঝোঁক থাকায়-ভেতো বাঙালী)	
২. (বানি)	”	(জীবন সঞ্জীবনী)	পানি(পানির অপর নাম জীবন)
৩. (কলাম)	”	(লেখার কলম)	কলম
৪. (নবাকা)	”	(নৌকা)	নৌকো
৫. (মাতুল)	”	(মাতুল)	মাতুল
৬. (হাইল)	”	(হাইল)	হাইল
৭. (ওয়াতী, বাতি)	”	(ভাটি, নদী প্রবাহ অনুকূল)	ভাটি
৮. (উজান)	”	(উজান, পানির গতি পরিবর্তন)	উজান

৯. (বাদিয়)	"	(অনাবাদী মরুভূমি বা বন)	বাদা, বাদ্দা
১০. (আলিয়াহ)	"	(উজান স্রোতের ধারা)	আল-এর বঙ্গ (অর্থাৎ আলিয়ার বঙ্গ)
১১. (কান্‌ক)	"	(গঙ্গা নদী)	গঙ্গা
১২. (ডুকান	"	(দোকান)	দোকান
১৩. (শাত)	"	(নদীর কিনারা) শাত (শাতিল কান্‌ক) চাটি গাঁ।	

উল্লেখ্য যে, “আরবী ভাষার সুবিশাল ও ব্যাপক শব্দ ভাণ্ডার রহিয়াছে। ইহার শব্দ সম্পদের সহিত কোন ভাষারই তুলনা হইতে পারে না। ভাষা সমূহের সুবৃহৎ ভূপের মধ্যে আরবী ভাষাই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত।.....আরবী ভাষায় এক গ্রন্থে সিংহের ৫০০ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অপরটিতে সর্পের ২০০ নাম। মধুর জন্য.....৮০০ শব্দ.....তরবারির জন্য আরবী ভাষায় কম পক্ষে ১০০০ শব্দ রহিয়াছে।” (The Islamic Review, Vol. XII, No. I January, 1959, Page-10, দ্রষ্টব্য।)। আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন উল্লিখিত বাংলা ক্রিয়া ও বিশেষ্যবাচক শব্দগুলির মত বাংলা ভাষার অন্যান্য শব্দ ও আরবী ভাষার উপরিউক্ত সুবিশাল ও ব্যাপক শব্দ ভাণ্ডারের কোন না কোন শব্দ হইতে মূলত উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাই সম্ভব কারণেই ধারণা করা যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, “বানানের ছন্দবশ ঘুটিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ (অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ) নেই বললেই চলে, এমন কি কোন নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনই সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক পড়ি আর এক অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায় আর সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলায়।” (পৃষ্ঠা-৯৬, বাংলা ভাষার পরিচয়) এমতাবস্থায় হালহেড-এর উপরে উল্লিখিত Indian verbs অর্থাৎ সংস্কৃত (verb) ক্রিয়া যে সংস্কৃত ক্রিয়া নহে, আরবী ক্রিয়া তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু বাংলার উপরিউক্ত মৌলিক সেমিটিক আরবীয় রূপকে বর্তমানে খুঁজিয়া বাহির করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে একটি মাত্র প্রধান কারণেই। এই দেশে ইংরেজ শাসন শুরু হইবার অল্প কাল পরেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ দ্বারা আর্থাগতির সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালাইয়া বাংলা ভাষার সত্য পরিচয় ঢাকিয়া দিয়া প্রকারান্তরে বাঙ্গালীর সত্য পরিচয় বিনষ্ট করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সুদীর্ঘকালের পূর্ববর্তী সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইয়া রাজ্যহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া হিন্দুদের, বিশেষ করিয়া বর্ণ হিন্দুদের সহযোগিতায় এতদ্দেশে সর্বপ্রথম রাজনীতির সহিত ধর্মকেও যুক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করিয়া Divide and rule নীতির দ্বারা এতদ্দেশে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ়করণ-সোজা কথায় সেই প্রধান কারণটি

হইতেছে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর কন্যার মুখোশ ও পোষাক পরাইয়া বাংলা ভাষার আর্ঘ্যন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সজনী কান্ত দাসের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলে—

‘১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি গিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদনযজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজী প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মও এই বৎসর। এই যজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, আরবী পারসীকে অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরিয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধানও রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সাহেবেরা সুবিধা পাইলেই আরবী পারসীর বিরোধিতা করিয়া বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। ফলে দশ পনর বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল।’ (পৃষ্ঠা-২১২, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, শ্রী সজনী কান্ত দাস।)

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ‘We have elaborate grammars of Sanskrit masquerading as Bengali grammar in which the genuine Bengali forms have been branded as vulgar (ashadhu) beside the so called polite (sadhu) forms borrowed from Sanskrit.’ (Page-Xv, 0-D-B.L)

বাংলা ভাষার শত্রু ও মিত্র

আরবী ভাষা যে বাংলা ভাষার মিত্র তাহা উইলিয়াম কেরীর ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ইংরেজী ভাষ্যের ‘Multitudes of words originally...Arabic are.....enriching.....the Bengali language’ অর্থাৎ বহু সংখ্যক শব্দ মূলত আরবী....বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতেছে ইত্যাদি কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এমনতাবস্থায় আরবীকে বিতাড়ন করিয়া বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার রূপ দেওয়া যে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে শত্রুতাই করা, তাহা কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও সুস্পষ্ট হইবে। ‘পার্সি আরবী কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে ছজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে, তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। ‘বিদায়’ কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবী ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোষাক পরে বসেছে। “হয়রান করে দিয়েছে”

বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে “দরদ” লাগে না বললে ঠিক কথাটা বলা হয়, ও ছাড়া আর কোন কথাই নেই। গুরু চণ্ডালির শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে সংবেদনা শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।

ভাষার অবিমিশ্র কৌলিন্য নিয়ে খুঁত খুঁত করেন এমন গৌড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুই মুখো করে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এ রকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্য কর্ম নয়।” (পৃষ্ঠা-৫৩, বাংলা ভাষা পরিচয়)

রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, “বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে, কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে এক ঘোঁষা ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী-সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধিপের আছে দুই রাণী, একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজা ঘঁষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আট পৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে- কবি বলেন, কিমিব হি মধুরাণং মণ্ডনং নাক্তীনাম্- যার মাদুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা পায়। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাই দেয় দুয়োরানীকে গোয়াল ঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরানী রাণীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহুকাল জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হৈশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর নিকোনো আগ্নিনার পাশে যেখানে সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায়, আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়া যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসেনি- কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায়, আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজ্যাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না। আমাদের দিন রাত্রির মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।” (পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭, ঐ)

রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতির প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, “বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে, কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা দুইই আমাদের জানা চাই।” তাই বাংলা ভাষাকে চিনিবার কথা বলিতে লোকমুখের চলতি বাংলা ভাষা যে বাংলা ভাষার শক্তি এবং সংস্কৃতপ্রধান সাধু ভাষা যে বাংলা ভাষার দুর্বলতা তাহাও রবীন্দ্রনাথ অব্যক্ত রাখেন নাই। লোক মুখের চলতি বাংলা ভাষার শক্তির কথায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা

ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সহিত তুলনামূলকভাবে আরবী পার্সি শব্দের শক্তি বেশী যেমন বলিয়াছেন, তেমনি উইলিয়াম কেরীও তাহার ইতঃপূর্বে উক্ত ভাষ্যে আরবী শব্দ যে বাংলা ভাষাকে বিকৃত না করিয়া সমৃদ্ধ করে তাহা বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় লোক মুখের বাংলা চলতি ভাষাকে চিনিতে হইলে বাংলা চলতি ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট আরবী ভাষাকেও চিনিতে চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, মানুষের মুখের চলতি ভাষাকে বর্জন করিয়া অপর কোনও ভাষায় ও অনুকরণে অরিজিন্যাল আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া আমেরিকার চিন্তাবিদ এমার্সন ও ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ লেখক সমারসেট মমও অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহারও কারণ স্যার, স্যামুয়েল জনসনের কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট, “Dialects are the pedigree of nations” অর্থাৎ মুখের চলতি ভাষাই জাতির নৃ-তাত্ত্বিক বংশ পরিচয়। তাইত মুখের চলতি ভাষার বিলুপ্তিতে জাতির আসল পরিচয়ও বিপুল হয় বলিয়া জাতিকে যে দাসত্ব বরণ করিতে হয় তাহা বিখ্যাত দার্শনিক প্ল্যাটোর ‘He who can not speak his thought is a slave’ অর্থাৎ যে নিজের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না সে একজন দাস, উক্তিভেদেও সুস্পষ্ট কোনও দাস যেহেতু নিজের ভাব-ভাষায় কথা বলিতে পারে না সেহেতু তাহার স্বাধীনতা বলিতেও কিছু থাকিতে পারে না বিধায় ফ্রান্সের প্রখ্যাত মনীষী ভিক্টর হুগো মনুষ্য জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য নিজের মুখের চলতি ভাষাকে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকিতে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন; ‘An invasion by armies can be resisted but an invasion of ideas can not be resisted.’ অর্থাৎ সৈন্য বাহিনীর আগ্রাসন ঠেকাইতে পারা যায় কিন্তু ভাব-ভাষার আগ্রাসন ঠেকাইতে পারা যায় না। বাংলাদেশেও তাইত ১৯৪৮ হইতে ১৯৫২-র বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনের দ্বারা ১৯৭১-এর রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হইলেও এবং আজ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও ভাষাগতভাবে দেশ যে এখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই বাংলা ভাষার উপরে সংস্কৃত ভাষার আগ্রাসন যে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে তাহাতেই মনীষী ভিক্টর হুগোর উপরিউক্ত সতর্কবাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বাংলা ভাষার উপরে সংস্কৃত ভাষার আগ্রাসন নিম্ন বর্ণিত ভাষ্য হইতেও প্রতিপন্ন হইবে :

আধুনিক বাংলা ভাষার স্বরূপ

“হিসাব করে দেখা গেছে, যে ভাষা আমাদের নামজাদা সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় ব্যবহার করছেন, তার শতকরা দুইটি অন্ব্যর্থক পঁচিশটি সংস্কৃত, পাঁচটি আধা সংস্কৃত, ষাটটি সংস্কৃত থেকে ভেঙে সোজা করে ক্লেয়া আর আটটি হচ্ছে বিদেশী অর্থাৎ কিনা আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি।” (ডক্টর এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানের তমদুন, মাসিক ‘মাহে নও’ সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৬৩।)

অর্থাৎ ১. অনার্য (দেশী) শব্দ	২
২. সংস্কৃত শব্দ	২৫
৩. আধা সংস্কৃত শব্দ	৫
৪. সংস্কৃত থেকে ভেঙে সোজা করে নেওয়া	৬০
৫. বিদেশী শব্দ (আরবী, পার্সী, ইংরেজী, পর্তুগীজ)	৮
সর্বমোট শব্দ-১০০	

উপরে বর্ণিত এই সত্য কবি রবীন্দ্রনাথের নিম্নবর্ণিত ভাষ্যেও স্পষ্ট— “বঙ্গালী জাতির মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভাল জানি না। আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না।....এখনো আমরা বঙ্গালীর ঠিক ভাবটি ধরিতে পারি নাই।...সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, আর ইংরেজী ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।” (পৃষ্ঠা-১৮০, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, ১ম খণ্ড, শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।)

এতদ্ব্যতীত প্রখ্যাত ভাষা তত্ত্ববিদ ডক্টর গ্রীয়ারসন (Dr.G.A. Grierson (তো খোলাখুলি বলিয়া দিয়াছেন “Calcutta pandits..ruined the language” অর্থাৎ কলিকাতার পণ্ডিত সমাজ ভাষাটাকে ধ্বংস করিয়াছেন—

The very same incapacities of the vocal organs exists with the Bengalees now, that existed with their predecessors eight hundred years ago. A Bengali can not pronounce ‘Kshmi’ any more than they could. He can not pronounce a clear ‘s’ but make it ‘sh’. The compound letter ‘hy’ beats him, and instead he has to say ‘jjh’ —Nevertheless a Bengali when he borrows his Sanskrit words, writes them in Sanskrit fashion which say, at least two thousand years out of date and then reads them as if they were Magadhi words. He writes ‘Lakshmi’ and says ‘Lakki.’ He writes sagar and says ‘Shayar’....in other words he writes Sanskrit and talks other language.

Literary Bengali as now known is the product of the present century. Its direct cultivators were Calcutta pandits who, however, well meaning has ruined the language by their learning.” (The Linguistic survey of India, Journal of the Asiatic Society, Part I & II, Dr. G. A. Grierson.

সঙ্গত কারণেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের জটাজাল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষার খাঁটি রূপকে চিনাইবার দাবীও বর্তমানে উঠিতেছে—“বানানের পাশাপাশি বাংলা ব্যাকরণকেও সংস্কৃতের জটাজাল মুক্ত করা উচিত। ডঃ সুকুমার সেন যাদবপুরে হালহেড সেমিনারে বলেছিলেন, বাংলা ব্যাকরণ ২৭/২৮ পৃষ্ঠার বেশী হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা পরিচয়ের আদলেও যদি বাংলা ব্যাকরণ লেখা হত, তাহলে ছাত্র ছাত্রীরা নিজের ভাষাকে চিনতে পারত। সংস্কৃত অনুসারী বাংলা ব্যাকরণ যেমন বিপুলায়তন তেমনি তা বাংলা ভাষার সজীবতার প্রাণ স্পন্দন সঞ্চারে ব্যর্থ।” (পৃষ্ঠা-৩, সাম্প্রতিক দেশ, কলিকাতা, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৮১, ব্যাকরণের জটাজালে বাংলা বানান, আশীষ কুমার দে)।

এই সত্যের পরিপূরক সত্য নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও প্রণিধানযোগ্য—“বাংলা ভাষার সংস্কৃতের আনুগত্য তিনি (প্রমথ চৌধুরী) পূর্বে ভালবাসিতেন না, এখনও না।.....প্রমথ চৌধুরী লিখলেন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্বন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাঙ্গালার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন, বাঙ্গালার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।.....আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই। ভাষা দু’য়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায় শুধু মুখের ভাষাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায় যে ভাষায় কথা কই সে ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।” (পৃষ্ঠা-১০৩, বাংলার শক্তি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, বাংলা ভাষায় ছোট গল্প, শ্রী নরেন্দ্র চক্রবর্তী)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য নামে সংস্কৃত শব্দ ও ব্যাকরণ দ্বারা গঠিত যে বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সাহিত্যের সহিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হৃদয়ের সংযোগ সাধিত হইতে পারিতেছে না বিধায় প্রথম চৌধুরী আরও বলিয়াছেন, “ভাষা মানুষের মুখ হইতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে কালিই লাগে।” কিন্তু মুখে কালি লাগাইয়া সংস্কৃত সাহিত্যে বহুদিনের নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আত্মসম্বিত হারাইয়া বর্তমানে আমরা বুদ্ধিতেও পারিতেছি না যে, আমাদের মুখে আজ যে কালির কালো রং দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহা আমাদের মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক ও প্রকৃত রং নহে। তাহা না হইলে, আমরা আমাদের মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক, সুন্দর, প্রকৃত ও খাঁটি রংটি আয়না দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত, আনন্দিত ও উল্লসিত হইতে পারতাম তথা আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইয়া জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির পথও বুজিয়া পাইতাম।

তাইত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ব্যাকরণ প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহাই আলোচনার দ্বারা

অবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইতে হইবে। তাহার পরে অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাংলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, এখন যাহাকে বাংলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাংলা ব্যাকরণ নহে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ নহে।” (পৃষ্ঠা-১৬, ভাষাতত্ত্ব, রফিকুল ইসলাম, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫ হইতে সংগৃহীত।)

অনুরূপভাবে “১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসের অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বক্তৃতায় এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যাহারা গড়িতে যাইবেন তাহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, তাহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ, প্রকৃতি, গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহাই ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।” (পৃষ্ঠা-৮৯, সাহিত্য সম্ভার, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ।) কারণ “পরের ভাষায় ও অনুকরণে অরিজিন্যাল আর্ট সৃষ্টি কখনো হয় না।” (আমেরিকার চিন্তানায়ক এমার্সন ও ইংলন্ডের বিখ্যাত লেখক সমারসেট মম।)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জনাব শাহাদাত হোসেন খান ‘পাঠ্যসূচীতে বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু’ শিরোনামে যে একটি মূল্যবান ও উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও প্রকৃতপক্ষেই বিশেষভাবে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে বিধায় প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইলেও পাঠকের অবগতির জন্য প্রবন্ধটি সম্পূর্ণরূপেই এতদস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

“বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বা মোটেই এর প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে কোন উপকার দর্শাবে কি-না তা ভেবে দেখা দরকার।

ব্যাকরণ এমন কোন বিধিমালা নয়, যা ভাষা বা সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাকরণ ভাষার অতীতকে বর্ণনা করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের পথকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা নতুন পথ সৃষ্টি করতে পারে না। এই যেন উড়ো জাহাজ থেকে তোলা প্রবহমান কোন নদীর ছবি বর্ণনার ন্যায়। এ বর্ণনা নদী বা নদীবিন্দোত এলাকার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, পারে শুধু রূপ বর্ণনা করতে। তেমনি সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা কালে ব্যাকরণ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না অথবা ব্যাকরণ তাকে সাহায্যও করতে আসে না। তাহলে ব্যাকরণের ব্যবহারিক উপকারিতা কোথায়? বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ লিখেন মনো এল দ্য আসুমপসাও। তিনি এটি লিখেন ১৭৪৪ খৃঃ মাদ্রিদ থেকে ছাপা হয়ে আসে। এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। তবে বাংলা অক্ষরে প্রথম ব্যাকরণ লিখেন নাথানি এল ব্যাস হালহেড ১৭৭৮ খৃঃ। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখেন রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃঃ

(গৌড়ীয় ব্যাকরণ)। এছাড়া বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কেরী (১৮০১), কীথ (১৮২০), বীমস (১৮৭২) এবং হর্নলে (১৮৮০)। এগুলো সবই খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। এরপর থেকে বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত সন্ধি সমাসাদি প্রক্রিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা সংস্করণ হতে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষার কোন ব্যাকরণই ছিল না। তবে কি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি? হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (ক) প্রাচীন যুগ (৯৫০ খৃঃ-১২০০খৃঃ) (খ) মধ্যযুগ (১২০০-খৃঃ-১৮০০খৃঃ)-এ সময় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কৃত্তিবাস ওঝার বাংলা রামায়ণ, মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁ), শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের নবীবাংলা ইত্যাদি রচিত হয়। এ ছাড়া পদাবলী, বিভিন্ন মহাকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন কাহিনী এই সময়ের সৃষ্টি। (গ) আধুনিক যুগ (১৮০০খৃঃ বর্তমান কাল) এই সময়ে সাহিত্য কীর্তির উল্লেখ এখানে নিম্নয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যাকরণের অভিত্ত সাহিত্য কর্মে বা সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করে না। অতএব ব্যাকরণ বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে নিম্নয়োজন।

ভাষার লিখিত রূপই সাহিত্য। এই সাহিত্য অবরোহণ পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে আরোহণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথম বর্ণ, শব্দ এবং তারপর বাক্য। শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতি থেকেই এ বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়। (ক) শিশু ভূমিষ্ঠ হলে প্রথম উচ্চারণ করে কতকগুলো স্বরধ্বনি, যেমন উঃ অঃ ইত্যাদি। (খ) তারপর স্বরতন্ত্র কিছুটা মজবুত হলে তার মুখ থেকে বের হয় স্বরমিশ্রিত ব্যঞ্জনধ্বনি, যেমন বা, মা, কা ইত্যাদি। (গ) আরো কিছুদিন পরে স্বরে মিশ্রিত দ্বৈত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে, যেমন বাবা, মামা, কাকা ইত্যাদি। (ঘ) বাক্যতন্ত্র আরো মজবুত হলে শব্দের মধ্যে স্বরহীন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে, যেমন বক, টক, ফল ইত্যাদি। (ঙ) তারপর ক্রমে ক্রমে শব্দমালা সাজিয়ে বাক্য গঠন করতে লিখে অর্থাৎ আর দশজনের মত বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে। উপরোক্ত পাঁচটি স্তরে শিশু যা যা উচ্চারণ করেছে সেগুলো প্রতিস্তরেই শিশুর জন্য ভাষা। কেননা এর প্রতিটিই স্তর বিশেষে শিশুর মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব প্রকাশ করেছে। স্বরবর্ণ থেকে ভাষা তথা সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ, অবশেষে শব্দ ও বাক্যের আগমন। এটিকে আরোহণ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। মুখ গহ্বরের ভিতর এক একটি জায়গা থেকে বায়ু চাপ প্রয়োগে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তারই এক একটি রেখাচিত্রের নাম এক একটি বর্ণ বা অক্ষর। প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চারণ স্থান, ধ্বনি ও রেখাচিত্র (বর্ণ) এই তিনটিই হচ্ছে আমাদের মানদণ্ড।

এই মানদণ্ড যাতে ঠিক থাকে সেদিকে আমাদের সচেষ্টি থাকতে হবে। তা না হলে ভাষার পরিবর্তন হতে হতে মূল ভাষাই একদিন হারিয়ে যাবে।

ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও বিধেয় (সাবজেক্ট ও প্রেডিকেট) এসেছে ইংরেজী থেকে। সন্ধি, সমাস, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি এসেছে সংস্কৃতি থেকে। সুতরাং বাংলা

ব্যাকরণের প্রায় পুরোটাই আমদানী করা। খাটি বাংলা সন্ধি হয় না। কারণ বাংলা বিশেষত্বক ভাষা, একাধিক শিকলে এক সংগে মিলিয়ে উচ্চারণ করার চাইতে আলাদা করে উচ্চারণ করার ঝোক বেশী। গোল+আলু=গোলআলু এমন ব্যবহার নেই। বাংলা সন্ধি এসেছে সংস্কৃত থেকে তৎসম শব্দের মাধ্যমে। বাংলায় তৎসম শব্দের হার ৪৪%, তদ্ভব ও দেশী ৫১.৪৫% এবং বিদেশী ৪.৫৫% (শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর হিসাব মতো)।

ব্যাকরণের কারক ও বিভক্তি সন্ধি-সমাসের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন এবং শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়, বরং শিক্ষার্থীর মনে তা জটিলতা সৃষ্টি করে। আরও মজার ব্যাপার এই যে, সংস্কৃত থেকে ধার করা কারকত্ব সংস্কৃতের অনুগামী নয়। সংস্কৃতে প্রত্যেক কারকেরই একটি নির্দিষ্ট বিভক্তি আছে। বাংলায় তা নেই। বাংলায় একই বিভক্তি বিভিন্ন কারকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কর্ম ও সম্প্রদান কারকে কে বিভক্তিকে একবার, দ্বিতীয় এবং কয়েকবার চতুর্থ বিভক্তি বলার কোন মানে নেই। করণ কারকের দ্বারা ওদিকে এবং অপাদানের হতে বা চেয়ে প্রকৃতপক্ষে বিভক্তি নয়, স্বতন্ত্র অব্যয়। ছেলেটির দ্বারা, ছেলেটিকে দিয়ে, বালকের চেয়ে, কে, কেমন, করে বিভক্তি বলা যায়? বস্তুত করণ ও অপাদানের অর্থ বিভিন্ন পদান্বয়ী অব্যয় দ্বারা প্রকাশিত হয়। করণ কারকে এ বিভক্তি নেই। সুতরাং সম্প্রদান ও অপাদানকে করণ না বললেও চলে। রাজা রাম মোহন রায় তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে শব্দ রূপে করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারক বিভক্তি দেননি। রাজা রাম মোহন রায় সম্প্রদান কারককে স্বীকারই করতেন না। সুতরাং এই জটিল ও ক্রটিপূর্ণ কারক তদ্ভব পড়ে লাভ কি?

উপসংহারে বলতে চাই, আমাদের কেবলমাত্র ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্বের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের মানদণ্ড ঠিক রাখার জন্য। এ ছাড়া বাকী সবই পরিত্যাগ করা চলে। ধ্বনিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব রচনা বইতে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাকরণের বাকী সব বোঝা শিক্ষার্থীদের মাথা থেকে নামিয়ে দিলে তারা মস্তিষ্কের অপচয় থেকে ক্ষমা পাবে। এ বিষয়ে ভাষাবিদগণ একটু ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।” (পৃষ্ঠা-৬, বিতর্ক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ৪ শ্রাবণ ১৪০১ সন; ১৯ শে জুলাই, ১৯৯৪।)

এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিম্ন বর্ণিত ভাষ্যেও উপরে বর্ণিত সত্যের পরিপূরক সাক্ষ্য মিলে— “আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিশ্মৃত জাতি.....। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই...যখন আর্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালী সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপনীত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহারা বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞানশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।.....বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে।.....ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃতি ও তাহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছে।” (মানসী, বৈশাখ, ১৩২১; পৃষ্ঠা-৩৫৬, ডঃ রফিকুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ ‘ভাষাতত্ত্ব’ হইতে সংগৃহীত।)

সেন আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ড. কাজী দীন মুহম্মদ



ভাষা ও সাহিত্য

রাজনৈতিক ইতিহাসের মত প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও যুগে যুগে রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের সাথে সাথে ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিবর্তন ঘটেছে।

বাংলাদেশে আর্যদের আসার আগে এদেশবাসীরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন, তার কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে সে সময়কার ভাষার কোন কোন শব্দ ও রচনাপদ্ধতি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মিশে গেছে। তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেছেন। আর্যদের প্রভাবে ক্রমে প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এদেশে আর্য ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, বাংলা ভাষার প্রাথমিক স্তর পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল। এ স্তরের ভাষা থেকেই নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। কিন্তু বাংলা ভাষার বর্তমান স্তরে পৌঁছতে যে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়েছে, তা আরও পরের।

বাংলা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে রূপ নিয়ে আমরা গৌরব করি তা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয়েছে বাংলায় মুসলিম আমল থেকে। গুপ্তদের শাসনামলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যে চর্চা শুরু হয়, পাল ও সেন আমলে সে ধারা অব্যাহত থাকে। তবে বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক পালদের আমলে দেশীয় ভাষা হিসেবে প্রথম বাংলার চর্চা শুরু হয়। সে যুগেই গৌড় অপভ্রংশ থেকে বঙ্গ ও কামরূপ ভাষায় বৌদ্ধ হীনযান ও মহাযান পন্থীদের কিছু কিছু গূঢ় ধর্মকথা রচিত ও প্রচারিত হয়। এ ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাগণ। পরে পাল রাজত্বের অবসানে বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ মহাজন ও ধর্মগুরুদের নির্মমভাবে নিধন করা হয় এবং বাকীদের নানাভাবে উৎপীড়ন অত্যাচার করে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ স্তরের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কিছু নিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোহাগানে বিদ্যুত। এগুলি সিদ্ধাচার্যরা রচনা করেছেন। এদেশে এসবের কোন চিহ্ন ছিল না। কিছু কিছু বৌদ্ধ মহাজন তিব্বতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং তাঁদের সঙ্গে যে সামান্য ধর্মবাণী নীত

হয় তা রক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে চর্যাচর্য বিনিশ্চয় নামের এ পদগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার থেকে উদ্ধার করে 'হায়ার বছরের পুরোনো বাংলা' শিরোনামে প্রকাশ করেন।

পালদের সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও প্রচারের জন্য এসব গান ও দোহা বা উপদেশ জনসাধারণের কথ্য বাংলাতেই প্রচারিত হয়েছে। এর ফলে একটি লোকসাহিত্য গড়ে ওঠার সুযোগ হয়।

এই যুগে বিশেষ করে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাভাষার যে সামান্য চর্চা হয় তাতে বাংলা ভাষার যে রূপটি ধরা পড়েছে, সেগুলি যে বর্তমান বাংলার আদিস্তরের তা এচর্যাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

পাল রাজাগণের আমলে অর্থাৎ দশম শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায়ও বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, কাব্য, নাটক, দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি রচিত হয়েছে। একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী আচারনিষ্ঠ গৌড়া হিন্দু সেন রাজারা এদেশ দখল করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উৎখাত করে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সেনেরা কনৌজ থেকে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এনে হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন করেন। তাঁরা সাহিত্য ও রাষ্ট্র ভাষায় সংস্কৃত আমদানী করে ভাষায়ও রাষ্ট্রগত কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যময় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা রহিত হয়। রাজদেশ অনুসরণ করে শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণও দেবভাষা সংস্কৃত ছাড়া লোক-ভাষায় শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন :

আষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।

ভাষায়ান মানবঃ শ্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত ইত্যাদি ধর্ম শাস্ত্র লোক-ভাষায় আলোচনা ও শ্রবণ করলে রৌরব নরকে যেতে হবে।

কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার লাভ ঘটেছে বৌদ্ধ আমলে; বিশেষ করে স্বাধীন পাল রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। হিন্দু সেন রাজাদের আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পৃষ্ঠ-পোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়। সেন রাজাদের কঠোর শ্রেণী বৈষম্য, ব্রাহ্মণ্য অস্পৃশ্যতা ও কঠোর শাস্ত্রীয় শাসনে যখন সর্বসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ঠিক সে সময় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।

সংস্কৃত

সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের ফলে একদিকে অপভ্রংশ ও বাংলায় রচিত সাহিত্যের প্রসার খর্ব হয়; অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। তাঁরা ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। আবার এদের অনেকেই কাব্য ও শাস্ত্রাদি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বল্লাল সেন রচিত 'দান সাগর' ও 'অমৃত সাগর' গ্রন্থে হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ কর্মাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও তিনি 'ব্রত সাগর', 'আচার সাগর' ও 'প্রতিষ্ঠা সাগর' নামে তিনখানি গ্রন্থ

প্রণয়ন করেন। লক্ষ্মণ সেন কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পিতার ‘অদ্ভুত সাগর’ গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করেন। তাঁর রচিত কিছু শ্লোকও পাওয়া গিয়েছে। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট, ‘হারলতা’ ও পিতৃদয়িতা’ নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান ও নিত্য কর্মের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে যুগের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত সেনরাজাদের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হলায়ুধ। তিনি অল্প বয়সেই রাজ্য পণ্ডিতের সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত ‘ব্রাহ্মণ সর্বস্ব’, ‘শৈব সর্বস্ব’, ‘পণ্ডিত সর্বস্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিত মহলে সমাদৃত হয়। কিন্তু একমাত্র ‘ব্রাহ্মণ সর্বস্ব’ ব্যতীত তাঁর আর কোন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। হলায়ুধ লিখেছেন যে, রাঢ় ও বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করতেন না। বৈদিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না। একারণে হিন্দুর আফ্রিক অনুষ্ঠান ও বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে তিনি ‘ব্রাহ্মণ সর্বস্ব’ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ দেশে বিদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ঈশান ও পশুপতি নামে হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রাদ্ধাদি ও অন্যান্য প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে দুটি ‘পদ্ধতি’ রচনা করেন। পশুপতি ‘শ্রাদ্ধ পদ্ধতি’ ছাড়াও ‘পাকষজ্জ’ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

এযুগে অভিধান বিশ্বকোষ ও ব্যাকরণ রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয়। ভাষা আলোচনায় আতিহার-পুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বানন্দের ‘টীকা সর্বস্ব’ নামক অমর কোষের টীকা সেকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এ গ্রন্থখানিতে সর্বানন্দ অপরূপ পণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এতে বহু প্রাচীন বাংলা শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এগুলি এখনও বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। পুরুষোত্তম ব্যাকরণ কোষ জাতীয় গ্রন্থ ‘ভাষাবৃত্তি’, ‘ত্রিকাণ্ডশেষ’ ‘হারাবলী’ ‘বর্ণদেশনা’ ও ‘দ্বিরূপ কোষ’ প্রণয়ন করেন।

সেন রাজাদের প্রায় সকলেই কবিতা রচনা করেছেন। তাই এ যুগকে সংস্কৃত কাব্যের সুবর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। লক্ষণ সেনের সভাসদ ও সুহৃদ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘সদুক্তি কর্ণামৃত’ নামে সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। এতে মোট ৪৮৫ জন কবির রচিত ২৩৭০টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে লক্ষ্মণ সেন ও কেশব সেনের রচিত কবিতাও স্থান পেয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের সভায় ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ ও জয়দেব— এ পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। কবি ধোয়ীর ‘পবন দূত কাব্য’ খানি কালিদাসের ‘মেঘদূত কাব্যের’ অনুকরণে রচিত। গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেন যখন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যে যান, তখন মলয় পর্বতের গন্ধর্ব কন্যা কুবলয়বতী তাঁর রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে পবনকে দূত করে তার মাধ্যমে তাঁর প্রণয় গীতা রাজার কাছে পাঠান। এ পটভূমিকায় কাব্যখানি লিখিত। দূত কাব্যের মধ্যে এখানির স্থান খুব উচ্চ। ধোয়ী আরো কাব্য লিখেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু সেগুলি পাওয়া যায়নি। কবি জয়দেব ধোয়ীকে ‘শ্রুতিধর’ ও ‘কবিগণের রাজা’ বলে উল্লেখ করেছেন। উমাপতিধরের ৯০টি শ্লোক সংকলিত

হয়েছে। এ গ্রন্থে তাঁর রচিত চন্দ্রচূড় কাব্যের উল্লেখ আছে। বিজয় সেনের প্রশস্তি সূচক দেওপাড়া লিপি এবং মাধাই নগর তাম্রশাসন তাঁরই রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জয়দেব তাঁকে ‘বাচঃ পল্লবয়তি’ অর্থাৎ ‘বাক্য বিন্যাসে পটু’ বলে প্রশংসা করেছেন।

‘আর্য্যসপ্তশতী’ গ্রন্থের প্রণেতা গোবর্ধনাচার্য ও গোবর্ধন একই ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে জয়দেব লিখেছেন যে, শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতা রচনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কাব্যখানিতে গোবর্ধনের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচয় বিধৃত। এ পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি আচার্য উপাধি পেয়েছিলেন।

সেন রাজাদের আমলে লক্ষ্মণ সেনের সভায়ই সবচাইতে বেশী কবি ও পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর সভাকবিদের মধ্যে জয়দেবই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। জয়দেব রচিত ‘গীত গোবিন্দ’ কাব্যের ‘কোমল কান্ত পদাবলী’ কেবল বৈষ্ণবদেরই নয়, সাহিত্য-রস-পিপাসু মাত্রেরই রসাস্বাদনের বস্তু। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ শ্রুতিমধুর, জনপ্রিয় অথচ উচ্চপদের সমৃদ্ধ কাব্য খুব বেশী পাওয়া যায় না। এর ৪০টিরও বেশী টীকা আছে। কাব্যখানির অনুকরণে প্রায় তের-চৌদ্দখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এতে ‘গীত গোবিন্দ’ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। বাংলার বৈষ্ণব সমাজ রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক এ কাব্য রস-শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হিসেবে একটি বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য করেন। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাদ দিলেও কেবলমাত্র ভাব ও রসের বিচারে এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্য। একাব্য প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নতুন সৃষ্টি। গ্রন্থখানির ভাষা ও আঙ্গিকে সংস্কৃত, অপভ্রংশ মৈথিলী ও প্রাচীন বাংলার পদাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে।

এখানে সংস্কৃত ভাষায় সমৃদ্ধ উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি হলেও, বাংলা ভাষা চর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পালযুগের বৌদ্ধগান ও দোঁহাগুলি যে ভাষায় রচিত, সে প্রাচীন বাংলা ভাষার পরিশীলনী এসময়ও চলছিল। নইলে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গিয়ে বড় চণ্ডীদাসের রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’ কাব্যের সাক্ষাৎ হয়ত পাওয়া যেত না। তাছাড়া সেন যুগেই ‘সেন ওভোদয়া’ নামক গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানি অপভ্রংশ মিশ্রিত বাংলায় রচিত। অনেকে মনে করেন, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপূরণও এ সময়েরই রচনা।

সেন আমলে বাংলা ভাষার চর্চা না হলেও এভাষার নিজস্ব সত্তা একেবারে লোপ পায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের আগমনের পর মুক্ত পরিবেশে সাধারণের মুখের ভাষা বাংলার ব্যাপক চর্চার সুযোগ ঘটে। একারণে পরে মধ্যযুগে এক সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

(জন্ম : রূপসী, রূপগঞ্জ, ঢাকা। ১ জানুয়ারী ১৯২৭।)

বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বি-এ. ডি-লিট



বাঙ্গলা ভাষা মুসলমান-প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাদান হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছিলেন, এবং “তৈলাধার পাত্র” কিম্বা “পাত্রাধার তৈল” এই লইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা হর্ষচরিত হইতে “হারং দেহি যে হরিণি” প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন, এবং কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পদ্য-রসাত্মক গদ্যের অপূর্ব সমাস-বদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইয়াছিলেন। রাজসভায় নর্তকী ও মন্দিরে দেবদাসীরা তখন হস্তের অঙ্কিত ভঙ্গী করিয়া এবং কঙ্কণ ঝঙ্কারে অলি গুঞ্জনের ভ্রম জন্মাইয়া “প্রিয়ে, মুঞ্চময়ি মানমনিদানং” কিম্বা “মুখরমধীরম, ত্যজ মঞ্জীরম্” প্রভৃতি জয়দেবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিল। সেখানে বঙ্গ-ভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গ ভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী ‘দূর দূর’ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্ত্য ছিল-তেমনই সৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।

কিছু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন-করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল। তাঁহারা ইরান তুরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন। আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি সেদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভূমি হইল। তাঁহারা বাণিজ্যের অছিলায় এদেশ হইতে রত্নাহরণ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুর মত এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট উহা তদপেক্ষাও বেশী আপনার হইয়া পড়িল।

বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্বে হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তরে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যাক্তি হইবে না। তাহা আমরা পরে দেখাইব।

চারিদিকে হিন্দু প্রজা- চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টার রোল, আরতির পঞ্চ প্রদীপ, ধূপ ধূনা, অঙ্কুর ঘোঁয়া- চারিদিকে রামায়ণ মহাভারতের কথা, এবং ঐ সকল বিষয়ক গান। প্রজাবৎসল মুসলমান সম্রাট স্বভাবতই জানিতে চাহিলেন, “এ গুলি কি?” পণ্ডিত ডাকিলেন- তিনি তিলক পরিয়ে, শিখা দোলাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া হজুরে হাজির হইয়া বলিলেন,

‘এগুলি কি জানিতে চাহিলে আমাদের ধর্মশাস্ত্র জানা চাই। দ্বাদশ বর্ষকাল ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার হইতে পারে।’ বাদশা ত্রুদ্ধ হইলেন, “আমি ব্যাকরণ বুঝি না, রাজ-কাজ ফেলিয়া আমি ব্যাকরণ শিখিতে যাইব, তাহাও বামুন আমাকে পড়াইবে না, -ও সকল হইবে না! দেশী ভাষায় এই রামায়ণ মহাভারত ও ভগবত রচনা কর।” গৌড়েশ্বর দেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন, না হইলে প্রজা শাসন করিবেন কিরূপে? তিনি পুরো দত্তর বাঙ্গালী সাজিয়াছিলেন- সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। দেশী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনা করিতে হইবে, এই আদেশ তিনিয়া পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল- ইতরের ভাষায় পবিত্র দেব-ভাষা রচনা করিতে হইবে, চঞ্জালকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে! কিন্তু শত শত কল্পক ভট্ট, রঘুনন্দন, শত শত স্মৃতি লিখিয়া শত শত বৎসরে যাহা না করিতে পারেন, শাহানশাহ বাদশাহের একদিনের হুকুমে তাহা হয়- রাজশক্তি এমনই অনিবার্য। অগত্যা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণকে তাহাই করিতে হইল। পরাগলী মহাভারতে উল্লিখিত আছে, “শ্রীযুত নায়ক শ্বে শ্বে নসরত খান রচাইল পাঞ্চালী সে গুণের নিধান।” এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, হুসেন সাহের পুত্র নসরত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইছিলেন। পাঞ্চালী (পাঁচালী) অর্থ মহাভারত। নসরতের আদেশে রচিত মহাভারতের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। এই গ্রন্থ অনুমান ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তখনও নসরত সম্রাট হন নাই- তাঁহাকে শুধু ‘নায়ক’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রেরিত হন, তাঁহার বংশধরগণ ফেনী নদীর তীরস্থ পরাগলপুরে (নোয়াখালী জেলায়) এখনও বাস করিতেছেন, এখনও তাঁহার স্ত্রীস্বামী ভূম্যধিকারী। এক সময়ে পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি যার প্রতাপ এই প্রদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, ছুটি খাঁর সম্বন্ধে কবি শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, “ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।” তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজ ধন্যমাধিক্য। তাঁহার মত এত বড় পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরার ইতিহাসের আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য তুল্য রাজনীতিবিশারদ রায়চাগ। এহেন সম্রাটও ছুটি খাঁর ভয়ে উদয়পুরের পার্শ্বত্যাগে দুর্গের নিভৃত কোণে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকরণ নন্দী আমাদের কাছে জানাইয়াছেন।

হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক সুপণ্ডিত কবিকে মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিতে নিযুক্ত করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর

বহুস্থানে পরাগল খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন- ‘শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী ভাস্কর’ তিনি। ‘রস বোদ্ধা’, ‘গুণগ্রাহী’ ইত্যাদি বিশেষণ তাঁর প্রতি সর্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী উভয়েই মহাভারত অনুবাদের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। কবীন্দ্র লিখিয়াছেন, ‘নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর/তান হক সেনাপতি হওন্ত লঙ্কর। লঙ্কর পরাগল খান, মহামতি/পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি/সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি। লঙ্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া/চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া। পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি/পূরণ গুণন্ত নিত্য হরষিত মতি।’ কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনি মহাভারতের ত্রীপর্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ রচনা করেন। পরাগলের বিজয়দণ্ড সুযোগ্য পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকরণ নন্দীর দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

শ্রীকরণ নন্দী তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক অনেক কথাই লিখিয়াছেন। পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত মহাভারতের এক জায়গায় কবীন্দ্র পরাগলতনয় ছুটি খাঁর উল্লেখ করিয়াছেন; ‘তনয় যে ছুটি খান পরগ উজ্জ্বল/কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল।’

সেই স্বভাবের নিভৃত পরম সুন্দর নিকেতনে- চন্দ্র শেখর পর্বতের ফোড় দেশে, শ্যামল বনস্পতি সচল মুক্ত পঙ্ক্তির ন্যায় নির্ঝরধারা অধ্যুষিত পরম রমণীয় রাজধানীতে বসিয়া প্রজারঞ্জক মহাবীর মুসলমান সেনাপতিরা হিন্দু পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্তি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক- এই ছিল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। সে কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। আজ ৪৫০ বৎসর পরে তাঁহাদের মাতৃভাষার গৌরবের সঙ্গে প্রজারঞ্জক এই রাজাদের কাহিনী দেশ-বিশ্রুত হইয়াছে। পরাগল খাঁর পিতা রাস্তি খানের সমাধি এখনও পরাগল পুরে বিদ্যাজিত। ঐ পল্লীতে বিশাল পরাগালী দীঘি। এখনও সেই মহামনা লঙ্কর খানের স্মৃতি বহন করিয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে।

হুসেন সাহ এবং অপরাপর মুসলমান সম্রাটেরা দেশীয় ভাষার কতটা অনুরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন- ‘সে নসিরা সাহ জানে যারে হানিল মদন বাণে। চিরঞ্জীবী রহ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভনে।’ অন্যত্র, ‘প্রভু গায়েশ উদ্দীন সুলতান।’ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসাদেবীর ভাসান গান রচনা করেন, তখন গৌড়ের তব্বতে হুসেন সাহ সমাসীন ছিলেন। কবি অতি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন- ‘সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।’ কবি যশোরাজ খান হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ‘সাহ হুসেন, জগত ভূষণ, সেই রস জানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খানে।’ কৃষ্ণিবাস রামায়ণের আদি

অনুবাদ কর্তা। তিনিও কোনো গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

গৌড়ের শামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ ১৩১৫ শকে (১৩৭৩ খৃঃ) মালাধর বসুকে ‘গুণরাজ বা’ উপাধি দিয়া তাঁহার দ্বারা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু কুলীসপ্রামবাসী বিখ্যাত বসুবংশীয় এবং কৃতিবাসের প্রায় সমসাময়িক কবি। পর পর অনেকগুলি মুসলমান সম্রাটের সঙ্গে বঙ্গীয় পুরাণানুবাদকদের নাম গ্রথিত দেখা যায়। সুতরাং— আমাদের নিঃসন্দেহভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, গৌড়েশ্বরগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা মাথা উচু করিয়া সুধী সমাজে দাঁড়াইতে পারিত না, মাথা হেঁট করিয়া পল্লীর এক কোণে চির উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল পুস্তক যে বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ উহা কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা প্রবাদবাক্য হইতে পরিষ্কার ভাবে জনা যায়। ‘অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ’ অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করিবে, তাহারা রৌরব নামক নরকে পমন করিবে। ব্যক্তিগত ভাবে কৃতিবাস ও কালীদাস এই কুকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা ব্রাহ্মণের ক্রোধ বহি হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কায়স্থকুলোদ্ভূত কালীদাস তাঁহার মহাভারতের প্রতি পদ্রে ব্রাহ্মণদের এত ভবভূতি করিয়াও তাঁহাদের অভিশাপ হইতে অব্যাহতি পান নাই। তিনি তো ভণিতায় ‘মন্তকে রাখিয়া ব্রাহ্মণেয় পদরজঃ’ প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিয়া তাঁহাদের মনতৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ রচিত এই প্রবাদ বাক্য— ‘কৃতিবেশে কালীদেশে আর বামুন ঘেঁষে এই তিন সর্ব্বনেশে’ (কৃতিবাস কালীদাস এবং যাহারা বামুনদের সঙ্গে ঘেঁষিয়া সম্মান হইতে চায়— এই তিন সর্ব্বনেশে) এখনও স্মরণীয় হইয়া আছে। এ হেন প্রতিকূল ব্রাহ্মণ সমাজ কি হিন্দু রাজত্ব থাকিলে বাঙ্গলাভাষাকে রাজসভার সদর দরজায় ঢুকিতে দিতেন? সুতরাং এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গলাভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়া ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের উপযোগী করিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আরাকান রাজের প্রধান সচিব মুসলমানধর্ম্মী ছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম ছিল মাগন ঠাকুর। ১৬২৬-২৭ খৃঃ অব্দে মাগন ঠাকুর সৈয়দ আলওয়াল নামক কবিকে মালিক মহাম্মদ রচিত পদ্মাবৎ নামক হিন্দী কাব্যের বাঙ্গলা তর্জমা করিতে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলা পদ্মাবৎ গ্রন্থের উল্লেখ আমরা পুনরায় করিব। দৌলত কাজি নামক এক কবি ‘লোর চন্দ্রানি’ নামক কাব্য রাজানুগ্রহে রচনা করেন।

মুসলমান রাজরাজড়ারা যে রীতি প্রবর্তন করেন, তাহা ব্রাহ্মণগণের নিষেধ বিধিও উপেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল; শাহান সাহ বাদশাহগণ যাহা

করিলেন, ছোট ছোট হিন্দু রাজন্যবর্গ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বঙ্গভাষা ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজসভায় প্রতিষ্ঠা পাইয়া বিজয়ী হইল; ব্রাহ্মণগণই স্বয়ং রৌরব নরকের ভয় অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রণয়নে তৎপর হইলেন! আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কবি ষষ্ঠিবরকে জগদানন্দ নামক মুকুটবির আদেশে মহাভারতের অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিতে দেখিতে পাই। এই ব্যক্তি সম্ভবত কোন জমিদার বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

মুসলমানগণ এই ভাবে বঙ্গদেশে বাঙ্গলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহাদের প্রভাব আমাদের ভাষার বক্ষে আরবী ফার্সীর ভূগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। প্রাকৃত ভাষার উপর ঐ সকল বিদেশী ভাষার দুষ্টদ্য ছাপ পড়িয়া গেল। মুসলমানেরা রাজত্বতে বসিলেন, তাহারাই সর্ব বিষয়ে দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন। বিলাসের আসবাব, রাজদরবারে যাহা কিছু শাসন সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চপদ তাঁহাদের অধিকৃত হইল। বাঙ্গলা ভাষার অভিধান বদলাইয়া গেল। “রাজস্ব” শব্দ “রাজনায়” পরিণত হইল, “প্রজা”রা “রায়” হইয়া গেল। “মহাপাত্র” “উজীর” হইলেন, “নিশাপতি” “কোটাল” হইল, “ধর্ম্মাধিকারী” “কাজী” হইলেন, “ভৃত্য” “নফর” হইল। “দোষী ব্যক্তি” “আসামী” হইল, অভিযোগকারী “ফেরাদী” হইল। “বিচারালয়” বা “রাজসভা” “আদালত” ও “দরবারে” পরিণত হইল। “প্রভু” হইলেন “হজুর”, দাস হইল “বেদমংগার”। এইরূপ অসংখ্য শব্দ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জাতীয় জীবনের উচ্চস্তরের ভাষা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গেল। যেখানে বিলাস,— যেখানে আমোদ-প্রমোদ, সেখানেও বিজেতাদের ভাষা প্রভাব বিস্তার করিল। যাহা সামাজিক জীবনের অধস্তরের কথা সেই শব্দগুলি শুধু প্রাকৃত ভাবাপন্ন রহিয়া গেল। কুটির বা কুঁড়ে কথার পরিবর্তন হইল না, মেটে তেলের দীপটি কুঁড়েঘরে “প্রদীপ” বা “পদিম” হইয়া জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু রাজপ্রাসাদে বা প্রাসাদোপম গৃহের আলো, ঝাড়ু, ফানুস, দেয়ালগিরি প্রভৃতি নাম বিদেশী কায়দা অবলম্বন করিল। শেষোক্ত শব্দটির শেষাংশ ফার্সীর অপভ্রংশ। ভাত, দাইল, তেল, ঘি, ক্ষেতের শস্য প্রভৃতি শব্দ নাম বদলাইল না। কিন্তু খাদ্য যেখানে উপাদেয় ও বিলাসীর যোগ্য, তখন তাহা ‘খানা’ হইয়া গেল। ক্ষেত যখন প্রভুত্বের নিদর্শন সেখানে তাহা “জমি”। “ভূস্বামী” জমিদার হইয়া পড়িলেন। দেশের বাণিজ্য ধীরে ধীরে মুসলমানের হস্তগত হইল, উহার নাম হইল “কারবার”, কারবারের সঙ্গে “আমদানী” “রপ্তানি” ও বঙ্গভাষায় ঢুকিল। সৌখিন লোকদের সুগন্ধি-গুণ্ড ও চন্দনের স্থলে “আতর” “খোশবো” অধিকার করিয়া লইল। আকাশের বায়ু, তারা, চাঁদ, সূর্য্য এগুলি অভিধানে রহিয়া গেল কিন্তু যেখানে বড় মানুষদের গৃহ কৃত্রিম আলোমালায় সুশোভিত হইল, সেখানে তাহা রোশনাই নাম

ধারণ করিল। পূর্বে “মাগধী”, “সূত” ও “বন্দীরা” শ্রুতিমধুর বন্দনা-গীতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে মিল রাখিয়া প্রত্যুবে গান করিত, -সেই সংগীতের মোহনীয় গুণে রাজাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত, কিন্তু এখন তাহার স্থলে “রশৌনচৌকী” “নইবৎ” ইত্যাদি শব্দ প্রবর্তিত হইল। রাজসিংহাসন এখন “তথ্তনামায়” পরিণত হইল। তাহা ছাড়া বিচারালয়ের সমস্ত শব্দ, “মতরজ্জম”, “নাজির”, “দলিল”, “দণ্ডরখানা”, “মুসাবিদা” ‘পেয়াদা’ ‘খাজাঞ্চি খানা’ ‘উকীল’ ‘মোক্তার’ ‘আইন’ ‘আরজী’ প্রভৃতি শত শত শব্দ প্রাচীন ভাষার প্রাকৃত শব্দের স্থল কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অধিকার বিস্তার করিল।

আমরা দেখিতে পাইলাম,- বঙ্গভাষা মুসলমান সম্রাটদের কৃপায় দ্বিতীয়বার জনগ্ৰহণ করিয়া ‘দ্বিজের’ ন্যায় সম্মান লাভ করিল। বঙ্গভাষার উপর আরবী ও ফারসী তাহাদের সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কন করিয়া দিল। এইবার আমরা দেখাইব তাঁহারা শুধু বঙ্গভাষার উপর পূর্বোক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব কবিত্ব সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহারা! মুসলমানী কেতাব লিখিয়া বাঙ্গলাকে উর্দুর দিকে টানিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিকৃত মুসলমানী বাঙ্গলায় আমরা বঙ্গভাষায় তাঁহাদের রচনার উৎকর্ষের বিশিষ্ট নিদর্শন পাই নাই।

অনুমান ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ পরগণায় সৈয়দ আলওয়ালের জন্ম হয়। আলওয়াল জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, যৌবনে এক জাহাজে চড়িয়া তাঁহার পিতা মজলিশ কাজির সংগে বঙ্গোপসাগরে যাইতেছিলেন। পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁহাদের জাহাজ আক্রমণ করে, সেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপর ছোট খাট একটি জলযুদ্ধ হয়। আলওয়ালের পিতা যুদ্ধে নিহত হন। কোন রকমে অব্যাহতি লাভ করিয়া আলওয়াল আরাকান যাইয়া তথাকার সচিব মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। মহামনা মাগন ঠাকুর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহারই আদেশে আলওয়াল পঞ্চাবৎ কাব্যের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুজা বাদশাহ আরাকানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সহিত আরাকান রাজ্যের মনোমালিন্য ঘটে। সুজা বাদশাহের গুপ্তচর বলিয়া আলওয়াল একটি মিথ্যাবাদী লোকের সাক্ষ্যে অভিযুক্ত হন, -এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত বৎসর কাল কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। তৎপরে উদ্ধার পাইয়া তিনি “ছয়ফল মল্লিক ও বদিউজ্জামাল” নামক একখানি বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। আলওয়ালের আরও অনেক কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও সাদরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তিন শত বৎসর পরেও যে কবির কাব্য জনসাধারণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছে-তাঁহার কবিতার গুণাগুণ আর সমালোচনা সাপেক্ষ নহে। তিন শত বৎসর যাবৎ যে কাব্য লোকের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার সমালোচনার আর বাকী কি আছে?

বাঙ্গলার একটি প্রদেশের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ইহা এত ছোট যে ইহাকে একখানি ইতিহাসিকা বলা চলে, ইহার প্রায় ৪০০ ছত্র কবিতা আছে। শমসের গাজি নামক এক ব্যক্তি কালক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠেন যে, তিনি ত্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থলে নিজে অধিষ্ঠিত হন। শমসের আলীবর্দি খাঁর সমসাময়িক লোকও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। এখনও শমসের গাজির গান ত্রিপুরায় গীত হইয়া থাকে— অবশ্য ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে এর বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। শমসের গাজির বিবরণ সমস্তই ঐতিহাসিক। ইনি রাজ পদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে শিক্ষা প্রচলনের যে রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, ধান চাউল ও অপরাপর খাদ্যদ্রব্যে এবং সোনা-রূপার যে দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেশের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিখুঁত ও ঝাঁটি চিত্র আমরা এই পুস্তকখানিতে পাইয়াছি। নানারূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বে এই পুস্তকখানি পূর্ণ। যদিও গ্রন্থকারের নাম নাই, তথাপি তিনি যে মুসলমান ও শমসের গাজির অভ্যন্তর ভক্ত ছিলেন, বই পড়ার পর তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বইখানি, রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় বলিতে গেলে একটি মুষ্টিভিক্ষা, কিন্তু উহা সুবর্ণ মুষ্টি, যেহেতু প্রাচীন বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক পুস্তক অতি অল্পই আছে। প্রায় ১২বৎসর পূর্বে নোয়াখালির জজ আদালতের সেরেস্তাদার মৌলভি লুৎফুল খবীর সাহেব এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া আমাকে একখণ্ড উপহার পাঠাইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় শমসের গাজির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

যদি মুসলমানগণ তাহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর ও মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে। উত্তর পশ্চিমে অনেক হিন্দু মহরমের মর্মান্বিত কাহিনী শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করে এবং উৎসবের দিনে তাজিয়া বাহির করে। নিদারুণ তৃষ্ণায় জল বিন্দুর জন্য কোমল কুসুম কোরকের মত সখিনা ও কাসেম শুকাইয়া মরিলেন— কারবালা ক্ষেত্রের সেই করুণ কাহিনী কি শুধু মুসলমানেরই জাতীয় সম্পত্তি না সমস্ত বিশ্ববাসীর রস-সম্পদ? বঙ্গের যে পত্নীসঙ্গীত মুসলমান কৃষকের অতুলনীয় সম্পদ, যে গৌরব নভঃস্পর্শী, অপূর্ব, আশ্চর্য্য, তাহার কথা আমি পরে লিখিতেছি। এখন এই সঙ্গীতের স্রোত মুসলমান সমাজে অবরুদ্ধ করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন শুকাইয়া মরিবে— বাড়ীখানি গঙ্গার তীরে অবস্থিত, সেই সুরনদীকে বদ্ধ করিলে জাতীয় জীবনের রসধারা কে সঙ্গীতবিত রাখিবে? আমির খসরু সেতারের উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন, মিঞা তানসেন সঙ্গীত বিদ্যারূপ হিমাদ্রির কাঞ্চন জজ্বায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন ইহারা কি ইসলামের শত্রু ছিলেন?

এ পর্যন্ত আমরা অনেক মুসলমান বাঙ্গলা কবির নাম করিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি নগণ্য অংশ। পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর মুসলমান চাষা ও মাঝিরা মুখে মুখে যে সকল গান বাঁধিয়া থাকে, তাহা অনেক সময় অতি সুন্দর কবিত্বময়। মুসলমান বাউলদের ‘মুরসিদা’ গান দেহতত্ত্ব বিষয়ক, তাহার ভাব-সম্পদ আধ্যাত্মিক, অনেক স্থলে তাহা এত সুন্দর যে আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়, সামান্য ফকির ও বাউলেরা কি করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের সেই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছে! শত শত মুরসিদা গান সেই সকল বাউল, মাঝি ও কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীর আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই সকল পল্লীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য গর্ব করিবার সামগ্রী— আমরা কখনও করিয়াছি? এই বঙ্গদেশে কত মসজিদ, কত ইষ্টক ও শিলালিপি, কত কীর্ত্তিস্তম্ভ মুসলমানদের বিজয়ের বার্তা ঘোষণা করিতেছে। বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যেখানে মুসলমানদের গৌরব ও পরাক্রান্ত অভিযানের কথা নাই, যেখানকার ধূলি পীর দরবেশদের পদধূলি কিম্বা সমাধিতে পবিত্র হয় নাই। কত জন তাহার খবর রাখেন?

এ পর্যন্ত আমরা দেখাইয়াছি বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর মুসলমানদের কতটা প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান কবি রাজসিংহাসনের দাবী করিতেছেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে একরূপ মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা কবিকুল চক্রবর্তী, যাহাদের যশোভাদির নিকট আলাওল এমন কি ভারতচন্দ্রের খ্যাতিও পরিম্লান হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনখণ্ড পল্লীগীতিকা প্রকাশিত করিয়াছে। তাহাতে মুসলমান কবিদের যে কবিত্বের নিদর্শন আছে, তাহা অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় এই সকল পল্লীগীতি সম্বন্ধে এদেশের লোক ততটা অবহিত নহেন। এই পল্লীগীতিকার প্রথম খণ্ডে “দেওয়ানা মদিনা” নামক একটি পালাগান প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ফরাসীদের বিখ্যাত লেখক মহাত্মা রোম্যাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন, একরূপ অদ্ভুত কাব্য তিনি গ্রাম্য কৃষকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন নাই। পল্লী কৃষক কবি কিরূপে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় এই আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মঠ রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিশ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

“দেওয়ানা মদিনার” প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন ‘জালাল গাএন’। তিনি যখন ভাটিয়াল সুরে এই গানটি গাহিতেন, তখন বেদনায় শ্রোতাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিত ও তাঁহারা আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। উহা ‘রয়াল’ আট পেজি ফর্ম্মার ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এত ক্ষুদ্র গণীর মধ্যে একরূপ করুণ রসাত্মক কাব্য আমরা আর কোন সাহিত্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রোম্যাঁ রোলাঁ সমালোচনা রাজ্যের সম্রাট, তিনি নির্ভয়ে যুক্তকণ্ঠে কবিকে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা দিয়াছেন। আমরা অধীন জাতি, আমরা নিজেদের কবি সম্বন্ধে একটা বড় রকমের প্রশংসা দিতে ভয় পাই। বিদেশী কবিগণের পশ্চাতে তাঁহাদের সমালোচকেরা দম্ভুভি-নিবাদ করেন ও

তাহাদের ডঙ্কা-নিমানে বসুধা কম্পিত হয় এবং লোকেরা গরুড় পক্ষীর ন্যায় জোড়হস্ত হইয়া থাকে— কিন্তু আমাদের পক্ষীর ক্ষেত্রে যদি অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড থাকে তাহা মাটির ঢেলার মত উপেক্ষিত হয়। “কাঠুরে এক মাণিক পেল, পাথর ব'লে ফেলে দিল, অভিমানে কাঁদছে মাণিক মহাজনে টের পেল না” —আমাদের পরাধীন দেশের কাঞ্চন কাঁচ হইয়া যায়, জয়দুগ্ধ বিদেশীদের কাঁচও কাঞ্চন মূল্যে বিকায়িত থাকে।

জামাত উল্লা বয়াতির রচিত “মাণিক তারা” বা “ডাকাতের পালা” দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পালা গানটির কাব্য-ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। কৃষক-কবি চাষাদের জীবনের যে নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়াছেন বঙ্গ সাহিত্যে তাহার সমকক্ষ কবিতা কতটি আছে জানি না। এই পালাটির কোনস্থানে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় লিপি কুশলতা, কোথাও হাস্যরসোজ্জ্বল হৈমন্তিক রোদ্দের ন্যায় সুখদ-পদবিন্যাস, কোথাও পূর্বরাগের রমণীয়তা— এ সমস্তই এমন দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে জামাত উল্লাকে সারস্বত কুঞ্জের প্রথম পংক্তিতে স্থান দিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। গ্রাম্য কবির এই কাব্যখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। পাড়ারগেয়ে ভাষা কোন স্থানে প্রাদেশিকতার বাহুল্যে দুর্ব্বোধ, কিন্তু ধূলিমাটিমলিন হীরকের জ্যোতি কি সেই সকল বাহিরের মলিনতা ফুটিয়া বাহির হয় না? মাণিক তারার কবিত্ব-ভাতির গ্রাম্য ভাষার মধ্য হইতে সেইরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডেও অনেকগুলি পালাগান আছে, তন্মধ্যে “মঞ্জুর মার পালা”টি উৎকৃষ্ট। যদিও কবির নাম পাওয়া গেল না, তথাপি ইহা যে মুসলমান কবির লেখা— সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মণির নামক এক মুসলমান সাপুড়ের কথা লইয়া এই কাব্য রচিত।

তৃতীয় খণ্ডের পল্লীগীতিকার আর কয়েকটা উৎকৃষ্ট পালা আছে, তাহার একটা মনসুর ডাকাত বা কাফন চোরার পালা। এই মনসুর ডাকাতের জীবনের গতি কি ভাবে ফিরিয়া গিয়াছিল—অতি জঘন্য নীচ ও নৃশংস-দস্যু বৃত্তি ছাড়িয়া সে কিরূপে একজন শ্রেষ্ঠ পীর ও সাধু হইয়াছিল, সেই মনস্তত্ত্বের আধ্যাত্মিক চিত্র-পটখানি কবি এই পালা গানটিতে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মাঝে মাঝে এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চরণ আছে যাহা পড়িলে কবিকে পল্লী-কালিদাস বলিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। একটি নববিবাহিতা নারী পল্লীপথে প্রথম স্বস্তর-বাড়ী যাত্রা করিয়াছেন। জ্যোৎস্না ধবধবে রাত্রি আট জন পাঙ্কীবাহক তাহাকে লইয়া যাইতেছে— কবি সেই রাত্রি দুটি ছত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন—জ্যোৎস্না রাত্রি, দোলা চলিয়া যাইতেছে— কেহ যেন মুষ্টি মুষ্টি বেলফুলের কলি দ্যলোক হইতে ভুলোকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে, এমনই সুন্দর জ্যোৎস্না।

এই জ্যোৎস্না রাত্রে মনসুর ডাকাত কুর্খাই খালের একটা বাকের কাছে, কেতকী ঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়া পাকী খানির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

দোলার গতি, জ্যোৎস্নার বর্ণনা কবিতাগুলিকে এমন একটা ছন্দ দিয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা বাহকদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি ও মনসুর ডাকাতের ব্যাঘ্রমূর্তি চাক্ষুষ করিতেছি।

কিন্তু মনসুরের পরিবর্তনের কথাটি অতি অপূর্ব। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়িবে। এই দুর্দান্ত দস্যু যে রমণীকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছে, তাহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা-সূতরাং তাহা দুর্লভ।

হাতীখেন্দার গানটি একশত বৎসর পূর্বের রচনা। এমন একটা বিষয় লইয়া যে কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহা অনেকেরই ধারণার অগম্য। কিন্তু গ্রাম্য মুসলমান কবি ইহাতে অপৰ্য্যাপ্ত কাব্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন। কবিতাগুলির বিদ্রূপছন্দ যেন শিকারীদের পদশব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। কবিতাগুলি একবারে স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতি রাখিয়া কোন স্থানে বন্দকের আওয়াজ, অগ্নিদাহের চটপট শব্দ, কোথাও শিবিরে দর্শকদের কোলাহল ও মশালের আলোকমালার দীপালির শোভা- যেন পাঠককে প্রত্যক্ষ করাইয়া সেই অদ্ভুত বন্য-অভিযানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়াছে। হাতীগুলির ভীষণতা, বুদ্ধিহীনতা, অকারণ আশঙ্কাদলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা-খেন্দার মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের আর্দ্রনাদ ও না খাইয়া অস্থিচর্খসার হইয়া যাওয়া, -এই সমস্তই হয়ত নিত্যন্ত নীরস বিষয়-কিন্তু এগুলিকে যে-কবি এরূপ রসাত্মক করিতে পারিয়াছেন-তাহার কবিত্ব ধন্যবাদার্থ-ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা চাটগেয়ে, অনেক স্থলে বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু নারিকেলের খোলাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যে রূপ ভিতরের সকলই সুসাদু ও সরস, ভাষার বাধাটা অতিক্রম করিলে এই কবিতাও তেমনই উপভোগ্য ও পরম উপাদেয় বোধ হইবে।

আমরা মুসলমান বিরচিত আরও অনেক পালাগানের উল্লেখ করিতে পারিলাম না-সে গুলিতে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের স্থান ও সময়ভাব।

মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের এইরূপ জনাদাতা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। তাঁহারা বহু ব্যয় করিয়া শাস্ত্রগুলির অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং সেগুলি অগ্রহ সহকারে শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। আরব-দেশবাসীরা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শুধু ধনরত্ন আহরণের চেষ্টায় ভিন্ন দেশ জয় করিতেন না, সেই সকল দেশে যদি জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকিত, তাহাও তাঁহারা লুটিয়া লইতেন। আবুল ফজলের ভ্রাতা ছদ্মবেশে কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্য মুসলমানদেরই সৃষ্ট, বঙ্গভাষা বাঙ্গালী

মুসলমানের মাতৃভাষা। বহু পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া মুসলমান কবিগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, -পালাগানের তাঁহারা যে শক্তি ও কবিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যিক আসরে তাঁহাদের স্থান প্রথম পঙ্ক্তিতে। কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু এখন বঙ্গ-সাহিত্যের কাণ্ডারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু গোটা বঙ্গদেশের সাহিত্য এখনও মুসলমানের হাতে- এই কথার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ময়নামতীর গান হইতে আরম্ভ করিয়া গোরক্ষ-বিজয়, ভাসান গান ও পূর্বোক্ত শত শত পালা গান; মুরশিদা গান, বাউলের গান, এ সমস্তই মুসলমানদের হাতে। তাঁহারাই অধিকাংশ স্থলে মূল গায়ন। তাঁহারাই তরজার গুরু। এই বঙ্গদেশ যে সুধামধুর কবিত্বরসে অভিষিক্ত, তাহার প্লাবন আনিয়াছে মুসলমান কৃষকেরা। একবার ধান কাটার পর বঙ্গদেশ-বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন, মুসলমান কৃষকেরা দল বাঁধিয়া কত প্রকারে গান গাহিয়া এদেশকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। কত বাউলের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, কত মাঝির ভাটিয়াল গান, কত রূপ কথা ও মনোহর কেচ্ছা ও গাজির গান তাহারা বাঙ্গলা দেশকে গুনাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। হিন্দুরা এ বিষয়ে কোনক্রমেই মুসলমানের সমকক্ষ নহে। দু'চারিজন শিক্ষিত লোক লইয়া এদেশ নহে। দুচারিজন উপন্যাস পড়ুয়ার হাতে বঙ্গদেশটি নহে। বঙ্গদেশ বলিতে যে সপ্তকোটি লোক বুঝায় তাহার শতকরা ৯০ জনেরও বেশী আধুনিক উচ্চ-শিক্ষার কোন ধার ধারে না। এই সুবৃহৎ জনসাধারণের শিক্ষা মুসলমান কৃষকেরা তাহাদের ক্ষমতা অনুসারে দিতেছে, সে ক্ষমতাও বড় সাধারণ নহে। যাহারা পদ্মাবতের ন্যায় এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বুঝিতে পারে, দেহতত্ত্ব বিষয়ক অতি সুস্বাদু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহারা কি 'মূর্খ' অভিধান পাইবার যোগ্য? এই বিপুল জনসাধারণের ভাষা বাঙ্গলা, মুসলমানগণ এখনও এই ভাষার উপর পল্লীগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন।

যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুভাষা এদেশে প্রচলনের প্রয়াসী, তাঁহারা কখনই সে চেষ্টায় কৃতকার্য হইবেন না। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বাঙ্গলাই মাতৃভাষা, মায়ের মুখে তাহারা বাঙ্গলা ভাষা প্রথম শুনিয়াছে- সে ভাষা তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। ঘরের সামগ্রী তৈরী থাকিতে এরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন তো কিছু দেখিতে পাই না। যদি বড় কিছু দিতে পার তবে ছোট জিনিষটি ছাড়িয়া দাও। সূর্যের আলো আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরের প্রদীপটি নিৰ্ব্বাণ কর, নতুবা যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া ঘর আঁধার করিবে মাত্র।'

আমাদের ভাষাসমস্যা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ



আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কি কিংবা কি হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরণ আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষায় কল্পনা-সুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে? কাহার হৃদয় এত পাষণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই; শুধু লইয়াছিল তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ। তাই আনোয়ারী, ফেরদৌসী, সাদী, হাফিয়, নিয়ামী, জামী, সানাঈ, রুমী-প্রমুখ কবি ও সাধক-বলবলকুলের কলতানে আজ ইরানের কুঞ্জ-কানন মুখরিত। যেদিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরাজি ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরাজের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যতদিন পর্যন্ত জার্মানিতে জার্মান ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত জার্মানির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্তানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ তাঁহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্তানী আলিমগণ উর্দু ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিকহ, হাদীস, তসউউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্বিময়ক আরবী, পারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দু ভাষায় সর্বত্র সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের

মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্ম-গ্রন্থের অমর্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না। বিতৃষ্ণরূপে বাংলা বলা বা লেখা তাঁহারা অপবাদজনকে মনে করেন। ফলে তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্য বাংলা জানা শ্রোতারা পর্যন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাদের বাংলা ভাষায় যেমন দখল, উর্দুও তেমন। কুলের ন্যায় যে পর্যন্ত বাংলার মাদ্রাসায়ও বাংলা ভাষা অবশ্য পাঠ্য দেশীয় ভাষারূপে স্থান না পাইবে, সে পর্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুটিবে না। যে পর্যন্ত আরবী পারসী জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না।

সে দিন অতি নিকট, যে দিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। বিদেশী ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না। যত দিন পর্যন্ত তাহা না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের একটি সময়োপযোগী শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কুলের ছাত্রদের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মানে কেবলমাত্র বাংলা থাকিবে। তৃতীয় মান হইতে ইংরাজি আরম্ভ হইবে। পঞ্চম মান হইতে Classical language শুরু হইবে। মুসলমান ছাত্রের পক্ষে কোন্ Classical language লওয়া উচিত, ইহার উত্তরে প্রত্যেক মুসলমান একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন- আরবী। আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে। আল্লাহর শেষ নবী আরবী। আমরা সেই নবীর উম্মত (মণ্ডলী), সেই শেষ প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র; মূলের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম ধর্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কোরআন হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া, বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুস্থান করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কোরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খ্রীষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তেমনই তাহার কোরআন শরীফকে না জানিবে, সে পর্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান তাহার কোরআন ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, আজ দেখ, সেই মুসলমান সন্তান সংস্কৃত, পারসী কিংবা পালী ভাষার বিনিময়ে কিরূপে তাহার কোরআনকে বর্জন করিতেছে। হা ধিক্ আমাদের মৌখিক ধর্মগুরু এইরূপ বলিয়াছেন যে, 'বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন, যেখানে পাও তাহাকে গ্রহণ কর।' পুনশ্চ, 'জ্ঞান অনুসন্ধান কর, যদিও তাহা চীন দেশে হয়।' আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই আগে ঘরের খবর

জান, পরে পরের খবর জানিও। হে মুসলমান, তুমি বাপ দাদার নাম ডুবাইয়া হেদে জেলার নাতি হইতে যাইও না।

স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসায়ও দেশীয় ভাষা, প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা এই তিন ভাষার চর্চা হইবে। মাদ্রাসাতেও স্কুলের ন্যায় ১ম হইতে ১০ম পর্য্যন্ত দশ মানে জুনিয়ার বিভাগ এবং ১ম বর্ষ হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত ছয় বর্ষ সিনিয়ার বিভাগ রাখিতে হইবে। ১ম ও ২য় মানে কেবলমাত্র বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৃতীয় মান হইতে আরবী ভাষা এবং পঞ্চম মান হইতে দ্বিতীয় ভাষা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দ্বিতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরাজি। ইংরাজি ভাষার সাহায্যে আমাদের মৌলভী সাহেবগণ আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের তত্ত্ব পাইবেন। যদি আমাদের আলিমকুল কুসুরী ফৎওয়াকরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ইসলামের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে না গিয়া, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়রাজ্যে ভক্তির আসন লাভ করিতে চান; যদি তাহারা ক্রমবর্ধমানীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গঞ্জী হইতে খারিজ করিয়া না দিয়া তাহাদের প্রকৃত ধর্মোপদেশক হইতে চান, তবে তাহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপক্ব হইতেই হইবে। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিলে যাহাদের মতে অতি ভাল মুসলমানও কাকের হইয়া যায়, পৃথিবী মাছের পিঠে আছে, পৃথিবীর চারিদিকে কাক পাহাড় দিয়া ঘেরা ইত্যাদিরূপ বালকোচিত মত যাহারা আজও পঞ্জীরভাবে প্রচার করেন, তাহাদিগকে তাহাদের সমস্ত ধার্মিকতা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজ ভক্তি করিতে অক্ষম।

স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা সর্বত্রই উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষা-সমস্যার সমাধান হয়। যাহাতে উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে সম্মত করাইতে হইবে।

অনেক দিন পূর্বে উর্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দু পক্ষকে বিস্তারিত সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। কিন্তু ন্যায়বান বিচারক দেখিবেন যে, উর্দু বাংলার দখল উত্যক্তে কিছুতেই রাস দখল পাইতে পারে না, দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।

বাংলা ভাষা চাই-ই। মুহম্মদ-ই-বখতিয়ারের বাংলা জয়ের পরে যখন হইতে মুসলমান বৃষ্টি এই চির-হরিতা ফলশয্যাপুরিতা নদনদী-ভূমিতা বঙ্গভূমি শুধু জয় করিয়া ফেলিয়া যাইবার জিনিস-নহে; এ দেশ কর্ণের জন্য, এ দেশ ভোগের জন্য, এ

দেশ জীবনের জন্য, এ দেশ মরণের জন্য, তখন হইতে মুসলমান জানিয়াছে বাংলা চাই। তাই বাংলার পাঠান বাদশাহগণ বাংলা ভাষাকে আদর করিতে লাগিলেন। যে ভাষা দেশের উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল, তাহা বাদশাহের দরবারে ঠাই পাইল। নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর নাম বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। বাদশাহের দেখাদেখি আমীর ওমরা বাংলার খাতির করিলেন। আমীর ওমরার দেখাদেখি সাধারণে বাংলার আদর করিল। পোড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ও চোখরাজনিকে ভয় না করিয়া বাঙ্গালী নবীন উৎসাহে তাহার প্রিয় ধর্ম পুস্তকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিল, কত দেশে প্রচলিত ধর্ম কথা বাংলায় প্রকাশ করিল, কত মর্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল। মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর রামায়ণ আছে; মুসলমানের 'জঙ্গনামা' আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে, মুসলমানের 'কাসাসুল আমিয়া' আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে; মুসলমানের মারফতী গান আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে; মুসলমানের 'পদ্মাবতী' আছে।

এই পুঁথি সাহিত্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। ইহাই বাঙ্গালী মুসলমানের খাঁচি সাহিত্য। সেই সময়ের কথিত ভাষায় পুঁথিগুলি রচিত হইয়াছিল। তখন পারসী রাজ-ভাষা মুসলমানের বাংলাদেশে নূতন ভাব ও নূতন জিনিস আনিয়াছিল। এই নূতন ভাব ও নূতন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারসী নাম বাংলা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজভাষার প্রভাব কথিত ভাষার উপর হওয়া স্বাভাবিক। এখন যেমন বাঙ্গালী চলিত ভাষায় ইংরাজির বুকনি ঝাড়ে, তখন ঝাড়িতেন পারসীর বুকনি। মুসলমান সেই পারসীর 'আমেজ' দেওয়া কথিত ভাষাতেই পুঁথি লিখিতেন। হিন্দু কিন্তু লিবিবার সময় যথাসাধ্য পারসী বর্জন করিয়া শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করিতেন। এখনও বাংলা ভাষায় প্রায় এক হাজার পারসী বা পারসীপত আরবী শব্দ পারসী প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।

গুটিকতক শিক্ষিত লোককে ছাড়িয়া দিলে, এখনও এই পুঁথি সাহিত্যই বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা সম্পাদন করিতেছে। পুঁথি পাঠক যখন সুর করিয়া পুঁথি পড়িতে থাকে; তখন শ্রোতৃবর্গ কখনও কারবালার শহীদগণের দুঃখে গলিয়া যায়, কখনও আমীর হামজার বা রোস্তমের বীরত্বে মাতিয়া ওঠে, কখন বা হাতেমের দয়ায় ভিজিয়া যায়। বেচারাদের আহার নিদ্রার কথা, ঘর-সংসারের কথা, চিরদিনের কথা আর মনে থাকে না। দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ন্যায় কে আমাদের এই পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে?

যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য-বিপর্যয় না ঘটিত, তবে হস্ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত। যাক সে কথা। অতীতকে যখন আমরা বদলাইতে পারিব না, তখন সে কথা লইয়া বেশী আলোচনার লাভ কি? এখন বর্তমানে আমরা বুঝিয়াছি পুঁথির ভাষা আর চলিবে না। তাহার সময়

গিয়াছে। অতীত যুগের জীব-কঙ্কালের ন্যায় তাহাকে কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও। এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের রুচি সাধু ভাষার দিকে। এখন এই ভাষাই চলিবে। ইহাতেই লেখাপড়া করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের ভাবী বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। ইহাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালী জাতির ভাষা হইবে।

হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে। কিন্তু দূর ভবিষ্যতেই হউক না কেন, তাহা ত করিতেই হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান ব্যতীত চলিতে পারিবে না। চিরকাল কি একভাবেই যাইবে? জগতের ইতিহাস পৃষ্ঠে কি হিন্দু-মুসলমান-মিলিত বাঙ্গালী জাতি, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালিয়ান, জার্মান, জাপানী প্রমুখ জাতির ন্যায় নাম রাখিতে পারিবে না? আশা কানে কানে গুঞ্জন করিয়া বলে 'পারিবে।' উত্থান-পতন, পতন-উত্থান ইতিহাসের ত এই ধার। যদি আমাদের এই মহামহীয়ান আদর্শ থাকে, তবে এখন হইতেই সেই আদর্শকে চোখের সামনে রাখিয়া চলিতে হইবে। এই আদর্শের অনুরোধে বলি ভাই মুসলমান আমাদের মিলনের শত বাধার মধ্যে আর এই ভাষার বাধা আনিও না; আর ভাই হিন্দু, তোমার নাটক-নভেলে মুসলমানের, শুধু মুসলমানের কেন-হিন্দু-মুসলমানের, বাদশাহ বেগমদিগের কালিমাখা মূর্তি কালি-মাখা কল্পনা দ্বারা আঁকিয়া আর তাহদের ভগ্নকণ্ঠে বেদনা দিও না।

আর এক কথা। মুসলমানের ধর্ম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নহে। তাহা সার্বজনীন ধর্ম। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তাহার ধর্ম তাহার প্রতিবেশীকে বুঝাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদেরকে ইসলামের মহত্ব ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্মের অধিক পক্ষপাতী। সে কি খ্রীষ্টান ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে নহে? প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে আমাদের প্রতিবেশীর ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভাষা তাহাদিগের মর্ম স্পর্শ করে, সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দুর ভাষায় ইসলামী ভাব ফুটাইতে হইবে। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন—

যবাঁ কয় বহুরে দী গোঙ্গি চে ইব্রানী চে সুরিয়ানী।

মকাঁ কয় বহুরে হক্ জোঙ্গি চে জাবলুকা চে জাবলসা।

‘ধর্মের তরে আছে সব বাণী, কি বা সে হিক্ কিবা সুরিয়ানী।

স্রুতোর তরে বোজ্জ সব ঠাই পূব-পশ্চিম কোন ভেদ নেই।’

মুসলমান বাঙালার কটমট বুলি বাঙালার কানে স্থান পাইবে না, অন্তরে ত নয়ই। খোদা, পরগম্বর, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, নামায, রোযা প্রভৃতি পারসী

শব্দ ব্যাহার করিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দী বা রাজপুতনী। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন?।

মুসলমানি বাঙ্গাল্য বাংলাদেশে প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। জলকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতে হয় না। সে আপনার পথ আপনি চিনিয়া লয়। বাঙ্গালার মুসলমানের মন আপনিই জানিতে পারিয়াছে কোন্ ভাষায় তাহার সাহিত্য রচিত হইবে। এখন মৌলানা, মৌলভী, পণ্ডিত, যিনিই বঙ্গ ভাষায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিছু লিখিতেছেন, তিনিই সাধু ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। দুই একজন যদি কেহ মুসলমানি বাংলা চালাইতে চেষ্টা করেন বা তাহাতে বই লেখেন, তাহা শুধু কলমের জোরে। ইহাদেরই সমশ্রেণীর মহাত্মারা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কলমের জোরে উর্দু করিয়া দিতে চান। কখনও কখনও আমার মনে হয় হয়ত ইহাদের কলম বনমানুষের হাড়ে ভৈরী, তাহা না হইলে এত গুণ কোথা হইতে আসিল?

বনমানুষের হাড়ে কত গুণ,

নুনকে বানায় চুন, চুনকে বানায় বেগুন।

এখানে এক নতুন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। বর্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাই ‘সবুজ পত্রের’ সম্পাদক প্রমথ বাবু। আমি রবি বাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে করি। ইহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্তন সহ্য করিতে পারেন না। ‘সাহিত্য’ পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইহারা প্রাচীনপন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয় কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব? এই প্রশ্নের একটা গা-জোরি উত্তর না দিয়া ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক কোন্ দলে আমাদের যাওয়া উচিত।

যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজাত-তন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাত-তন্ত্রের ভাষা, লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য অকথ্য। না স্রোদ্ধিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। স্রেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও

না। অপভাষা ব্যবহার করিওনা। যদি কর, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।’ ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন, ‘খবরদার। ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয় আর তোমার রক্ষা নাই। দেখনা অসুরেরা ‘হে অরুয়ঃ’ ‘হেরুয়ঃ’ স্থানে ‘হেলয়ঃ হেলয়ঃ’ বলিয়াছিল, তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখ না, বৃদ্ধের পিতা পুত্রোষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল, তাই বৃদ্ধ ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃদ্ধের নিহতা হইল।’ ঋষিদিগের শত সহস্র দোহাইতেও কিছু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালী ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, ‘ন স্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত, স্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।’ তখন ব্রাহ্মণ্য কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালী ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল, গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাত-তন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া পালীকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিছু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈন ধর্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালী প্রাকৃতির নিকট ভিত্তিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, গড়িয়া আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাটী প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের জননী।

তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘঁষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন। বিশাল জন সাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিতে তাহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্ব্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা সফল হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালী সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালীকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধু ভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাই পাইবে। যেমন মিলটন, জনসন প্রভৃতির ল্যাটিনবহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে। পরিণামে চরমপন্থীরই

জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীলযুগের (Transitional period এর) উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্লা লাগিবে নিশ্চয়ই।

ভাষাবিজ্ঞান শিক্ষাদান করে যে বহু প্রাদেশিক বিভাষার মধ্যে যে বিভাষায় বহু সদস্যস্থ রচিত হয় বা যাহা রাজশক্তির আশ্রয় পায়, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠে। জীবজগতের ন্যায় বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পরিদ্রাণ-নীতি চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক শক্তিতে নবদ্বীপের বুলি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতে ও রাজশক্তির আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথা-বার্তার জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই সূচনা। তারপর রবিবাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিকগণের প্রভাবে কলিকাতার বিভাষা সাহিত্যের ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

ভাষার-রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। একদল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবী পারসী শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে তাঁহারা বাংলাদেশ হইতে যবনকে দূর করুন, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র, দীনার প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এবং ইক্বাল, ইন্দুরার, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? ঐ সকল আরবী-পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ান সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি এবং আইন আদালতে প্রচলিত সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। বাংলা ভাষায় আরবী, পারসী, তুরকী, ইংরাজি, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি যে কোন ভাষার শব্দ বেমালাম খাপ খাইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজেদের দখলী স্বত্ববলে বাংলা ভাষায় থাকিবে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলে জুলুম করা হইবে।

(জন্ম ১০ জুলাই ১৮৮৫, পেয়ারা গ্রাম, ২৪ পরগনা এবং মৃত্যু ১৩ জুলাই ১৯৬৯।)

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান এস. ওয়াজেদ আলী



বাঙ্গালা ভাষার চর্চা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। তবে মাতৃভাষা আমাদের হাতে কি রূপ পরিগ্রহণ করবে তা নিয়ে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়।

এ সমস্যার সমাধান “আমরা বাঙ্গালী মুসলমান” এই কথাটুকুর মধ্যেই রয়েছে। কোটি কোটি মানুষের স্বাভাবিক ভাষা যদি একটা সাহিত্যের বাহন না হয়, তা হলে কোন ভাষা যে সে গৌরবের অধিকারী তা বলতে পারি না।

ভাষার আকার প্রকার এবং জাতি বিচার নিয়ে হিন্দু এবং মোসলেম সাহিত্যিকের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই অসংখ্য আরবী, ফার্সী এবং উর্দু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করতেন পরিপূর্ণ মনের ভাব অভিব্যক্ত করার জন্য।

সাহিত্যের ভাষা কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে বদলে দিয়েছেন। তিনি আরবী, ফার্সী এবং উর্দু শব্দসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, তাদের জায়গায় সংস্কৃতমূলক শব্দের আমদানী করেছেন। ফলে পণ্ডিত বাঙ্গালা তথা বর্তমান বাঙ্গালা হিন্দু-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যাসাগরের মত স্বজাতি প্রেমিক কোন মনীষী যদি আমাদের সমাজে থাকতেন, তা হলে তাঁর প্রচেষ্টায় আমাদের সেই প্রাচীন সাহিত্যও নতুন রূপ পরিগ্রহণ করতো এবং যথাসময়ে বর্তমান কালোপযোগী ভাব এবং চিন্তার উপযোগী বাহন হয়ে দাঁড়াত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তির উর্দু এবং ফার্সীর মোহেই তখন মেতে রইলেন, মাতৃভাষার দিকে জ্ঞান্বেষমাত্র করলেন না। আমাদের জাতীয় সাহিত্য তাই নতুন যুগের উপযোগী হয়ে উঠতে পারলো না, লাঞ্ছিত, অনাদৃত হয়ে সে পল্লীর কুটিরেই পড়ে রইলো। পক্ষান্তরে হিন্দুদের জাতীয় সাহিত্য তাদের অক্লান্ত সেবায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্যে পরিণত হল। তারপর দুই-একজন করে মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামতে আরম্ভ করলেন, তখন হিন্দুর ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিকে দখল করে বসেছে, দেশের সাহিত্যকে দখল করে বসেছে, সংবাদপত্র প্রভৃতিকে দখল করে বসেছে। জাতীয় ভাষা ব্যবহার করার মত সাহস, শক্তি এবং প্রতিভা আমাদের তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুর ব্যবহৃত ভাষাকেই তাঁরা রুচিসম্মত এবং ভদ্রতাসম্মত বলে মনে করলেন। মীর মশাররফ হোসেন, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন, শেখ আবদুর রহিম প্রভৃতি হচ্ছেন সেই যুগের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাহিত্যিক।

তারপর এসেছে আমাদের এই বর্তমান যুগ। বিদ্যাসাগরী গৌড়ামীর বিরুদ্ধে এবং মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক বিদ্রোহ বা Natural reaction দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিকালে ‘সওগাত’-এ প্রকাশিত “বান্গালা ভাষায় মুসলমানী শব্দ”, “মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য” প্রভৃতি প্রবন্ধই তাঁর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা আন্তে আন্তে এখন বুঝতে পারছি, আমাদের স্বাভাবিক জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা লজ্জার বিষয় নয়, উপরন্তু সেই ভাষাতেই আমাদের প্রকৃত সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

আমাদের স্বাভাবিক ভাষা কি? বান্গালী মুসলমানের বান্গালা যে বান্গালী হিন্দুর বান্গালা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আর এই প্রভেদ অহেতুক নয়। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং কালচারগত কারণ বর্তমান আছে। সেই সব কারণের দরুন এক সময় পুঁথির ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এখন আমাদের ভাষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করতে হবে। আমির হামজার দাস্তানের ভাষা আমাদের সাহিত্যে আর চলবে না। আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুকরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হব। পরে হয়তো হিন্দু ও মুসলমানের দুই উপভাষায় মিলে ব্যাপকতর এক ভাষার সৃষ্টি করবে। তবে সে পরিণতি নির্ভর করবে আমাদের হিন্দু বন্ধুদের উপর, কেননা তাঁদের উপভাষা গ্রহণে এক্ষণে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছি। তাঁরা এখন এগিয়ে অর্থ পথে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

সাহিত্যে কাজ হচ্ছে ব্যক্তির, জাতির, বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-সমবেদনা প্রভৃতি অনুভূতিকে, মানুষের অন্তরের অন্তরতম সত্যকে, সুন্দর সরল মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করা। তবে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক যুগের সাহিত্যের দেশগত, জাতিগত, যুগগত, বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এবং প্রত্যেক সমাজের মধ্যে এইসব বিশেষত্ব আবহমানকাল থেকে চলে আসছে।

বিশ্বমানবতার বড় সমর্থক হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বমানবতার বিষয় নিয়ে যত লিখেছেন, আর কেউ বোধ হয় তত লেখেন নি। তাঁরই লেখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে একদল দেশপ্রেমিক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছেন, আর তাঁরা ইসলামী সভ্যতাকে বান্গালা দেশ থেকে তাড়াবার জন্য বন্ধপরিষ্কর হয়েছেন এবং হিন্দু ও মোসলেম সভ্যতার সমন্বয় করে নতুন একটা কিছু গড়বার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এ সব করছেন, তিনি অশেষ কষ্ট করে ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে যাচ্ছেন হিন্দু কালচারের পুনরুত্থানের জন্য; নটরাজের পালা লিখছেন, বান্গালী

ছেলেদের হিন্দু পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্য বেদমন্ত্র পাঠে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য। যে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখলে দশবার তাতে উপনিষদের উল্লেখ করতে ছাড়েন না, তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে আমাদের সমাজের কতিপয় সাহিত্যিক ইসলামিক কালচারের শত্রুতা সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

এই সেইদিন মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ভারতে, মিশনারীদের তিনি খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে দেবেন না। কারণ, তাঁদের নিজস্ব ধর্মবাদই ভারতবাসীর পক্ষে যথেষ্ট। হিন্দুরা তাঁদের জাতীয় কালচারের প্রয়োজন কতটা অনুভব করেন, রবীন্দ্রনাথের এবং মহাত্মা গান্ধীর সাধনা এবং উক্তি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। হিন্দু সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য আজ সমস্ত হিন্দু সমাজ উঠে পড়ে লেগেছেন। হিন্দু যে ভবিষ্যৎ ভারতীয় কালচারের স্বপ্ন দেখেন, তা লুপ্ত হিন্দু সভ্যতার দ্বিতীয় সংস্কারণ ছাড়া আর কিছু নহে।

জাতীয় জীবনের সঙ্গে জাতির কালচারের ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ—যেমন শরীরের সঙ্গে প্রাণের। যতদিন জাতীয় কালচার বর্তমান আছে, ততদিন জাতির মৃত্যু নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই জাতীয় কালচারের সাহায্যেই জাতি সমস্ত বিপদ-আপদ অতিক্রম করে সিদ্ধির, মুক্তির উদার আকাশতলে এসে দাঁড়ায়।

বিপদের ঘনঘটায় জীবন আমাদের আচ্ছন্ন। আমাদের ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী বিপদসঙ্কুল হবে, স্পষ্টই তা বোঝা যায়। সেই দুর্দিনে স্বতন্ত্র নির্বাচন আমাদের বাঁচাবে না আর মিশ্র নির্বাচনও আমাদের বাঁচাবে না। আমাদের কালচারকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকি, সেই কালচারের যদি উপযুক্ত সম্মান এবং সমাদর করি, তা হলেই সেই কালচারই আমাদের তখন একমাত্র রক্ষাকবচ হবে, আর সেই কালচারের সাহায্যেই আমাদের সমাজ-তরুণী বিপদের উত্তাল তরঙ্গ-মালা অতিক্রম করে সালামতের বন্দরে পৌঁছতে পারে।

আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে তিনটি সত্য একান্ত স্পষ্ট হয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরা দেয়, যথা: ১. আমরা ধর্মে, কালচারে এবং রক্তে মুসলমান ২. রাষ্ট্রে এবং ভৌগোলিক বিভাগ হিসাবে আমরা ভারতবাসী, ৩. মাটি, ভাষা, স্বাভাবিক সহানুভূতি হিসাবে আমরা বাঙ্গালী। এই তিনটি বড় সত্য আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এর কোনটিকে অবহেলা করে কিছু সমাধান করলে তা আমাদের সমস্যার নিষ্পত্তি করবে না, আমাদের প্রাণে প্রেরণার সঞ্চার করবে না। আমাদের মুসলমান হিসেবেই সমস্যাকে দেখতে হবে, কেননা, ভারতবর্ষে আমরা হচ্ছি বিশিষ্ট এক কালচার ইউনিট।

তবে, সমস্যা কে যেমন মুসলমান হিসাবে দেখতে হবে, তেমনি ভারতবাসী হিসেবেও দেখতে হবে। মুসলমান ভারতবাসীর পক্ষে যা অনিষ্টকর, ভারতবর্ষের পক্ষেও তা অনিষ্টকর। ভারতীয় মুসলমান সমাজের স্বার্থ হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বার্থ, আর যা ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থের বিরোধী তা ভারতবর্ষের স্বার্থেরও বিরোধী।

আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানবতা, আধুনিক পরিভাষায় বিশ্বমানবতা প্রকাশ পাবে। সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে মোসলেম কালচারের অনুসারী আমরা, সে সাহিত্যে প্রকাশ পাবে বাঙালা আমাদের মাতৃভাষা, আর বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের সাহিত্যিকদের লেখা থেকে এই তিনটি সত্য সুপ্রকট হয়ে উঠুক।

সাহিত্যে দাস মনোবৃত্তি ও পরাজিতের মানসিকতা দূর করে যথেষ্ট সাহসের এবং নতুন আত্মসম্মানপূর্ণ মানসিকতার পরিচয় আমাদের দিতে হবে। যে দিন বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানের লেখায় এই রকম আত্মসম্মানের পরিচয় পাবো, সেদিন সত্যই আমাদের মনে আনন্দের হিল্লোল উঠবে।

আমাদের বর্তমান মানসিক এবং নৈতিক দুর্দশার জন্য প্রধানত: দায়ী হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী। হিন্দু ছাত্র হিন্দুর উপযোগী শিক্ষা পায়, খৃষ্টান ছাত্র খৃষ্টান উপযোগী শিক্ষা পায়, আর মুসলমান ছাত্র খৃষ্টান এবং হিন্দুর উপযোগী শিক্ষা পেয়ে থাকে; মুসলমানের উপযোগী শিক্ষা পায় না। আমাদের ছেলেরা মুসলমানের উপযোগী শিক্ষা যাতে লাভ করতে পারে এবং তা নিয়ে তারা যাতে গৌরব অনুভব করতে শিখে তার আয়োজন করতে হবে। আর বাঙালা ভাষায় মুসলমানের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে। এই দুইটি কাজ যদি আমরা সূচারুভাবে করতে পারি, তা হলে জাতীয় আদর্শকে তার উপযুক্ত আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবো।

আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের সমাজের তরুণ এবং তরুণীদের উপর। আর কারো উপর নয়। তাঁরা যদি জাতীয় সাহিত্য রচনায় তাঁদের কর্তব্য পালন করেন, তাঁরা যদি সমাজকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, তা হলে তাঁদের আন্তরিক সেবায় সব দুঃখ, সব দৈন্য আমাদের কেটে যাবে, আশার এবং আনন্দের গানে জীবন আবার আমাদের মুখরিত হবে।

(জন্ম : বড়জাতপুর, গ্রীলামপুর, হুগলী, ভারত, ১৮৯০ এবং মৃত্যু ১৯৫১)

পুঁথি সাহিত্য : আমাদের সাহিত্য ভাষার বুনিয়েদ আবুল কালাম শামসুদ্দীন



এক. উত্তরাধিকার

পুঁথি-সাহিত্য বাঙলা সাহিত্যের এক বড় সম্পদ। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি রূপ কি ছিল, সে সম্পর্কে নানা মুণির নানা মত। কিন্তু পুঁথিরূপে একে যখন আমরা সর্বপ্রথম দেখি, তখন তার কদর রাজসভার দরবার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। বাঙলার তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ে তখন পুঁথি-সাহিত্য দরবারী আসন লাভ করেছে। গৌড়ের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন তার কদর বাঙলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কি আরাকানের মগ রাজ্যের দরবারেও পুঁথি-সাহিত্যের আসন তখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইতিপূর্বে বাঙলা ভাষার কোনরূপ সাহিত্যিক মর্যাদা ছিল না; আর্য সম্ভানেরা একে ‘পক্ষীর ভাষা’ বলে অবজ্ঞা করতেন এবং এই ভাষায় সাহিত্য রচনাকে দৃষ্ণীয় মনে করতেন। কিন্তু বাঙলার মুসলমান সুলতানগণ সূচারূপে রাজ্য শাসনের তাগিদে দেশরক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। তাই তাঁরা বিনা দ্বিধায় বাঙলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিলেন এবং কবি ও সাহিত্যিকগণকে বাঙলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁথির মাধ্যমে বাঙলা ভাষা সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত হল।

প্রথম অবস্থায় পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা গৌড়ের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক ছিল বলে মনে হয়। এতে অবশ্য বিন্ময়বোধ করার কারণ নাই। সংস্কৃত যাদের ‘দেবভাষা’, তাঁদের ভাষার অনুসরণেই মুসলিম পুঁথিকারগণ পুঁথি রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তা’ছাড়া জনসাধারণের ভাষায় লেখার চাইতেও প্রাথমিক লেখকের ঝোঁক সাধারণত দেখা যায় অপ্রচলিত কঠিন শব্দ প্রয়োগে সাহিত্য প্রকাশের দিকে। পুঁথি-সাহিত্য রচয়িতাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগে দেখা যায়, সাহিত্যের ভাষা ক্রমে জনসাধারণের ভাষার সন্নিহিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে রাজধানী গৌড়ের জনসাধারণের ভাষায় খুব স্বাভাবিকভাবেই বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দের মিশ্রণ ঘটেছিল। তাই পুঁথি-লেখকদের রচনায় ক্রমেই আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ বেড়ে গিয়েছিল। এতে বিন্মিত হওয়ার কোন কারণই ছিল না। আরবী-ফার্সী শব্দবহুল ভাষা তখন শিক্ষিত জনসাধারণেরই ভাষা হয়ে উঠেছিল এবং এই কারণেই

সাহিত্যের ভাষায় তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই ভাষাকে সেকালে কেউ গুরুত্বপূর্ণী দোষের বলে মনে করে নাই। স্বাভাবিক সাহিত্যিক ভাষা বলেই তখন তাকে সকলে গ্রহণ করেছিল।

পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে বাঙলা ভাষাকে ঢেলে সাজানো হল। যে ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষার সন্নিহিত হয়ে উঠেছিল, তাকে জোর করে সংস্কৃতানুসারী করে তোলা হল। এই নব-সংস্কৃত বাঙলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ দিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রচেষ্টার সাহিত্যিক প্রতিবাদে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখলেন ‘আলালের ঘরের দুলাল।’ আলাওল, শাহ গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনাবলীর মাধ্যমে যে ভাষার ক্রমবিকাশ হচ্ছিল স্বাভাবিকভাবে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে এসে তার গতিধারা পরিবর্তিত হল। অর্থাৎ বাঙলার জনসাধারণের মুখের ভাষা ছেড়ে তা নবদ্বীপের টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ভাষার অনুসরণে নিয়োজিত হল। প্যারীচাঁদ এই অস্বাভাবিক অবস্থারই প্রতিবাদ করলেন।

এই প্রতিবাদে ফল কিছু হল না, এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র উভয় প্রকার ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের প্রভাব থেকে আরো দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভাষা জনসাধারণের, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের, ভাষা থেকে অনেকটা দূরেই রয়ে গেল।

এরপরেই এলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সাহিত্যের ভাবের ক্ষেত্রেই শুধু বিদ্রোহ করলেন না, ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর বিদ্রোহ লক্ষ্যযোগ্য। পুঁথির ভাষাকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন না বটে, কিন্তু আধুনিক ভাষার সাথে পুঁথির ভাষার এমন চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করলেন যে, সকলে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করল। কোনো কোনো মহল থেকে তাঁর এ প্রচেষ্টার বিপক্ষে ক্ষুদ্র প্রতিবাদ উত্থিত হল বটে, কিন্তু তিনি জনগণের চিন্তাজয় করলেন। বাঙলা ভাষার যে যোগসূত্র বিদ্যাসাগরে এসে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, নজরুল ইসলাম বেমালুমভাবে তা জুড়ে দিলেন। নজরুল ইসলাম পুঁথি-সাহিত্যেরই উত্তরাধিক।

পাকিস্তান এসে বাঙলা দেশকে দু’ভাগ করে দিয়েছে রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের তাগিদে। তার ফলে উভয় অংশের সাহিত্যেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভাষা সম্পর্কে নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গে হয়ত স্বীকৃতি পাবে না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী বাঙলা সাহিত্যে নজরুল-উদ্ভাবিত ভাষার নব-রূপায়ণের স্বীকৃতি অবশ্যজ্ঞাবী। শুধু ভাষার দিক দিয়ে নয়, পুঁথি-সাহিত্য যে তমদ্দুনের ধারক ও বাহক, সেদিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী পুঁথি-সাহিত্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করতে পারে না। একথা ঠিক যে

পুঁথি-সাহিত্যকে হুবহু সাহিত্যক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা চলবে না, তবে পরিবর্তিত ও সংশোধিতভাবে পুঁথি-সাহিত্যের ধারাকে আমাদের সাহিত্যে ফিরিয়ে আনতে হবেই। নজরুল ইসলাম সেদিক দিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক।

দুই. কয়েকজন পুঁথিকাব্যাকার

পুঁথি-সাহিত্য বিশাল। ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে পুঁথির সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। এ অভিমতের সত্যতা যাচাই করা কঠিন। কারণ বহু পুঁথির নামের সন্ধান পাওয়া গেলেও সে সবার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। তা'ছাড়া অনেক পুঁথির অস্তিত্বের খবর পাওয়া গেছে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির মারফতে। সে সব পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ আবার এমন অসমাপ্ত ও জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে যে, সেগুলি পুঁথি হিসাবে উল্লেখযোগ্য রচনা কিনা সে-সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সব জীর্ণ পাণ্ডুলিপির রচনাংশ উদ্ধার করে কেউ কেউ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখে পুঁথি-সাহিত্যের গবেষক হওয়ার জন্য কোশেশ করেছেন বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নিতান্ত বাজে জিনিষ নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছে! আবার এই শ্রেণীর গবেষণার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, গবেষকের বাসভূমিপ্রীতি এর মূলে সক্রিয় হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতনের মোহও গবেষকের প্রেরণা যুগিয়েছে। হয়ত গবেষক ভেবেছেন, প্রাচীন পুঁথি নিয়ে একটা গবেষণার মতো কিছু খাড়া করলে সাহিত্যমহলের বাহবা-প্রাপ্তি সহজলভ্য হতে পারে।

পুঁথি-সাহিত্য নিয়ে গবেষণাকে নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে এ সব কথা বলছি, এ কথা যেনো কেউ না ভাবেন এবং এ সম্পর্কে সত্যকার গবেষণার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী বলে আমি মনে করি। কারণ পুঁথি-সাহিত্যে এত মূল্যবান সাহিত্য-সম্পদ রয়েছে, যা সত্যিই পাক-বাঙলার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে এবং মুসলিম বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য সাধনা যে কোনোদিক দিয়েই হিন্দু সাধনার চাইতে নীচু স্তরের ছিল না, তা প্রতিপন্ন করবে। এই কারণে আমরা চাই, পুঁথি-সাহিত্য নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চলুক এবং লুপ্তপ্রায় সাহিত্য-সম্পদের পুনরুদ্ধার সম্ভব হোক। কিন্তু তাই বলে কোনো বাড়ীর আনাচে-কানাচে প্রাচীন কাগজে কোনো লেখা পেয়ে তার মূল্য যথাযথভাবে যাচাই না করে তাকে গবেষণার ফল বলে চালাবার চেষ্টা নিতান্তই হাস্য্যাস্পদ। অপ্রকাশিত বহু জীর্ণ পাণ্ডুলিপিতে মূল্যবান সাহিত্যসম্পদ থাকা সম্ভব নিশ্চয়ই, কিন্তু বহু কবিশপ্রার্থীর অক্ষম রচনাও সে সবে রয়েছে এবং হয়ত বা এ কারণেই তারা ছাপার হরফে প্রকাশিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করে নাই। আমাদের কথা : ‘গবুচন্দ্রের কয়টা ছিল হাতী, হবুচন্দ্রের কয়জন ছিল নাতি’-পুঁথির গবেষণা যেনো এ পর্যায়ে না হয়।

আগেই বলেছি, পুঁথি-সাহিত্য বিশাল এবং এই বিশাল পুঁথি-সাহিত্যের সম্যক আলোচনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন বিশাল গ্রন্থ রচনার। আমি সে বিষয়ে অধিকারী নই, যোগ্য পণ্ডিতগণ তা করবেন। আমি এখানে শুধু কয়েকজন শক্তিশালী পুঁথিকারের কথাই উল্লেখ করব, যাদের প্রতিভার দান পুঁথি-সাহিত্যকে সত্যিই গৌরবে মণ্ডিত করেছে এবং সাহিত্যসমাজে যাদের স্বীকৃতি অবিসম্বাদিত। আমি জইনুদ্দীন, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, হায়াত মাহমুদ, দওলত কাজী, আলাওল, শাহ গরীবুল্লাহ, মুনশী মোহাম্মদ ইয়াকুব, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ খাতের, মোহাম্মদ দানেশ, মফিজুদ্দীন প্রমুখ পুঁথিকারদের কথা বলছি।

প্রথমোক্ত ছয়জন কবির পুঁথিগুলির ভাষা প্রধানত সংস্কৃতভাষা; তবে প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দের মিশেল সে সবে একেবারে নাই এ কথা বলা যায় না। আর বাকী কয়েকজন তখনকার প্রচলিত ভাষায় অর্থাৎ আরবী-ফার্সী-মিশেল তখনকার জনসাধারণের মুখের ভাষায় তাঁদের পুঁথিগুলি লিখেছেন। এই কারণে প্রথমোক্ত কবিদের সংস্কৃত-প্রধান পুঁথিগুলির জনসাধারণে ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয় নাই; আর জনসাধারণে প্রচলিত ভাষায় লেখা শেষোক্ত পর্যায়ের পুঁথিগুলো সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান এড়িয়ে এখনো পর্যন্ত বাঙলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে-শুধু তাই নয়, এখনো এসব পল্লীবাসীদের বৈঠকখানায় সানন্দে পঠিত হচ্ছে এবং তার সাগ্রহ শ্রোতারও অভাব হচ্ছে না।

এই উভয় পর্যায়ের পুঁথি-কবিদের রচনায়ই শক্তির পরিচয় আছে। শুধু তা-ই নয়, তারা যে জীবনভর এ নিয়ে সাধনা করেছেন, তারও পরিচয় তাঁরা তাঁদের বিশালকায় কাব্যগুলিতে রেখে গেছেন। তাঁদের সে সব রচনার একটুখানি পরিচয় দিলেই আমাদের এ মন্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সৈয়দ সুলতান-ইনি সম্ভবত চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবত ঐর জন্ম হয়। ইনি দীর্ঘকাল অর্থাৎ প্রায় শত বৎসর বেঁচে ছিলেন বলে মনে করার কারণ আছে। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খান ‘কিয়ামতনামা’ রচনা করেন ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে দেখা যায়, এই রচনার সময়েও সৈয়দ সুলতান বেঁচে ছিলেন। কাজেই সৈয়দ সুলতান শতায়ু হয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

সৈয়দ সুলতানের রচনা-সংখ্যা কত, তা এখন সঠিকভাবে জানার উপায় নাই। তবে এ পর্যন্ত তাঁর যে সব পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে এই : (১) নবী-বংশ, (২) রসুল বিজয়, (৩) শবে-মেরাজ, (৪) ওফাতে-রসুল, (৫) জয়কুম রাজার লড়াই, (৬) জ্ঞান প্রদীপ, (৭) ইবলিসনামা, (৮) মারফতী গান, (৯) জ্ঞানচৌতিশা ইত্যাদি। এদের মধ্যে ‘নবী-বংশ’, ‘শবে-মেরাজ’, ‘রসুল বিজয়’ প্রভৃতি কাব্যগুলির আকার বিরাট। ‘নবীবংশ’ ও ‘শবে-মেরাজে’র রচনায় তাঁর চকৎকার কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে।। মধ্যযুগে সম্ভবত এত বেশী সংখ্যক কাব্যের রচয়িতা আর কেউ ছিলেন না।

মোহাম্মদ খান- সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মোহাম্মদ খানও সে যুগে প্রতিভাশালী কাব্যসাধক ছিলেন। তাঁরও বাসস্থান চট্টগ্রামে ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। তাঁরও রচনা-সংখ্যা অল্প নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : (১) কিয়ামতনামা, (২) মজল হুসেন, (৩) সত্যকলি বিবাদ-সংবাদ ইত্যাদি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁর কাব্যসাধনা চলেছিল বলে মনে হয়।

হায়াত মামুদ- ইনি রংপুর নিবাসী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি ছিলেন। এঁর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা ‘আখিয়াবাণী।’ তাছাড়া, ‘জারীজ্ঞানামা’ বা ‘মহরম পর্ব’, ‘চিন্ত-উধান’ বা ‘সর্বভেদ’, ‘হিতজ্ঞানবাণী’ প্রভৃতি কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন। এঁর রচনায় যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

দওলত কাজী ও আলাওল- সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুঁথি-কাব্যকার ছিলেন। তাঁর বাসভূমি নিয়ে বাঙলা-সাহিত্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, তাঁর বাসভূমি ছিল চট্টগ্রাম। কিন্তু আবদুল গফুর সিদ্দিকী, যামিনীকান্ত সেন প্রমুখ সাহিত্যিকের মতে আলাওলের জন্মস্থান ছিল ফরিদপুরে, তবে শেষ জীবনে তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু বাসস্থান তাঁর যেখানেই হোক, তাঁর কাব্যবিচারে সেটা খুব বড় কথা নিশ্চয় নয়।

দওলত কাজী ও আলাওল এঁরা উভয়েই ছিলেন আরাকান রাজসভার কবি। রোসাক রাজদরবারের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় উভয়েই কাব্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তার ফলে উভয়েই তাঁদের অমূল্য কাব্যসম্পদ রেখে গেছেন। দওলত কাজী ‘সতী-ময়না’ ‘লোর-চন্দ্রাণী’ এবং আলাওল ‘পদ্মাবতী’, ‘হফত-পয়কর’, ‘তোহফা’, ‘সয়ফল মূলক বদিউজ্জামাল’, ‘সিকান্দর নামা’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাঙলার কবিমহলে অমর হয়ে রয়েছেন। উভয়েরই সত্যকার কবিত্বপ্রতিভা ছিল।

শাহ গরীবুল্লাহ ও মোহাম্মদ ইয়াকুব শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন হুগলী জেলার অধিবাসী এবং মোহাম্মদ ইয়াকুব ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাটের লোক। যে কোনো কারণেই হোক, মোহাম্মদ ইয়াকুব নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে হুগলীতে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। তখন শাহ গরীবুল্লাহ সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং উভয়ে একসঙ্গে কাব্যচর্চা শুরু করেন। তাঁরা উভয়েই সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁদের কাব্যরচনা করেন। বাঙলা ভাষায় তাঁরা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছিলেন এবং এজন্য তাঁরা চিরদিন সাহিত্যক্ষেত্রে কীর্তিত হবেন। বাঙলা কাব্যের ভাষাকে সংস্কৃতির নিগড় থেকে মুক্ত করে তাঁরা জনসাধারণের মুখের জবানে কাব্যরচনা শুরু করেন। সেকালে এটা ছিল এক অসমসাহসিক কাজ। হিন্দু বাঙলা তাদের

‘দেবভাষা’র এই ‘অপমানে’ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা তাদের পক্ষেও সম্ভব হল না। কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষা লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন :

‘না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল-

অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।’

শাহ গরীবুদ্দাহ রচনা করেন : (১) ইউসুফ-জুলায়খা, (২) সত্যপীর এবং (৩) মক্তাল হোসেন বা জঙ্গনামা। শেষোক্ত ‘জঙ্গনামা’র রচনার সূচনা মাত্র করেছিলেন শাহ গরীবুদ্দাহ। এর প্রায় সব রচনারই শায়ের হচ্ছেন তাঁরই সহযোগী বন্ধু মোহাম্মদ ইয়াকুব। ‘জঙ্গনামা’ পুঁথি-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর মতো বহুলপ্রচারিত কাব্য পুঁথি-সাহিত্যে খুব কমই আছে। এটি ফার্সী কাব্য ‘মক্তাল হোসেন’র অনুবাদ। ইতিপূর্বে আরো কয়েকজন পুঁথিকার এই কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন, বিশেষ করে মোহাম্মদ খানের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ ইয়াকুবের ‘জঙ্গনামা’ যেমন এখনো পর্যন্ত পত্নী-বাড়লার মুসলমানদের ঘরে ঘরে পঠিত হচ্ছে, তেমন প্রচার সৌভাগ্য অন্য কোনো ‘মক্তাল-হোসেন’ বা ‘জঙ্গনামা’র ভাগ্যে ঘটে নাই। তার প্রধান কারণ এর ভাষা দুর্কন্ডার সংস্কৃত-প্রধান নয়; মুসলমানদের সুবোধ্যতম ঘরোয়া বাড়লায় এ রচিত।

সৈয়দ হামজা- সৈয়দ হামজা পুঁথি-সাহিত্যের আরেকজন বহুলপ্রচারিত পুঁথি-লেখক। তাঁর ‘আমীর হামজা’রও ব্যাপক প্রচার-সৌভাগ্য দেখা গেছে। এ ‘রামায়ণে’র মতোই বিরাটকায় কাব্য। শুধু এ পুঁথিই নয়, সৈয়দ হামজা আরও বহু জনপ্রিয় পুঁথি রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ‘জৈগুণ’, ‘মধুমাল্য’, ‘হাতেম তাই’ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ‘হাতেম তাই’ প্রায় ‘জঙ্গনামা’র মতোই বিপুল প্রচার-গৌরবের অধিকারী। ইনি ছিলেন হাওড়া-হুগলী জেলাঘরের সীমান্তে অবস্থিত ডুরশট পরগণার অধিবাসী।

মোহাম্মদ খাতের- মোহাম্মদ খাতের আরেকজন উল্লেখযোগ্য পুঁথিকাব্যকার। ইনিও বহু পুঁথিকাব্যপ্রণেতা। তন্মধ্যে ফেরদৌসীর ফার্সী মহাকাব্য ‘শাহনামা’র অনুবাদ প্রধান। পুঁথি ‘শাহনামা’ও বিপুল প্রচার-সৌভাগ্য লাভ করেছে। ‘শাহনামা’ ছাড়াও তিনি আর যে, সব পুঁথিকাব্য রচনা করেছেন, তন্মধ্যে (১) ‘তাজকিরাতুল আউলিয়া’, (২) খোলাসাতুল আখিয়া, (৩) লাইলী-মজনু, (৪) নূরনামা, (৫) মিস্তাহল জান্নাত, (৬) গোলে হরমুজ, (৭) তুতীনামা, (৮) মেরাজনামা প্রভৃতি পুঁথিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি হাওড়া জেলার অধিবাসী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন বলে মনে হয়।

মোহাম্মদ দানেশ- অন্যতম প্রধান পুঁথিকাব্য ‘চাহার দরবেশ’-এর প্রণেতা হচ্ছেন মোহাম্মদ দানেশ। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁথিকারদের অন্যতম।

মুফিজুদ্দীন-পঞ্চাশ খণ্ডে সমাপ্ত বিরাটকায় ‘আলেফ লায়লা’ গ্রন্থের রচয়িতাদের অন্যতম হিসাবে মুফিজুদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এই বিশাল পুঁথির শায়ের একজন নন। ‘আলেফ লায়লা’ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য। যে পুঁথিকারগণ এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদ পুঁথির মারফতে বাড়লা ভাষায় উপহার দিয়েছেন, তাঁরা বাড়লা সাহিত্যের পরম উপকার করেছিলেন।

তিন. পুঁথি-সাহিত্যের গবেষক

পুঁথিসাহিত্য নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ও ডা. আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর নাম সর্বাত্মে উল্লেখযোগ্য। পরে যারা এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক আদমউদ্দীন, আলী আহমদ, সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, অধ্যাপক আবু তালিব প্রমুখ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের চেষ্টায় আমাদের পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তবু মনে হয়, এ সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার এখনো বাকী রয়ে গিয়েছে। তাছাড়া যে পদ্ধতিতে এর আলোচনা-গবেষণা অগ্রসর হচ্ছে, মনে হয়, তাতে গোড়া থেকেই যেনো ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

সাহিত্যের ইতিহাস লেখার সূচনা হিন্দুদের থেকেই শুরু হয়েছে, এ কথা সকলেই জানেন। পুঁথি-সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপারে নিরাসক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেন নাই। সংস্কৃত-ঘেঁষা বাড়লায় লেখা হিন্দুয়ানী ভাবের পুঁথিগুলোকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন; আর আরবী-ফার্সী-মিশেল ভাষা মুসলমানী ভাব ও বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বিশাল পুঁথি-সাহিত্যকে তাঁরা ‘বটতলার পুঁথি’ বলে উপেক্ষা করে গেছেন। এই সব হিন্দুপণ্ডিতের মুসলমান সাগরেদদের এ সম্পর্কিত গবেষণাও তাই একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। উপরে যাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সবাই অবশ্য হিন্দু-পণ্ডিতদের সাগরেদ নন।

পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে এঁদের কারুর কারুর আলোচনা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পরিসরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বিশাল পুঁথি-সাহিত্যের ব্যাপকতার আলোচনা তাঁদের দ্বারা এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। প্রধানত: আলাওল নিয়েই এঁরা বেশী আলোচনা করেছেন। কিন্তু পুঁথি-সাহিত্য-রচয়িতার সংখ্যা অনেক। এই বিশাল পুঁথিসাহিত্য নিয়ে যারা আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন, তাঁদের শুধু আলাওল প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁথি-সাহিত্যিকের গুণগানে নিরত থাকলেই চলে না-সব রকমের পুঁথি-সাহিত্যের মোটামুটি একটা পরিচয় তাঁদের নিকট থেকে সকলে

আশা করতে পারে। কারণ তা না হলে বাঙলার বিশাল পুঁথি-সাহিত্যের একটা সুষ্ঠু চেহারা ই অনুসন্ধিৎসু পাঠকমনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না-উঠতে পারে না। পুঁথি-সাহিত্যের পরিচয়-দাতাদের কাছে বাঙলার সাহিত্যরসিকরা চায় এই সাহিত্যের একটা ব্যাপকতর পরিচয় যার ফলে বাঙলা সাহিত্যে পুঁথি-সাহিত্যের অবদান কতটুকু, তা নিয়ে সত্যিই বাঙলা সাহিত্য গর্ব করতে পারে কিনা, এ তারা যাচাই করে দেখতে পারে। এই দিক দিয়ে এই অনুকারী শিষ্যদের আলোচনা খুব বেশী সহায়ক হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। কারণ এঁরা শুধু একশ্রেণীর পুঁথি-সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করেছেন এবং তা বিশাল পুঁথি-সাহিত্যের তুলনায় নিতান্তই সামান্য অংশ মাত্র। এই সামান্য অংশের বিচ্ছিন্ন আলোচনা করেই বিশাল পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা চলে না।

বস্তুতঃ এঁদের হাতে পুঁথি-সাহিত্যের সুবিচার হয় নাই-হওয়া সম্ভবও নয়। পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের রায় সকলে দ্বিধাহীন চিন্তে মেনে নেবে, তাঁদের আলোচনা এতটা গুরুত্বসম্পন্নও নয়। পুঁথি-সাহিত্যের একপেশে আলোচনা দ্বারা সেতরুত্ব অর্জনও করা যায় না। সংস্কৃতানুসারী ভাষায় রচিত পুঁথিগুলি পুঁথি-সাহিত্যের সব নয়; আর পূর্ব বাংলার পুঁথি-সাহিত্যিকরাই শুধু সাহিত্যিক পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য, এ কথাও সত্য নয়। পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ-বিচারের প্রশ্ন তুলে এঁরা পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অগভীরতাই প্রতিপন্ন করেছেন। পূর্ববঙ্গেই শুধু সংস্কৃতানুসারী ভাষায় লেখা পুঁথি-সাহিত্যিকরা আবির্ভূত হন নাই, পশ্চিমবঙ্গেও হয়েছেন। আবার আরবী-ফার্সী শব্দসম্বিত বাঙলা ভাষায় কম নয়। আর সংস্কৃতানুসারী ভাষায় লেখা পুঁথিগুলিই সাহিত্য হিসাবে আরবী-ফার্সী সম্বিত বাঙলা ভাষায় লেখা পুঁথিগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এ নেহাৎ inferiority-complex-গ্রস্ত মুসলমান সাহিত্যিকদের মনোবিকার মাত্র। হিন্দু সাহিত্যিকদের আবেষ্টনের মধ্যে যারা সাহিত্য সাধনা করেছেন এবং হিন্দু সাহিত্যিকদের যা মনঃপূত নয় তা-ই সাহিত্য হিসাবে অগ্রাহ্য, এই ধারণা যাদের সংস্কারগত হয়ে গিয়েছে, এ তাঁদেরই কথা মাত্র। কিন্তু হিন্দু সাহিত্যিকদের খেয়াল-খুশী, মনোভাব ও মতামত সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড নয়। রসসৃষ্টি ও জনপ্রিয়তাই সাহিত্য বিচারের বড় কথা। এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলেই আরবী-ফার্সী ভাষাসম্বিত বাঙলা ভাষায় রচিত পুঁথিগ্রন্থগুলিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। হিন্দু সাহিত্যিকদের কাছে সাম্প্রদায়িক কারণে এগুলি ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু যেহেতু মুসলিম বাঙলায় এগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তা অনস্বীকার্য এবং যেহেতু এসবের অনেকগুলিতেই রসের প্রাচুর্য রয়েছে, তাই সাহিত্য হিসাবে এসব পুঁথিগ্রন্থকে অগ্রাহ্য করার সাধ্য কারুর নাই। কেউ কেউ, বিশেষ করে হিন্দু সাহিত্যিকগণ, প্রশ্ন করবেন: এগুলির রচনাকে কি বাঙলা ভাষা বলতে হবে? উত্তরে

আমরা বলব: কেন নয়, শুনি? অর্ধাধিক বাঙালীর কাছে যা সুবোধ্য এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রচলিত ভাষা, তা'ছাড়া যে ভাষার সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে তাদের মনের কুখা মিটিয়ে আসছে, তা বাঙলা ভাষা নয় বলে কতোয়া দিলেই বাঙালী মুসলমান সে কথা ভনবে কেন? বস্তুত এসব পুঁথিগ্রন্থ বাঙালী মুসলমানের স্বাভাবিক মাতৃভাষায় রচিত হয়েছে এবং সেজন্য এদের প্রচার-প্রসার এত অধিক। পঞ্চান্তরে আলাওল কৃত্রিম; তাই রসসৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণে সেসবের প্রচার-প্রসার নাই—সেসব এখন কীটের খোরাক জোগাচ্ছে মাত্র।

এ কথা সত্য যে, আলাওলী-ধরনের পুঁথি-সাহিত্যের আলোচনাই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে বেশী হয়েছে। এর কারণ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের রচনায় হিন্দুদের অসাধারণ প্রাধান্য ছাড়া আর কিছু নয়। সংস্কৃত-ঘেঁষা বাঙলায় রচিত আলাওলী ধরনের পুঁথিগুলি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ভালো লেগেছে; আরবী-ফার্সী শব্দসমবিত্ত বাঙলায় রচিত পুঁথিগুলি ভালো লাগে নাই। শেষোক্ত শ্রেণীর পুঁথিগুলির প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। যেসব মুসলমান সাহিত্যিক পুঁথি-সাহিত্যের আলোচনার সূচনা করেছিলেন, তাঁরা হিন্দু সাহিত্যিকদের এই মনোভাবের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। পুঁথি-সাহিত্য বিচার সম্পর্কে হিন্দু সাহিত্যিকদের মনোভাবই চরম কথা, এই তাঁদের মনে হয়েছিল। সে যুগে-বর্তমান কালের মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার সেই প্রথম যুগে-তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক ছিল, এও বলা চলে না। কিন্তু সে inferiority-complex, সে মারাত্মক পরানুকরণপ্রবৃত্তি মুসলমানদের মধ্যে চিরকাল থাকবে, এ কি করে মনে করা যেতে পারে? সাহিত্যেও এখন মুসলমান জাঘত চিত্ত। সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষার মোহ এখন আর তার থাকতে পারে না। কারণ বাঙলা ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। বাঙলার অধিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষা তার সহজবোধ্য, তাই বাঙলা ভাষা। আরবী-ফার্সী শব্দসমবিত্ত বাঙলা ভাষায় রচিত পুঁথি-সাহিত্যগুলি যে মুসলিম বাঙলা সুবোধ্যতম ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তার শ্রেষ্ঠ ও অকাট্য প্রমাণ এই যে, সে সব গ্রন্থ শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট বাঙালী মুসলমানও বুঝতে পারে। তাছাড়া সে সবে মতো প্রচার-সৌভাগ্য বাঙলায় কোনো গ্রন্থেরই নাই।

তাই বলে আমরা এমন কথা বলছি না যে, এই সব পুঁথি-সাহিত্যের ভাষাই বর্তমানে অবিকল অনুসরণ করতে হবে। তাই বর্তমানে সম্ভব নয়-হয়ত উচিতও নয়। কারণ মাঝখানে সাহিত্যের ভাষার এমন এক যুগ গিয়েছে, যখন সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছিল এবং মুসলমান সাহিত্যিকরা সে ভাষায় হাত মক্শ করেছেন, আর তাতে বেশ অভ্যস্তও হয়ে উঠেছেন। এই অবস্থায় অবিকল সেসব পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা বর্তমানে গৃহীত হতে পারে না। তবে তার আধুনিক

যুগোপযোগী বিবর্তিত ধারা-বর্তমানে প্রচলিত ভাষার সাথে সেসব পুঁথি ভাষার একটা সুসমঞ্জসভাবে মিশেল ভাষাই হবে পাক-বাঙলার স্বাভাবিক সাহিত্যিক ভাষা। নজরুল ইসলামের প্রাথমিক যুগের রচনার ভাষা কতকটা এই ভাষা হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এ ভাষায়ই মুসলমান সাহিত্যিকদের স্বকীয়তা ফুটেবে এবং তা বাঙলা ভাষার সম্পদ বাড়াবে বই কমাতে না। অতএব, এতে কান্নার আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই।

কাজেই আমাদের সাহিত্যিক ভাষার বুনিয়াদ এই সব পুঁথি-সাহিত্য বর্জনের কল্পনাও আমরা করতে পারি না। পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষকদের কেউ কেউ আরবী-ফারসী-ঘেঁষা এইসব পুঁথি-সাহিত্যের প্রতি যে মনোভাব প্রদর্শন করছেন, তার মূলে আছে হিন্দু-প্রভাবিত তাঁদের পূর্বসংস্কার যে সংস্কারমোহ থেকে জাগ্রতচিত্ত মুসলমান সাহিত্যিকগণ ক্রমে মুক্ত হচ্ছেন। এই পূর্ব-সংস্কারের স্পর্ধিত আঞ্চালনের হাস্যকরতা এখনো এঁদের বোধগম্য হচ্ছে না, এটা সত্যই লজ্জার কথা।

১. মুসলিম শাসনকালে গৌড়ে একটি বিশেষ ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা সমস্ত উদ্ভবেরই ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ আমলে যেমন লোকে শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে কলিকাতায় যাইত, মুসলমান আমলে ঠিক তেমনি করিয়া লোকে গৌড়ে যাইত। তাহাদের সকলের সম্মেলনে এক নূতন ভাষা গড়িয়া উঠে- সেই ভাষাই পুঁথির ভাষা।’ (বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, ৩১১ পৃষ্ঠা)।

২. রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ‘ঢাকাতেই যদি সমগ্র বাংলার রাজধানী হইত, তবে একদিন নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত, তবে সে বক্রতা আপনি সিধা হইয়া যাইত : মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।’ (ঐ-২৫৬ পৃঃ)।

(লেখক: জন্ম ১৮৯৭, ধানীখোলা, জিশাল, মোমেনশাহী, মৃত্যু ৪ মার্চ ১৯৭৮)

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা খাদেমোল এসলাম বঙ্গবাসী



মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানজনোচিত কাজ নহে। আমরা যে কোন ভাষাই পড়ি না কেন, তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি, কারণ বাল্যকাল হইতে সেই ভাষা দ্বারাই আমাদের অন্তরে কথা বুঝিবার শক্তি গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের নানাদেশ ও নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন এবং দেশ ও জাতি বিশেষে বিভিন্ন ভাষাও দিয়াছেন। এজন্য কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। বাঙ্গালা, ইংরেজী, উর্দু ও ফারসী ইত্যাদি ভাষা অর্থাৎ আরবী ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই মুসলমানের জন্য সমান এবং সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই হিন্দুর জন্য সেইরূপ। মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজের মাতৃভাষা উর্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিংবা ‘বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি’ এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজমুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা হীনতা জ্ঞাপন করে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা করা এবং তাহার উন্নতি সাধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিলে তাহা উর্দু প্রভৃতি হইতে কোন মতেই হীন হওয়ার কথা নহে। আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই তদ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। মায়ের কাজ মায়ের দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হইবে, অপরের দ্বারা তাহা কখনো পূর্ণ হইবে না। এরূপ না করার ফল হইয়াছে যে, আজকাল সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তির বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনার জন্য যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের ভক্তিভাজন মৌলবী মৌলানা সাহেবানের আরবী-উর্দু ওয়াজ শুনিবার জন্য শিরণী, রসগোল্লা, লাড্ডু ও জিলাপী ইত্যাদি বিতরণের প্রলোভন সত্ত্বেও সভায় লোক উপস্থিত করা মহামুঙ্কিল হইয়া থাকে।

মাতৃভাষার উন্নতি আমরা দুই রকমে করিতে পারি। প্রথমত ঐ ভাষায় ধর্ম সংক্রান্ত কেতাব সকল তরজমা করা এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাদশা, অলী ও দরবেশগণের জীবন চরিত ইত্যাদি লেখা। দ্বিতীয়ত আজকালের নূতন আবিস্কৃত হেকমত বা জ্ঞান বিজ্ঞান ও হিসাব ইত্যাদি পার্শ্ব উন্নতি বিষয়ক পুস্তকাদি লিখিয়া তাহা জনসমাজে প্রচারের সুবিধা করা।

আজকাল আমাদের দেশে দুই রকমের বাঙ্গালা দেখা যাইতেছে। একটি আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের অবলম্বিত সংস্কৃতবহুল শব্দবিজড়িত বাঙ্গালা, ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ানে বাঙ্গালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে। বর্তমান সময় অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানও তাঁহাদের অনুকরণে ঐরূপ সাধু ভাষা জড়িত বাঙ্গালা বই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম বাঙ্গালাই আজকাল স্কুলে পড়ান হয়। এই ভাষাতে বাঙ্গালীর পূর্ব-পুরুষগণ যেসব শব্দ কখনও শুনেন নাই, তাহা অতি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমন কি, তাহা ভালমতো বুঝার জন্য মৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা এবং গুস্তাদ ও অভিধানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। বাঙ্গালার সাধারণ লোকে কখনও ঐরূপ ভাষায় কথাবার্তা বলে না। ইহাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না বরং তাহা মাতৃভাষার বিকৃতি মাত্র।

অন্যরূপ বাঙ্গালা এই দেশে বহুকাল পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ধর্ম ও কারবারের আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যবহার ও স্থান আছে। এই ভাষাই বাস্তবিকপক্ষে এ দেশের লোকের মাতৃভাষা।

এইরূপ ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলা ঠিক হয় না। কারণ এই ভাষায় আমরা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি পুরুষানুক্রমে কথাবার্তা ও লেখাপড়া করিয়া আসিতেছি। কাগজ, কলম, কেতাব, আদালত, আরজী, ইশাফ, কুরছি, মেজ, দোয়াত, সির, সিরনী, মগজ, বরতন, পেয়ালা, তন্তুরী, পালং, তোসক, বালিশ, গয়রহ ইত্যাদি শব্দ আমরা উভয় সমাজে সর্বদা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। কিন্তু আজ ২০/২৫ বৎসর হইতে দেশের দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষাদোষে বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনে মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ভালবাসা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা মুসলমানগণ হইতে পৃথক হওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন মাতৃভাষার অন্তরঙ্গ স্বরূপ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত শব্দসমূহের স্থলে, নূতন শব্দ ব্যবহার করত এবং তাহাকে নানা রকমের বিকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহারা যেন বৃদ্ধ মায়ের এক যুবতী সতীন গড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণপ্রিয় কতক মুসলমানও ইহার পরিণাম ফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া মায়ের গায় কুড়াল মারিতে ক্রটি করেন নাই। এতদিন ত মুসলমানগণ লেখাপড়ার দিকে বিশেষ কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই। তাহাদের বাদশাহী গেলেও কিন্তু বাদশাহী খেয়াল যায় নাই এবং পূর্ব-পুরুষগণের ঝুট (উজ্জিষ্ট) সব খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু এখন তাহাও ফুরাইয়া যাওয়ায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল পাঠশালার দিকে ছুটিয়াছেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, তাহাদিগকে মাতৃভাষা নামে এক নূতন ভাষা শিখিতে হইবে। তাঁহাদের মা-বাপের নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সেখানে কোন কাজে লাগিবে না এবং বাধ্য হইয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক বিগত

২০/২৫ বৎসরের মধ্যে আমরা পূর্ব প্রচলিত অনেক শব্দই ভুলিয়া গিয়াছি এবং কতক নিত্য ব্যবহারের শব্দও কমাইতে শিখিয়াছি। হায় কি দুর্দশা! যে জাতিকে মাতৃভাষাও নূতন করিয়া শিখিতে হয়, তাহারা কি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপর লোকদের সমানে পড়া চলাইতে পারে? এখনও সময় আছে, শিক্ষার উন্নতির সহিত হিন্দুদের বেয়াদবি ভাব বাড়িতেছে এবং শিক্ষিত মুসলমানগণও এখন এত কম নহেন যে তাহাদিগকে তুচ্ছ করা যায়। বলাবাহুল্য যে সকলেই এখন উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। এমন সুসময়ে উভয় সমাজের লেখকগণের পক্ষে ভ্রাতৃত্বাবে মিলিত হইয়া এ বিষয়ে-যে ক্ষেত্রে দেশের হিন্দু মুসলমান এই উভয় জাতি একত্রে সম্মিলিত হইতে পারে, মাতৃভাষাকে সেরূপভাবে গড়িয়া তোলা আবশ্যক এবং আমি ভরসা করি, সকলে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

এখন আমি মুসলমান লেখকদের প্রতি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। ইহাদের মধ্যে যাহারা নূতন শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহারা প্রায়ই সংসর্গ দোষে সাবেক ভাষাকে ঘৃণা করিয়া নয়া ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাহাদের শক্তি সাধারণত কাব্য কবিতা ও উপন্যাস লিখনে ব্যয় হইয়াছে। তাহারা সময় সময় সমাজের বা ধর্মের উপকারের জন্য যে সকল বহি লিখেন তাহার ভাষা সাধারণ লোকে সহজে বুজে না বলিয়া নিজ সমাজে সে সকল পুস্তকের আশানুরূপ আদর হয় নাই। হযরতের যেসব জীবন বৃত্তান্ত ছাপা হইয়াছে, তাহা প্রায়ই কবিতা বা উপন্যাসের সুরে দুর্বোধ্য নূতন বাঙ্গালায় লিখিত। লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ ‘আল্লাহ’ স্থলে ঈশ্বর, রসূল স্থলে প্রেরিত পুরুষ, বিবি স্থলে দেবী, সাহেব স্থলে দেব, নামাজ রোজা স্থলে উপাসনা, উপবাস, মসজিদ স্থলে ভজনালায় ইত্যাদি ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

হায়! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এতকাল যাবত আবশ্যক মতে আরবী ও পারসী হইতে শব্দাদি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার যে অভাব পূরণ ও যে উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা কি আমরা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিব? যে আরবী ভাষা ১০০০ বৎসর যাবত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক, চিকিৎসা গয়রহ সমগ্র শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু মুসলমানগণ মুসলমান আমলে ও ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে যে সব আবশ্যকীয় শব্দ লইয়া নিজ বাঙ্গালা ভাষা গড়াইয়া ছিলেন, তাহা কি আমাদের ভুলিয়া যাওয়া কিম্বা উঠাইয়া দেওয়া উচিত? পূর্ববর্তী ভাষা ভুলিয়া নূতন ভাষা শিখিতে কি জাতীয় জীবনের বলক্ষয় হইবে না? এই অতিরিক্ত বলক্ষয়ের পর জীবন সংগ্রামে আমরা কি অপর জাতিদের সমানে দাঁড়াইতে পারিব? ভ্রাতৃগণ চিন্তা করুন, মুসলমানগণের এশিয়াবাসী হইয়া জাতীয় শব্দের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। এখনও সময় আছে। সরকারী সেরেস্তায় এখনও সাবেক ভাষা রহিয়াছে। লেখকগণের মুখে এখনও সাবেক কথাই প্রবল।

(লেখাটি ‘আল এসলাম’ পত্রিকার কার্তিক, ১৩২১ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।)

বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়

গোলাম মোস্তফা



বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার দরবারে বাংলা ভাষা সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে। কোনো ভাষার চর্চা করিতে হইলে তাহার ইতিহাসের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা প্রয়োজন; নতুবা সেই ভাষার রূপ ও প্রকৃতি, মন ও মেজাজ, গঠন ও আঙ্গিক এবং লক্ষ্য ও প্রবণতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা জন্মে না। আমরা তাই অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্ন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তি এযাবত কয়েকখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থেও অনেক বিভ্রান্তি ও গৌজামিল আছে। উপাদানের অপ্রতুলতাও এই বিড়ম্বনার অন্যতম কারণ। বর্তমানে নূতন নূতন তথ্য ও উপাদান আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্বের অনেক মতবাদ স্বাভাবিকভাবে খণ্ডিত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কাজেই, নূতন গবেষণার আলোকে বাংলা ভাষার একখানি নূতন ইতিহাস লিখবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

উপরোক্ত লেখকদিগের প্রায় সকলেই এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, কাজেই ইহা আৰ্য-ভাষা। এই দাবীর ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বৈদিক যুগ হইতেই বঙ্গদেশের সহিত আৰ্যদের একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন : “বঙ্গদেশ হইতে দেশবাচক বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। বঙ্গজাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে।” [বাল্মীকি সাহিত্যের ইতিহাস]

অন্যত্র বলিতেছেন : “খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব হইতে এদেশে আৰ্যদিগের বসতি আরম্ভ হয় গঙ্গাপথ ধরিয়া এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র আৰ্যভাষার একচ্ছত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আৰ্যদিগের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ শিক্ষার, বিদ্যাচর্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল সংস্কৃত, আটপহুরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষা

বদলাইয়া প্রাকৃত ভাষার রূপ নিল। এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙিয়া আবার বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষায়— যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি— পরিণত হইল। বাংলাদেশে যে আর্যভাষা প্রবর্তিত হইল, তাহা এই পূর্বা প্রাকৃতেরই প্রকারভেদ।” [বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা] উপরোক্ত দাবীগুলি কতোদূর সত্য, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক :

ঐতরেয় আরণ্যক

সুকুমার সেন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলিতে চান যে, যেহেতু ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে এবং ঐতরেয় আরণ্যক বেদের অংশ অতএব বঙ্গদেশ বৈদিক যুগ হইতেই আর্থভূমি।

একেইতো সিদ্ধান্তটি ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারার (syllogism) সম্পূর্ণ বিরোধী তদুপরি ঐতিহাসিক সত্যের সহিতও ইহার কোনো সম্পর্ক নাই।

ঐতরেয় আরণ্যকে প্রকৃতই ‘বঙ্গ’ শব্দের উল্লেখ আছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। থাকিলেও সে প্রমাণ এত ক্ষণ-ভঙ্গুর যে, তাহার উপর কোনো খিণ্ডরী রচনা করা চলে না। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন যে, ঐতরেয় আরণ্যক বা অন্য কোনো বৈদিক-সাহিত্যে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নাই। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় অথর্ববেদের পরিশিষ্টে, কিন্তু সেখানেও শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন :

‘It is a fact that the Veda-Samhita and the early Bedic literature do not mention the name ‘Vanga’ either in connection with the names of the Indian tribes or in any enumeration of the countries owned by the Aryans, as well as by the non Aryans. The Rigveda-Samhita did not know even Anga, but the Anga country is mentioned in the Atharvaveda Parisista, In the Atharvaveda Parisista, however, the word ‘Vanga’ occurs with Bagadha (বঙ্গবগধা) as a component of a compound word ; but as the scholars do not attach any value to it owing partly to the lateness of the Parisista itself, I advisedly leave the mention out of consideration.’ [History of Bengali Literature]

তাহা হইলে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বঙ্গদেশের কোনো উল্লেখ নাই; ঐতরেয় আরণ্যক বেদের কোনো অংশও নহে। পরবর্তী সময়ে রচিত একখানি ভাষ্য মাত্র। বঙ্গ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় অথর্ববেদের পরিশিষ্টে;

তাহাও ‘বঙ্গবগধা’ নামক একটি যৌগিক শব্দের অংশ রূপে, আর যাহার অর্থ কোনো দেশ নয়, এক প্রকার রাক্ষস বিশেষ ।

যদি ধরিয়াই লই যে, ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে, তবে দেখা যাক আরণ্যক গ্রন্থ কখন কিভাবে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল ।

ঐতরেয় আরণ্যকের রচনাকাল

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থখানির রচয়িতা হইতেছেন মহিদাস ঐতরেয় নামক একজন ঋষি-কবি । তিনি রাজা ভোজের সমসাময়িক ছিলেন । রাজা ভোজ মালব-রাজ্যের অন্তর্গত ধারা নগরের রাজা ছিলেন । একাদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি রাজত্ব করিতেন । গজনির সুলতান মাহমুদ যখন সোমনাথ আক্রমণ করেন, তখন রাজা ভোজ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ মুসলিম পরিব্রাজক আলবিরুনী তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রাজা ভোজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । কাজেই এ অনুমান অনায়াসেই করা যায় যে, ঐতরেয় আরণ্যক একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই ।

অথর্ববেদের পরিশিষ্টও অনেক পরে রচিত । কাজেই ইহার উল্লেখ কোনো প্রাচীন ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না ।

বাংলা ভাষা কি আর্য ভাষা?

বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত কাজেই উহা আর্যভাষা-এ দাবীও বিচারসহ নয় । সংস্কৃত ভাষাভাষি আর্যদের আসিবার বহু পূর্ব হইতেই এ দেশবাসীদের যে নিজস্ব ভাষা ছিল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় । প্রাচীনকালে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া ঐতিহাসিক (Marshman 1859) যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্যঃ

“অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে কি অবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয় করা অতি দুষ্কর । বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম কোন্ সময় হইতে চলিল, তাহা জানা যায় না । যে মানুষেরা বঙ্গদেশে প্রথম বাস করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল না । কিন্তু পশ্চিম সীমার পার্বতীয় লোকদের তুল্য এক জাতি ছিল । যে ভাষা এখন চলিত আছে, তাহা কোন্ সময় উৎপন্ন হইল, ইহাও নিশ্চয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য । সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভিন্ন আরও অন্য অনেক শব্দ বঙ্গভাষায় চলিত আছে । তাহাতে অনুমান হয় যে, বঙ্গদেশবাসী লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার সহিত সংস্কৃত ভাষার কোনো সম্পর্ক ছিল না ।” [বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত]

শুধু তাই নয় । সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় আরও কঠিন কথা বলিয়াছেন । তাঁহার মতে আর্যভাষা তো দূরের কথা, বাংলাদেশে আদৌ

কোনো আৰ্য আছে কিনা, তাহাই তো সন্দেহের বিষয়। তিনি বলেন : “যে সময় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সেই সময় অঙ্গে-বঙ্গে অথবা মগধে আৰ্য জাতির বাস ছিল না।”

অন্যত্র বলিতেছেন : “এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই বঙ্গ-মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি ও উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আৰ্যজাতীয় অথবা আৰ্য-সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে। উত্তরাঞ্চলের পশ্চিমাংশ আৰ্যগণ-কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ স্বাধীন ছিল। সেই সময় তাহাদের কেহ এখানে আসিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রাচীন সাহিত্যে আৰ্যগণ-কর্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময় আৰ্যজাতি বঙ্গ মগধ অধিকার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।” [বঙ্গালার ইতিহাস]

বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক V.C Pillai সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, আৰ্যদিগের ভারতগমনের পূর্বে-(যাহা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল) এদেশ সম্পূর্ণভাবে দ্রাবিড়দের শাসনাধীন ছিল :

“The theme which first set up upon this investigation is the intricate subject known as the Aryo-Dravidian problem. It is needless to mention that the question was first set in motion on the day the Aryan entered India; which event we shall soon see took place in the fifteenth century B.C. India, prior to this entry, was a Dravidian land.”

ইহা হইতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষা উৎসারিত হয় নাই। আৰ্যদের বহুপূর্ব হইতে যখন এদেশে দ্রাবিড়রাই বাস করিত, তখন স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষা তাহাদের হাতেই জন্মলাভ করিয়াছিল-আৰ্যদের হাতে নয়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, আধুনিক বাংলা ভাষাতেও বহু দ্রাবিড় শব্দ মিশিয়া রহিয়াছে। এদেশের বহু প্রাচীন নগর ও গ্রামের নাম, নদ-নদী ও পর্বতের নাম এখনও দ্রাবিড়। যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, পাবনা, ঝিনাইদাহ, দামুকাদিয়া, রওড়া, নাগিরাট, গড়াই, তিস্তা, কড়া, গগা, পণ, কুড়ি, খোকা, খুকি- ইত্যাদি অসংখ্য দ্রাবিড় শব্দ আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় চালু আছে। তবে অনেক শব্দ ধীরে ধীরে নিষ্কৃ হইয়া যাইতেছে, কারণ হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ ও অন্যান্য জাতিরা কালে কালে ঐ সব শব্দ হয় বর্জন করিয়াছে, নয় বিকৃত বা রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার

করিতেছে। যেমন নাগিরাট হইয়াছে নাগের হাট, যসর হইয়াছে যশোহর ইত্যাদি।
ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতও ঠিক তাই। তিনি বলেন :

“প্রাগৈতিহাসিক কালের বাঙ্গালার অধিবাসীরা কি প্রকারের মানুষ ছিল, তাহা
জানা অসম্ভব, তবে এইটুকুই অনুমান হয় যে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়
না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব পুরুষেরাই
বাস করিয়া আসিতেছে। ভাষাতত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা
দেশে আর্য ভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং
কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত। বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক নামে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক
কথার সম্মান পাওয়া যায়। এইগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আর্যভাষা উত্তর-
ভারতে ও বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এ দেশে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন
ছিল; অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়াই এ দেশের
নদনদী, পাহাড়-পর্বত ও গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল। সেই সকল নামকে ঈষৎ
পরিবর্তিত করিয়া উত্তরকালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছিল, কোথাও বা সেই সকল
নাম বিকৃত হইয়া অর্থহীন নাম রূপে এখনও প্রচলিত আছে। [জাতি সংস্কৃতি ও
সাহিত্য]

লিপি কাহাদের?

বাংলা ভাষা যে আর্যদের সৃষ্টি নয়, অন্যদিক দিয়াও তাহা প্রমাণিত হয়। ভাষা
ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হইতেছে তাহার লিপি। লিপি ছাড়া কোনো ভাষা
প্রসারিত বা পদ্ধতিত হইতে পারে না। কিন্তু আর্যদিগের কোনো লিপি ছিল কি?— না।
আর্যেরা কোনো লিপিচর্চা করিত না। ভারতের প্রাচীনতম লিপি ছিল ‘ব্রাহ্মী’ ও
‘খরোষ্ঠী’ লিপি। ‘অশোক’ লিপিও পরে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু কোনো লিপিই আর্যদের
নিজস্ব নয়, সব লিপিই সেমিটিক। লিপিতত্ত্ববিদ Rawlinson বলেন:

‘The Brahmi script, the parent script of India, was bor-
rowed from semitic source probably about the seventh centu-
ry B.C.’

উপরোক্ত তিনটি লিপিই যে সেমিটিক, তার আর এক বড় প্রমাণ এই যে,
উহাদের প্রত্যেকটিই দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত (from right to left)।

এই সব লিপি দ্রাবিড়রাই আমদানি করিয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের চারি হাজার
বৎসর অথবা তাহারও পূর্ব হইতে ভারতীয় দ্রাবিড় জাতিদের সহিত আর্যদিগের
বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রেই তাহারা এইসব লিপি ভারতে আনিয়াছিল।
বলাবাহুল্য, দ্রাবিড় জাতি ছিল সেমিটিক জাতিদেরই জ্ঞাতি। ব্যাবিলন অঞ্চল হইতে
তাহাদের এক শাখা বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং কালে কালে

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলাদেশে অধিকার বিস্তার করে। সিন্ধুর ময়েন-জো-দারোতে কিছুকাল পূর্বে (১৯২১) প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে যে লিপি ও সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও সেমিটিক, কেননা সে লিপিও দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত।

অতএব কোনো দিক দিয়াই বাংলা ভাষার সৃজনে বা বিকাশে আমরা আর্যদের কোনো দানেরই পরিচয় পাইতেছি না। বাংলাদেশের প্রতি এবং বাংলা ভাষার প্রতি আর্যদের মনোভাবও সুকুমার সেনের অনুমানকে সমর্থন করে না। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন :

“বাংলাদেশ আর্যের জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া এদেশে আগমন ও বসতি উত্তর ভারতবাসী আর্যদিগের পক্ষে বহুদিন অবধি নিষিদ্ধ ছিল।” ঠিকই তো, আর্যেরা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে চিরদিনই অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। বাংলার অধিবাসীদিগকে তাহারা স্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বর্বর ইত্যাদি বলিয়া গালাগাল দিয়াছে এবং তাহাদের ভাষাকে ‘পক্ষীর ভাষা’ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। এমন কি যদি কোনো আর্য ভুলক্রমেও বাংলাদেশের মাটি মাড়াইত, তবে বিনা প্রায়শ্চিত্তে আর্যেরা তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিত না। নিম্নের শাস্ত্রবাণীই তাহার প্রমাণ :

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেশু সৌরত্ব মগধেশু চ।

তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মহতি ॥

এই অবস্থায় কি করিয়া আর্যদের হাতে বাংলা ভাষার জন্ম হইতে পারে? যাহারা বাংলাদেশকে ভালোবাসিল না, বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসিল না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসিল না, বাঙালীদের সহিত মেলামেশা, উঠাবসা বা কোনোরূপ সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিল না, যাহাদের লিপিজ্ঞান ছিল না, ছুঁমার্গের ভয়ে যাহারা লিপিচর্চাই করিল না, তাহারা কি করিয়া বাংলা ভাষার স্রষ্টা হইতে পারে?

খ্রীষ্টের জন্মের পরে

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বাবস্থা তো দেখিলাম। এইবার দেখা যাউক খ্রীষ্টের জন্মের পর হইতে দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত (অর্থাৎ মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত) আর্যেরা কখন কিভাবে বাংলাদেশে আসিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং বাংলা ভাষাকে কতখানি উৎসাহ দিল।

ডক্টর সুকুমার সেন বলিতেছেন, “পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই বাংলাদেশের সর্বত্র আর্যবসতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে আর্য ভাষাও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।” কিন্তু ইতিহাসে সেরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। দশম-একাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ পাল বংশের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত) আর্যেরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কর্নাট হইতে আগত আর্য-ভক্ত সেনাগণ যখন বৌদ্ধ পালদিগকে পরাজিত করিয়া বাংলাদেশ দখল করিল, তখনই আর্যেরা

এদেশে আসিবার সুযোগ পাইল। একটা গৃঢ় কথা এখানে চাপা পড়িয়া আছে। আর্যেরা যে বাংলাদেশ এবং বাঙালীদিগকে ঘৃণা করিত বলিয়াই এদেশে আসে নাই, ইহা পূর্ণ সত্য নহে। ইহাতে মনে হয় যেন আর্যেরা আসিতে চাহিলেই এদেশবাসী তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইত। সেরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। এদেশে দ্রাবিড়-বৌদ্ধদিগের কি কোনোরূপ আত্মমর্যাদাবোধ ছিল না? দেশপ্রেম ছিল না? শক্তি-সাহস ছিল না? আর্যরা যখন তাহাদিগকে ‘যবন’ ‘ম্লেচ্ছ’ ‘রাক্ষস’ ‘বর্বর’ ‘দস্যু’ ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিত, তখন তাহারাই বা আর্যদিগকে পূজা করিবে কেন? তাহারাও প্রাণপণে আর্যদিগকে বাধা দিত। কাজেই আর্য-অনার্য বিরোধ সর্বদা লাগিয়াই ছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এদেশের লোকেরা তাই আর্যদিগকে বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কিছুটা আভাস দিয়াছেন :

‘The country (i.e. Bengal) was for centuries in open revolt against Hindu orthodoxy. Beddhist and Jain influence was so great that the codes of Manu, while including Bengal within the geographical boundary of Aryyavarta, distinctly prohibited all contact with the land for fear of contamination.’ [History of Bengali Language Literature]

ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই আর্যেরা বাংলাদেশ দখল করিয়াছিল এবং আর্যভাষায় সারা দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমরা তো দেখিতেছি অন্যরূপ। গুপ্তদের দ্বারা (পঞ্চম শতাব্দী) বাংলাদেশ (সমতট) যে বিজিত হইয়াছিল এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। অন্ততঃ হিন্দুদের সহিত তখনও যে বৌদ্ধদের ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, একথা চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন-সাঙ তাহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :

‘The Chinese pilgrims Fa-Hien in the fifth century and Huen Tsang in the seventh century found the Buddhist religion prevailing in Bengal, but already engaged in a fierce struggle with Hinduism, which ended about the ninth or tenth century in the general establishment of the later faith. In the eleventh century the Senas rose to power in Bengal while in the next century, both the Palas and the Senas were submerged beneath the flood of Muslim conquest.’ [Encyclopaedia Britannica]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, পাল রাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য-হিন্দুরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রায় দুইশত বৎসর

ধরিয়া বাংলাদেশ তাহাদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও কি বাংলা ভাষার প্রতি তাহারা কোনোরূপ দরদ দেখাইয়াছে?—মোটাই না। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : “আমরা হিন্দু-কালের কোনো বাঙ্গালা সাহিত্য পাই নাই। হিন্দু সেনরাজ্যগণ সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণের ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই সম্ভবতঃ তাহারা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন।” [বাঙ্গালা ব্যাকরণ]

কোনোরূপ সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, বাংলা ভাষার উচ্ছেদ-সাধনের জন্যই তাহারা প্রয়াস পাইয়াছিল। সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঠিকই বলিয়াছেন : “বাংলার শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তাহার সভায় ধোয়ী, উমাপতি ধর প্রভৃতি কবি এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাহার রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা ভাষা চর্চার কোনো আয়োজন তথায় ছিল না।” আর একটি মূল্যবান মন্তব্যও তিনি করিয়াছেন :

“১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীবীর ইখতিয়ার বিন্ মুহম্মদ বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনকে লক্ষ্মণাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।” [মুসলিম বাংলা-সাহিত্য]

বস্তুতঃ মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ারের হাতে বঙ্গ-বিজয় বাংলা-ভাষার পক্ষে এক মহামুক্তির দিন। মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ-বিজয় না হইলে আর্যদের হাতে যে বাংলাভাষা লোপ পাইত অথবা শুদ্ধিকৃত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিত, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই। সেন রাজাদিগের অল্প-পরিসর সময়-রেখার মধ্যই আর্য ব্রাহ্মণগণ আইন করিয়া বাংলা ভাষার উৎখাত সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহারা এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, যদি কোনো আর্য হিন্দু বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রসমূহ কোনো মানব ভাষায় (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) আলোচনা করে, তবে তাহাকে ‘রৌরব’ নামক নরকদণ্ড ভোগ করিতে হইবে—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চারিতানি চ।

ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

ইহাই সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষার প্রথম সংঘাতের ফল।

বৌদ্ধদের দান

এখানে বাংলা ভাষার সংগঠনে ও প্রচারে বৌদ্ধদের দান, সেবা ও ত্যাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধরা আর্যদের নিকট পরাজিত হইয়া এবং তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আরাকান, নেপাল, সিংহল

প্রভৃতি দেশে পালাইয়া যায়। আরাকানে গিয়া বৌদ্ধরা বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। আরাকান রাজসভায় বৌদ্ধ রাজা ও মন্ত্রীবর্গের উৎসাহ পাইয়া বাংলাদেশ হইতে অনেক মুসলিম কবি সেখানে গিয়া কাব্যচর্চা আরম্ভ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাকবি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি খ্যাতনামা কবি বৌদ্ধদের উৎসাহেই দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা সাহিত্য চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আলাওলের ‘পদ্মাবতী’, ‘হুণপয়কর’ এবং দৌলত কাজীর ‘সতী-ময়না’ প্রভৃতি কাব্য এই যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য বাংলা সাহিত্য চিরদিন আরাকানী বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী থাকিবে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার ঘাঁটিয়া ৪৬টি চর্যাপদ বা বৌদ্ধ দোহা আবিষ্কার করিয়া আনেন। তিনি অনুমান করেন সেগুলিই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন। চর্যা গীতগুলি দশম শতাব্দীতে লুইপার প্রমুখ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত। নিম্নে একটি চর্যার নমুনা দিতেছি :

উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।

মরঙ্গি গিচ্ছ পরহিণ; গিবত গুঞ্জরী মালী ॥

উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারী।

তোহেরি নিজ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।

(উঁচু উঁচু পর্বত-তায় শবরী বালিকা বাস করে। সে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা, তাহার গলায় গুঞ্জার মালা। হে উন্মত্ত শবর, গোল করিও না। তোমার নিজ গৃহিনী সহজ সুন্দরী নামে পরিচিতা)।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত এই দোহাগুলির রচয়িতা ও রচনা কাল সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে, কিন্তু এ কথা না মানিয়া উপায় নাই যে, সেগুলি বৌদ্ধ রচনা-আর্য নহে। কোনো আর্য হিন্দুর এরূপ কোনো রচনা আবিষ্কার করিতে পারিলে বাংলা ভাষার উপর আর্যদের কিছুটা দাবী প্রতিপন্ন হইত বটে। কিন্তু দশম শতাব্দীতে নামিয়া গিয়াও তো সেই বৌদ্ধদিগকেই আমরা দেখিতে পাইতেছি।

আর্য-খিওরীর অসারতা

এতক্ষণ আমরা দেখাইলাম যে বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়। এইবার আরও গভীরে যাইব। গোটা আর্য-খিওরীটাই এবার আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আমরা দেখিব আর্য বলিয়া কোনো জাতি ছিল কি না? থাকিলে কোথায় তাহারা ছিল, কোথা হইতে কোথায় তাহারা গেল, কেমন তাহাদের স্বরূপ আর কেমন তাহাদের প্রকৃতি। এই ভিত্তিমূল যদি অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহার উপর নির্মিত গোটা সৌধটাই তো ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে।

এতকাল ইতিহাসে আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে, অতি প্রাচীনকালে পাক-ভারত উপমহাদেশে অনার্য জাতির বাস করিত। তাহারা অত্যন্ত অসভ্য ও বর্বর

ছিল। তাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত এবং বনে-জঙ্গলে বাস করিত। তারপর আসিল দ্রাবিড় জাতি। তাহারাও অনার্য ও অসভ্য ছিল। তবে পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা কিছুটা উন্নত ছিল। সর্বশেষে আসিল এক সুশ্রী গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ও সুসভ্য জাতি। ইহাদের নাম আর্যজাতি। ইহারা মধ্য-এশিয়ায় বাস করিত। কালে কালে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাহারা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। মোটামুটিভাবে দুইভাগে তাহারা বিভক্ত হয়। এক ভাগ যায় পশ্চিম দিকে, অপর ভাগ আসে পূর্ব দিকে। পূর্বশাখা ইরান হইয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া এই দেশ অধিকার করে। তাহারাই সর্বপ্রথম এদেশে সভ্যতার আলো জ্বালে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে ও ললিত-কলায় তাহারাই এদেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

ময়েনজোদারো

কিন্তু এই খিওরী এখন একরূপ অচল। সিন্ধুর ময়েন-জো-দারো, পাজাবের হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর এখন আর একথা কেহই বলিতে সাহস করে না যে, পাক-ভারতের সভ্যতা আর্যদের দান। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, আর্যদের অপেক্ষা দ্রাবিড়রাই ছিল অধিকতর উন্নত ও সভ্য। ময়েন-জো-দারো ধ্বংসাবশেষ হইতে জানা যায় যে, সেখানে সুপরিকল্পিত নগর ছিল, ইষ্টক নির্মিত গৃহ ছিল, রাজপথ ও পয়ঃপ্রণালী ছিল, এমন কি সে-যুগের লোকেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কৌশলও জানিত। বিভিন্ন কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্র, নানা ধরনের তৈজসপত্র, বহু শৌখিন আসবাবপত্র ও প্রসাধন দ্রব্য এবং অন্যান্য আরও অনেক নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের মধ্যে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ রহিয়াছে। আর একটি বিশেষ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেছে ৫০০ সীলমোহর। সীলমোহরগুলির উপরে এক বিশেষ ভাষার অক্ষর অঙ্কিত। সেগুলি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত এবং প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিসর-লিপির সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। অন্য কথায় : লিপিগুলি সেমিটিক।

বলাবাহুল্য, এই সভ্যতা ছিল দ্রাবিড়দের। ইহার সহিত আর্য সভ্যতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, কেননা এ সভ্যতা ছিল আর্যদের ভারত আগমনের অন্তত দেড় হাজার বৎসর অগ্ণগামী। Sir John Marshal বলেন :

“They (i. e. material remains of Mohen-jo-daro) exhibit the Indus people of the fourth and the fifth millennium B.C. in possession of a highly developed culture in which no vestige of any Indo-Aryan culture is to be found.”

কাজেই আৰ্যরাই যে সৰ্বপ্ৰথম প্ৰাচীন ভাৰতে সভ্যতাৰ আলো জ্বালাইয়াছিল এ কথাৰ মূলে কোনো সত্য নাই। প্ৰসিদ্ধ ভাৰতীয় ঐতিহাসিক K.M. Panikkar অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই এই মতৰ প্ৰতিবাদ কৰিয়াছেন :

‘One thing is certain, and can no longer be contested: civilisation did not come to India with the Aryans. The doctrine of the Aryan origin of Indian civilisation is the result of the theories of the Indo-Germanic scholars who held that anything valuable in this world originated from the Aryans....not only is Indian civilisation pre-Vedic, but also the essential features of the Hindu religion as we know it today, were perhaps present in Mohen-jodaro.’ [A Survey of Indian History]

তাৰপৰ আৰ্যদের আদি নিবাস যে কোথায় ছিল, আজ পৰ্যন্ত তাহা কেহ নিশ্চয় কৰিয়া বলিতে পারে না। কেহ বলে মধ্য এশিয়ায়, কেহ বলে ইউৰোপে, কেহ বলে ভাৰতে, কেহবা বলে অন্যৰূপ। প্ৰত্যেক প্ৰাচীন জাতিৰই একটা আদিম উৎপত্তিস্থল এবং তাহাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ কিছু না কিছু নিদৰ্শন আছে। মিসৰীয়দের পিৰামিড, ব্যাবিলোনিয়ানদের শূন্যোদ্যান, চীনাৰে মহাপ্ৰাচীৰ, বৌদ্ধদের নালন্দা, তক্ষশীলা, দ্ৰাবিড়দের ময়েন-জো-দাৰো ইত্যাদি স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান। কিন্তু আৰ্যদের সৰূপ কোনো কীৰ্তি-চিহ্ন কই? কোথাও আছে কি? শ্ৰীযুক্ত অৰিনাশচন্দ্ৰ দাস (এম.এ.বি.এল) তাই আৰ্যসভ্যতাৰ প্ৰাচীনতাৰ দাবী মিথ্যা বলিয়া মনে করেন :

‘The Indo-Aryans claim that they are the most ancient people in India; but that claim is false. India has no ancient monuments or relics like Egypt, Babylonia or Assyria.’

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সভ্যসঙ্ঘাতী ঐতিহাসিকেরা আৰ্য-খিওৰীকে এখন একটা অলীক কাহিনী (myth) বলিয়া মনে করেন। কেহ বা বলেন, খিওৰীটি শুধুমাত্ৰ একটা অনুভূতিৰ উপৰ দাঁড়াইয়া আছে (based on a solid basis of sentiment)। আবার কেহ বা ইহাকে একটা ঐতিহাসিক প্ৰলাপ (a historical nonsense) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

আৰ্য-খিওৰীৰ জন্ম

এইবাৰ আৰ্য-খিওৰী সম্বন্ধে শেষ কথা বলিব। আৰ্য-অনাৰ্যের কথা শুনিলেই আমৰা আমাদেৰ চিন্তা ও ধাৰণাকে সুদূৰ অতীতে টানিয়া লইয়া যাই এবং ভাবি যে, আলো ও অন্ধকাৰেৰ মতো দুই স্বতন্ত্ৰ পৰিমণ্ডলে আৰ্য ও অনাৰ্যেৰা বাস কৰিতেছে

এবং সেখান হইতেই মানব-গোষ্ঠীর এই দুই ধারা বহিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। আর্য-খিওরীর বয়স এখন মাত্র দেড়শত বৎসর। ইহার পূর্বে কোনো ইতিহাসে ‘আর্য’ অথবা ‘অনার্য’ বলিয়া কোনো বিশেষ চিহ্নিত জনগোষ্ঠী অথবা কোনো ভাষা ছিল না। এসব তীক্ষ্ণ শ্রেণী বিভাগ আমরা এখানে বসিয়া করিতেছি মাত্র! কাজেই সমস্ত কল্পনাটাই একটা কৃত্রিম আবরণ দিয়া মোড়া। খিওরীটির উৎপত্তি কাহিনী নিম্নরূপ :

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস এবং ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’-এর প্রেসিডেন্ট Sir William Jones সোসাইটির এক বার্ষিক সভায় একটি মূল্যবান ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে তিনি ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানি, পহলবী, সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার অনেকগুলি শব্দ ও ধাতুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, ঐ সব ভাষার মূলে একই রহিয়াছে। তিনি তাই অনুমান করেন, ঐসব ভাষাভাষীজনেরা আদিতে একই স্থানে বাস করিত এবং একই ভাষায় কথা বলিত। কালে কালে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ইংগিত পাইয়া জার্মান পণ্ডিতদের মনে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হইল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) আলোচনায় তাহারা প্রবৃত্ত হইলেন। Max Muller, Bopp, Kalaproth প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে বহু গবেষণা করিলেন। অতঃপর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে Sir Thomas young নামক জনৈক মিসরভাষাবিদ পণ্ডিত আলোচ্য ভাষাগুলিকে ‘Family of Indo-European Language’ বলিয়া অভিহিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ভাষাভাষী জনগণকে Indo-European Races নামে পরিচয় দেন। ইহার পরই Indo-Aryan এবং Aryan নামের উৎপত্তি হয়।

তাহা হইলে একথা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, আর্য-অনার্যের প্রভেদ নিতান্তই আধুনিক যুগের সৃষ্টি। এই জন্যই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, আর্য, অনার্য বা দ্রাবিড় কোনো নৃতাত্ত্বিক প্রকারভেদ নয়; উহারা ভাষার নাম; অর্থাৎ আর্য ভাষাভাষী যাহারা তাহারাি ছিল আর্য, দ্রাবিড় ভাষাভাষী যাহারা তাহারা ছিল দ্রাবিড়। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও খুব সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাতে আর্যদের আভিজাত্যের ভঙ্গি নষ্ট হয় বটে।

আর্য-খিওরীর কুফল

আর্য-খিওরীর স্বরূপ দেখান হইল। ইহাতে ভারতীয় আর্যদের ভূমিকা থাকিলেও তাহারা ইহার স্রষ্টা নহে; ইউরোপ হইতে— বিশেষ করিয়া জার্মান জাতির দ্বারা— এই খিওরী উদ্ভাবিত ও প্রচারিত। উৎকট সেমিটিক বিদ্রোহ এবং দুর্বল জাতিদ্বিগকে গ্রাস

করিবার গভীর দূরভিসন্ধি এই খিওরীর প্রধান প্রেরণা। ইউরোপে জার্মান জাতিই গৌড়া আর্থ বলিয়া খ্যাত। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ তাহাদের গৌড়ামির ফলেই সংঘটিত হইয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার মূলেও আছে এই আর্থ-খিওরীর প্রভাব। বস্তুতঃ এই খিওরী নিতান্তই মানবতা বিরোধী, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে বিরোধ ও বৈষম্য সৃষ্টি করিতে এই খিওরী এক অমোঘ অস্ত্র। এই খিওরী মানব-সভ্যতার ইতিহাসকেও বিকৃত ও কলুষিত করিয়াছে এবং মানবজাতির সত্য পরিচয়কে সকলের চোখের আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই প্রত্যেক কল্যাণকামী মানুষের উচিত এই খিওরীর অবসান ঘটানো।

মধ্যযুগ

মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষার মধ্যযুগের প্রবেশ-দ্বারের আসিয়া পৌঁছলাম। এ যুগকে মুসলিম যুগও বলা যাইতে পারে। ১৩৫০-১৭৫০ খ্রী: পর্যন্ত দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্য মুসলিমদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে কিছুকাল যাবৎ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্ম তেমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, কারণ যুগ-বিপ্লবের পর শান্ত পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে কিছুটা সময় লাগে। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের আমল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিমদিগের সেবায়, দানে, সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বাংলা ভাষা নানা গৌরবে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। বাংলা ভাষার সর্ব প্রথম মুসলিম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর আযম শাহের রাজত্বকালে ‘য়ুসুফ জুলিখা’ নামক কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন। মুহম্মদ সগীরের ‘য়ুসুফ জুলিখা’ এবং তৎপূর্ববর্তী বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ই বাংলা সাহিত্যের দুই প্রথম গ্রন্থ। যুসুফ জুলিখার ভাষা ছিল এইরূপ :

কহে শাহ্-মোহাম্মদ যুসুফ জুলিখা পদ

দেশিভাষা- পয়ার রচিত।

কিতাব কোরাণ মধ্যে দেখিনু বিশেষ

য়ুসুফ জুলিখা কথা অমিয়া অশেষ।

কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি।

শুনহ ভকত জন শ্রুতিষট ভরি ॥

দোষ ধেম, গুণ ধর রসিক সুজন।

মোহাম্মদ হুগীর ভনে প্রেমিক বচন ॥ [মুসলিম বাংলা সাহিত্য]

সুলতান হসেন শাহ্ এবং তাঁহার বংশধরদিগের আমলই মধ্য-বাংলা সাহিত্যের

স্বর্ণযুগ। এই উদারমনা সাহিত্য-রসিক গুণগ্রাহী সুলতান সভ্যই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের কবি-সাহিত্যিকদিগকে ডাকিয়া তিনি দরবারে স্থান দেন। আরবী-ফারসী হইতে নানা ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, গল্প ইত্যাদি অনুবাদ করাইবার কাজে তিনি মুসলিম কবিদিগকে নিয়োগ করেন। সেই সঙ্গে মৌলিক রচনাবলীরও মর্যাদা দেন। শুধু মুসলিম কবি নন, হিন্দু কবিদিগকেও তিনি এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ সাদরে আহ্বান করেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। হুসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব-ধারাও সংযোজিত হয়। এইরূপে বাংলা ভাষা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে গোটা বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়।

কিন্তু একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। হুসেন শাহের দরবারে যখন বাংলা সাহিত্য চর্চার এমন সমারোহ চলিতেছে, তখনই-বা বাংলা ভাষার প্রতি আর্য-হিন্দুদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল? পূর্বের সেই জাতক্ৰোধ, বিদ্বেষ ঘৃণার ভাব তাহারা তখনও অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিল, এই জন্য সুলতানের আবেদনে অগ্রে তাহারা সাড়া দেয় নাই। পরে যখন অন্যান্য কবিরা নিজেদের কাব্য-রচনার জন্য সুলতানের নিকট হইতে প্রচুর ইনাম, খেতাব ও পুরস্কার লাভ করিতে লাগিল, কেবল মাত্র তখনই তাহারা রাজ-দরবারে আসিয়া সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

“The Brahmins could not resist the influence of this high patronage. They were, therefore, compelled to favour the language they had hated so much and laterly they themselves came forward to write poems and compile works of translation in Bengali.” [History of Bengali Literature]

শুধু তাই নয়। সুলতানদের দেখাদেখি দেশীয় অন্যান্য হিন্দু রাজারাও তখন নিজেদের রাজসভায় বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদিগকে সমাদর করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইল এবং উহার সমস্ত গৌরব মুসলমানদের প্রাপ্য :

“Thus the appointment of Bengali poets to the courts of Hindu Rajas grew to be fashion after the example of the Muslim chiefs.” [Ibid]

এইসব তথ্যের মুকাবেলায় কি করিয়া বলা যায় যে, বাংলা ভাষা আর্ষভাষা?

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদিগের দান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও ছিল প্রচুর। ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, লৌকিক কেম্বা ও কাহিনী এবং অনুবাদই ছিল তাঁহাদের সাহিত্য-কর্মের মূলধারা। কাসাসোল আখিয়া, ফতুহুন্নাম, ফতুল মেহের,

আলেক-লায়লা, জঙ্গনামা, শহীদে-কারবালা, লায়লি-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা, আমির হামজা, চাহার দরবেশ, ছয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান, সোনাভান, গাজী কালু ইত্যাদি অসংখ্য পুঁথি মুসলমান কবির রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্তর আব্দুল গফুর সিদ্দিকীর মতে মুসলিম পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ হইবে। মুসলিম পুঁথি-সাহিত্যের ভাষা ও রচনা-রীতির কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল :

মেহের সহর হইতে বাহির হইয়া
মকদ্দস পানে নবি জ্ঞান নেকালিয়া
সামের সহর বিচে ফলগুন গ্রাম
তথা উতরিল যদি নবি নেককাম ।
জিবরিল আসিয়া কহে শোন সমাচার
দেখ হেথা জমিনেতে কেমন বাহার ॥ [কাসাসুল আশিয়া]

উজিরের পানে বাদশা আঁখি ঘুমাইল ।
দেলেতে হইল গোষ্ঠা কিছু না কহিল ।
উজির কহিল বাদশা আমি সব জানি ।
আমিরের বেটা এই উম্মর ইউসানি ॥ [আমির হামজা]

শুন যত বেরাদার, কহি কিছু সমাচার
শুন সবে আগামি কালাম
রুমের সহর বিচে, কুস্তনডুনিয়া দেশে
এস্তাবুল বলে যার নাম । [চাহার দরবেশ]

এই চলিত ভাষা এতই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক হিন্দু কবিও এই ভাষায় পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই :

আল্লা আল্লা বল পাক পরোয়ারদিগার ।
আখের দোজখে ডালি...যার ॥
দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির ।
জাহিরে বাতুনে লইলাম আল্লার জিকির ॥
আল্লার আরশ কোর্সে কিছু মেহেরবানী চাই ।
ইমামগণের কেছা কিছু মিলাইয়া গাই ।
শ্রীযুক্ত সাহেবের কেছা রাখাচরণ গাএ ।
আল্লা আল্লা বল নবি পাঞ্জাতনের পাএ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিতে কুঠাবোধ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাপতির নাম করা যায়। নিম্নে দুইটি উদ্ধৃতি দিতেছি :

মানসিংহ জোড় হাতে অঞ্জলি বাঁধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজির কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারই কেরামত।
হকুম শাহানশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল জালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম। [ভারতচন্দ্র রায়]

প্রাচীন গদ্য

প্রাচীন বাংলা গদ্যের নিদর্শন খুবই বিরল। শুধু সরকারী দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেই যা-কিছু নমুনা পাওয়া যায়। নিম্নে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষার নমুনা দেখানো হইতেছে :

সপ্তদশ শতাব্দী (১৬৬২)

শ্রী যশোমাধব ঠাকুর কুমড়াল গ্রামে দেবালয়ং আছিল। রাম শর্মা ও গায়রহু আপনার ২ ওয়াদা মাফিক সেবা করিতেছিল। রাত্রদিন চৌকি দিতেছিল। শ্রী রামজীবন মৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন।' - ইত্যাদি। (শ্রী মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চারযুগ')

অষ্টাদশ শতাব্দী (১৭৮৬)

শ্রীযুক্ত ওলন্দেজ কোম্পানীতে আড়ঙ্গ বিরভূমের খরিদর দাদনী আমি লইয়া ঢাকা আড়ঙ্গ চালানী করিয়াছি। আপরেল মাহেতে এবং মোকাম মজবুরের গোমস্তা কাপড় খরিদ করিতেছিল এবং কাপড় কথক ২ আমদানি হইয়াছে এবং হইতেছে দান্ত কথক ২ তৈয়ার হইতেছে এবং মবলগ কাপড় ধোবার হাতে দান্তর কারণ রহিয়াছে। তাহাতে সংপ্রীতি মেঃ গেল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিঠ করিয়া ঘাট হইতে ধোবা লোককে ধরিয়া লইয়া গেল।'... ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এই মিলিত রূপ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ইহার পরই বাংলা ভাষার খাত পরিবর্তিত হইল। তখন এদেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। শাসন কার্যের 'সুবিধার' জন্য ইংরাজেরা ভেদনীতির আশ্রয় লইল। সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিল।

এতদিন ফার্সী ভাষা রাজভাষা ছিল, এখন তাহার স্থলে ইংরাজী ভাষাকে তাহারা রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা করিল। বাংলা ভাষাকেও হিন্দুয়ানী রূপ দিয়া মুসলমানদিগের শিক্ষা ও প্রগতির পথে মন্ত বড় বাধার সৃষ্টি করিল। কিরূপ করিয়া এই পটপরিবর্তন ঘটিল, চিন্তাশীল লেখক সজ্জনীকান্ত দাস তাহা নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন :

‘১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি গিটস্ ফরষ্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃত পক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আরবী-পারসী নিসূদন-যজ্ঞের সূত্রপাত এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতসমূহে আরবী-পারসীর পরিবর্তে বাংলা ও ইংরেজীর প্রবর্তনে এই যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গিতি।’ [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস]

এই কাজে ইংরাজ পাদ্রীদের সহিত যোগ দিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাচাম্পতি, রামরায় বসু এবং আরও অনেকে। তখন বাংলা ভাষা হইতে আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করিয়া ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করা হইল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু মনীষীরা এই কার্যে অগ্রণী হইলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষা রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইখান হইতেই বাংলা ভাষার নবযুগ আরম্ভ হইল। ইহাকে ‘হিন্দু রেনেসাঁর’ যুগও বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বাংলা ভাষা নিম্নের রূপ ধারণ করিল :

‘কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণ উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের সম্বরণপূর্বক সীতার চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। চৈতন্য সম্ভার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ শুদ্ধভাবে থাকিয়া স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আর বিলাপ ও পরিভাষা করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক চিন্তে তপস্যা করিব— যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন।’ [সীতার বনবাস]

এই ভাষা ও ভাবধারা যখন সরকারী স্কুলসমূহে পাঠ্য হইল, তখন মুসলমানেরা এক চরম সংকটের সম্মুখীন হইল। এ ভাষা কিছুতেই তাহারা গ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। একবাক্যে তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে শিক্ষা দিতে অসম্মতি জানাইল।

William Hunter তাহার Indian Musalmans নামক গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার মুসলমানের মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন :

‘The language of our Government schools, in Lower Bengal Hindu and the masters are Hindus. The Musalmans

with one consent spurned the instruction of their boys through the medium of this language of idolatry.’

কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় কালে কালে মুসলমানদিগকে ইংরাজী ভাষাও শিখিতে হইল, সংস্কৃত-বাংলাও শিখিতে হইল।

এই পণ্ডিতী বাংলায় বুদ্ধির দীপ্তি ও মার্জিত রুচিবোধ থাকিলেও, এ ভাষা জনসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। এই ভাষাকে লক্ষ্য করিয়া বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ Grierson মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন :

‘Literary Bengali, as now known, is the product of the present (19th) century. Its direct cultivators were the Calcutta pandits who, however well-meaning, have ruined the language by their learning.’

অবশ্য এই পণ্ডিতী বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে বেশী বিলম্ব ঘটে নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে একটা গতিহীন অচলায়তনে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই ভাগ্যক্রমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হইল। উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশ্চাত্যধর্মী মন লইয়া তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে গভী-সংকীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। মাইকেলই এ যুগে আর্য-বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তিযোদ্ধা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবি। তিনি না আসিলে বাংলা ভাষা কোন্ ধারায় কোন্ সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইত তাহা ভাবিবার বিষয়।

ইহার পর প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা ভাষা আরও সহজ ও সবল হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তবু ইহার সাহিত্য-রূপ এখনও জনগণের দূর্বোধ্য হইয়াই আছে।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো অতি আধুনিক লেখকও একথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন : ‘ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে খাত বদল করেছিল আজও সেই পথেই তার স্রোত বইছে। ইংরেজ এসেছে, তার ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব এসেছে, বাংলা-রীতি তাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু ঊনবিংশ শতকের সেই প্রথম পর্বের জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে তার যে পার্থক্য রচিত হয়েছে আজও তা সমান্তরাল সরল রেখার মতই চলেছে। আজ যখন বাঙালী লেখকের রচনা জনমনস্পর্শী হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে তখন সে অভিযোগের পেছনে নাগরিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যই নয়, দেড়শ বছর আগে বাংলা ভাষার নববিধানও যে তার জন্য কতটা দায়ী, সে কথাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে।’

এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বর্তমান বাংলা সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম-সাহিত্য

রাজ্যহারা মুসলমানেরা যখন বুঝিতে পারিল যে, ইংরাজী ও বাংলা না শিখিয়া তাহাদের গতান্তর নাই, তখন তাহারা এইদিকে মনোযোগ দিল। এই নতুন যুগের প্রথম মুসলিম সাহিত্য-স্রষ্টা হইতেছেন মরহুম মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। তাঁহার প্রণীত ‘বিষাদ-সিন্ধু’ সাধু ভাষায় লিখিত হইলেও তাহার ভাষা যে কতো সাবলীল ও প্রাণবন্ত। নিম্নের উদ্ধৃতি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে :

‘রক্ত দর্শনে হোসেন চমকিয়া উঠিলেন। আজ ভয়শূন্য মনে ভয়ের সম্ভার হইল। সভয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন : আবদুল্লাহ জেয়াদ, ওমর, সীমার এবং আরও কয়েকজন সেনা তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া যাইতেছে। সকলের হাতেই তীর-ধনু। ইহা দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। যে সমুদয় বসনের মাহাত্ম্যে তিনি নির্ভয়-হৃদয়ে ছিলেন, তৎসমুদয় এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন; তরবারি, তীর, নেজা, বল্লম, বর্ম, খজুর কিছুই তাঁহার সঙ্গে নাই। কেবল দুইখানি হাত মাত্র সম্বল। অন্যমনস্কভাবে তিনি দুই এক পদ করিয়া চলিলেন, শত্রুরাও পূর্ববৎ ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।’ [বিষাদ-সিন্ধু]

কিন্তু মুসলিম কাব্য-সাহিত্য ও পুঁথির ধারা তখনও মস্তুর গতিতে চলিতেছিল। এই সময়কার জনৈক মুসলিম কবির রচিত নিম্নের ব্যঙ্গ কবিতাটিতে কিছুটা আধুনিকতার ছাপ এবং উন্নত রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি ইনকামট্যাক্সকে লক্ষ্য করিয়া রচিত :

বালেশ্বর বিচে গড় পদ্মা পরগনা
ভিটোরিয়া শাহজাদী যার মালিকানা।
লেয়সন করোসন দুই লাট বন্দি,
খাজানা দাখিল করি মোরা হাত বান্ধি।
জরিপেতে বন্দবস্ত হইয়াছে যার
বহুত মশকেলে দিতে হবে রাজকর।
তাহাতে যাহোক করি দুঃখেতে গুজরাণ
এইরূপে দিনপাত চালান রহমান।
রাতদিন দোওয়া করি মহারাণীর তরে,
রাজ্যবৃদ্ধি হয় তার খোদাতালা করে।
এমন আমল দুটা হয় না জাহানে
এক জাগায় রাখে বাঘ বকরী দুইজনে।
কেহ কারো জবরদস্তি করিতে না পারে,
কায়েম হুকুম যে আইন অনুসারে।
এই মতে কতদিন যায় গুজারিয়া

পালেন সবার তরে মেহের করিয়া ।

তাহাতে আইল এক এমন রাক্ষস

তাহার বিখ্যাত নাম ইনকাম ট্যাকস্ ।

এই ধারা এখনও বাঁচিয়া আছে । নজরুল ইসলামের হাতে ইহার রূপান্তর ঘটয়াছে । আরবী-ফার্সী শব্দ দ্বারা, বলিষ্ঠ আঙ্গিক দ্বারা এবং ইসলামী ভাবধারা দ্বারা তিনি বাংলা ভাষাকে প্রচুর শ্রী ও সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন ।

উপসংহার

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এতক্ষণ আমরা দিলাম । এই পরিচয়ে দেখিলাম বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, অনার্য ভাষা । অনার্য ভাষার অর্থে অসভ্য বর্বর অস্পৃশ্যদের ভাষা নয়— আর্য-বহির্ভূত নরগোষ্ঠীর ভাষা; অন্য কথায় বাংলার ভাষা-বাঙালীদের ভাষা । অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছে । কিন্তু সে প্রভাব ‘অত্যন্ত নগণ্য’ এবং ‘অত্যন্ত আধুনিক’ । উক্তর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন :

‘বর্তমান বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন নগণ্য, তেমনই অত্যন্ত আধুনিকও বটে ।’ [মুসলিম বাংলা সাহিত্য]

বাংলা ভাষার সংগঠনে সংস্কৃত হইতে যতটুকু সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি । কিন্তু বাংলা যে সংস্কৃতের দূহিতা এবং কাজেই আর্যভাষা এই দাবী অস্বীকার করি । আর্যামির গোঁড়ামি হইতে বাংলা ভাষাকে আমরা মুক্ত রাখিতে চাই । ইহাই হইবে বাংলা ভাষার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথ ।

আজ বাংলা ভাষা দ্বিধা-বিভক্ত । পশ্চিম বঙ্গের বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা এক হইয়াও এক নয় । উভয়ের গতি ও লক্ষ্য বিভিন্ন । ইহাতে আমাদের আনন্দের কারণ আছে । এখানকার বাংলা সংস্কৃতের আওতা হইতে অনেক দূরে থাকিবে । সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা; সুতরাং মৃতের সহিত যাহারা যত বেশী মিতালী করিবে, তাহারা ততো বেশী আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইবে । পাক-ভারত উপমহাদেশের বহু প্রাদেশিক ভাষা রহিয়াছে । যেমন বাংলা, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি, আসামী ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে বাংলা ও উর্দুই যে শীর্ষস্থানীয়, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন । উর্দুর কবি ইকবাল আজ সারা জগতের বিপ্লবী কবি ও দার্শনিক । এই দুই ভাষাতেই বহু বিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এ গৌরব এক হিসাবে ইসলামের । উর্দু ও বাংলা যে আজ এত প্রগতিশীল ও জীবন্ত তাহার কারণ যে উহার আর্য ভাষা নহে; অন্য কথায় সংস্কৃত হইতে উহাদের জন্ম হয় নাই । সংস্কৃত

হইতে যে ভাষা যতো দূরে রহিয়াছে, সে ভাষা আজ ততো জীবন্ত, ততো প্রগতিশীল। পাক-ভারত উপমহাদেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আজ যে উর্দু ও বাংলা ভাষাই সর্বাপেক্ষা উন্নত, বলিষ্ঠ ও ব্যাপক, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের প্রকৃতি ও রক্কে আছে ইসলামের বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবিকতার ছাপ। প্রচারধর্মী সাম্যবাদী মানুষেরাই উহাদের জন্মদাতা ও পালয়িতা। বাংলা ভাষার গতিপথ লক্ষ্য করিলেও এ সত্য সহজেই বুঝা যায়। দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, সুলতানী আমল পার হইয়া সে আসিল বৃটিশ আমলে। এখানে আসিয়া পাদ্রী ও পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে সে অনেকখানি স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু মুক্তির নূতন পথ ধরিয়া বাহিরে আসিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। এই মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্য করিলেন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ উদারধর্মী কবি-সাহিত্যিকেরা। পাকিস্তান আসিয়া তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। সুখস্মৃতি ঘেরা পূর্ব পাকিস্তানই তো তাহার আদি বাসভূমি। এখানে আসিবামাত্রই সে আবার তাহার হৃতগৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে। উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাও এখন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। এই গৌরব বাংলা ভাষা অন্যত্র লাভ করিতে পারে নাই।

পূর্ব-পাক বাংলা সাহিত্যে এবারেও ইসলাম এক নূতন ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও মহামানবতার বাণী এবং তাহার রূপ, রস ও সুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রেরণা যোগাইবে এবং সম্ভাবনার এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিবে।

(লেখকের জন্ম : ১৮৯৭, যশোর এবং মৃত্যু : ১৩ অক্টোবর ১৯৬৪ ঢাকা।)

মুসলমানী বাঙ্গালা

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক



বঙ্গের মুসলিম-সেবিত বাঙ্গালা সাহিত্য বহুদিন হইতে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সর্বপ্রথম যখন এই নামটি শুনিয়াছিলাম, তখন কেমন বোধ করিয়াছিলাম মনে নাই ; তবে আজকাল যখন যাবনিকত্বের আমেজ প্রলিঙ করিয়া এই মধুর ‘নামামৃত’ আমাদিগকে পান করানো হয়, তখন আনন্দাতিশয্যে আমাদের ঠিক ‘দশা’ উপস্থিত না হইলেও, ইহাতে আমরা যেন একটু কেমন-কেমন বোধ করিয়া থাকি। বিগতপ্রায় অর্ধযুগ হইতেই এই চমৎকার নামটির সার্থকতা সঙ্কল্পে আমরা নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। তাহাতে এই নামের সার্থকতার যে-রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছে তাহাকে সংক্ষিপ্তাদপি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা।

কোন জাতিবিশেষের গায়ে হিন্দুয়ানী বা মুসলমানী মার্কী মারিতে পারা গেলেও, কোন দেশ, বিশেষতঃ কোন দেশের ভাষার গায়ে তেমন কোন মার্কী আদৌ মারা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমাদের বিস্তর সন্দেহ আছে। বাঙ্গালী মুসলমানরা বাঙ্গালা দেশের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে। দুনিয়ার সব দেশের ভাষাতেই অল্প-বিস্তর মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ ভাষার মিশ্রণ দিয়াই, জাতির বৈরাট্য, বিস্তৃতি, কর্ম-তৎপরতা ও ঔদার্য নির্ণীত হইতে পারে। বিরাট অতীতে বাঙ্গালী জাতির ভাষা যে-কাঠামো অবলম্বন করিয়াই বড় হউক, ইহা এই জাতির বৈরাট্য, বিস্তৃতি, কর্মতৎপরতা ও ঔদার্যের পরিচায়ক। এদেশের মুসলমানদের বাঙ্গালাকে ‘মুসলমানী’ নাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবার যে আধুনিক প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা আধুনিক বাঙ্গালী জাতির স্বকীয়তার পরিচায়ক বই আর কি বলিতে পারা যায়? একটি বিরাট দেশের ভাষার গায়ে এখন ধর্মীয় মার্কী দেওয়া একরূপ নূতন ব্যাপার। হিন্দী ভাষার মুসলিম ঔরসজাত কন্যা উর্দুভাষার গায়েও উস্তর-ভারতীয়েরা এমন কোন ধর্মীয় মার্কী মারেন নাই। তবে, আমাদের বাঙ্গালা দেশে সবই যখন সম্ভবপর, তখন ভাষার বেলায়ও যদি হঠাৎ কোন নূতন কথা শুনিয়া ফেলি, তাহাতে আশ্চর্য না হইয়া নিজের বাঙ্গালীত্বের কথা স্মরণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাঙ্গালী মুসলমানের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহাদের মাতৃভাষার জন্য তাঁহারা একটি সুন্দর নাম পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান এ পর্যন্ত এদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-সেবিত বাঙ্গালাকে ‘হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা’

তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের বাঙ্গালাকে এই মধুর
কেন তাঁহাদিগকে এই পরম সৌভাগ্য-ভোগ হইতে
কে বলিবে? তবে মনে হয়, বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বীয়
সাম্প্রতিক শ্রদ্ধা এবং ঔদার্যই কৃপত্বই ইহার প্রধান কারণ। যদি
আমাদের সত্য হয়, তবে এইজন্য বাঙ্গালী মুসলমানকে দোষ দেওয়া চলে না।

সে যাহা হউক, ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ বলিয়া একটি কথা প্রায়ই চোখে পড়ে,
‘হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা’ বলিয়া কোন কথা এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নাই— ইহাই আমরা
বলিতে চাই। এই ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ কি, সে সম্বন্ধে বিগত কয়েক বৎসর হইতে
আমরা চিন্তা করিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার একটি বিরাট অংশের প্রতি এই নাম
আরোপের মূলে যদি কোন শুভ ইচ্ছা দেখিতাম, তবে এ বিষয়ে আমাদের মাথা
ঘামাইতে হইত কিনা সন্দেহ। ইহাতে তেমন কোন শুভ ইচ্ছা নিহিত আছে বা ছিল
বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার মুসলমানগণ ধর্মে, কর্মে ও বিশ্বাসে বাঙ্গালার হিন্দু
হইতে মোটামুটি পৃথক হইলেও, সংস্কৃতিমূলক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া, হিন্দুগণ
এদেশের মুসলমানকে চিরদিনই স্বজাতীয় বলিয়া দাবী করিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু
নিতান্তই আচর্যের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া,
মুসলমানদের বাঙ্গালাকে হিন্দুগণ তাঁহাদের বলিয়া দাবী করা দূরে থাকুক, ইহাকে
চিরঘৃণ্য হরিজনের ন্যায় ‘দূর দূর’ করিয়া তাঁহাদের অপাংক্ত্যে করিয়া তুলিতে প্রয়াস
পাইতেছেন। ইহার কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া বৃথা। সম্ভবতঃ আধুনিক
যুগের রাজনৈতিক মানসিকতা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া
এইরূপ ঘটিতেছে। বঙ্গের মুসলিমসেবিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ ঘৃণ্য ছাপ
দেওয়ার সার্থকতা কি, তাহাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়। সুতরাং একটু
ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিলে ভাল হয়।

‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ কথাটির ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। খুব সম্ভব, মাত্র ৮২
(বিরাজী) বৎসর পূর্বে, কথাটি লেখায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। লং সাহেব
(Rcv. James Long 1814-1887) ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন কৃষ্ণণে তাঁহার
বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় (Catalogue of Bengali Books) ‘মুসলমানী
বেঙ্গলী’ কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন কে বলিতে পারে? তাঁহার তালিকাটি দেখিলে
বেশ বুঝিতে পারা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত বাঙ্গালার অনুসরণে ও
অনুকরণে লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক হইতে পৃথক করিবার জন্য, ‘বটতলার’ উনবিংশ
শতকের পুঁথিগুলিকে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। কেননা পণ্ডিত বাঙ্গালায় লেখা
মুসলমানদের অন্য পুস্তককে তিনি ‘মুসলমানী বেঙ্গলী’ শীর্ষের অন্তর্গত করেন নাই।
ইহার পর, যে সকল উল্লেখযোগ্য পুস্তকে এই কথাটির ব্যবহার দেখা যায়, তাহা রায়
বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত ‘Origin and Development of Language’ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দুইজন মহারথীও কথাটিকে অতিরিক্ত মাত্রায় অসাবধানভাবে মুসলমানদের সমগ্র পুঁথির অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের ব্যবহারে অসাবধানতা ব্যতীত কোন প্রকারের ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা নানাস্থানে কথায় ও লেখায় ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ কথাটি সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনাকে বুঝাইবার জন্য ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার কোন নজীর উদ্ধৃত করার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না। ...

যদি ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্য-সেবককে ধর্মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সেবিত সাহিত্যকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে হ্যালহেড সাহেবের ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ বা মার্সম্যান প্রভৃতির বাঙ্গালা-সাহিত্যকে ‘খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা’ এবং তরুদত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির ইংরেজী সাহিত্যকে ‘হিন্দুয়ানী ইংরেজী’ বলা উচিত। ফলে তাহা হয় কি? যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি জৈনুদ্দিন, মোহাম্মদ সগীর, শেখ কবীর, ষোড়শ শতাব্দীর কবি মোহাম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন, আলাওল, মোহাম্মদ খাঁ প্রভৃতির বাঙ্গালা সাহিত্যকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ আখ্যায় আখ্যাত করা হয় কেন? অথচ তাহারা যে ভাষা বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

‘আমির হাসন সুতা, রূপে গুণে অদভূতা,
যেহেন স্বর্গের বিদ্যাধরী।

চাঁচর চিকুর খোঁপা, শোভে অতি মনোলোভা
মুজা দোলে লহরে লহরী ॥

নয়ন চঞ্চল দেখি, ধাইল খঞ্জন পাখী,
কটাক্ষে হানিল দ্বিজরাজ।

মৃগমদ পত্রাবলী, মৃগাক্ষ কলঙ্ক বলি,
ভ্রম হয় মুনিমন মাঝ।।’ (মকতুল হোসেন ॥ মোহাম্মদ খাঁ)

যে রূপ মনোভাব লইয়া এইরূপ বাঙ্গালাকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ বলিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করা হয়, সেইরূপ কোন প্রকারের মনোভাব আমাদের নাই বলিয়া, যিনিই ইহাকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ বলুন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। এইরূপ বাঙ্গালা সপ্তদশ শতাব্দীর সেরা হিন্দুকবিদের কয়জন লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা তলাশ করিতে গেলে, ‘লোম বাছিতে কয়ল উজাড়’-এর দশা ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

বিচার করিয়াই কতকগুলি বাঙ্গালা কাব্যকে দেওয়া হয়? লেখার মধ্য হইতে কিংবা কথার ভিতর হইতে বাদ করা যায়, তদ্বারা এমন কোন ব্যাপার বুঝিতে পারা যায় না যে বাঙ্গালা কাব্যে ইসলামী ভাবের প্রাধান্য হইলেই, তাহাকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রচিত পদাবলী-সাহিত্যকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বস্তু বলিয়া নির্দেশ না করিয়া তাহার গায়ে মুসলমানী বাঙ্গালার ছাপ মারিয়া, সে গৌরবটুকু বাঙ্গালার মুসলমানকেই দেওয়া উচিত ; কেননা পদাবলি সাহিত্যটির আগাগোড়া মুসলমানদের সুফী-সাহিত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এবং ভাব-সামঞ্জস্যের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণিত। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কোন বাঙ্গালী (অবশ্য বাঙ্গালার মুসলমানকে বাদ দিয়া) তাহা করিতে স্বীকৃত আছেন বলিয়া মনে হয় না। এই হিসাব ধরিতে গেলে, কবি নজরুল ইসলামের ‘হাক্কেজের অনুবাদ’ এবং নরেন দেবের ‘ওমর খৈয়াম’ সমভাবে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’। কিন্তু, হিন্দুগণ কান্তি ঘোষ কি নরেন দেবকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’র লেখক বলিয়া একঘরে করিয়াছেন কি?

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং এই সাহিত্যের সেবকের জাতি এই তিনটির কোনটির দিক হইতে বিচার করিয়া যখন ইহার গায়ে ‘মুসলমানী বাঙ্গালার’ ছাপ দেওয়া যায় না, তখন এই মার্কটি এক শ্রেণীর বাঙ্গালা-সাহিত্যের গায়ে মারিয়া দেওয়ার সার্থকতা নাই, তেমন কথা বলা যায় না। হ্যাঁ, ইহাতে যে সার্থকতাটুকু রহিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের আরোপিত সার্থকতা নহে, একথা জোর করিয়া বলা যায়। সাহিত্য-সেবকের জাতি এবং ইহার ব্যবহার ভাষা-সংশ্লিষ্ট তথাকথিত কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই উপযুক্ত সার্থকতা আরোপ করা হয়। এইরূপ সার্থকতা আরোপের মূলে সারবস্তুর চেয়ে অসাবধানতাই বেশি বলিয়া আমাদের ধারণা। নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট করিবে।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রগতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান-কালের মধ্যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সেবিত পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালা-সাহিত্যে এমন একযুগ আসিয়াছিল, যাহাকে নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীভাবে ইচ্ছা করিলে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ নামে অভিহিত করা চলে। আবার একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙ্গালার সকল অংশের সাহিত্য সম্বন্ধে এ উক্তি অচল। এই যুগীয় পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্যকে, পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য-সাধনার বাহিরে রাখা উচিত ; কেননা, যে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই যুগকে পৃথক নাম দেওয়া যায়, তাহার বিশেষ প্রভাব উত্তর ও পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গের যে অঞ্চলে আধুনিক প্রেসিডেন্সী ও

বৰ্হমান বিভাগ এবং রাজশাহী বিভাগের মালদহ, রংপুরের দক্ষিণাংশ এবং রাজশাহী জেলার সবখানি অবস্থিত, সে অঞ্চল বাঙ্গালা সাহিত্যে বরাবরই প্রাধান্যবিস্তার করিয়াছে ; এই কারণে এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে বলিতে, আমরা উপর্যুক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় অঞ্চলের বাঙ্গালা সাহিত্যই বুঝাইতেছি ।

যে যুগের কথা বলা হইতেছে, সে-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষায় ও ভাবে মুসলিম প্রভাব প্রচুর । এ স্থলে এই প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভবপর নহে । আবশ্যক বোধ করিলে, আমরা অন্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি । বলাবাহুল্য পলাশীক্ষেত্রে মুসলিম রাজশক্তির পতনের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পর, বাঙ্গালার হিন্দু-সাহিত্য হইতে এই প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে । কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণ মেরুদণ্ডবিহীন হইয়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত একরূপ ‘ষিচুড়ি’ বাঙ্গালায় এমন একরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকে, যাহা অধুনা ‘বটতলার-সাহিত্য’ নামে অভিহিত হয় । এই বটতলার সাহিত্যকেই লঙ সাহেব ‘মুসলমানী বেঙ্গলী’ নাম দিয়াছিলেন । ভাষার দিক হইতেও ইহাদের মূল্য যেমন নগণ্য, সাহিত্য-সম্পদের দিক হইতেও ইহার মূল্য তেমন হয় । বর্তমানে আমাদের এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান-কাল পর্যন্ত বাঙ্গালার সাহিত্যে (হিন্দুরই হউক বা মুসলমানেরই হউক) মুসলিম প্রভাব, ভাব ও ভাষা এই উভয়ই যথেষ্ট । পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম রাজধানীর নিকটবর্তী ছিল বলিয়া নানাভাবে নানাদিক হইতে মুসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । এই প্রভাব সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ায়, এই সময়কার হিন্দু-মুসলিম-সেবিত বাঙ্গালা-ভাষায় এমন একটি ইসলামী অর্থাৎ তথাকথিত ‘মুসলমানী’ পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার জন্য ইহার গায়ে ইচ্ছা করিলে নিতান্তই অসাধারণ ভাবে ‘মুসলমানী বাঙ্গালার’র ছাপ দেওয়া যায় । কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডী’, বৈষ্ণবদের পদাবলী এবং হিন্দুদের সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি । এই স্থলে এই যুগের ইসলামী পারিপার্শ্বিকতার উদাহরণ স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্কর্মী ধর্মগ্রন্থ শূন্যপুরাণের অন্তর্গত ‘নিরঞ্জনের রক্ষা’ হইতে (কেননা এই গ্রন্থের এই অংশ ষোড়শ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী রচনা বলিয়া নির্দেশিত হয়) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

‘এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ,

ই বড় হইল অবিচার ।

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম,

মায়াতে হইল অন্ধকার ॥

ধর্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাধায়ত কাল টুপি,

হাতে শোভে ত্রিকচ কামান ।

ইহাকে মানিয়া লইলেও বুঝিতে হয় যে, এই সময়ের মুসলিম জীবনের প্রসার এমন বিস্তৃত ছিল যে, সাহিত্যে এই জীবনের রূপ দিতে হইলে মুসলিম রঙের আশ্রয়গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। যদি তাহাই হয়, তবে এই সময়ে মুসলিম কবিদিগকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ ব্যবহারের জন্য হীনতার চক্ষে দেখার কোন কারণ দেখি না, কেননা মুসলমান কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে মুসলিম জীবনের ছবিই আঁকিয়াছেন।

নির্বিকার ও নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, এই সময়ের বাঙ্গালা-সাহিত্যে এইরূপ কোন ব্যাপার নিহিত ছিল না। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা-ভাষা মুসলিম রাজধানীর নিকটবর্তী ছিল বলিয়া নানাভাবে মুসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এই মুসলিম প্রভাবের মধ্যে রাজ্যভাষার একটি প্রবল ভাষাগত প্রভাব ছিল বলিয়া একরূপ নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়। অধিকন্তু, এই সময়ে বঙ্গের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি সংস্কৃতিগত (cultural) মিলন বা ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাউল মতের বিস্তৃতি ইহার অন্যতম প্রমাণ। মোটামুটি এইরূপ প্রভাবের ফলে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষা তথাকথিত ‘মুসলমানী বাঙ্গালার’ আকার ধারণ করে, এবং এই স্থানেরই সাময়িক সাহিত্যে (হিন্দু-মুসলিম উভয়) তাহার ছাপ অঙ্কিত হয়। ইহার প্রমাণ বিস্তার। পশ্চিমবঙ্গের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে প্রায় তিনশতাধিক মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অথচ এই সময়ের একটু পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গীয় কবি মাধবাচার্যের চণ্ডীতে এইরূপ শাব্দিক প্রভাব নগণ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গীয় ‘সত্যনারায়ণের বা সত্যপীরের’ ভাষা তেমনই সুষ্ঠু ও সাধু, এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গীয় অধিকাংশ সত্যপীরের পুঁথির ভাষা তেমনই অসাধু ও বিকৃত।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গীয় কবি দৌলত কাজী যখন ‘সতী ময়না’ রচনা (১৬২২-১৬৩৮ খ্রী.) করিতে গিয়া লিখিতেছিলেন :

‘চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে ।

মৃগাঙ্ক শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে ॥

মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন!

লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ ॥’

তখন পশ্চিমবঙ্গের মোহাম্মদ এয়াকুব প্রমুখ খ্যাতনামা কবিগণ ‘জঙ্গনামা’ (রচনাকাল-১৬৯৫) শ্রেণীর পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহা এইরূপ :

‘যত মুসলমান ছিল এজিদ লঙ্করে ।

জার জার হৈয়া কান্দে এমাম খাতিরে ॥

শোকেতে কাতর হৈল যত মুসলমান ।

দেলেতে হইল খুসি যত কুফরান ॥’

এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা-ভাষায় একটি বেশ স্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। এই প্রভেদের মূলে অন্য যে কোন কারণ থাকুক, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের দূরত্ব ও নৈকট্য যে একটি প্রধান কারণ, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গের ভাষা রাজধানী পৌড়, রাজমহল বা মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করার ফলে, রাজভাষার আভ্যপ্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাল যাবৎ ঢাকায় মুঘল রাজধানী অবস্থিত থাকিলেও, এই সময়ে মুঘল শাসনকর্তৃগণ আহম, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকায়, পূর্ববঙ্গে রাজভাষার প্রভাব রাজশক্তির ন্যায় শিথিল ছিল। এই জন্যই পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষার রূপ অনেকখানি অবিকৃত। এই অবিকৃতি হিন্দু ও মুসলমান কবির হাতে সমানভাবে স্থান পাইয়াছে, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বিকৃত ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের হাতে সমানভাবে স্থান পায় নাই, তাহাও ভাবিবার কথা। এই সময়ের পশ্চিম-বঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষা যতটুকু ‘ষিচুড়ি’, হিন্দুর ভাষা ততখানি নয়। মুসলমানদের ভাষায় ‘ষিচুড়িত্ব’ অধিক মাত্রায়-ইহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-প্রসূত কল্পনার সাহায্যে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে বলিতে হয়, আজকাল যেমন ‘টেনুফিরঙ্গীরা’ বিশ্রী ইংরেজী বলিলেও তাহাদের ইংরেজীপ্রীতি-যে কারণেই হউক আমাদের চেয়ে একটু অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই আলোচ্যকাল অতিশয় স্বল্পসংখ্যক অভিজাতবংশীয় মুসলমানের কথা বাদ দিলেও, অপরাপর সকলশ্রেণীর পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের প্রীতি রাজভাষা ফারসী ও রাজকথ্যভাষা উর্দুর প্রতি-যে কারণেই হউক-পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের এহেন অত্যধিক উর্দু বা ফারসী-প্রীতির ফলে, এই সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার তাহার একটুখানি অধিকমাত্রায় ষিচুড়ি পাকাইয়াছেন। ইহাতে তাহাদের ভাষা স্থলে স্থলে যে উৎকট মূর্তি ধারণ করে নাই, সে কথাও, বলা যায় না। ঊনবিংশ শতকের বটতলার পুঁথিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই ভাষায় লেখকের কৃত্রিমতা যতখানি বেশী, স্বভাবিকতা ততটুকু কম। কেননা, বাঙ্গালার কোন অংশের মুসলমান বটতলার পুঁথির উৎকট ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানি না। কি কারণে এই ভাষা পুঁথিগুলিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার কোন কারণ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে, মূল হিন্দী ভাষাকে ফারসী অঙ্করে লিখিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ফারসী শব্দ সমাবেশে উত্তর-ভারতীয় মুসলমানেরা ইহা হইতে উর্দুর ন্যায় একটি কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে হইতে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকালের মধ্যে বাঙ্গালার মুসলমানগণও ফারসী বা আরবী অঙ্করে বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষা হইতে আর একটি কৃত্রিম

ভাষা-সৃষ্টির চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে মুসলিম শাসনের গৌরবময় যুগ হইতে হিন্দীকে উর্দু করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়া তথায় উর্দুর সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু, বাঙ্গালায় নবাবী আমলের নিতান্তই শোচনীয় অবস্থার সময়, বাঙ্গালা ভাষাতে ফারসী বা আরবী অক্ষর চালাইয়া ইহাকে ‘মুসলমানী’ করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হওয়ায়, বঙ্গে এ আরবী বা ফারসীকৃতির আন্দোলন বেশী দিন চলিল না। বলা বাহুল্য, বঙ্গের মেরুদণ্ডবিহীন মুসলিম শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে, এ আন্দোলন প্রতিহত হয়, এবং ক্রমেই তাহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।

বাঙ্গালা-ভাষাকে এইরূপ আরবী বা ফার্সী-কৃতির প্রচেষ্টায়ও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালাকে ফারসী অক্ষরে লিখিতেছিলেন, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগে তখন মুসলমানেরা বাঙ্গালাকে আরবী অক্ষরে লিখিতেছিলেন। আমাদের নিকট আরবী ও ফারসী অক্ষরে লিখিত কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে। আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে কোন হস্তলিপি দেড়শত বৎসরের উর্ধ্বকালের নহে। আবার ফারসী হস্তলিপিশুলির কাল আরও আধুনিক। পূর্ববঙ্গীয় পুঁথির ফারসী হস্তলিপির সংখ্যা দুই চারিটি, কিন্তু আরবী হস্তলিপির সংখ্যা বিস্তর। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, পশ্চিমবঙ্গের ফারসী-প্রীতির ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা (যেমন গরীবুল্লা, হামজা প্রভৃতি কবিগণ) মূল বাঙ্গালা-ভাষাকে যেমন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ফারসীকৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনই মূল বাঙ্গালা অক্ষরকেও ফারসী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি হামজা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ‘আমির হামজার কেছা’ রচনা করিতে গিয়া লিখিতেছিলেন,

‘কামেল ফাজেল লোগ যত কারিগর।
কেহ না করিল কবি আখেরি কেছার ॥
লোগের খাহেস দেখে ভাবি মনে মনে।
আখেরি শায়েরি পুঁথি হইবে কেমনে ॥’

তখন তাঁহার এই লিপিবদ্ধ করার জন্য বাঙ্গালা-হরফের চেয়ে ফারসী হরফ অধিক সুবিধাজনক ছিল, সন্দেহ নাই। এইজন্য তিনি যদি বাঙ্গালা বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া ফারসী বর্ণমালার সাহায্য লইয়া থাকেন, তাহতে কিছুই অন্যায় হয় নাই।

ঠিক এই সময়ে, পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগের, মুসলমানেরা কবি আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে ব্যবহৃত অপূর্ব সৌষ্ঠবশালী সংস্কৃত-প্রধান ভাষাকেও আরবী হরফে লিখিবার প্রয়াস পান। পদ্মাবতী কাব্যের—

‘আজানুলম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ ।
মহা অন্ধকারে যেন দৃষ্টি-পরাভব ॥
স্বর্গ হইতে আসিতে যাইতে মনোরথ ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহা শুদ্ধ পথ ॥’

প্রভৃতির ন্যায় ভাষাকে স্বল্প-সংখ্যক আরবী হরফে প্রকাশ করিতে হইলে তাহাতে লেখক, পাঠক ও ভাষার যে দুর্দশা ঘটবার সম্ভাবনা, তাহার ষোল আনা আরবী হরফে লেখা এই বাঙ্গালা পুঁথিগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময়ে অনেকেই এই পুঁথিগুলি বাঙ্গালা অঙ্করে লিখিয়াছিলেন ; নতুবা এই পুঁথিগুলির ভাল পাঠোদ্ধার হইত কি-না সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস, মুসলিম রাজশক্তির পতন, ব্যাপক চেষ্টার অভাব, ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধতা প্রভৃতি নানাকারণে বাঙ্গালা-ভাষাকে ফারসীকৃত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা এদেশে হয় নাই।

এইরূপ নানা সাময়িক ব্যাপার ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ কথার সৃষ্টির মূলে ক্রিয়া করিয়া থাকিবে। বাঙ্গালার মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার এক নগণ্য ও তুচ্ছ অংশবিশেষকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ নাম দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাও খুব সাবধান উক্তি নহে; কেননা, উপর্যুক্ত কারণে এই সময়ের হিন্দু সাহিত্যও ‘মুসলমানী’ সাহিত্যে জড়াইয়া যায়। এই বাঙ্গালাকে ‘মুসলমানী বাঙ্গালা’ না বলিয়া যদি ‘উর্দুকৃত বাঙ্গালা’ বলা যায়, তবে কতকটা সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। আমাদের মতে এইরূপ কোন নাম দেওয়াই সমীচীন নহে। বাঙ্গালা ভাষার প্রগতির ইতিহাসে ইহা একটি স্তর মাত্র। যদি একান্তই এই স্তরটির নাম দিতে হয়, ইহাকে উর্দু স্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না; কেননা উর্দুর সঙ্গে ফারসী, আরবী ও হিন্দী মিশ্রিত আছে।

(লেখকের জন্ম : ১৯০৬, বখতপুর, ফটিক ছড়ি চট্টগ্রাম এবং মৃত্যু ১৯৮২)

বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি : দেশীয় দালাল শ্রেণীর উত্থান

ড. কাজী আবদুল মান্নান



সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পরিতুষ্ট করে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বর প্রার্থনা করেছিল, পাক-ভারত উপমহাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার। বাঙালী কবির কাব্যে, সেবায় সন্তুষ্ট দেবীর কাছে ভক্ত বর প্রার্থনা করেছিল, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’। বলা বাহুল্য, তাদের উভয়েরই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল; কিন্তু কালের কুটিল চক্রে একজনের সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় আর একজনের ব্যর্থ কামনা মাথা কুটে মরেছে। স্বর্গের ঈশ্বরী বাঙালীকে যা দিতে পারেননি, দিগ্বীশ্বর ইংরেজকে তার চেয়ে ঢের বেশী দিতে পেরেছিলেন। ঢাকাই মসলিন থেকে বনের খড় পর্যন্ত সব রকম পণ্যের অবাধ ব্যবসা, স্যার টমাস রো-এর বংশধরদের দিয়েছে অপরিাপ্ত সম্পৎ, ইংলণ্ডে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরাট কল-কারখানা, ইংরেজ সন্তানের জন্য গড়ে উঠেছে ‘দুধে ভাতে’ থাকার নিশ্চিত ব্যবস্থা।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা দেশে ব্যবসা শুরু করে। তারা ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এবং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় কুঠি স্থাপন করে। সম্রাটের কৃপায় কোম্পানী বিনা শুষ্কে বাণিজ্য করার যে পরোয়ানা লাভ করে, ইতিহাসে তা ‘দস্তক’ নামে পরিচিত। এই ‘দস্তক’ বাঙালীর জীবনে এক মর্মান্তিক অভিশাপে পরিণত হয়। এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতিতে ‘দস্তক’ের প্রভাব অপরিসীম। পাক-ভারত উপমহাদেশে সামন্ততন্ত্রের স্বর্ণযুগে যে নতুন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তার প্রাথমিক আশ্রয় ছিল কৃপা এবং করুণা; কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল সম্পৎ এবং সমৃদ্ধি। কাজেই এদেশের ভূমির চেয়ে ভূমিতে উৎপন্ন পণ্যের দিকেই তারা প্রথমে তাদের লুক্ক বাহু বিস্তার করেছিল। কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা রক্ষা করার কোন বালাই ছিল না। পলাশী-যুদ্ধের বহু আগে থেকেই তারা ‘দস্তক’ের অপব্যবহার শুরু করে এবং নানা রকম দুর্নীতির প্রবর্তন করে; ফলে, দেশের ব্যবসায়ের, কৃষক সম্প্রদায়ের ও সরকারী রাজস্বের ক্ষতি হতে থাকে। দেশের অর্থনীতির উপর বিদেশী বণিকের ক্রমবর্ধমান দৌরাণ্ড্য, কোন শাসকের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গেও কোম্পানীর মনোমালিন্য দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীন সামন্ত-শাসনের অবসান ঘটে।

পলাশী-যুদ্ধের পর কোম্পানী এবং তার সহচররা বাঙলা দেশে যা শুরু করে, তাকে বাণিজ্য না ব'লে লুণ্ঠন বললেই সত্য বলা হয়। পলাশী-যুদ্ধের নায়ক ক্লাইভ আওয়াজ তোলেন— 'সময় নষ্ট করা চলবে না; টাকা চাই,— আরও টাকা'। শুধু ব্যবসার দ্বারাই নয়, ক্লাইভ এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ যে-কোন উপায়ে সম্পৎশালী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভীত ও সন্ত্রস্ত জমিদার এবং জনসাধারণের কাছ থেকে তারা বিপুল পরিমাণে ঘুষ আদায় করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা ব্যক্তিগতভাবে এদেশের লোকের কাছ থেকে যে-ঘুষ আদায় করে, তার একটি অভ্যস্ত অসম্পূর্ণ হিসাবেই পাঁচ কোটি টাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পলাশী-যুদ্ধের মাত্র এক বছরের মধ্যেই 'দস্তক' নিয়ে দুর্নীতি এত বেড়ে যায় যে, কোম্পানীর ডিরেক্টররা পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ-দেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে সব রকম বাধা-নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং আফিম, তামাক, চিনি, চাল, লবণ, ঘি, মাছ, বাঁশ, ঋড় প্রভৃতি সংখ্যাভীত ছোট বড় পণ্যের ব্যবসা একচেটে করে ফেলে। এতে দেশের ব্যবসায়ী, কারিগর এবং চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয় এবং প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এ-সব কারণেই নবাব মীর কাসিমের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাসিমের পতনের পর তাদের সামনে শেষ বাধাটুকুও অপসৃত হয়। যত শীঘ্র সম্ভব বাঙলার সম্পৎ লুণ্ঠন করে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেওয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোম্পানীর কলেবর ও তার কর্মচারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা টাকা সংগ্রহের কাজে লেগে পড়ে। সীমাতীত অর্থলিপ্সার ফলে তারা সব রকম বিচার, বিবেচনা, এমন কি লজ্জা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে কোম্পানী বাঙালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। এর দ্বারা টাকা সংগ্রহের আর একটি প্রশস্ত পথ তাদের সামনে খুলে যায় এবং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা তাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের মত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও তাদের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় টাকা। কি ক'রে বেশী কর আদায় করা যায়, সেইটেই হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রধান লক্ষ্য। কোম্পানী খাজনা আদায়ের জন্য যে-সব দেশী কর্মচারী নিযুক্ত করে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রত্যেক বছর নতুন নতুন 'আমিল', 'ইজারাদার' প্রভৃতি নিযুক্ত ক'রে, খাজনা আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়। প্রজার কাছ থেকে জমির খাজনা ছাড়াও নানা রকম 'আবওয়াব' বা বে-আইনী সেস আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্মম শোষণের ফলেই ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে

(বাঙলা ১১৭৬ সালে), দেশ জুড়ে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ‘হিয়ান্তরের-মবন্তর’ নামে পরিচিত। এর ফলে বাঙালা দেশের প্রায় দেড় কোটি লোক মারা যায়, ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলি জঙ্গলে পরিণত হয় এবং দেশের এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে; কিন্তু দেশের এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কালেও খাজনা আদায় বেড়ে যায়। এ সময় কোম্পানী ‘নাজাই কর’ নামে এক ধরনের খাজনা প্রবর্তন করে। তাতে যে-সব প্রজা দুর্ভিক্ষে মারা গেছে বা গ্রাম ছেড়ে পাগিয়ে গেছে, তাদের দেয় খাজনা আদায় করা হয়, যারা বেঁচে আছে তাদের কাছ থেকে; ফলে, দুর্ভিক্ষের পরের বছর দুর্ভিক্ষের আগের বছরের চেয়ে বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হয়।

মুঘল-আমলে বাঙলা দেশের যে ভূমি-ব্যবস্থা ছিল তারই উপর ভিত্তি করে মুর্শিদকুলী খাঁ বড় বড় জমিদারের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁরাই ছিলেন বাঙলার গ্রামাঞ্চলের শাসক। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এঁদের ছিল সুদীর্ঘ কালের সংযোগ। কিন্তু কোম্পানীর অর্থলিঙ্গা চরিতার্থ করার কাজে এঁরা অযোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় ভূমি-ব্যবস্থায় নানা রকম পরিবর্তন করা হয়। বড় বড় জমিদারী নিলামে তুলে দেওয়া হয় এবং নগদ টাকার বিনিময়ে তা ছোট ছোট আকারে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এভাবে এক নতুন ভূস্বামী-শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জমির মালিকানা স্বত্ব কৃষকের হাত থেকে ছিনিয়ে এই নতুন জমিদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরাই হলেন কোম্পানী-শাসনের বিশ্বস্ত দেশী-অনুচর। একটির পর একটি নতুন আইন করে এঁদের হাত শক্ত করা হয়। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস ‘হুগুম আইন’ প্রবর্তন করে প্রজাদের উপর জমিদারের অত্যাচার করার বিশেষ সুযোগ করে দেন। এই আইনের সাহায্যে জমিদাররা যে-সব অত্যাচার করতেন, প্রজারা তার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করতো। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ‘পঞ্চম আইনে’ সে অধিকার হরণ করে জমিদার বা তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা নিষিদ্ধ হয়। এবারে কোম্পানী দেশের লাখেরাজ সম্পত্তিগুলি হস্তগত করার দিকে মনোযোগ দেয়। অবশ্য ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সেদিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিচার ও শাসন বিভাগের যুক্ত প্রচেষ্টায় Resumption proceedings-এর কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করে, নানা রকম মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে, গুপ্তচর নিযুক্ত করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করে একের পর এক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ ভূস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিষ্কর ভূমির আয়ের উপর

নির্ভর করেই চলতো। এর ফলে সেগুলো নষ্ট হয়। দেশের শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞসমাজ তাঁদের মর্যাদা ও জীবিকার অবলম্বন হারিয়ে ফেলেন এবং ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হন।

১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডব্লিউ এ্যাডাম বাঙলা-বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সরঞ্জামে তদন্ত করে তদানীন্তন সরকারের কাছে তিনটি বিস্তৃত রিপোর্ট দাখিল করেন। দেশের অগণিত গ্রামে যে অসংখ্য আরবী-ফারসী মাদ্রাসা, সংস্কৃত টোল এবং বাঙলা পাঠশালা ছিল তা ভেঙ্গে পড়ার করণ ও মর্যাস্তিক চিত্র ঐ সব রিপোর্টের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় জমিদারের অবস্থা বিপর্যয়ের দরুন, দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকে। কিন্তু শিক্ষার প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা ও আগ্রহের ফলে, মধ্যবিত্তরা সমবায় ভিত্তিতে নিজেদের গ্রামে শিক্ষায়তনগুলি চালু রাখার চেষ্টা করে। পরিশেষে প্রতিষ্ঠানের অভাবে গৃহস্থেরা বাড়িতে শিক্ষক রেখে নিজের এবং প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্যবসার নামে কোম্পানীর নির্মম লুণ্ঠন এবং শাসনের নামে নিত্য নতুন খাজনা ও আবণ্ড্যাবের ভারে এ দেশের সম্পন্ন গৃহস্থ ক্ষেত-মজুরে এবং ক্ষেত-মজুর ও কারিগররা দীন দরিদ্রে পরিণত হয়। দেশে প্রচলিত শিক্ষার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়। অজ্ঞতার তিমিরে আচ্ছন্ন, নিরন্ন বুড়ুস্কু মানুষ, পশুর-জীবন যাপন করতে থাকে এবং তারা জীবনের সমস্ত মহৎ তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। বাঙলা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে, ডব্লিউ এ্যাডাম এই দরিদ্র ও অধঃপতিত মানুষের দুর্গতি দেখে, বিস্ময়ে ও বেদনায় অভিভূত হয়েছেন।

বাঙলা দেশের শহরগুলিতে যে অল্প সংখ্যক ফারসীনবীশ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কাজ করে টিকে ছিলেন, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ভাষা পরিবর্তনের ফলে, তাঁরাও জীবিকার অবলম্বন হারিয়ে ফেলেন। এভাবে উনিশ শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যেই, বাঙলার পণ্য বিদেশী শাসকের সীমাভীত ক্ষুধার ইন্ধনে পরিণত হয়; দেশের ভূমি এবং কৃষক তাদের শোষণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়; দেশের বনেদী সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধিজীবী-সমাজ বেকার ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এই ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে প্রবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

২

বাঙলা দেশের মানুষ, ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার রীতিকে, কোনদিনই নির্বিবাদে মেনে নিতে চায়নি। গোড়া থেকেই তারা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে

এসেছে। অনেকের মতে নবাব মীর কাসিমই বাঙলা তথা পাক-ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত। আসলে কোম্পানী এদেশে যে-ভাবে তাদের শাসন প্রবর্তিত করে, তাতে পুরানো ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, কারিগর এবং কৃষকরা অতি দ্রুত ও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কাজেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই, মাঝে মাঝে স্থান বিশেষে সজ্জবদ্ধ হওয়ার এবং সরকার ও তার অনুচরদের অত্যাচারকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অষ্টাদশ শতকেই ছোট বড় নানা আকারের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেশে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, শান্তিপুরের তাঁতীদের বিদ্রোহ, মেদেনীপুরে মলঙ্গীদের অসহযোগিতা ও ‘চোয়াড়-বিদ্রোহ’। কোম্পানীর এজেন্ট দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুর ও দিনাজপুরে ‘কৃষক-বিদ্রোহ’। বাঁকুড়ায় ‘প্রজা-বিদ্রোহ’ এবং উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকীরদের হাঙ্গামায় জনসাধারণের সহযোগিতা। উনিশ শতকে এ-ধরনের বিদ্রোহ অধিকতর ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিঁতুমীরের নেতৃত্বে ওহাবীদের বিদ্রোহ হয় এবং সরকারী ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর অঞ্চলে ‘পাগল-পন্থীদের’ বিদ্রোহ হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে করম শাহ নামে এক দরবেশ শেরপুর অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সাম্য-মৈত্রীর বাণী প্রচার করেন। এই দরবেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু পিতার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক, বিশেষ করে গারো পাহাড়ের হাজংরা, তাঁর নেতৃত্বে সজ্জবদ্ধ হয় এবং স্থানীয় জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের আক্রমণ করে। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকারকে সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করতে হয়। টিপুকে সাধারণ লোকে পাগল বলতো এবং তাঁর শিষ্যেরা ‘পাগল-পন্থী’ নামে পরিচিত ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহ-এর নেতৃত্বে ‘ফরায়িজী’ আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন পূর্ব-বাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শরীয়তুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ‘ফরায়িজী আন্দোলনকে’ আরও ব্যাপক ও সংহত করেন। দীর্ঘকাল তিনি অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘সিপাহী বিদ্রোহের’ সময় সরকার তাঁকে কারাবদ্ধ করে রাখে। এ সব বিদ্রোহের মেঘ-খণ্ডই হয়তো ‘সিপাহী বিদ্রোহের’ মহাঝটিকায় বিরাট আকার ধারণ করেছিল। এ-বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতি স্বয়ং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এ-বিদ্রোহ যে পাক-ভারত উপমহাদেশের মানুষের এক বিরাট ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রকৃতপক্ষে পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে মেকলেই প্রবর্তন করেন। শিক্ষা বিস্তারের ফলে ইংরেজরা এমেরিকায় তাদের সাম্রাজ্য হারিয়েছিল কাজেই তিনি এ দেশে শিক্ষাকে শুধু কঠোরভাবে সীমাবদ্ধই করতে চান নি তার দ্বারা একটি ইংরেজ-ভক্ত সমাজ সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করতেও চেয়েছিলেন। উপরোক্ত মন্তব্যে মেকলে স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ‘আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।’

অষ্টাদশ শতকে গ্রাম-বাঙলার অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয় এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সে ধ্বংস-পর্ব সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু, ইতিমধ্যেই এক নতুন অর্থনীতি এবং তাকে আশ্রয় করে এক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ী, জমিদার ও চাকরিজীবী- মূলত এই তিন শ্রেণীর মানুষ, কোলকাতা ও অন্যান্য শহরকে কেন্দ্র করে এই সমাজ গড়ে তোলেন। এঁরা বুদ্ধিমান, বিত্তবান, স্বার্থ-সচেতন ও পরাশ্রয়ী হিন্দু-সম্প্রদায়। এ সমাজের অঙ্কুর বাদশাহী আমলে উদগত হয়েছিল; তবে এর বিকাশ হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানীগুলির, বিশেষ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে সহযোগিতার দ্বারা।

বাদশাহী আমল থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং টাকা-কড়ি লেনদেনের কাজ হিন্দুদের মধ্যেই প্রায় একচেটে ছিল। সপ্তদশ শতকে মানরিক, থিবনট প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক এ-দেশের যে-সব বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি বড় শহরে, ব্যবসার ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিপুল প্রাধান্য দেখা যায়। বাঙলা দেশেও ব্যবসা এবং টাকা কড়ি লেনদেনের কাজ হিন্দুদের হাতেই ছিল। ধর্মে সুদের কারবার নিষিদ্ধ হওয়ার জন্যই হয়তো মুসলমানরা টাকার বাজারে (Money market) প্রবেশ করেনি। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে (১৬০৮-১৬২৫) আলাউদ্দীন ইস্পাহানী তাঁর ‘বাহারিস্তান-ই-গায়িবী’ নামক গ্রন্থে বাঙলা দেশের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে ব্যবসা ও হিসাবপত্র সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে, হিন্দুদের প্রাধান্য দেখা যায়। হিসাব পত্রের ব্যাপারে মুসলমানরা হিন্দু কর্মচারীদের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। বাঙলার অর্থনীতিতে মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবারের প্রভাব সুবিদিত। সপ্তদশ শতকে তাঁরা ছিলেন দেশের ব্যাঙ্ক বিশেষ। এমনকি বাঙলার নবাবও টাকার ব্যাপারে তাঁদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। (আর. কে. মুখার্জী: দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ১৬০০-১৮০০)

বাঙলা দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার সূচনা থেকেই হিন্দু-ব্যবসায়ীরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। নবাবী আমলেই শেঠ ও বসাকরা সুতানটিতে ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণে থেকে কোম্পানীর দাদনী ও দালালী করেন। বৈশ্যরা কোম্পানীর বেনিয়াগিরি করে সমৃদ্ধি অর্জন করেন। পলাশী যুদ্ধের অনেক আগেই উমিচাঁদ, গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক লক্ষীকান্ত প্রভৃতি ব্যবসায়ী কোম্পানীর দাদনী ও দালালী করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ‘দস্তক’ নিয়ে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে দেশী কর্মচারীরাও দুর্নীতি শুরু করে। এ-দেশের কৃষক ও কারিগরদের প্রবঞ্চিত করে যে-সব ব্যাপারী কোম্পানীর এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের তহবিল বাড়িয়েছিল, তারাও ছিল প্রধানত হিন্দু। এ ভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এক দল হিন্দুর স্বার্থ অভিন্ন হয়ে পড়ে এবং ইংরেজ এ দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক শ্রেণীর বিশ্বস্ত বন্ধু লাভ করে। এ সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এম. এন. রায় বলেছেন : ‘It is a historical fact that a very large section of the Hindu Community welcomed the advent of the English power.’

[এটা ঐতিহাসিক সত্য যে হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশ এ-দেশে ইংরেজ-শক্তির আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা জানায়।] (এম. এন. রায় : ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন)

পলাশীর যুদ্ধের পর দেশে কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ব্যবসায়ী ও কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এ-কালে কোম্পানী ‘অসং উপায়ে ধন-সঞ্চয় করার সীমাতীত লোভ’ নিয়ে, বাঙলা দেশে বাণিজ্যের নামে যে লুটের রাজত্ব শুরু করে, তার সহায় হয়ে দাঁড়ায় দেশী গোমস্তারা। কোম্পানীর সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে এই ভাগ্যান্বেষীর দল বিপুল অর্থের অধিকারী হয় এবং এরাই পরে এক একটি ক্ষুদে রাজা-মহারাজায় পরিণত হয়। [এন. কে. সিনহা : ওপিসিআইটি’, পৃষ্ঠা ৭৪]

উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী হিন্দুরাও অনেকে ইংরেজের বেনিয়াগিরি করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। গোকুল ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জী, অত্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জী, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মহারাজ নবকৃষ্ণ, জয়নারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী হিন্দু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খ্যাতিনামা ধনী বলে পরিগণিত হন। এঁরা কোম্পানীর সহযোগিতায় চাউল, কাপড়, তামাক, আফিম, গালা প্রভৃতি অসংখ্য পণ্যের ব্যবসা করে সম্পৎশালী হন। অষ্টাদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বহু বাঙালী হিন্দু বড় বড় ব্যবসা শুরু করেন এবং নগণ্য অবস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী হন। তাঁদের সঞ্চিত টাকা উৎপাদন-ব্যবস্থায় খাটানোর পথটি প্রশস্ত ছিল না। দেশী ধনীরা ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুক এটা কোম্পানী বরদাস্ত

করতে চায়নি। ফলে, তাদের সামনে ক্রমেই নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে থাকে। তবে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাদের টাকা খাটানোর একটি নতুন পথ খুলে দেন। এভাবে কোলকাতার হিন্দু বেনিয়া-সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়। এদেরই বংশধরেরা কোলকাতায় বাবু নামে পরিচিত হন। এই বাবু সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা কত বিচিত্র পন্থায় টাকা রোজগার করেছিলেন, তার একটি কৌতুকপূর্ণ বিবরণ ভবানীচরণ ‘নববাবু বিলাস’ পুস্তিকায় দিয়েছেন : ‘ইংরেজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন, এই কলিকাতা নামক মহানগরে আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারী চৌকিদারী জুয়াচুরি পোন্ধরী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপাত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্জন করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিম্বা জমিদারী ক্রয়াদীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।’ আর এসব করে তাঁরা যে টাকা সঞ্চয় করেন, তার পরিমাণ বিস্ময়কর। ‘হুতোম পাঁচাচার নকশা’য় কোন এক বাবুর প্রপিতামহের ‘নিমকের দেওয়ান’ হিসাবে অর্থ-সঞ্চয়ের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে : ‘বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন।’

ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা সূত্রে ‘বনেদী বড় মানুষ’ হওয়ার গরজেই বাঙালী হিন্দু ইংরেজী-ভাষার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ মিত্র, জয়নারায়ণ ঘোষ, মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রভৃতি কোম্পানীর বেনিয়ারাই প্রথম ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ বাঙালী। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে তারিখের ‘সমাচার চন্দ্রিকায়’ বলা হয় : ‘পূর্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম সুসম্পন্ন পূর্বক বহু ধনোপার্জন করিয়াছিলেন, ইহাতে ইংরেজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকার মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন।’

ইংরেজী শিখে, ইংরেজকে তুষ্ট করে ‘নানাপ্রকার মর্যাদা’ লাভ করার সুযোগ উপস্থিত হওয়ার সূচনা থেকেই হিন্দুরা ‘ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস’ শুরু করেন। বাঙলা দেশে ইংরেজ-শাসনের প্রথম পর্বে ইংরেজী-শিক্ষাকে হিন্দুরা তাঁদের উন্নতির প্রশস্ত পন্থা বলে জ্ঞান করতেন। তাঁদের কাছে চাকরি, বিস্তৃত প্রতিপত্তি লাভের একটি সহজ উপায় ছিল ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা। কাজেই শহর এবং শহরতলির মধ্যবিস্তৃত সমাজ তাদের জীবিকার উপায় হিসাবে ইংরেজী শিখবার জন্য

ব্যস্ত হয়ে পড়েন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজী শেখার আগ্রহ, শহর ছেড়ে গ্রামের মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্টে সি. ই. ট্রেভেলিন গঙ্গার উপর স্টীমার যাত্রী ইংরেজদের কাছে ছেলেদের ইংরেজী বই ভিক্ষা করার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন— ‘একবার কয়েকজন ইংরেজ ভদ্রলোক স্টীমারে কলকাতা ফিরছিলেন, পথে ‘Comercolly’ (কুমারখালি?) থেকে এক দঙ্গল ছেলে স্টীমারে উঠে বই-এর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। টেবিলের উপর প্লাটোর রচনাবলী ছিল একখণ্ড। জনৈক ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, এতে চলবে? ছেলেরা উত্তর করলো, নিশ্চয়, নিশ্চয়; যে কোন বইতেই চলবে; শুধু চাই একটি বই। ভদ্রলোক শেষটায় খুব বুদ্ধি করে কোয়ার্টার্লি রিভিউ থেকে একটি একটি পাতা ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করে নিষ্কৃতি লাভ করেন।’

সেদিনের বলদৃষ্ট ইংরেজের প্রতি বাঙালী হিন্দুর জেগেছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং তাঁরা শ্রদ্ধাপুত চিন্তে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজী শিখতে। সরকার কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অনেক আগে থেকেই মিশনারি ও উদারচিন্ত ইংরেজদের সহায়তায় এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের উদ্যমে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ও এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট-এর পরামর্শক্রমে হিন্দু সমাজপতিদের দ্বারা কোলকাতায় ‘হিন্দু কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ঐ কলেজের ছাত্র তৈরীর জন্য তাঁরা কোলকাতায় ‘ইউনিয়ন স্কুল’, ‘খিদিরপুর স্কুল’, ‘শোভাবাজার স্কুল’, ‘হিন্দু ফ্রি-স্কুল’ প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

(লেখক: সাবেক অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

আধুনিক কাব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মডার্ন বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্নস্ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিল। যথা, ওয়ার্ডস স্বার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস্।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহার-রীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতাদুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটা-ভিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্নসের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। ‘কুমুদকলোরসেবিত সরোবর’ হচ্ছে সাধু-কারখানার তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে বুলি সরিয়ে পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে করে সরোবর নানা দৃষ্টিতে, নানা খেলালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে ‘ধিক্’।

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। এডেনবরা রিভিযুতে যে তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে, ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড স্বার্থ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ

করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্র্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীটসের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাক ফিরিয়েছিল।

কবিচিন্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র করে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরূপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কার্ঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিদ্যে। যে দাম্পত্য সংসার রচনা করতে তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাক্ত-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন করে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংগুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা, নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা, তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম-বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ড্‌ স্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্‌-স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে সেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথেয়। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারা মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়, সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেরও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সম্বন্ধে জাগিয়ে রাখতে হয়, সে যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তী-কালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাক ফিরিয়ে-ছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্য-ভিত্তিক প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরামকেন্দ্রীয় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা-কাপড় ছাঁটা-চুলের ঝটখটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ভত অসংকোচে। বলতে চায়, মোহ জিনিসটাকে আর কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ, সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে দেখেছে; বলছে, মূল মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়ার বিস্তার করে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তাই ঈশ্বর বাস্তবের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখিছি, নববধূর মতো তা সঙ্কল্প। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃশব্দ হতে হয় না।

কিন্তু আধুনিক কালের মনের মধ্যে তড়াহড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু করে কাজ, হুড়মুড় করে আমোদ-প্রমোদ। যে মানুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার করে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া করে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায় ‘মারো ঠেলা হেঁইরো’। জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়স্বন্ধের জগতে নয়। তার চিন্তাবৃষ্টিটা ব্যস্তবাগীশের চিন্তাবৃষ্টি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা-কিছু আছে তাকে আছে বলেই মনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আশ্রয়ে তাকে সাজিয়ে তোলে না।

এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধবন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিকমত কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। হৃন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি ঢুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রুঢ় কুশী ভাবে ভাঙা কাচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন : I am the greatest laugher of all- বলেছেন, আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে Than the frog and Apollo-এটা হল ভাঙা কাচ। পাছে কেউ মনে করে, কবি মিঠে করে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না বলে যদি বলা হত সমুদ্র তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত, এটা দন্তুরমত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটোছাঁদের দন্তুরমত কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয় এ কথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ অ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমি ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন কি, যথাস্থানে কবিশ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্‌-হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে, শ্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু অতি বড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে হাসি সূর্যের, যে হাসি ওক-বনস্পতির যে হাসি অ্যাপলোর, সে হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর করে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখাতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে, সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। ‘দ্রাণেন অর্ধভোজনং’ বললে প্রায় বারো আনা অতুষ্কি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে-কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা করে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না। -

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি-

যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর

বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।

কিন্তু তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়

যেন রেশমের আসবার, তাতে রোদ পড়েছে।

তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের

ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।

তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,

ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘঁষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।

তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো—

তোমার ঐ মিলেমিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে

আমার মন ওঠে মেতে।

আর আমার তেজ যেন টাকশালের নতুন পয়সা

তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।

ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,

তার ঝক্‌ঝকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম, কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট টং করে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেক কালের যে মাধুরী, তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, ‘অয়মহং ভোঃ! আমাকে দেখো।’ ঐ মেয়ে-কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটি জুতোর মালা like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটিজুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদদার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, ‘মানে কী হল মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হুন্সা কিসের, না হয় হলই বা তার রঙ লাল।’ উত্তরে বলতে হয়, ‘চেয়েই দেখা-না’। ‘দেখে লাভ কী।’ তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (aesthetics) সম্বন্ধে এজ্জরা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে; একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেরে; সে থাকতে পাল না, বলে উঠল, 'দেখ চেয়ে রে, কী সুন্দর!' এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ভিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাজ্রে ওরা দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্।' তখন সে সেই সাজানো মাঝগলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে ভুঙির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর।' কবি বলছেন, শুনে I was mildly adashed।

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সাতিন মাছকেও, একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না 'কী সুন্দর'। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক-নিছক দেখা, এর পংক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজায়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যথার্থ্য।। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেস্টারকে, অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে বলেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, গুয়োরকে অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর; কেউ কাজের, কেউ অকাজের; কিন্তু সৃষ্টি ক্ষেত্রে কোনো ছুঁতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে চিত্রকলাতেও সেইরকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর কোনো জবাবদিহি নেই; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সম্ভার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জ্ঞাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাহ্যবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এটা-রকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখছেন—

এ ঘরে ও ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।

এখন ছ'টা—

ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।

বাদলের হাওয়া পায়ের কাজে উড়িয়ে আনে

পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুকনো পাতা

আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।

ভাঙা শার্সি আর চিমনির চোঙের উপর

বৃষ্টির ঝাপট লাগে,

আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া—

ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,

চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,

কখনো কিম্বছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে

হাজার খেলো খেয়ালের ছবি

যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই—

His soul stretched tight across the skies

That fade behind a city block,

Or trampled by insistent feet

At four and five and six o'clock ;

And short square fingers stuffing pipes,

And evening newspapers, and eyes

Assured of certain certainties,

The conscience of a blackend street

Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনা-ওয়ালা
নিতান্ত খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জ্বাভের ছবি
জাগল। বললেন—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling ;
The notion of some infinitely gentle
Infenitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাণ্ডের মিল আর টিকল না।

এইখানে কৃপমণ্ডকের মকমক্ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার
প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই
কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।

দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো

ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরাটি স্পষ্টই দেখা যায়।

সাবেক কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙির স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে
ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে
হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না করে। কাদার উপর
অনুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে,
মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো
ভালোই, যদি নাও ফোটে তা হলে ব্যাণ্ডের লক্ষমান অট্টহাস্যটাকে উপেক্ষা করবার
প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে—এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও
কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার
বৈঠকখানায় ঐ ব্যাণ্ডটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার
বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের
নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থটাকে রোম্যান্টিক বলা যায়। সদ্যজাগা চৈতন্য বাইরে
নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বস্থিতিতে এবং নিজের রচনায় নিজের
চিন্তাকে নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া
দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে তাকে, সংসারের
আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে অনাবৃত
আকাশে পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন

কবি ভিন্ন রকম করে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে একে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে, কেউ-বা একে এমন অশ্রদ্ধা করে যে এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুষ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে আকৃতি তারও অন্তরে কেউ-বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে, মনে করে না গূঢ় ব'লে কিছুই নেই, মনে করে না যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত যুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ এত নির্ভুর হয়েছিল, তার বহুগুণপ্রচলিত যত-কিছু আদব ও আক্রে তা সাংঘাতিক সংকটে মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল, দীর্ঘকাল যে সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস করে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে-সকল শোভনরীতি কল্যাণ-নীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল- বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিন্তাবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিন্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তালচৌকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইনফুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইনফুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে, আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই ঝাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিন্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিন্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাস্ত্রতভাবে আধুনিক।

কিন্তু একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত্ত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।

প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।

যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—

সে জগৎ কোনো মানুষের না।

পীচ গাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর-একটা ছবি-

নীল জল... নির্মল চাঁদ,

চাঁদের আলোতে সাদা সারস উঠে চলেছে।

ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল-

তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর-একটা-

নগ্নদেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।

এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।

টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,

পাইনগাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে

আমার খালি মাথার' পরে।

একটি বধূর কথা-

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।

আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।

তুমি এলে আমার খ্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে

কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।

চাঁৎকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।

আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।

তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।

এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,

অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট করে,

তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।

পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুরকুটি গেল ঘুচে

আমি হাসলুম।

আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে-

চুটিগাছের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের টিবির ভিতর দিয়ে।

পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।

আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,

সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল-

সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।

অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।

এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো

আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায়
মান হয়ে।

ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে ভূমি ফিরবে

আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।

চাংফেংশার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার' পরে বিদ্রূপ বা অবিস্থাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা 'আধুনিক' হত। কেননা সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনই লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে। এই প্রশ্নের উত্তরে দেড় লাইন ভরে ফুটকি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো হয়েই থাকে।' 'অন্যটাও তো হয়।' 'হয় বটে কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকেলে কাব্যের বাবুগিরি ছিল সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিন্তা যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিতৃষ্ণভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে; বলে, আসল জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই: বুড়ি মারা গেল— সে বড়োঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলি-গুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমত সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো খানসামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে। ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো

লেখায় যদি পাই তা হলে বলব এ খবরটা দেবার মতো বটে, কিন্তু তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি ডেক্সিস্ট এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে, কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয় আগেকার কবির বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে ; ঐরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, ঐরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে ঐদের কেউ বদনাম দেয় যে ঐদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপঙ্খীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপঙ্খীর সাধনা যদি প্রচলিত হয় তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যায় কোথায়। কোনো কোনো পাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক পাছে না-প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়া-কেই কি বাস্তব সাধনা বলে বাহাদুরি করতে হবে। একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন—

রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত।
ছিপ্ ছিপে, যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন ‘গুড মর্নিং’ আমাদের নাড়ী উঠত
চঞ্চল হয়ে।

চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু ঐর চোখে পড়ত, মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পাতায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে—
এমনসময় একদিন শান্ত বসন্তের রাতে

রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চলিয়ে দিলেন এক গুলি ।

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে উপবাসী। যারা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। যুরোপীয় সন্ন্যাসী-উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন করে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরঞ্জের কদর্য সমাবেশ সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চটকা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে, সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া— এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে-ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিভ্রঙ্ক স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অতৃপ্তি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজেই অসারতাকে দূর করতে চায়, গঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে, লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ করে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিত্তিকীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান করে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আত্ম শ্রুতিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেন্টালিজম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিত্তিকীয় যুগকে যদি অতিভদ্রমানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাস্ত্রত নয়। সায়াঙ্গেই বল আর আর্টেই বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; যুরোপ সায়াঙ্গে সেটা পেয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

(লেখাটি ১৩৩৯ বৈশাখ প্রথম প্রকাশিত)

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ

কাজী নজরুল ইসলাম



তখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদী। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটনা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে ডাইনী বলে ফেলেছিলাম।... এর মধ্যে একদিন এসিস্ট্যান্ট জেলার এসে খবর দিলেন—আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, আপনাকে রবি ঠাকুর তাঁর ‘বসন্ত’ নাটক উৎসর্গ করেছেন।

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু’একটি কাব্য-বাতিকগ্রস্ত রাজ-কয়েদী। আমার চেয়েও বেশী হেসেছিলেন সেদিন তাঁরা। আনন্দে নয়, যা নয় তাই শুনে।

কিন্তু ঐ আজগুबी গল্পও সত্য হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যি সত্যিই আমার ললাটে ‘অলক্ষণের তিলক-রেখা’ এঁকে দিলেন।

অলক্ষণের তিলক-রেখাই বটে! কারণ এর পর থেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ রাজবন্দী বন্ধুরাও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। যারা এতদিন আমার এক লেখাকে দশবার করে প্রশংসা করেছেন, তাঁরাই পরে সেই লেখার পনর বার করে নিন্দা করলেন। আমার হয়ে গেল বরে শাপ!

জেলের ভিতর থেকেই শুনেতে পেলাম, বাইরেও একটা বিপুল ঈর্ষা-সিদ্ধি ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস হ’ল না। বিশেষ করে যখন শুনলাম, আমরা অগ্রজপ্রতিম কোন কবিবন্ধু সেই সিদ্ধি-মহুনের অসুর-পক্ষ লীড করছেন। আমার প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অপরিণীম ভালবাসার কথা শুধু যে আমরা দু’জনেই জানতাম তা নয়, দেশের সকলেই জানত তাঁর গদ্যে-পদ্যে কীর্তিত আমার মহিমা-গানের ঘটনা দেখে।

সত্য-সুন্দরের পূজারী বলে যারা হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বেড়ান, তাঁদের মনও ঈর্ষায় কালো হয়ে ওঠে, শুনলে আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকে না।

এ খবর শুনে চোখের জল আমার চোখেই শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম শুধু আমি—বাইরের এই লাভে অন্তরের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল আমার। মনে মনে কেঁদে বললাম, হায় গুরুদেব! কেন আমার এত বড় ক্ষতিটা করলে!

বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয়-মন দিয়ে,

যেমন ক'রে ভক্ত তার ইষ্টদেবকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল-চন্দন দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা করেছি। এ নিয়ে কত লোকে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন।

এমন কি, আমার এই ভক্তির নির্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্যেশী কোন একজনের মাথার চাঁদিতে আজও অক্ষয় হয়ে লেখা আছে এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্মাধিকরণের ওপরেই পড়েছিল।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কথাশিল্পী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একদিন কবির সামনেই এ কথা ফাঁস করে দিলেন। কবি হেসে বললেন, যাক, আমার আর ভয় নেই তাহলে।

তারপর কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে। নিজের লেখা দু'চারটে কবিতা গানও শুনিয়েছি, অবশ্য কবির অনুরোধেই এবং আমার অতি সৌভাগ্যবশত তার অতি প্রশংসা লাভও করেছি কবির কাছ থেকে। সে উল্লসিত প্রশংসায় কোনদিন এতটুকু প্রাণের দৈন্য বা মন-রাখা ভাল-বলবার চেষ্টা দেখিনি।

সন্ধ্যাে দূরে গিয়ে বসলে সন্নেহে কাছে ডেকে বসিয়েছেন। মনে হয়েছে, আমার পূজা সার্থক হ'ল, আমি বর পেয়ে গেলাম।

অনেক দিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মত্ত গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না। বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।

এই নিয়ে কতদিন তিনি আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন, তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ- তোমাকে জন-সাধারণ একেবারে খানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে- ইত্যাদি।

আমি দেখেছি, এ গৌরবে আমার মুখ যত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো নাম-করা কবির মুখে কে যেন তত কালি ঢেলে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুভানুধ্যায়ীরাই এমনি করে শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। আজ তিন চার বছর ধরে এই শুভানুধ্যায়ীরা গালি-গালাজ করেছেন আমায়, তবু তাঁদের মনের ঝাল বা প্রাণের খেদ্ মিটল না। বাপ রে বাপ! মানুষের গাল দেবার ভাষা ও তার এত কসরতও থাকতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ফি শনিবারে চিঠি! এবং তাতে সে কী গাড়োয়ানী রসিকতা, আর মেছোহাটা থেকে টুকে-আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমি এ-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ্!

বাংলায় রেকর্ড হয়ে রইল আমায় দেওয়া এই গালির ছুপ। কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! ফি হাওয়ায় মেল (ধাপা-মেল) বোঝাই। কিন্তু এত নিন্দাও সয়েছিল।

এতদিন তবু সান্ত্বনা ছিল যে, এ হচ্ছে তন্তুবায়ের বলীবর্দ ক্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। বাবা, তুই নখদস্তহীন নিরামিষাশী কবি, তোর কেন এ ঘোড়া-রোগ-এ স্বদেশ-প্রেমের বাই উঠল! কোথায় তুই হাঁ ক’রে খাবি গুলবদনীর গুলিস্তানে মলয় হাওয়া, দেখবি ফুলের হাই-তোলা, গাইবি ‘আয় লো অলি কুসুম-কলি’ গান, -তা না ক’রে দিতে গেলি রাজার পেছনে খোঁচা! গেলি জেলে, টানলি ঘানি, করলি প্রয়োপবেশন, পরলি শিকল-বেড়ী, ডাণ্ডাবেড়ী, বইগুলোকে একধার থেকে করাতে লাগলি বাজেয়াপ্ত, এ কোন্ রকম রসিকতা তোর? কেনই বা এ হ্যাঙ্গাম-হুজুং!

হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে সাহিত্যের বেণু-বনে এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশী অসুরের কোঁৎকা হয়ে উঠেছে! ছুট ছুট! যত মোলায়েম ক’রেই বেণু-বন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠলে যে তা চিরন্তন বাঁশ-বনই হয়ে ওঠে, তা কোন্ পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে!

বেচারী তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্ত মহারথীর সমাবেশ! বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল! ঘন ঘন হাততালি! বলে, ‘এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়।’ কিন্তু, শুধুই কি সপ্ত মহারথীর মার! তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধূলো কাদা গোবর মাটি –কোনো রুচির বাছ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে।

মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আনা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামীতে সাহিত্যের বেনুবন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল!

পুলিশের জুলুম আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওদের জুলুমের তবু একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জুলুম করতে শুরু করে, তার আর পারাপার নেই। এরা তখন হয়ে ওঠে টিক্‌টিকি পুলিশের চেয়েও ক্রুর, অভদ্র। যেন চাক-ভান্ডা ভীমরুল। জলে ডুবেও নিষ্কৃতি নেই, সেখানে গিয়েও দংশন করবে।

পলিটিক্সের পাঁকের ভয়ে পালিয়ে গেলাম নাগালের বাইরে। মনে করলাম, যাক্, এতদিনে একবার প্রাণ ভ’রে সাহিত্যের নির্মল বায়ু সেবন ক’রে অতীতের গ্রানি কাটিয়ে উঠব। ও বাবা! সাহিত্যের আসর যে পলিটিক্যাল আখড়ার চেয়েও নোংরা, তা কে জানত!

কপাল, কপাল! পালিয়েও কি পার আছে? হঠাৎ একদিন সপ্ত-রথীর সপ্ত প্রহরণে চকিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপার কি!

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ, আমি তরুণ। তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তা’রা আমার লেখার ভক্ত।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, আঙ্কে, এতে আমার অপরাধটা কিসের হ’ল?

বহু কঠোর হুঙ্কার উঠলো, ঐটেই তোমার অপরাধ, তুমি তরুণ এবং তরুণেরা তোমায় নিয়ে নাচে।

বললাম, আপাততঃ আপনাদের ভয়ে আজই তো বুড়ো হয়ে যেতে পারছি। ওর জন্য দু-দশ বছর মার খেয়েই অপেক্ষা করতে হবে। আর, যারা আমায় নিয়ে নাচে, আপনারাও তাদের নাচিয়ে ছেড়ে দিন। গোল চুকে যাবে। আমায় নিয়ে কেন টানাটানি!

আবার নেপথ্যে শোনা গেল, তুমি এই জ্যাঠা অভিমন্যুর পৃষ্ঠরক্ষী। তোমাকে মারতে পারলেই একে কতল করতে দেবী লাগবে না।

দেখাই যাক।...

এতদিন আমি উপেক্ষাবশতঃই এ ধোঁয়াবাণের প্রত্যুত্তরে ধোঁওয়া ছাড়িনি— না উনুনের, না সিগারেটের, ভেবেছিলাম, সম্রাটে সম্রাটে যুদ্ধ, দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু হাতিতে হাতিতে লড়াই হলেও নলখাগড়ার নিস্তার নাই দেখছি। কাজেই, আমাদেরও এবার আত্মরক্ষা করতে হবে। প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়ায় কোন পৌরুষ নেই।

পলিটিক্সের পাককে যারা এতদিন ঘৃণা ক'রে এসেছেন, বেণু-বনের বাঁশের প্রতি তাঁদের এই আকস্মিক আসক্তি দেখে আমারই লজ্জা করছে— বাইরের লোক কি বলছে তা না-ই বললাম।

এ-বাঁশ ছোঁড়ারও তারিফ করতে হবে। কোনো বিশেষ একজনের শির লক্ষ্য ক'রে না ছুঁড়ে এঁরা ছুঁড়ছেন একেবারে দল লক্ষ্য ক'রে। কারণ, তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার লজ্জা নেই। বীর বটে! এতদিন তাই পরাস্ত মেনেই চুপ ক'রে ছিলাম। কিন্তু ঐ চুপ ক'রে থাকি বলেই ও-পক্ষ মনে করেন, আমরা জিতে গেলাম। তাই এবার মাথা বেছে বেছেই বাঁশ ছোঁড়া হচ্ছে— বাণ নয়।

অবশ্য, সে বাঁশে বাঁশীর মত গোটাকতক ফুটো ক'রে সুর ফোটাবার আয়াসেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু তার খোঁচা আর স্থলত্বই বলে, ও বাঁশী নয়— বাঁশ।

বীণাই শোভা পায় যার হাতে, তাঁকেও লাঠি ঘুরাতে দেখলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। পালোয়ানী মাতামাতিতে কে যে কম যান, তা ত বলা দুষ্কর।...

আজকের 'বাক্সলার কথা'য় দেখলাম— যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চ পাণ্ডবকে লাক্ষিত করবার সৈন্যপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবি-গুরু এই অভিমন্যুবধে সায় দিয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্ম এই অন্যায় যুদ্ধে সায় দেননি, বৃহত্তর ভারতের ভীষ্ম সায় দিয়েছেন— ঐটেই এ যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক।

এই অভিমত্যুর রক্ষী মনে ক'রে কবিশুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় 'রক্ত'কে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপী-পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনি।

এই আরবী ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক'রে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা-শেরওয়ানী-টুপী ব্যবহার করেন, এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন ওরিয়েন্টাল। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তা'রা হয়ে যায় 'মিঞা সাহেব'। মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশ্কিল- তবু ও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আর অন্ত নেই।

আমি ত টুপী পায়জামা শেরওয়ানী দাড়িকে বর্জন ক'রে চলেছি শুধু ঐ 'মিঞা সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই- তবুও নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির পেশ্কার উকিল মোক্তারকে কী বলব?

কবি-গুরু চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালীকে উদ্দেশ্য ক'রে এক কবিতা লিখেছেন। তাতে- 'উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। ঘোমটা-খোলা শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জ্বাভেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও-জায়গাটায়, তা ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো-শোনাবার লোভেই, ঐ একটি ভিন্ দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবি-গুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চির-চেনা রবীন্দ্রনাথ নন। তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে দিয়ে।

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়, মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও-দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু 'খুন' নয়- বাংলায় চলতি আরো অনেক আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি

মনে করি, বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্তীও এ-ঢংএর ভূয়সী প্রশংসা ক'রে গেছেন।

বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দুটো ইরানী 'জেগুর' পরালে তাঁর জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও 'খুবসুরত'ই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবিয়া স্বীকার করতে না পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তা ছাড়া যে 'খুন'র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায়, কালার বক্সে (colour box-এ) এবং তা খুন-করা, খুন-হওয়া ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও 'খুন-খারাবী' হ'তে দেখি আজো এবং তা শুধু মুসলমান-পাড়া লেনেই হয় না। আমার একটা গানে আছে—

'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বীর।'

এই গানটি সেদিন কবি-গুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে—'উদিবে সে রবি মোদের রক্তে রাঙিয়া পুনর্বীর'ও করা চলত। চলত, কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐরকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্রসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর করে খুনধারা লিখি নাই। তাই বলে রক্ত-খারাবীও লিখি নাই, হয় রক্তারক্তি, না হয় খুন-খারাবী লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেরটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু তখন ওতে রাগ মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না, তেমনি রক্তও ফোটে না— নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে খুনা-খুনি খেলি না, কিন্তু খুন-সুড়ি হয়ত করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর আচকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেকীর সুর শুনতে, ফুল-বনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল যঁারা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য-সভায় ভিড় না ক'রে হিন্দু-সভারই মেঝার হন গিয়ে।

যে কবিগুরু অভিধান ছাড়া নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি ক'রে ভাবীকালের জন্য আরো তিনটে অভিধানের সম্বন্ধ রেখে গেলেন, তাঁর এই নূতন শব্দ-ভীতি দেখে

আমরা বিস্মিত হই। মনে হয়, তাঁর এই আক্রোশের পেছনে অনেক-কেহ এবং অনেক-কিছু আছে। আরো মনে হয়, আমার শত্রু সাহিত্যিকগণের অনেক দিনের অনেক মিথ্যা অভিযোগ জমে জমে ওঁর মনকে বিধিয়ে তুলেছে। নৈলে আরবী-ফার্সি শব্দের মোহ ত আমার আজকের নয়; এবং কবি-গুরুর সাথে আমার বা আমার কবিতার পরিচয়ও আজকের নয়। কই, এতদিন ত কোনো কথা উঠল না এ নিয়ে।

সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন দেখি কতকগুলো জোনাকিপোকা রবিলোকের বহু নিম্নে থেকেও কবিত্বের আক্ষালন করে। ভক্ত কি শুধু ঐ নোংরা লোকগুলোই, যারা রাত-দিন তাঁর কানের কাছে অন্যের কুৎসা গেয়ে তাঁর শান্ত সুন্দর মনকে নিরন্তন বিক্ষুব্ধ করে তুলছে? আর, আমরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাইনে বলেই হয়ে গেলাম তাঁর শত্রু।

কবি-গুরুর কাছে প্রার্থনা, ঐ ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব তিনি করুন, দুঃখ নাই। কিন্তু ওদের প্ররোচনায় আমাদের প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে যেন তাঁর মহিমাকে খর্ব না করেন।

সবচেয়ে কাছে যারা থাকে, দেব-মন্দিরের সেই পাণ্ডারাই দেবতার সবচেয়ে বড় ভক্ত নয়।

আরো একটা কথা। যেটা সম্বন্ধে কবি-গুরুর একটা খোলা কথা শুনতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য করে ওঁর আজকালকার লেখাগুলোর সুর শুনে মনে হয়, আমাদের অভিশপ্ত জীবনের দারিদ্র্য নিয়েও যেন তিনি বিদ্রূপ করতে শুরু করেছেন।

আমাদের এই দুঃখকে কৃত্রিম বলে সন্দেহ করবার প্রচুর ঐশ্বর্য তাঁর আছে, জানি এবং এও জানি, তিনি জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখ ঐ দারিদ্র্য ব্যতীত হয়ত আর সব দুঃখের সাথেই অল্প-বিস্তর পরিচিত। তাই এতে ব্যথা পেলেও রাগ করিনে।

কি ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে আমাদের নতুন লেখকদের বেঁচে থাকতে হয়— লক্ষ্মীর কৃপায় কবি-গুরু কোনদিন আমাদের মত সাহিত্যিকের কুটীরে পদার্পণ করেন নি— হয়ত তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ হ'ত না তাতে— নৈলে দেখতে পেতেন, আমাদের জীবন-যাত্রার দৈন্য কত ভীষণ! এই দীন মলিন বেশ নিয়ে আমরা আছি দেশের একটেরে আত্মগোপন করে। দেশে দেশে প্রোপাগান্ডা করা ত দূরের কথা, বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতেও লজ্জা করে। কিছুতেই ছেঁড়া জামার তালিগুলোকে লুকাতে পারিনে। ভদ্র শিক্ষিতদের মাঝে ব'সে সর্বদাই মন খুঁত খুঁত করে, যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি! বাইরের দৈন্য অভাব যত ভিতরে ভিতরে চাবকাতে থাকে, তত মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে।

কবি-গুরুর কাছেও শুধু ঐ দীনতার লজ্জাতেই যেতে পারিনে। ভয় হয়, এ লক্ষীছাড়া মূর্তি দেখে তাঁর দারোয়ানেরাই ঐ সুর-সভায় প্রবেশ করতে দেবে না।

দীন ভক্ত তীর্থ যাত্রা করতে পারল না বলে দেবতা যদি অভিশাপ দেন, তা হ'লে এই পোড়া কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া কীই বা বলবার আছে!

তাঁর কাছে নিবেদন, তিনি যত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুন, তা হয়ত সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত-আপনার এই দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে উপহাস ক'রে যেন আর কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে না দেন। শুধু ঐ নির্মমতাটাই সইবে না।

কবি-গুরুর চরণে ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধ আবেদন— যদি আমাদের দোষত্রুটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সন্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিৎ বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে, তাঁকে তাদেরি বাহন হ'তে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায় বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায়। বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন-রবিলোক—কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির বহু উর্ধ্বে।

কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র শনিবারের চিঠিওয়ালাদের কাছে আমায় গালিই দেন আর যাই করুন, (জানি না, এ সংবাদ সত্য কিনা) ঐ দারিদ্র্যটুকুর অসম্মান তিনি করতে পারেন নি। অসহায় মানুষের দুঃখ-বেদনাকে তিনি এত বড় ক'রে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবি-লোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

একদিন কথাশিল্পী সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র তাঁর বই-এর সমস্ত আয় দিয়ে 'পথের কুকুর'দের জন্য একটা মঠ তৈরী ক'রে যাবেন। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যে সব হন্যে কুকুর, তারা আহার ও বাসস্থান পাবে ঐ মঠে— ফ্রি অব্ চার্জ। শরৎচন্দ্র নাকি জানতে পেরেছেন, ঐ সমস্ত পথের কুকুর পূর্বজন্মে সাহিত্যিক ছিল, ম'রে কুকুর হয়েছে। শুনলাম, ঐ মর্মে নাকি উইলও হয়ে গেছে।

ঐ গল্প শুনে আমি বারংবার শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলেছিলাম, 'শরৎদা সত্যিই একজন মহাপুরুষ। সত্যিই আমরা—সাহিত্যিকরা কুকুরের জাত। কুকুরের মতই আমরা না খেয়ে এবং কামড়া-কামড়ি ক'রে মরি। তাঁর সত্যিকার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, তিনি সাহিত্যিকদের অবতার-রূপ দেখতে পেয়েছেন।'

আজ তাই একটি মাত্র প্রার্থনা, যদি পরজন্ম থাকেই, তবে আর যেন এদেশে কবি হয়ে না জন্মাই। যদি আসি, বরং শরৎচন্দ্রের মঠের কুকুর হয়েই আসি যেন। নিশ্চিন্তে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচব।

(লেখাটি ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত)

ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা

আবুল ফজল



ভাষাকে শুধু ভাবের বাহন বলিলে ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ হয় না— ভাষার উপর ভাবের জন্ম ও প্রকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভাষা ভাবের জননী। ভাষা-জননীর অঞ্চল ছায়াতলেই তার পরিপুষ্ট। যে মানুষের ভাষা যতখানি শক্তিমান ও বলিষ্ঠ তাহার চিন্তা ও ভাবও ততখানি পূর্ণাঙ্গ, তাহার প্রকাশও ততখানি সাবলীল। ভাষাহীন মানুষের চিন্তা পঙ্গু, ভাব দুর্বল, একথা ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে সমানভাবে প্রযোজ্য। মানুষের নৈতিক মানসিক ও রুচি-জ্ঞানের বিকাশ অনেকখানি তার ভাষা-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে— ভাষা তার অন্তর্নিহিত সব সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশে সহায়তা করে।

যাঁহাদের ভাষার উপর দখল কম, তাঁহাদের চিন্তা যে নিতান্ত দুর্বল, প্রকাশ-ভঙ্গিমা যে নেহাৎ পঙ্গু, একথা যাঁহারা চিন্তা করেন এবং চিন্তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা জানেন। ভাষা ও চিন্তার এই দৌর্বল্য হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ভাষা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা। বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদেশিক কোন ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি বর্তমানে ইংরেজী একটু ভাল রকমে জানিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজীর প্রতি জোর দেন। ইংরেজীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন রকমের সংস্কার নাই, বরং আমরা বিশ্বাস করি ইংরেজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া গেলেও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগ রাখিতে হইবে। আমাদের কথা— আমাদের শিক্ষাবিভাগ ইংরেজীর প্রতি জোর দিতে যাইয়া আমাদের স্বকীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাহার ফলে দেশীয় ভাষায় ফলপ্রসূ শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত হইতেছে না। ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। আমাদের চিন্তায় এবং প্রকাশে যে দৌর্বল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার অন্যতম কারণ বোধ হয় আমাদের পরিপূর্ণ ভাষা-জ্ঞানের অভাব। এই দিক দিয়া বাংলার মুসলমানদের জীবন অত্যন্ত শোচনীয়। সুদূর অতীতে এবং বর্তমানে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে এমন কোন চিন্তাশীল লোকের নাম শুনা যায় না, যাহাকে লইয়া একটা জাতি গৌরব করিতে পারে। জাতির ইতিহাস এমন ভাবে ব্যর্থ হইতে বড় একটা দেখা যায় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে নাম করিবার মত লোকের অভাব নাই। মুসলমান আমলে এবং পরবর্তী যুগে ঐ সমস্ত প্রদেশে বহু শাস্ত্রকার, ঐতিহাসিক ও কবির জন্ম হইতেছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হইতেই দেশে আরও অসংখ্য স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সব স্কুল মাদ্রাসা হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ বা শিবলী নোমানীর মত একজন লোকও বাহির হয় নাই, অথবা মৌলানা আবদুল হক, মৌলানা কেরামত আলী, মৌলানা আশরাফ আলী প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রকারেরও নাম শুনা যায় না। অথচ বাংলা দেশে মাদ্রাসা ও মৌলবী-মৌলানার সংখ্যা করা যায় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের বড় পার্থক্য ভাষা সম্পর্কে। অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরা উর্দুকে তাহাদের মাতৃ-ভাষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কালচার এর ভাষা-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার মুসলমান বহু দিন পর্যন্ত কোন ভাষাকেই তাহার কালচার-এর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। অভিজাত পরিবারের মুসলমানেরা উর্দুতে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বাংলা দেশে ভিন্ন আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাহারা উর্দুর কৃষ্টিসম্মত একটা আবহাওয়া (cultural atmosphere) গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই এবং বাহিরের উর্দু কালচার ও চিন্তা জগতের সঙ্গেও নিজেদের সংযোগ রাখিতে পারেন নাই। এই না-পারার প্রধান কারণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা। আজ লগুন-প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি সঙ্কল্প করেন- আমরা লগুনে ইংরেজী সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিব; সে শুধু হাস্যকর ব্যাপার হইবে। উর্দু ভাষী মুসলমানরা বাংলায় বসিয়া পদে পদে অনুভব করিয়াছেন বাংলার প্রয়োজনীয়তা, কিন্তু অভিজাত্যাভিমানে তাহারা উর্দুকে ছাড়িয়া বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই দোদুল্যমান জীবন-যাত্রার ফল হইয়াছে, তাহারা চিন্তার জগতে শুধু ফাঁকি দিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান বাড়িতে বাংলা বলিলেও এতদিন কিছু বাহিরে উর্দুর ওকালতী করিয়াছে। কাজেই বাংলা ভাষাকে সে তাহার কালচার-এর ভাষা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। রাজকার্য্যের জন্য সে ইংরেজী শিখিয়াছে, ধর্ম হারািবার ভয়ে সে আরবী, পারসী, উর্দু পড়িয়াছে এবং ব্যবহারিক জীবনের সুবিধার জন্য বাংলাও তাহাকে কিছু কিছু পড়িতে হইয়াছে (কিন্তু সে শুধু বাধ্য হইয়া), উহাতে তাহার ইহপরকালের জীবন যাত্রার একরকম চলনসহই সুবিধা হয়তো হইয়াছে কিন্তু চিন্তা ও কালচারের দিককে সে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইংরেজী, আরবী, পারসী ও উর্দু তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ বৈদেশিক ভাষা, কাজেই তাহার ভাব, চিন্তা ও প্রেরণার বাহন এ সব ভাষা হইতে পারে না -হইতে পারে নাই। এক হইতে পারিত বাংলা কিন্তু বাংলাকে সে এতদিন গ্রহণ করে নাই। তার উপর এতগুলি ভাষা যাহাদের শিক্ষিতে হয় কোন ভাষার উপরই যে তাহাদের পরিপূর্ণ দখল হয় না, এবং সে জাতির চিন্তা-জগত যতখানি ফাঁকা থাকা উচিত, বাঙালী মুসলমানের চিন্তার জগত ততখানি ফাঁকাই রহিয়া গিয়াছে।

আজ বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষাকে তাহার মাতৃভাষা ও কালচার-এর ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে সত্য কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত

এখনো হয় নাই। ‘মুসলিম বাংলা’ এখনো মাদ্রাসা-ঘেঁষা: কিন্তু মাদ্রাসা ও মক্তবগুলিতে এখনো বাংলাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহাত অত্যন্ত ভুল-ভ্রান্তিজনক। এই ভুল ভ্রান্তি তিন কারণে। প্রথমত বর্তমান মাতৃভাষা-শিক্ষা প্রণালী মোটেই আদর্শস্থানীয় নয়। ইহাতে ছাত্রদের মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কোন রকমের দরদের সৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয়ত অনুপযুক্ত শিক্ষক। যাহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে মোটেও পরিচিত নন, বর্তমানে তাঁহরাই মাদ্রাসা ও মক্তবে বাংলা শিক্ষক। (কোন জুনিয়ার মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বাংলা পড়াইবার সময় ‘সধবা’র উল্টা ‘ধবা’ বলিতেও গুনিয়াছিলাম।) তৃতীয়তঃ, কুলিখিত পাঠ্য বই। সাধারণত অন্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা, যাহারা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন-এবং বাহিরের জ্ঞান-রাজ্যের কোন খবরই রাখেন না তাঁহরাই ঐ সমস্ত পাঠ্য বইয়ের লেখক। বইগুলিতে না আছে জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত, না আছে পুষ্ট ভাষা, না আছে সুন্দর বর্ণনা। অনেক বই এর ভাব ভ্রমপূর্ণ-বানান পর্য্যন্ত বিশ্রী। এই প্রকারে গোড়াতে যে ভুল ভাষা শিক্ষা হয়, তাহা ছাত্রদের সারাজীবন থাকিয়া যায়। আজ মুসলমান-সাহিত্যের প্রতি তাকাইলে উহার ভয়াবহ পরিণতি বুঝা যাইবে। আজ মুসলমানদের সাহিত্য-সেবার আশ্রয় জাগিয়াছে, উহা সুখের বিষয়; কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখা যায়, অনেকের ভাষা বিতর্ক নয়, নানা ভুলত্রুটিতে পূর্ণ; অনেকে বাংলা লিখিতে গিয়া ভাষাকে অপূর্ব্ব খিচুড়ী করিয়া তোলেন। অনেকের চিন্তার আগাগোড়ায় মিল নাই; -সমস্ত লেখাটি পড়িলে মনে হয় আবোল-তাবোল বলিতেছেন। আমাদের মনে হয়, এ সব ভাষা জ্ঞানের অভাবে- ভুল ভাষা শিক্ষার পরিণতি এ। গোড়াতেই বলিয়াছি, ভাষাই চিন্তার জন্মদাতা ও বাহন; -সেই ভাষা যখন ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন চিন্তাও গোলমালে না হইয়া পারে না। বাংলার মুসলমান সমাজের যে আজ-পর্য্যন্ত কোন বড় চিন্তাশীল লোকের জন্ম হয় নাই, তাহার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা যায় ভাষাজ্ঞানের তথা পরিপূর্ণ চিন্তা-ক্ষেত্রের অভাব।

আরবী পারসীতে সুপণ্ডিত লোক বাংলার মুসলমান সমাজে বিস্তর আছেন। কিন্তু ঐ সব ভাষা এবং সাহিত্য তাঁহাদের অন্তরের ভাষা এবং জীবনের খাদ্য হইতে পারে নাই। তাই তাঁহাদের শিক্ষা এবং কাল্চার কোন সময় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের হাসি এবং অশ্রুর -বোধ এবং অনুভূতির যে ভাষা সে বাংলা ভাষাই- অথচ সেই বাংলা ভাষাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ফলে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তাজগৎ একবারে ফাঁকা রহিয়া গিয়াছে। ভয় হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যদি আমরা আমাদের কাল্চার-এর ভাষা ও আমাদের জাতীয় সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ না করি এবং তাহা শিক্ষা করিবার জন্য, আয়ত্ত করিবার জন্য ভালরূপে বন্দোবস্ত না করি, তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতেও আমাদের চিন্তা-জগৎ এমন ফাঁকা থাকিয়া যাইবে- আমাদের মধ্যে কোন চিন্তাশীলের, কোন বড় স্রষ্টার জন্ম সম্ভবপর হইবে না।

(লেখকের জন্ম : কাজির পাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ১ জুলাই ১৯০৩, মৃত্যু ৪ এপ্রিল ১৯৮৩)

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : সাংস্কৃতিক বিভেদ

আব্দুল মওদুদ



হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : সাংস্কৃতিক বিভেদ

মধ্যযুগের ইংরেজের ইতিহাসে ভূমি সংক্রান্ত দুটি অভিধা উল্লেখযোগ্য : ‘ফিউডালিজম’ ও ‘সার্কডম’ (feudalism, serfdom)। প্রথমটির উদ্দিষ্ট জমির মালিক, যিনি ভূমিস্বত্বের পরিবর্তে রাজার অনুগামী হতেন সেনাবাহিনী নিয়ে, আর দ্বিতীয়টির উদ্দিষ্ট ভূমিদাস, সে জমির সংগে আজীবন বাঁধা থাকতো পরিবারসহ জমির কৃষিকর্ম করত ও মালিককে উৎপাদনের সবটাই দিত তার ভোগের জন্য। এ দেশে মুঘলাই মনসবদারী কতকটা ফিউডালিজমের সংগে তুলনীয়, কিন্তু ‘সার্কডমে’র কোন প্রতিরূপের অস্তিত্ব ছিল না এদেশে।

পূর্বেই বিশদ হয়েছে, ইংরেজরা সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে যে তিন শ্রেণীর সমবায়ে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্মদান করে, তার অন্যতম ছিল ভূম্যধিকারী শ্রেণী। আর এই নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী- যাদের জন্ম হয়েছিল কর্ণওয়ালিসী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে- ‘তারা হচ্ছে সেসব হিন্দু গোমস্তারা, যারা এ পর্যন্ত নগণ্য পদে নিযুক্ত থাকতো, কিন্তু অতঃপর জমিদার বনে গেল এবং জমিদার সর্বস্বত্বে মালিকানা লাভ করে’। নজরুল ইসলাম এদের লক্ষ্য করেই বলেছেন: মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ, মাটির মালিক তাঁহারাই হন। এই ভূম্যধিকারী শ্রেণীই ছিল মধ্যযুগের ইংরেজের ‘ফিউডাল লর্ডস’-দের আধুনিক সংস্করণ।

আর জমির চাষী শ্রেণী হলো প্রধানত মুসলমানরা। যারা কয়েক বছর আগে ছিল শাসকশ্রেণী, তারা হলো কৃষকশ্রেণী। তাদের লক্ষ্য করেই নজরুল বলেছেন: সম্ভান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়। এই কৃষক সমাজই ছিল ইংরেজের ‘সার্কডমে’র আধুনিক সংস্করণ।

ইংরেজদের নয়া ব্যবস্থায় হিন্দু জমিদার শ্রেণী হলো ‘বাবু’ ও ‘ভদ্রলোক’ এবং মুসলমানরা হলো ‘চাষা’। বস্তুত এই সেদিনও ভদ্রলোক ও বাবু বলতে বোঝাতো হিন্দুকে এবং চাষা বলতে মুসলমান। রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক প্রবন্ধে ঠিক এই অর্থেই শব্দ দুটির ব্যবহার করেছেন। জমিদার-নন্দন রবীন্দ্রনাথ মুসলমানকে জানতেন রায়ত হিসাবেই, তার কর্তব্য হিন্দু জমিদারকে দোয়া করে তাঁর কল্যাণ আকর্ষণ করা। শোষিত প্রজারা শোষক জমিদার মহাজনকে পিতামাতা জ্ঞানে

তাদেরই মঙ্গল কামনায় আল্লাহর দোয়া প্রার্থনা করবে- এই ছিল জমিদার নন্দনের স্বাভাবিক জীবন দর্শন। তাঁর উক্তিটি লক্ষণীয় :

‘যখন কোন কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ত তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লাহর দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু হৃদয় স্পর্শ করে না।’

ভূমি ব্যবস্থার এই পটভূমিকায় মনিবানার দাপটে হিন্দু জমিদার ছিল উদ্যত খড়্গ, আর গরিবানার সংকটে মুসলমান প্রজা ছিল সর্বহারা, সবার পিছে সবার নীচে। গোটা মুসলমান সমাজটাকে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় কী চোখে দেখতো, এবং সামাজিক স্তরে সম্বন্ধটা কী ছিল রবীন্দ্রনাথের যবানীতেই শোনা যাক :

‘আর মিথ্যাকথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমরাগিকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখের মানুষ : তবু প্রতিবেশীর সংগে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে হিন্দু-মুসলমান বসে না- ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্রাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।

একথা বলিয়া ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু-মুসলমানের স্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

অল্পকাল হলো, একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পাবে না, এমনকি সেই আহারে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ কোন আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা একথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূল।

তখনকার কালে দুই বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে— পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য।’

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এ কথাটি পরিচ্ছন্ন যে, মুসলমান এদেশে প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু বরাবরই তাকে বিদেশী ও অস্পৃশ্য ভেবেছে, এ উপমহাদেশের বৃহৎ গণ-জীবনের একাংশ হিসাবে ভাবতে পারেনি এবং কখনও তা স্বীকার করেনি। ইংরেজ এদেশবাসীকে ‘নেটিভ’ বলে দূরে রাখত; তাদের ‘ডগ্‌স্‌ এ্যান্ড ইন্ডিয়ান্‌স নট্‌ আলউড্‌’ কথায় ছিলো শাসকসুলভ দৃষ্টি। ইউরোপের বাইরের সমাজকে তার ঘরে বসে ‘নেটিভ’ বলার মতো ঔদ্ধত্য আর হতে পারে না; তার দ্বারা মানবতারই অসম্মান করা হয় তাদের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক শূন্যাবস্থাকে কটাক্ষ করে। কিন্তু হিন্দুর ঘৃণাটা আরও মর্মান্তিক, সে মুসলমানের সান্নিধ্যকে বর্জন করেছে ধর্মের ও আত্মার পবিত্রতা রক্ষার্থে। মানুষকে এর চেয়ে বড়ো অসম্মান আর কিছুতেই দেখানো সম্ভব নয়। অথচ মানবাত্মার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা ও অসম্মান করেও হিন্দুরা আশা করেছিল মুসলমান তাদের অনুবর্তী হবে, ‘বাবুদের’ ‘স্বদেশী’ ডাকে সাড়া দেবে। এবং সেটা হয়নি বলেই রবীন্দ্রনাথও পরিণত বয়সে ক্রোধে ফেটে পড়ে সব দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে দোষী করেছিলেন :

‘আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে— তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অংক ফল না কষে ভাগেরই অংক ফল কষছে। দেশে এরা আছে, অথচ রাষ্ট্র জাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর তাই ভারত-বর্ষের লোকসংখ্যা তালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সবচেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।’

বিভেদটাকে ধর্মীয় অনুজ্ঞা হিসাবে শিরোধার্য করে যে হিন্দু মুসলমানকে দূরে নিক্ষেপ করলো এবং আঙিনায় বেড়া দিয়ে রইলো মুখ ফিরিয়ে, যোগ-বিয়োগের সমস্যাটা যে সেই হিন্দুরই সৃষ্টি, এই দৃঢ় সত্যটা মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথেরও সংস্কারে বেধেছিল।

কিন্তু তাঁর চেয়েও প্রাজ্ঞ ভাষায় এই বাস্তব অবস্থাটা বিশদ করে দোষটা ঘাড় পেতে নিতে সংকোচ অনুভব করেননি, বর্তমানের এক বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ নীরদ সি চৌধুরী। তিনি বলেছেন :

‘আজকাল হিন্দু-মুসলমান বিরোধের এই বিষয় বিপদটা আমি যখন দেখি, তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হইনে, কারণ আমরাই ছেলেখেলায় মতো নিজেদের হাতে পরিশ্রম করে এই সর্বের বীজ বুনে দিয়েছি বস্তুত এই বিরোধটা ছিল

আমাদের ইতিহাসের অন্তর্গত এবং এড়ানো ছিল অসম্ভব। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন ভারতীয়দের সেই সাধারণ অসাধুতা থেকে, যারা বলেন যে, এ বিরোধ ব্রিটিশেরই সৃষ্টি, যদিও এই বিদেশী শাসকরা এর দ্বারা প্রচুর লাভবান হয়েছিল। বাস্তবিক তারা দেবতা হিসাবে ক্ষমার হতো, রাজনীতিক জীব মানুষ হিসাবে নয়, যদি তারা আমাদেরই বহু সাধনায় নির্মিত ও আমাদের দ্বারাই তাদের হাতে তুলে দেওয়া এ অস্ত্রটির সুযোগ গ্রহণ না করতো। স্বদেশী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানদের দিকে তাকাবার পূর্বেই অতি শৈশবে আমাদের মনমানস চারটি প্রত্যক্ষ দিকে ঐতিহ্যগতভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল। প্রথম, আমরা স্বভাবতই তাদের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাতাম, কারণ তারা এক সময়ে হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করেছিল। দ্বিতীয়, সমকালীন সমাজের অঙ্গ হিসাবে মুসলমানদের আমরা কখনও চিন্তা করিনি। তৃতীয়, আমাদের বন্ধুত্ব ছিল শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় সমশ্রেণীর মুসলমানদের সঙ্গে। চতুর্থ, মুসলমান কৃষক সমাজের উপর আমাদের দৃষ্টিটা ছিল মিশ্রিত এবং ঘৃণাবাজক, কারণ তাদের আমরা শূদ্রশ্রেণীর হিন্দুর মতো কিংবা অন্য কথায় গরু-ছাগলের মতো বিবেচনা করতাম। এই চারটির মধ্যে আবার প্রথমটি ছিল প্রত্যক্ষ ও শিক্ষিত মনোবৃত্তিসঞ্জাত; বাকীগুলি স্বভাবগত।

আমরা মুসলমানদের সংগে যে ব্যবহার করেছি, তার বিপরীত কিছু করা ছিল আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা পড়তে শেখার পূর্বেই আমাদের শেখানো হতো: মুসলমানরা একদা আমাদের শাসন করেছে ও অত্যাচার করেছে; তারা ভারতে একহাতে কুরআন ও অন্যহাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম প্রচার করেছে; মুসলমান শাসকরা আমাদের নারীহরণ করেছে, আমাদের মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ অপবিত্র করেছে। আমরা যখন বড়ো হলাম, তখন পড়েছি রাজপুত, মারাঠা ও শিখরা কতো বীরবিক্রমে মুসলমানদের সংগে লড়েছে; শিখেছি আওরঙজেব আমাদের উপর কী ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে! উনিশ শতকী বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চিত্রিত হয়েছে শুধু 'যবন'-রূপে। বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ও রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদের উপন্যাসসমূহে মুসলমানের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে গৌরবোজ্জ্বল হিসাবে চিত্রিত করেছেন এবং মুসলমানকে চিত্রিত করেছেন ঘৃণ্যভাবে। চ্যাটার্জি তো ছিলেন প্রত্যক্ষ ও হিংস্রভাবে মুসলিম-বিদ্বেষী। আমরা গোথ্রাসে সে সব উপন্যাস গলধঃকরণ করেছি এবং তাঁদের মঞ্চে দীক্ষিত হয়েছি।

আমাদের চারপাশে যে সব মুসলমান দেখেছি তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব প্রভাবিত হয়েছে উনিশ শতকী হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ কিংবা নীরব সমর্থনের দ্বারা। তাঁদের নীতি ছিল ঐতিহাসিক মুসলমানের প্রতি

ঘৃণাটা মুসলিম সমাজের উপর প্রচারিত করা। এর ফল হয়েছে অতীতমুখী। সমসাময়িক মুসলমানদের আমরা গণনার মধ্যে আনিনি, হয় তাদের ভুলেছি নয় উপেক্ষা করেছি। ব্রিটিশ শাসন ইসলামী কালচারের চর্চা করা কিংবা হিন্দুদের সহানুভূতি মুসলমানের প্রতি আকর্ষণ করার বিরুদ্ধে ছিল; আর এই পরিস্থিতিতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আবিষ্কার কর্মটা জোরদার করা হয়েছিল। এই রেনেসাঁর প্রথম ফল হয়েছিল ভারতীয় হিন্দুকে একেবারেই অইসলামীকরণ ও হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন-করণ। সারা উনিশ শতকব্যাপী সাধনা চলেছিল ভারতীয় হিন্দু কালচারকে প্রাচীন সংস্কৃতির মৌল ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করা। যে একটি মাত্র অহিন্দু প্রভাবকে স্বীকৃতি দেয়া হতো ও যার আত্মীকরণ করা হতো, তা হলো ইউরোপীয় মাত্র। আধুনিক ভারতের সব চিন্তানায়ক ও সংস্কারক— রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন একটি মাত্র সমন্বয় সাধনের : আর সেই সমন্বয়টি হিন্দু ও ইউরোপীয় চিন্তাধারা। ইসলামী ভাবধারা ও ট্রাডিশন তাঁদের চেতনাবৃত্তকে কখনও স্পর্শ করেনি।’

এভাবে উনিশ শতকী নব্য ভারতীয় কালচার একটি সুপরিষ্কৃত নিজস্ব সীমিত বৃত্ত রচনা করলো, এবং মুসলিম প্রভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবেই সে বৃত্তের বাইরে নিক্ষেপ করলো। তার সঙ্গে মুসলমানের সম্বন্ধটা দাঁড়ালো ‘একস্টার্নাল প্রোলেটারিয়েতে’র মতো বাইরে অবস্থান; মুসলমান যদি হিন্দুর এ জগতে প্রবেশের স্পর্ধা করতো, তাহলে তাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে আসতে হতো।

যখন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল, তখন তাদের নেতারা ভদ্রভাবে কিন্তু দৃঢ়ভাবেই অসম্মতি জানিয়েছিলেন; তখন তাঁদের একজন বেশ রসালোভাবেই বলেছিলেন :

‘মুসলমানরা জগন্নাথের রথচক্রের মতো হিন্দু সংখ্যাগুরুত্বের চাপে এভাবে পিষ্ট হবে যে ‘জাতীয়তার’ কোন চিহ্নই তার অংশে দেখা যাবে না। সত্য বলতে কি মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই-জাতিত্ব-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, আর এটা শুধু তত্ত্বকথা না, এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানতো, এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম।’

হিন্দু-মুসলমান সামাজিক ক্ষেত্রেও মৌখিক সৌহার্দ্য কোন কোন অবস্থায় বজায় রাখলেও তার দ্বারা দুজনের মধ্যে কোনও হৃদয়িক সম্বন্ধ গঠিত হয়নি। হিন্দু তার বিজয়া দশমীতে, পালা-পার্বণে মুসলমানকে গ্রহণ করেনি, মুসলমানও কখনো এসবে যোগ দেয়নি। আর হিন্দু, মুসলমানের পর্বোৎসবে যোগ দেয়া দূরে থাক,

সক্রিয় বাধা দিয়েছে যাতে মুসলমান নিশ্চিত মনে আপন পর্বোপলক্ষে আনন্দ উপভোগ করতে না পারে। এ বিষয়ে হিন্দু ভূম্যধিকারী শ্রেণী ছিল আরও নির্মম। নিজের এলাকায় গো-জবেহ গো-কোরবানী বন্ধ করে দেওয়া, মসজিদ ও কবরগাহ নির্মাণ করতে না দেওয়া, মহরমের সময় তাজিয়া নির্মাণ করতে না দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল এসব জমিদারের সাধারণ আচরণ। চাকুরীব্যপদেশে যুক্তবাংলার বহু জেলায় দেখেছি, বিচারকার্য কালে বহু পাট্টা ও কবুলতি উপস্থাপিত হয়েছে স্বত্বের মামলায় এবং সেসব দলিলে পরিষ্কার শর্ত থাকতো উপরোক্ত কাজগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, এবং এরূপ কোনও একটির-শর্ত খেলাফে জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ারও কঠিন শর্ত আরোপিত হতো। শহর এলাকার বাসযোগ্য জমি সম্বন্ধেই এসব নিষেধাজ্ঞা বেশী মাত্রায় লক্ষিত হতো।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রথমে ‘মুহম্মদী তরিকা’র আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম-বিরুদ্ধ আচরণসমূহ নির্মূল করতে তৎপর হন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে নববলদৃষ্ট শিখ-শক্তি মুসলমানদের আযান দেওয়া, ঈদের জামাত করা, গো-জবেহ করার বিরুদ্ধতা করতে থাকে। বাংলাদেশেও হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তিতুমীর হিন্দু জমিদারের হাতে প্রবল বাধা পেয়েছেন মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার কর্মে। মুসলমান প্রজাকে হিন্দুর পূজা-পার্বণে নিয়মিত চাঁদা দিতে বাধ্য করা হতো, ঝুল-কলেজে স্বরস্বতীর পূজা করা হতো হিন্দুর ধর্মীয় উৎসব হিসাবে, এবং মুসলমান ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা দিতে হতো; অথচ মুসলমান ছাত্ররা ‘মিলাদুল্লাহী’ করতে চাইলে অনুমতি মিলতো না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিষয়ক আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করতে সক্ষম হয়। প্রায় সাতশো বছর পর এই প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে হিন্দুরা উন্মত্ত হয়ে উঠে এবং নিরীহ মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। ‘১৮৫৭ সালের পর ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের ঘন তমসচ্ছন্ন কাল। যে বৃহৎ অংশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব-ক্ষমতা অধিকার করে, সেখানের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মনে করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে... কংগ্রেস শীঘ্রই মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহে ক্ষমতালাভ করবে এবং সমগ্র দেশটা মুসলমানদের জন্যে এক বিরাট কয়েদখানায় রূপান্তরিত হবে। জওয়াহরলাল ভো এ বিষয়ে একরকম দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে এই সময় সগর্বে বলেছিলেন : ভারতে মাত্র দুটি পক্ষ আছে— ব্রিটিশ ও কংগ্রেস। ক্ষমতাসিদ্ধ হয়ে কংগ্রেস এরূপ নীতি গ্রহণ করে, যার দরুন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কটা আরও তিক্ত হয়ে ওঠে, এবং মুসলমানদের নানা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এই সময়ে কংগ্রেস তথা হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি যে মর্মান্তিক অন্যায় উৎপীড়ন করেছে তার কিছুটা

পরিচয় মেলে মুসলিম লীগ প্রকাশিত ‘পীরপুর রিপোর্ট’ ও ‘শরীফ রিপোর্ট’ দুটিতে। প্রথম-খানিতে উন্মোচন করা হয়েছে যে, এই সময় প্রত্যেকটি সরকারী কর্মের উদ্বোধন করা হতো বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বত আচার-অনুষ্ঠানে; মুসলমান ছেলেমেয়েদের বাধ্য করা হতো ‘বন্দেমাতরম’ গান করতে ও গান্ধীর ফটো পূজা করতে; মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শন করে বিরত রাখা হতো গো-জবহেহ করা থেকে; তাদের সমস্ত স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল; উর্দুতে কথা বলা নিষেধ করা হতো; সাম্প্রদায়িক হান্সামায় পুলিশ ও সরকার কংগ্রেসের নির্দেশে হিন্দুদের সমর্থন করতো। ‘পীরপুর রিপোর্টে’ দেখানো হয়েছে, কী ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু কংগ্রেস স্থানীয় নেতা, জমিদার এমনকি প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের দ্বারা দুর্ভাগা মুসলমানদের জন্যে। এই সময় এ. কে. ফজলুল হকও ‘কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুর্ভোগ’ (Muslim Sufferings Under Congress Rule, 1939) শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করে কংগ্রেসী অত্যাচারের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করেন।

হিন্দুরা এভাবে শুধু নিপীড়ন ও নির্যাতন করে, ঘৃণা ও ঔদাসীন্য দেখিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেনি, বাবু সম্প্রদায় সৃষ্ট সাহিত্য ও কালচার থেকেও মুসলমানদের বিতাড়িত করেছিল একটা প্রচ্ছন্ন সুপারিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে। এ সম্বন্ধে ১৮০৫ সালের ‘সমাচার দর্পণে’ প্রকাশিত একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট :

‘(সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী প্রচলন হলে) প্রথমেই যবনদের ঔদ্ধত্য খর্ব হবে, তার দরুন আমাদেরই উপকার হবে। বাংলাভাষা প্রবর্তিত হলে মুসলমানরাই বিতাড়িত হবে, কেননা তারা বাংলাভাষা পড়তে পারে না, লিখতে পারে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।’

আশ্চর্য এই যে, মুসলমান যখন তার ধর্মীয় জীবন উন্নত করতে চেয়েছে, অনুসরণ করতে চেয়েছে, তখন তাকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষায়তন থেকে সর্বক্ষেত্রে যখনই সে নিজেকে চিহ্নিত করতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে মুসলমান হিসাবে, তখনই তাকে বিজাতীয়, বিদেশী ও অস্পৃশ্য হিসাবে বর্জন কর করা হয়েছে। ‘ভারতীয় মুসলমান’ না হয়ে ‘ভারতীয় হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত’ হতে যখন মুসলমান আপত্তি জানিয়েছে, তখনই তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে ‘যোগ বিয়োগের সমস্যা’ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এর চেয়ে সত্য নিয়ে প্রতারণা ও ছেলেখেলা আর ইতিহাসে দেখা যায়নি।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা বিবেচনা করেন, ‘মুসলমানরা আরবী ফারসী সংস্কৃতিকে নিজের ঐতিহ্য মনে করে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশকে বাতিল করে মগ্ন হলেন এক

সংকর সংস্কৃতি গঠন করতে...উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যবিস্তৃত মুসলিম সংস্কৃতি এইভাবে বেশ কিছুটা আচ্ছন্ন হলো মোগল যুগের উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের দ্বারা...মুসলিম সংস্কৃতি আসলে ইরানী তুর্কী নয়, ভারতীয়, বংগদেশীয় বা পাকিস্তানীও নয় এবং সর্বোপরি তত্ত্বগত ক্ষেত্রে ইসলামের সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। এ সংস্কৃতি যেন সর্বদাই ভেসে বেড়াচ্ছে কিন্তু না পারছে কোনও দেশের কুলে ভিড়তে, না পারছে নিজের দেশের মাটিতে বিস্তার করতে তার মূল।’ দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ যুক্তিগুলির মধ্যে সংগতি রক্ষিত হয়নি, এবং এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে ঐতিহাসিক সত্যের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়নি। মুসলমানরা উচ্চনীচ নির্বিশেষে কখনও ভারত তথা বাংলাদেশকে বাতিল করেনি; তাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুরা বরাবর বিদেশী ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছে, এবং ঐক্য বা মিলনের কথা বলেছে বা গান গেয়েছে বিংশ শতকে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত হয়েই বা যখন ‘বাবুরা বিপদে ঠেকিয়াছে’। দিবালোকের মতো এ সত্যটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিক এবং রবীন্দ্রনাথের মতো পণ্ডিতকুলমান্য কবি— যা পূর্বে বিশদভাবেই দেখানো হয়েছে। মুসলিম সংস্কৃতির একটা বিশ্বময় রূপ আছে, তাই এ সংস্কৃতি কোথাও ভেসে বেড়ায় না, যেখানেই যায় গভীরে শিকড় চালনা করে সে দেশের ইসলামানুসারীদের জীবনাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়ে। যে মুসলিম-সংস্কৃতি পাঁচশো বছরেরও অধিককাল এদেশে একচ্ছত্রভাবে কোটি কোটি মন-মানসকে আবর্তিত ও প্রভাবিত করেছে, তাকে সংকর বা ভাসমান সংস্কৃতি বলায় ইতিহাস-জ্ঞানের দৈন্যই প্রকাশ পায়। বলাবাহুল্য, এ মন-মানস ছিল শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দুরও, এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের দ্বারাও।

মুসলমানের অপরাধ ছিল, তার মুখের ভাষা ও রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ছয়শো বছরেরও অধিককাল ব্যবহৃত ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে এককালে বরণ করে নিতে পারেনি, পারেনি নিজের জাতীয় কালচারের পরিবর্তে ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট মুৎসুদ্দি-দালালদের সংস্কৃতি বা বাবু কালচারকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে। প্রথমটির কারণ ছিল, মুসলমান দেখেছে ইংরেজ তাকে শাসক থেকে শাসিতে পরিণত করে এমনকি তার মুখের ভাষাও কেড়ে নিয়ে তাকে সব ক্ষেত্র থেকে স্থানচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। আর দ্বিতীয়টির কারণ ছিল, বাবু কালচার ও বাংলা সাহিত্য থেকে তাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে বর্জন করা হয়েছিল। নীরদ সি চৌধুরীর ভাষায় মুসলমানকে নব্য ভারতীয় কালচার থেকে ‘এক্সটানলি প্রলেতারীয়েতে’র মতো দূরে রাখা হয়েছিল; তবু যদি মুসলমান হিন্দুর এ জগতে প্রবেশের স্পর্ধা করতো তাহলে তাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে আসতে হতো।

সেকালীন মুসলমান তা পারেনি আত্মমর্যাদা ও আত্মসত্তা বিকিয়ে দিয়ে। অথচ তার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, আজকাল তাকে তারই বংশধরের হাতে ধিকৃত হতে হচ্ছে! পিতামাতাসহ আজ ধিকৃত হচ্ছেন ‘সংকর সংস্কৃতি গঠন’ ও অনুসরণ করার জন্যে এবং ইসলামী মূল্যবোধ ও ট্রাডিশন বিসর্জন দিয়ে ‘হিন্দু মধ্যবিশ্ত্রশ্রেণীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে’ পারিয়ার মতো পদলেহনশীল জীবে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য (?) থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যে।

এরূপ অসংগতিপূর্ণ সংকর ও অপরিপক্ক চিন্তার প্রবণতা জন্মে দুটি কারণে : প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে প্রত্যাী জ্ঞানের অভাব হলে অথবা অন্য স্বার্থবশে হীনমন্যতা জন্মালে ও প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করার মানসিকতার সৃষ্টি হলে। উভয় কারণই বেদনাদায়ক। সকলশ্রেণীর শূভবুদ্ধির ভিত্তিমূলেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত এবং কল্যাণ নিহিত। সকলেরই এ শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, এ আশাই করবো।

অবশ্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটা চেষ্টা চলেছিল মধ্যযুগে এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিরা পদাবলীও রচনা করেছিলেন, এটি ঐতিহাসিক সত্য। ধর্ম সমন্বয় ও ধর্মীয় ঐক্যের বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল রামানন্দ, একলব্য, দাদু, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস প্রমুখ প্রচারকদের দ্বারা; কিন্তু এসব ধর্মীয় সমন্বয়ের আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছিল হিন্দুধর্মেরই নিরাপত্তা রক্ষার ও হিন্দুর সামাজিক সত্তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রেরণা থেকে, এ কথাও আজ তর্কের বিষয় নয়। ঠিক এ ভাবেই হিন্দু সমাজের ভাঙন রোধকল্পে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল রামমোহনের দ্বারা এবং এ যুগে রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে গান্ধীর ‘রামধনু’ সংগীতও শেষ প্রয়াস হিসাবে ধরা যায়। কিন্তু এসব প্রচারকরা ছিলেন মূলত হিন্দু এবং মতবাদে প্রগতিপন্থী হলেও ধর্মে ও জাতিতে তাঁরা হিন্দুত্বের বৃত্তেই বিচরণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রচারের ফলে ‘উত্তরকালে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রচুর সুযোগ সুবিধাই হয়। সমন্বয় কর্মের কোনও প্রত্যক্ষফল জন্মেনি। জোলা শ্রেণীর কবীর এবং ধুনকর শ্রেণীর দাদু ও রজ্জব মুসলমান হলেও পূর্বসংস্কারগত মায়্যাবাদের ও হিন্দুর ধর্মীর শিক্ষার প্রভাবের প্রাবল্যহেতু এবং শরীয়তী ইসলামের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবহেতু তাঁদের আন্দোলনে কেবলমাত্র হিন্দুর ভাবরসের আবেগ প্রবল ছিল এবং তার দরুন ক্ষুদ্র-তম গণীর মধ্যেই সীমিত ছিল, বৃহৎ হিন্দু বা মুসলমান সমাজমানে কোন প্রতিক্রিয়া জাগেনি। রবীন্দ্রনাথও সত্যটি স্বীকার করে বলেছেন, তখনকার কালের দুই বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ; তাদের মধ্যে কিছুই প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয়, তবে তা অতি সামান্য।

আসলে অভাব ছিল আন্তরিকতার, সহৃদয়তার ও সহানুভূতির, অসম্ভব ছিল হাঁড়ীর ও নাড়ীর বন্ধন স্থাপিত হওয়া। ‘সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না... তাদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়’।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও নানাভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে এবং সাহিত্যে, শিল্পে ও সংগীতে দেয়া-নেয়ার অজস্র চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তারও প্রভাব ছিল অতি ক্ষীণ এবং দুটি সম্প্রদায়কে একই সমতলে সমাঙ্গীকরণের পক্ষে প্রচুর সমন্বয় সাধনের কথা তো চিন্তা করা যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক আমলে অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চেষ্টায় হিন্দু মন-মানসকে করে দিল সনাতন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদমুখী, আর মুসলমানদের মধ্যেও ফারায়েযী হেদায়তী প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলনের মারফত মুসলমান-মন-মানস হয়ে উঠল শরীয়তমুখী; ফলে সে ক্ষীণধারাটিও কোথায় বিলীন হয়ে গেল।

বাংলাভাষী অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ সাহিত্য-সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁদের কেউ করেছেন নেশার বোঁকে, আর কেউ করেছেন পেশা হিসাবে-ইসলামে শিথিল বিশ্বাসের কারণে নয়, কিংবা হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ ও ইসলাম বর্জনের উদ্দেশ্যেও নয়। রূপক হিসাবে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে সুফীতত্ত্বে সহজভাবে প্রকট করে মুসলিম মানসকে সুফীতত্ত্বে শিক্ষিত ও আকৃষ্ট করার উৎসাহহেতু তার ব্যবহার হয়েছিল, অনুরাগবশে নয়। ‘একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের আওতায় রচিত নহে।’ আহমদ শরীফের মতে বৈষ্ণব সাহিত্য প্লাবিত দেশে যখন ‘কানু ছাড়া গীত নাই’ তখন কেবল হজুগের বশেও কোনও কোনও মুসলিম কবি এ জাতীয় পদ রচনা করে থাকতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা উল্লেখযোগ্য :

‘পূর্ব পাকিস্তানের খ্যাতনামা কবিরাম শ্রীরমেশচন্দ্র শীল মাইজ-ভাণ্ডারপন্থী মারফতী গান লিখে ‘নুরের ঝংকার’ নামে কয়েকখণ্ড পুস্তিকায় তা প্রকাশ করেছেন। এতে রটে গেল যে, রমেশশীল মাইজ-ভাণ্ডার দরবারের মুরিদ হয়েছেন। কথাটি আমার কানে এলে আমি শ্রীরমেশচন্দ্র শীলকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘একবার উরুসের সময় মাইজ-ভাণ্ডার গিয়েছিলেন। দেখলাম দিনরাত

মাইজ-ভাগুরী গানের আসর চলছে। কিন্তু যারা গান বেঁধেছে, তারা ভাল করে বাঁধতে পারেনি, ফলে সুর-ভাল ভাল উঠছে না। আমি ভাবলাম একুশ গান লিখলে বেশ কাটতি হবে- আমার পয়সা হবে। তাই মাইজ-ভাগুরী গান লিখে ছাপিয়ে দিলাম।' এমনি পেশার লোভে না হোক, অন্তত জনপ্রিয়তার লোভে যে কোন কোন মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ লীলা ও শাক্তপদ রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। আবার নির্বোধের অন্ধ অনুকৃতিও যে ছিল না তা নয়; সন্তোষ, বাৎসল্য, গৌরচন্দ্রিকা, শাক্তপদ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণলীলার অনুকরণে নবীলীলা বর্ণনার প্রয়াসের মধ্যে এর আভাস আছে।'

অতএব দেখা যাচ্ছে, অন্য স্বার্থবশে বা অন্য প্রবৃত্তির তাড়নায় এসব শ্রেণীর কবিতা সৃষ্টি হয়েছে। অন্তরের বিশ্বাস বা প্রেরণার প্রত্যয়ে এসব কবিতা জন্ম লাভ করেনি। এজন্যে সাধারণ মনেও তার ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য হয়নি, তার আবেদনও ফলপ্রসূ হয়নি। সাহিত্যের মূল্যায়নেও এ শ্রেণীর কবিতা উচ্চস্তরের হিসাবে বিবেচ্য হয়নি। এজন্যে এসব কবিতার স্মৃতিও লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

ইংরেজ আমলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মন-মানস একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ আমলে মুসলমান সমাজটাই হিন্দুর দৃষ্টি থেকে নিষ্টিহ্ন হয়ে গেছে। তখন হিন্দুর এক চক্ষু থেকেছে প্রাচীন হিন্দু কালচারকে আবিষ্কার করে সনাতন বৈদিক ভিত্তিমূলে তার প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন করায়, এবং অন্য চক্ষু নিবদ্ধ রয়েছে পান্ডিত্য ভাবধারার প্রতি। এজন্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন একটিমাত্র সমন্বয় সাধনের- হিন্দু ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার। বরং এ যুগে আন্ডিনার পাশে অবস্থিতিটাই মুসলমানের অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং তার দরুন তার প্রতি হিন্দু বিরূপতা আরও কঠোর হয়েছে, বিতৃষ্ণা আরও পুঞ্জীভূত হয়েছে। তখন খাস বাবুর্চি মানিক সেখের হাতের রন্ধন-বিলাসী রবীন্দ্রনাথের চোখেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে : 'বাংলা ভাষায় পার্শ্ব শব্দ জমেছে বিস্তর তাছাড়া শহরে রাজধানীতে পারসীক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। কবির এই শোকাবহ খেদোক্তিতে মুসলমান সমাজ কবির ভাষাতেই জওয়াব দিতে পারে : সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি আমি- আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই, শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ!

যেখানে এতো বিরূপতা, এতো বিতৃষ্ণা, এতো অবিশ্বাস ও সন্দেহ, সেখানে সমন্বয় তো দূরের কথা, অন্বয় ঘটিয়ে বেঁচে থাকাই দুষ্কর। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক কেটেছে দুটি জাতির মধ্যে গাঁট ছাড়া বাঁধাবাঁধির আবেগ আর 'নব-প্যাণ্টের আসনাই' অভিনয়ের ভিতর দিয়ে কিন্তু সে মিলন কখনও প্রাণের মিলন হয়নি, কারণ প্রাণ যে তাদের একপ্রাণ নয়। তাই বারে বারে দেখা গেছে মিলনের

সুর কোথায় মিলিয়ে গেছে আর ‘শব্দ ছুটেছে বস্তু লইয়া ছকু মিয়া নিল ছোররা’।
বারে বারে এ উপমহাদেশের ‘আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা— করুণ চন্দ্রবিন্দু’।

মিলন যেখানে হয় না, সমন্বয় যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে একটিমাত্র পথই
খোলা থাকে। সে পথের ইংগিত দিয়ে গেছেন সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে
শান্তিকামী মহা-মানুষ, দিয়ে গেছেন সকল বিরোধ স্তব্ধ করার শাস্ত্রত ঘোষণা :

বলে দাও : হে অবিদ্বাসী সমাজ!

তোমরা যার এবাদত করো, আমি তার এবাদত করিনে;

এবং যার এবাদত আমি করি, তাঁর এবাদত করতে তোমরা তৈরী নও;

আর যার এবাদত তোমরা করছো, তার এবাদত করতে আমি তৈরী নই;

আমি যার এবাদত করছি তোমরা তাঁর এবাদত করতে তৈরী নও;

তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্যে; আমার কর্মফল আমার জন্যে।

মানুষ বাস্তবধর্মী। সাময়িক আবেগ-উত্তেজনা হয়তো ক্ষণিক চিন্তাবিভ্রম
ঘটাতে পারে, কিন্তু মানবমন কখনও তার সেবা তার সাধনা করতে পারে না, যার
মধ্যে প্রাণ বাঁচানোর অমৃতধারা মেলে না। এ সহজ সরল সঠিক পথের সন্ধান এ
দেশেরই এক হিন্দু বিদুষী মৈত্রেয়ী দিয়ে গেছেন আরও অতীতকালে: যেনাহম্
নাম্তা স্যাম্ কিমহম্তেন কুবমি- যার মধ্যে অমৃত মিলছে না, তা নিয়ে আমি কী
করবো? শুদ্ধ আদর্শ ও উপকরণ চাননি তিনি, তিনি চেয়েছিলেন অমৃত। জীবন-
ধারণই প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে মানুষ চিরকালই অমোঘভাবে
চূড়ান্ত পথই-বেছে নেয়। এ উপমহাদেশের মুসলমানরা সাতশো বছরেরও
অধিককাল এক আন্ডিনায় হিন্দুর সঙ্গে বাস করে এ ঐতিহাসিক সত্যটি উপলব্ধি
করতে ভুল করেনি- তার জাতি, তার ধর্ম, তার সংস্কৃতি পৃথক, পৃথক সত্তা
হিসাবেই এদেশের মাটিতে তার শিকড় বসে গেছে, পৃথকভাবে তার বিকাশ ও
প্রকাশ হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এবং এই পৃথক হয়ে যাওয়াতেই তার
শাস্ত্রত কল্যাণ নিহিত।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্য

তসদুদ আহমদ



ইসলামের ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা আপাতত আরবী, পারসী এবং উর্দু ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এই সব ভাষার প্রচলন আমাদের বাঙ্গালা দেশে তত বেশী নাই। ইহার কোনটিকেই দেশবাসীর মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা করাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল ভাষাবিদগণের নিকট আমাদেরকে রহুদিন পর্যন্ত ইসলামের ভাবধারার জন্য ঋণী থাকিতে হইবে। যাঁহারা ঐ সকল ভাষা জানেন তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় ইসলামের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যক মত ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দাদি ধীরে ধীরে বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলন করিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আপনাদের শব্দের প্রযুক্ত্যতা বা ভাবের মহত্ত্বতা উপলব্ধি করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাষা ও সাহিত্য এইরূপেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জীবিত ভাষামাত্রেরই এইরূপে তাহার বর্তমান সম্পদ লাভ করিয়াছে। আমাদের কোন কোন নবীন কবির আরবী ও পারসী শব্দ-বহুল পদ্য সাহিত্য আপাতত টীকা, টিপ্পনী সম্বলিত হইলেও সেই সময় সুদূরপর্যন্ত নয় যখন সেগুলি সাহিত্যের বৃক্কে বেমালুম স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজে বলুন, সাহিত্যে বলুন, এমন কি মানব-শরীরেও যখনই কোন নূতন কিছু প্রবেশাধিকার লাভ করিতে চায় তখনই বিষম দন্দ, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় কিন্তু কালে সেই নূতনই পরম পুরাতন, পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি টেবিলকে পীঠিকা, থিয়েটারকে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমাকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আদালতকে ধর্মোপাসনা বলিতে যাই, তাহা হইলে আপনারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবেন। নিপুণ শিল্পীর ন্যায় আপনি যদি উক্ত ভাব সম্বলিত বৈদেশিক শব্দসমূহ সহজ সরল ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করান, তাহা হইলে ভাষা বা সাহিত্যের উপর নিশ্চয়ই কোন অত্যাচার করা হইবে না। তাই বলিয়া ইদানীং মস্তব ও মাদ্রাসার জন্য মধ্যে মধ্যে যে একপ্রকার অস্বাভাবিক সাহিত্য দেখিতে পাই, তাহাতে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। এ সম্বন্ধে আমার কথা এই যে, এই কার্য

অত্যন্ত নিপুণতার সহিত করিতে হইবে এবং যিনি এ বিষয়ে তত সিদ্ধহস্ত ন'ন তিনি যদি এ চেষ্টা না করেন তাহা হইলে ভাল হয়। যাঁহারা এ কাজে পাকা, তাঁহারাই করুন; আমরা সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যের কোন কোন খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লেখক দেখা দিতেছেন যাঁহারা তাঁহাদের অর্থটা ভাষার বাঁধুনিতে ও ভঙ্গিতে লুকাইয়া রাখিতে চান। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অর্থটাকে দুর্বোধ্য করেন অথবা নকলের নাকালের মধ্যে পড়িয়া করেন তাহা বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। ‘বড্ড বোঝা যাচ্ছে’ এই ভয়ে যদি ইচ্ছা করিয়াই দুর্বোধ্য হন তাহা হইলে তাহারা পাঠকবর্গের প্রতি অবিচার ত করেনই পরন্তু সংসাহিত্যেরও সৃষ্টি করেন না। সংসাহিত্য তাহাকেই বলিব যাহা আপনার ভিতরকার সর্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে জগতের লোকের নিকট তাহাদের উপকারার্থে নিবেদিত হয়। এরূপ সংসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যিক।

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান তাহাকে তর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাব সমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমায় মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দু, আরবী, পারসী আমার ধর্ম্মের ভাষা কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজী লিখিলে আমাদের সংসার জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদঘাটন হইতে পারে; উর্দু, আরবী, পারসী লিখিলে আমরা ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য, কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয় আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না, কারণ ইতিপূর্বে উহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যিক। জগতটা আজকাল ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। নানা দেশের নানা ভাষার লোক আসিয়া আজ আমাদের কুটীরদ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা কৃপমণ্ডকের ন্যায় মাথা লুকাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং অপরের সহিত মনের ভাবের আদান প্রদান করিবার জন্য লেনাদেনার জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদের আরও দু'একটা ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আজকাল পাশ্চাত্য দেশ সমূহে মাতৃভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য একটা প্রাচীন ভাষা ব্যতীত এক বা ততোধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমানের জন্যও আমার মতে অন্তত দুইটি ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। যেহেতু ইংরাজী রাজভাষা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান ভাষা এবং সাহিত্যের হিসাবেও বড় সম্পদশালী ভাষা। অতএব ইংরাজী আমাদের কাছে শিখিতেই হইবে।

তারপর আরবী আমাদের কোরানের ভাষা; যাহারা কোরানের রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না তাঁহাদিগকে মূলভাষা শিক্ষা করা দরকার। এই ভাষা শিক্ষা-বিভ্রাট লইয়া আমাদের বহু সময় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও আবিষ্কৃত হয়। আমরা যদি মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি তাহা হইলে আমাদের আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত সাধকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায় নম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই কঠিন সমস্যার সমাধানে কৃত সঙ্কল্প হইতে হইবে। আলাদীনের প্রদীপ আমাদের কাছে হাতে তুলিয়া দিবে না। একদিনেই আমাদের মুসলিম সাহিত্য সমাজকে সর্ববিষয়ে গরীয়ান করিতে পারিব না।

বাঙ্গলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের অভাব এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্তব্য সম্বন্ধে দুই চারি কথাই উল্লেখ করিতেছি। নবীন লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, তাঁহারা সাহিত্যের আসরে নামিয়াই অন্তত কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্য এক দুর্নিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কবিত্বের পরিচায়ক স্বরূপ চাঁদের আলো, কোকিলের কুহুধ্বনি, পত্রের মর্মর শব্দ, শ্রোতবিনীর কুলকুল রাগিনী হইতে আরম্ভ করিয়া চটিজুতা, পুঁইশাক, মিনি বিড়াল প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যায় না। বোধ হয় এটা কাল মাহাত্ম্যের দরুনই হয়। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমস্ত পৃথিবীটাই রঙ্গীন মনে হয়, কল্পনা রথে চড়িয়া বাস্তব জগতের উপর কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং সংসারের বন্ধুর, কঙ্করময় পথগুলি তখন চোখে পড়ে না। তারপর যত বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে

ততই বাস্তবের সহিত পরিচয়টা ঘনীভূত ও গাঢ়তর হয়, কবিত্ব, হা-ছতাস, ধীরে ধীরে উবিয়া যায়। ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে আমি কাব্যসাহিত্যের নিন্দা করিতেছি। কাব্যের যে কি মহীয়সী ক্ষমতা তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। তবে তাহা কাব্যের মত কাব্য হওয়া চাই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দিন তাহাতে অসার কল্পনার দাস হইয়া আল্পনশ্বরের আকাশ কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আত্মাহুতলা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করেন কাস্তিাবাবু, নরেন্দ্রবাবু, কোরান ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশ বাবু। আমরা কবে আমাদের রত্নরাজি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব? বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম্’ ইকবালের ‘তারানা’ আমাদের মধ্যে কবে গুনিব? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য কৌতুক, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, দীলিপকুমারের সঙ্গীত চর্চা, পুলিনদাসের লাঠিখেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন?

আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরম করুণাময় সর্বনিয়ন্তা আত্মাহুতলার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সার্থক করুন, আমাদের বিজয়মালায় বিভূষিত করুন, আমাদের সাহিত্যসেবাকে সফল করুন। আমিন।

(লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সপ্তগাতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

রাষ্ট্র-ভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা-সমস্যা

কাজী মোতাহার হোসেন



কোনো দেশের লোকে যে ভাষায় কথা বলে, সেইটিই সে দেশের স্বাভাবিক ভাষা। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আবার বাংলাদেশের ভাষা সম্বন্ধে সমস্যা ওঠে কি করে? সত্য সত্য এইটেই মজার কথা— যা স্বাভাবিক, তা অনেক সময় জটিল, বুদ্ধি দিয়ে সহজে বোঝা যায় না। একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করছি।

ধরে নেওয়া যাক, কোনো দেশের শতকরা ৯৯ জন বাংলা ভাষায়, আর বাকী শতকরা ১ জন মাত্র ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। আরও মনে করা যাক, এই শেষোক্ত ব্যক্তির বাগিছাসূত্রে বা শাসক-হিসাবে সে দেশে গিয়ে প্রতিষ্ঠাবান হয়েছে এবং অল্প শিক্ষিত বা অল্প বিত্তশালীদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে। তাই এরা সে দেশের লোকের প্রতি ও তার ভাষার প্রতি স্বভাবতই অশ্রদ্ধাবান। সে দেশের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে কাই-কারবার করা এরা অনাবশ্যক শক্তি-ক্ষয় বলে মনে করে, আর তাতে এদের আত্ম-সম্মানেও আঘাত করে বৈকি। অবশ্য, বিজিত জাতি বা শোষিত অধমর্ণের আত্মসম্মান থাকে না, আর তা শোভাও পায় না। বিশেষত উত্তমর্ণের ভাষা শিক্ষা করে তাদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখতে পারলে তাদের সম্মতি সাধন করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথও প্রশস্ত হয়। আর একটা প্রধান কথা, এইভাবে দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে নিজেদের বিরাট পার্থক্য সংরক্ষণ ও স্মরণ করে যথেষ্ট মর্যাদা অনুভব করা যায়। বিজেতা উত্তমর্ণের অনুগৃহীত এই সৌভাগ্যবানেরাই দেশের নেতা এবং জনগণের নামে সমুদয় সুবিধা ভোগের অধিকারী। বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় ইহা স্বাভাবিক, কারণ ‘মুট-মুকদের’ বঞ্চিত করায় ভয়ের কারণ নেই বরং না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।

এই হল মোটামুটি বাংলাদেশের এবং বিশেষ করে বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার মানসিক পটভূমি।

পাঠান রাজত্বে রাজভাষা ছিল পোস্তু, আর মোগল আমলে ফার্সী। মোগল-পাঠানেরা বিদেশী হলেও এদেশকেই জন্মভূমি-রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের অবস্থা জানবার জন্য দেশীয় ভাষাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে পাঠান-রাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ ও মহাভারত সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় অনূদিত হয়— তা ছাড়া ভগবত এবং পুরাণাদিও রচিত হয়। আগে

বাংলা ভাষা নিতান্ত অপুষ্ট ছিল এবং এ ভাষা জনসাধারণের ভাষা বলে পণ্ডিতদের কাছে অশ্রদ্ধেয় ছিল। তখনকার পণ্ডিতেরা কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষার আবরণে নিজেদের গুচিতা ও শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করতেন। রাজসুলভ উদারতার সঙ্গে গৌড়ের পাঠান সুবাদারগণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধাচরণ অগ্রাহ্য করত সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য (এবং হয়ত সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও গল্প-পিপাসা নিবৃত্ত করবার জন্য) এই সকল পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত রচনা করান। বলা বাহুল্য, দেশীয় কালচারের ধারা রক্ষা করবার পক্ষে এবং দেশবাসীর নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই সব পুস্তকের তুলনা নাই। কতকটা এই কারণেই আজ ভারতবর্ষের সামান্যতম কৃষকরাও এক-একজন দার্শনিক বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। বাস্তবিক দেশবাসীর ভাষা বৈদেশিক শাসকের উৎসাহ পেয়েছিল বলেই বাঙালীরা আত্মস্থ ছিল এবং ইসলামী সভ্যতার থেকে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় গ্রহণ করে নিজেদের জীবন ও সভ্যতাকে পুষ্টতর করতে পেরেছিল। অন্যদিকে, মুসলমান শাসকগণ এবং জনসাধারণও হিন্দু ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে কাল অনুযায়ী ইসলামের নব নব বিকাশ সাধন করে কার্যক্ষেত্রে স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের উদারতা ও সর্বোপযোগিতাই প্রমাণিত করেছে।

মোগল যুগে বিশেষ করে আরাকান রাজসভার অমাত্যগণ, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। মুসলমান সভাকবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা কবিতা লিখে অমর কীর্তি লাভ করেছেন। এঁদের ভাষা সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, উর্দু, প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু এঁরা জোর করে কোনও নির্দিষ্ট ভাষা থেকে বিকট বিকট শব্দ আমদানী করতে চেষ্টা করেন নি, তৎকালীন জনসমাজের নিত্য ব্যবহৃত বা সহজ-বোধ্য ভাষাতেই তাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন। মোগল পাঠানেরা মূলে বৈদেশিক হলেও এই দেশকেই তাঁরা স্বদেশ করেছিলেন। তাঁদের রাষ্ট্রভাষা পোস্ত বা ফার্সী রুঢ় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এদেশীদের আদর্শকে গ্রাস করতে চায়নি, বরং এদেশীয় ভাষাকে রাজকীয় উৎসাহ দিয়ে মোগল-পাঠান বাদশাহ ও সুবাদারেরা এদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই দেশবাসী রাজভাষা শিক্ষা করেও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এমন কি বৈদেশিক ভাবধারায় সিদ্ধান্ত করে তার শ্রীবৃদ্ধিও সাধন করেছিলেন।

এর পর এল ইংরাজ রাজত্ব। কিছুদিন পরে, ইংরাজী হল রাষ্ট্রভাষা। হিন্দুরা সানন্দে নূতন প্রভু ও তার ভাষাকে বরণ করে নিল, কিন্তু মুসলমানেরা নানা কারণে তা' পারল না। রামমোহনের যুগেও তার উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি, হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিন্ত ভদ্রলোকের মধ্যে তুলনায় মুসলমানই ভদ্রতায়, বিচারবুদ্ধিতে

এবং কার্যপরিচালনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উপরোক্ত কারণ এবং রাকজীয় ভেদনীতির ফলে আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সমুদয় ব্যাপারে মুসলমান তলায় পড়ে গেল এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মনে পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা ও হিংসার সৃষ্টি হল। বাংলা ভাষাও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ল। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতেরা একে সংস্কৃতের আওতায় নিয়ে কেবল হিন্দু সভ্যতার বাহন করে তুলল। আর মুসলিম অর্ধশিক্ষিত মুন্সীরা আরবী-ফার্সীবহুল এক প্রকার ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করল। দুই দিকেই বাড়াবাড়ি হল। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে পণ্ডিতি বাংলা টিকে গেল, মুন্সীয়ানা বাংলা লুপ্ত হল। অবশ্য বর্তমান গণপ্রাধান্যের যুগে ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতি বাংলাও সরল হয়েছে।

কিন্তু আজ ইংরাজ প্রভুত্বের অবসান ঘটেছে—১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়, ১৮৩০-৪০ সালে ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা, ১৮৫৭ সালে হিপাহী-বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণাম সব গ্লানিকে সার্থক করে ১৯৪৭ সালের জাতীয় জয়-পতাকা উড়ুত্বীন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের সামনে বিরাট কর্তব্য আর গুরু-দায়িত্ব উপস্থিত হয়েছে। আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সমবেত চেষ্টার ফলে আশা করা যায় যে, দেশের দারিদ্র, স্বাস্থ্যহীনতা, অশিক্ষা এবং অন্তর্ভন্দ্র দূর হয়ে সাধের পূর্ব-পাকিস্তান আবার গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। দারিদ্র্য দূর করতে হলে সামাজিক বৈষম্য দূর করা, বৈদেশিকের শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা, এবং জাতীয় সম্পদ যাই থাক, শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে তার সুবিনিময়ের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যিক। শুধু ইংরেজের প্রভাব কিছুটা খর্ব হলেই হবে না—ইংরেজের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য প্রদেশীয় লোকে দখল করে না বসে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন। কুচক্রী লোকেরা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, ভাষার বাধা সৃষ্টি করে নানা অভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের মানসিক বিকাশে বাধা না জন্মাতে পারে সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে।

ভাষার বাধা একটি জাতিকে কিভাবে পঙ্গু করে রাখতে পারে তার উদাহরণ ত আমরাই অর্থাৎ ভারতের হিন্দু-মুসলমান এবং বিশেষ করে পূর্ব বাঙলার মুসলমানেরাই। ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হল এবং শিক্ষার বাহনও হল। ফলে, প্রচুর মানসিক শক্তি ব্যয় করে পাঁচ বছরের জ্ঞান দশ বছর ধরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা হল, কিন্তু বৈদেশিক ভাষার ফলে—সে জ্ঞানও নিতান্ত ভাসা ভাসা বা অস্পষ্ট হয়ে রইল। ছাত্রদের মুখে উপলব্ধিবিহীন লম্বা লম্বা কোটেশন বা গালভরা বুলি শোনা যেতে লাগল। আরও এক বিষয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল। সে হচ্ছে ভারতবর্ষে বৃটিশের শিক্ষা-নীতি। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্য বিষয় এমনভাবে নির্ধারিত হয়েছিল,

যাতে কার্যকরী শিক্ষার বদলে কতকটা মন-বুঝান মত পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত হয় মাত্র। তাই দেশে বি. এসসি, বি.এল এবং এম. এসসি, বি. এল এর সংখ্যা অল্প নয়, অথচ বৈজ্ঞানিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নগণ্য। অবশ্য ইংরেজী শিক্ষায় লাভও যে কিছু হয়েছিল তাও অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের এই সাধারণ পঙ্কতার উপরেও বিশেষ করে পূর্ববাঙলার মুসলমানের আড়ষ্টতার আরও দু'টি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাঙলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষা সম্পর্কিত মনে করে বাঙলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ। ফলে বাঙালী মুসলমান, বাদশাহদের প্রবর্তিত ফার্সী সভ্যতা ভুলে গেল, আর বাঙলা ভাষার সাহায্যেও ইসলামী ঐতিহ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করল না। উর্দুর স্বপক্ষে যতই ওকালতী করা যাক, সেটা যে আসলে পরকীয় ভাষা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর নাড়ীর সঙ্গে যোগ না থাকায় উর্দু ভাষার সাহায্যে ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নি, কারণ ভাষা ভাষা দু-চারটা বুলির সংযোগে জাতীয় বা ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা বাস্তবিকই অসম্ভব। পুঁথি-সাহিত্যের সাহায্যে যা কিছু রক্ষা হয়েছিল, তাতে বাঙালী মুসলমান-চাষীর মনের ক্ষুধা অনেকটা পরিতৃপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু শিক্ষাভিমানীদের অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ফলে সাধারণ জন-সমাজ সে সম্পদও প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। তাতে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে যেন কোন জিনিসই নাই, পরের মুখের ভাষা বা পরের শেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী, বিদেশীই যেন তা আপন। তাই তার উদাসী ভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আত্মহীনতা। পশ্চিমা চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে, বৃহৎ পাগড়ী বেঁধে বাঙলাদেশে এলেই এদেশে পীর হওয়া যায়, কন্মের পক্ষে মৌলবীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু-পয়সা রোজগারের যোগাড় হয়। শহরে দোকানদার যেমন করে গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠিকিয়ে লাভবান হতে পারে, এ যেন ঠিক সেই অবস্থা। বাস্তবিক বাঙালী মুসলমান 'বাঙাল' বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।

এই দৈন্য ও হীনতা-বোধের আসল কারণ, আমরা মাতৃভাষা বাঙলাকে অবহেলা করে ফাঁকা ফাঁকা অস্পষ্ট বুলি আওড়াতে অভ্যস্ত হয়েছি। এই সব কথা আমাদের অন্তর-রসে সিঞ্চিত নয় বলেই আমরা কথার মধ্যে জোর পাইনে। বর্তমানে ইংরাজের প্রভাব কমে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র অতিরিক্ত হিন্দু-প্রভাব থেকে মুক্ত মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট বাংলা ভাষা রচিত হবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। মুসলিম ভাবধারার ঘাটতি পূরণ

করে নিয়ে মাতৃভাষাকে পুষ্ট এবং সমগ্র রাষ্ট্রকে গৌরবান্বিত করবার দায়িত্ব এখন আমাদের উপর। এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিষ্কিন্ত আরামে বসে বলেছে যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে ত তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করবার দায়িত্ব মুখ্যত মুসলমান সাহিত্যিকদেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে, মুসলমান বিদ্যার্জন পুঁথি-সাহিত্যের স্থলবতী বাংলা-সু-সাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন : তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতা-বোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধনী দিয়ে আমাদের কোনো কালেই যথার্থ-লাভ হবে না। আল্লার কাছে উর্দু বেশী আদরের কিংবা বাংলা হতাদরের সামগ্রী নয়। উর্দু আরবী থেকে গৃহীত বলেই যে উর্দু ভাষা মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা একথাও যথার্থ নয়। গোড়ায় উর্দু মোগল-রাজ্যের নানা দেশীয় সৈনিকের তৈরী একটি খিচুড়ী ভাষা ছিল কিন্তু তাই বলে অশ্রদ্ধেয় নয়। আরবী, ফার্সী, প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে উর্দু ভাষা সমৃদ্ধ। কালে কালে অবশ্য মৌলভী ও পণ্ডিতের টানাটানিতে আরবী-উর্দু এবং সংস্কৃত-উর্দু, দুই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, হায়দ্রাবাদ এসব জায়গার উর্দুর মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উর্দুতে মৌলিক সাহিত্যের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ হয়ত সামান্য, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্যসত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহর মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথচ বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম সঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত। তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই; ব্যাপারটা শুধু ধনিজ মোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মোহে আমরা আর কতদিন আবিষ্ট থাকব? আমাদের জগৎ-সংসারের দিকে তাকাতে হবে, তার জীবন-স্রোতের সঙ্গে সমান তালে চলতে হবে। সুতরাং স্বপুচালিতের মত বা কলের পুতুলের মত না চলে মানুষের মত চলতে হবে। আমাদের মোহাবেশ কাটাতে হবে, চোখ মেলে বিষয় ও ব্যাপারের যাচাই করে নিতে হবে। সেই চলাই হবে আমাদের প্রকৃত স্বাধীন চলা। এর একমাত্র সহায় হচ্ছে মাতৃ-ভাষার যথোপযুক্ত চর্চা এবং জীবনে যা কিছু সুন্দর, লোভনীয় বা বরণীয় মাতৃ-ভাষার মারফতেই তা সম্যক অর্জন করা। আমাদের এই মাতৃ-ভাষা ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না।

অবশ্য সম্পূর্ণ জীবন বলতে আত্মকেন্দ্রিক জীবন বুঝায় না, দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন-যাত্রাই বুঝায়। কাজে কাজেই ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে সম্পর্ক

রাখার জন্য ভিন্ন ভাষাও শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু এ শিক্ষা, মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ শিক্ষার পটভূমির উপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, মাতৃভাষার পরিবর্তে কিছুতেই নয়। বলা বাহুল্য, আমাদের আশেপাশে যেসব লোক বাস করে, তাদের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক নিকটতম-কাজেই তাদের দাবীই অগ্রগণ্য, দূরবর্তীদের দাবী এর পরে। তাই মাতৃভাষায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর, প্রয়োজন মত অন্য ভাষা শিক্ষা করতে হবে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু মাতৃভাষা, পরে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর শেষ তিন-চার বছর এর সঙ্গে প্রয়োজনমত অন্য একটি বা দুটি ভাষা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে এইসব দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষার শিক্ষাও দ্রুততর এবং অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হবে। শিক্ষার বাহন অবশ্যই মাতৃভাষা হবে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হলে, হয়ত ইংরেজী ভাষাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে। কিন্তু এর উপর অত্যধিক জোর দেওয়া এখন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। রাষ্ট্রের ভিন্ন-প্রদেশীয় লোকদের বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে আমার বিবেচনায় পঞ্জিতি ও মৌলবী-উর্দুর মাঝামাঝি ধরনের উর্দুই সবচেয়ে বেশী উপযোগী হবে। এই দিক দিয়ে বর্তমানে উর্দু ভাষারও সংস্কার করা আবশ্যক। বৃথা অহমিকা বা অন্ধ গৌড়ামি ত্যাগ করে একযোগে কাজ করলে বোধ হয় উর্দু ও হিন্দীর পার্থক্য কমিয়ে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের উপযোগী একটি বলিষ্ঠ অর্থাৎ সহজ Lingua franca বা সার্বভৌম ভাষা সৃষ্টি করা যেতে পারে। ম্যাট্রিকুলেশনের শেষ তিন-চার শ্রেণীতে এ ভাষা শিক্ষা দিলে বোধ হয় ছাত্রেরা মোটামুটি ধরনের ব্যাপক কালচারের অধিকারী হতে পারে; আর যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষা শেষ করে, তারাও অকারণ ভাষা-নিষ্পেষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শুধু মাতৃভাষার সাহায্যেই আবশ্যক জ্ঞান ও স্বকীয় কালচারের স্বাদ পেতে পারে!

শিক্ষার বাহন ও সার্বভৌমিক ভাষা ছাড়াও ভাষা-সমস্যার আর একটা দিক আছে-সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা কি হবে। এতদিন ইংরেজ প্রভু ছিল, কাজেই রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী ছিল অর্থাৎ রাজভাষাই রাষ্ট্রভাষা ছিল। রাষ্ট্র-ভাষা বলতে অবশ্য বুঝায়, আদালতে কোন্ ভাষায় রায় লেখা হবে- কোন্ ভাষায় শিক্ষিত হলে সরকারী উচ্চপদ পাওয়া যাবে, রাষ্ট্রের চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হবে, ইত্যাদি। এক কথায় কোন্ ভাষায় শিক্ষার জন্যে সরকার থেকে সবচেয়ে বেশী ব্যয় বরাদ্দ হবে, এবং কোন্ ভাষায় শিক্ষিত হলে রাষ্ট্রের চক্ষে অধিক শিক্ষিত বলে বিবেচিত হবে।

অতএব পূর্ব-পাকিস্তানের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাঙলাই হওয়া স্বাভাবিক এবং সমীচীন। কোনও কোনও পরমুখাপেক্ষী বাঙালীর মুখেই ইতিমধ্যে উর্দুর ঝনৎকার শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এঁদের বিচার-বুদ্ধিকে প্রশংসা করা যায় না। আগেই উর্দুর মোহ এবং তার কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। এ সমস্ত উজ্জি কলের মানুষের অবোধ অপুট

মনেরই অভিব্যক্তি। এতে বাঙালীর জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। এর ফলে এই দাঁড়াবে যে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ-রাজের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে অমনিই পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচি-রাজের কবলে যেয়ে পড়বে। ধর্মের অন্ধ উন্মত্ততায় মেতেই অনেকে উর্দু-উর্দু হুঙ্কার ছাড়ছেন; কিন্তু আগেই বলেছি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে না হলে প্রকৃত ধর্মবোধ বা ঐতিহ্য-জ্ঞান কখনও বাঙালীর অন্তরে প্রবেশ করবে না। এর জন্য চাই অনুবাদ কমিটি গঠন করে অন্য ভাষা থেকে অবিলম্বে ধর্ম ও সভ্যতার যাবতীয় প্রধান প্রধান বিষয়ের ভাষান্তরকরণ। এই কর্তব্যে উদাসীন থেকে পরের উচ্চিষ্ট ভোজন করে পেটও ভরবে না তৃপ্তিও হবে না। জাতির স্থায়ী মঙ্গল এ ভাবে কখনও হবে না। উর্দুকে শ্রেষ্ঠ ভাষা, ধর্মীয় ভাষা বা বনিয়াদী ভাষা বলে চালাবার চেষ্টার মধ্যে যে অহমিকা প্রচ্ছন্ন আছে তা আর চলবে না। নবজগত জনগণ আর মুষ্টিমেয় চালিয়াত বা তথাকথিত বনিয়াদী গোষ্ঠীর চালাকীতে বলবে না। বরং পূর্ব-পাকিস্তানে সরকারী চাকুরী করতে হলে প্রত্যেককে বাংলা ভাষায় মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষানবিশী সময়ের পরে অযোগ্য এবং জনসাধারণের সহিত সহানুভূতিহীন বলে একরূপ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে।

সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলা ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তবু আমরা পশ্চিম-পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের জনসাধারণের স্বাভাবিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি হবে। সুতরাং পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু বা পোস্তু এবং পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ব্যবস্থা মোটেই অশোভন নয়; রাশিয়ার মত বা কেনেডার মত আধুনিক ও উন্নত দেশে বহু রাষ্ট্রভাষার নজির আছে। রাশিয়ার পরস্পর সংলগ্ন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে যদি একাধিক রাষ্ট্রভাষা হতে পারে, তাহলে পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলার মত হাজার দেড় হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানে অবশ্যই দুটি রাষ্ট্রভাষা হতে পারে, এবং তাই স্বাভাবিক। রাশিয়ার জনমতের প্রাধান্য আছে অর্থাৎ জনগণই প্রকৃত রাজা তাই জোর করে ভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার মত মনোবৃত্তি সেখানে মাথা তুলতে পারে না। আমাদের দেশেও, নূতন পাকিস্তান রাষ্ট্রে, জনগণ প্রমাণ করবে যে তারাই রাজা-উপাধিদারীদের জনশোষণ আর বেশীদিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধুমায়িত অসন্তোষ বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তা'হলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে! জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য।

(লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সপ্তম সংস্করণে ১৯৪৭ সালে)

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য কেন?

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী



‘অল্পদিন হইল মুসলমান শিক্ষিতদের দৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা এবং এই মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবা ব্যতীত আমাদের সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে বর্তমান সময় নূতন করিয়া পদার্পণ করিয়াই মুসলমানেরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য-সমিতি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং একটা মোসলেম বাঙলা সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছেন।

হিন্দুরা প্রশ্ন করেন, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের ন্যায় সাহিত্য-সেবাক্ষেত্রেও মুসলমানদের এই স্বাতন্ত্র্য কেন? হিন্দু ভ্রাতাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা এ বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিতেছি।

প্রথমেই বলা উচিত যে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের ন্যায় মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সবার ব্যাপারেও যদি মুসলমানদিগকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে না হইত, যদি হিন্দুদের সাহিত্য পরিষদের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া গিয়া সাহিত্য সেবার পথে অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ও সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা কেহ অধিক সুখী হইতেন না।

মুসলমানেরা সাহিত্য ক্ষেত্রে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী কেন—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কিঞ্চিৎ ‘গোড়ার কথা’ বলিয়া লইতে হইবে।

সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্য কি? —‘নির্জলা’ আর্টভক্তদের মতামত যাহাই হোক না কেন, যাহারা আর্টের উদ্দেশ্যহীনতা মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক ও অসমর্থ, তাঁহারা বলিবেন যে, সমাজকে বর্তমান অপেক্ষা একটা বিরাটতর, উচ্চতর, মহত্তর, সুন্দরতর ভবিষ্যতে দিকে গতিশীল করিয়া দেওয়াই প্রকৃত সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু সে ভবিষ্যতের স্বরূপ কি? সাহিত্য-শিল্পীদের নির্মিতব্য সে ভবিষ্যৎ সৌধের ভিত্তি কি? এক কথায় তাহার ভিত্তি হইতেছে জাতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার সার্বজনীন উপকরণগুলি। ফলকথা, যে সমাজের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, তাহার নিজস্ব জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা ও কর্মসাধনার বিস্তারিত সাহিত্যিক তাহার নিপুণ তুলিকার সাহায্যে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া একটা মোহন সুন্দর আদর্শরূপে তাহার সম্মুখে ধরিবেন, ইহাই তাহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যুগধর্মের প্ররোচনায় এবং অন্য

সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতের ফলে কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে নব নব রূপ ও রস গ্রহণ করা যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন, তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে সে কোনমতেই বিসর্জন দিতে পারে না; দিলে তাহাকে আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয়; যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যত কোন সমাজ অন্যের দ্বারা পরাজিত ও পরিপ্লাবিত হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় এ পাপে কখনও লিপ্ত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। সুতরাং মুসলমান সমাজও যে অনুরূপ মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

বর্তমানে বাঙলার মুসলমান সমাজকে দুইটি বিরাট বিসদৃশ সভ্যতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথম, ইউরোপীয় সভ্যতা; দ্বিতীয়ত, ভারতের হিন্দু সভ্যতা। ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি বহিরঙ্গের সহিত ইসলামী সভ্যতার বিরোধ থাকিলেও অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে ইউরোপ আজ বিশ্বজয়ী হইয়াছে, আরব বা ইসলামী সভ্যতাই সে বিষয়ে তাহার শিক্ষাগুরু। এ কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত আমাদের তেমন প্রত্যক্ষ ও নিকট সংঘর্ষ বিদ্যমান নাই। পক্ষান্তরে হিন্দু সভ্যতার সহিত ইসলামী সভ্যতার বিন্দুমাত্রও মিল বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ; বহুযুগ পূর্ব হইতে এই বিশিষ্ট রূপেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে; ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক এক অদ্বিতীয়, নিরাকার, সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান আল্লার উপাসনা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই ইসলামের উদ্ভব। ইসলাম জাতিভেদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা, এবং সকল মানুষই এক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত—ইহাই কোরআনের অভিমত! এমন দুইটি পরস্পর বিরোধী সভ্যতার মধ্যে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সাংসারিক জীবন কর্মের সংঘর্ষ হইতেছে। সাহিত্য-সেবা ক্ষেত্রেও এই সংঘর্ষ অবশ্যস্বাভাবী, এজন্য মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা কাহারো অবিদিত নহে, যে, হিন্দু-সেবিত বাঙ্গলা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়াই দণ্ডায়মান। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রক্তে-মাংসে, অস্থি-মজ্জায় বিজড়িত রহিয়াছে। মুসলমানকে নিজের সঙ্গী, সহচর ও দোসর রূপে পাইবার আশায় হিন্দু কখনও বাঙ্গলা সাহিত্যের অঙ্গ হইতে তাঁহার নিজস্ব সভ্যতার এই ছাপগুলি তুলিয়া লইতে রাজী হইবেন না। পক্ষান্তরে মুসলমানও নিজের সার্বজনীন বিশিষ্টতাগুলি বিসর্জন দিয়া হিন্দু সেবিত বাঙ্গলা সাহিত্যকে নিজস্ব

বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না কিংবা হিন্দুর অঙ্গ অনুকরণ দ্বারা নিজের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে সম্মত হইবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুরা শ্রদ্ধা করেন; কারণ তিনি স্বদেশ মন্ত্রের পুরোহিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে কি দিয়া গিয়াছেন? তিনি যে স্বদেশিকতার আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন, মোসলেম বিদ্রোহকেই তাহার ভিত্তি করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ সঙ্গীত—‘বন্দে মাতরম্’ গান পৌত্তলিকতার ভাবে পরিপূর্ণ, তাহা কোন অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী নিজের ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। তথাপি হিন্দুরা এই সঙ্গীতটিকেই হিন্দু-মুসলমানের সিংহিলিত জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যাহারা অগ্নিমন্ত্রের সাধন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারাও ঘোর পৌত্তলিকতার মধ্য দিয়া মোসলেমহীন বাঙ্গলা বা ভারতের কল্পনা করিয়া নিজেদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। হিন্দু সেবিত সাহিত্যের প্রভাব এই ভাবে জাতীয় মনের উপর কার্য করিয়াছে। ইহাকে মুসলমানেরা যুগপৎ ভয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত অসামান্য প্রতিভা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গ মাত্র। যেভাবে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য ভাবে তাহার বিকাশ বা প্রকাশের উপায় ছিল না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অসামান্য হইলেও তাহা সার্বজনীনতার সুউচ্চ গ্রামে আরোহণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে সমালোচনা করিয়া লাভ নাই। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-সেবিত বঙ্গ-সাহিত্য হিন্দু সভ্যতা হইতে রূপ-রস সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। পৌত্তলিক হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়া, পৌত্তলিক সংস্কৃত প্রাকৃত সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া, পৌত্তলিক হিন্দু মনের ছাপ সর্বত্র ভিতরে বাহিরে ধারণ করিয়া এই সাহিত্য বিরাজমান। মোসলেম সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে ইহা একান্তই মারাত্মক। মুসলমান ইহা বুঝিতে না পারিয়া একবার সর্বনাশের পথে উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব কবিদের কোমল মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সুললিত পদাবলীর রূপ রসে মজিয়া মুসলমান একবার নিজেকে হারাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব কবিতার সহজ সরল সৌন্দর্য্যে কিছুকাল সম্বোধিত থাকিবার পর মুসলমান ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন প্রাচীন বাঙ্গলা বর্জ্জন পূর্বক তাহার স্থানে দাঁত ভাঙ্গা সংস্কৃত আমদানী করিলেন তখন মুসলমানদের চৈতন্য আরও অধিক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। হিন্দু রাজকন্যা সংস্কৃতের চেহারা দেখিয়া তাহারা

একেবারে খতমত খাইয়া গেলেন। এই অবস্থা মোসলেম চিন্তে অতি শুভ প্রতিক্রিয়া করিল। তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জাখত ভাবে নিজের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানদের ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ বহুলভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতপ্রিয়তার ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টা দ্রুততর হইয়া উঠিল।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয় কুমার প্রভৃতি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক ও কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহাও স্বাভাবিক ভাবে হিন্দু-সভ্যতার দ্বারা অন্তরে বাহিরে অনুরঞ্জিত হইল। মুসলমানেরা কিছুদিন ইহা হইতে দূরে রহিলেন। কিন্তু সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শিক্ষিতেরা ক্রমশ এই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন; পুরাতন ‘মুসলমানী’ বাঙ্গলা লিখিত কেতাব পুঁথি আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গলাই শিক্ষণীয় বাঙ্গলা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। একদল মুসলমান লেখক এই অবস্থা সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে বিপদজনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা পুরাতন বাঙ্গলা ছাড়িয়া দিয়া তথাকথিত ‘সাধু’ বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কয়েকজনের মধ্যে হিন্দু-সাহিত্যের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, শুধু ‘বিষাদ সিন্ধু’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

তারপর এই বর্তমান যুগের বাঙ্গলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদিগের চেষ্টায় বাঙ্গলা ভাষা পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরল হইয়া আসিয়াছে। এজন্য এবং অন্যান্য কারণে শিক্ষিত মুসলমানেরা এখন বাঙ্গলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চা করিতে আসিয়া তাঁহার একটা অনাঙ্গীয় সন্ধীর্ণ সভ্যতার বিষবাল্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই পূর্বযুগের সন্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহারা আবার আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে নিজস্ব ধান-ধারণা, চিন্তা-সাধনা, ভাব-প্রেরণা আনয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মুসলমানদের নিজস্ব সভ্যতা ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহা ব্যতীত তাঁহাদের গতান্তর নাই।

পুরাতনপন্থী পণ্ডিতেরা এখনও মাঝে মাঝে হাঁকিয়া বলিতেছেন, যবন স্নেহের সংস্পর্শ হইতে বাঙ্গলার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চল। বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিযুগ হইতে মুসলমানদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সভ্যতার

উত্তরাধিকারী পৌত্তলিক হিন্দুর সঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সাহিত্য-সেবা করিতে গেলেই তাহাকে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির রাতুল চরণে ভক্তিকুসুমাজ্জলি উপহার দিতে হইবে। হিন্দু-সভ্যতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে-বর্তমান যুগে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-সাধনা ও তজ্জনিত শক্তি সামর্থ্যে বলীয়ান হওয়ায় হিন্দু-মানসিকতার সংক্রমণ অত্যন্ত তীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার আওতায় গেলে মুসলমানেরা স্বরূপ লুপ্ত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী। এই কারণে মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বৃকে তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার জন্য স্থায়ী আসন রচনা করিতে চাহেন।

প্রকৃত দেশকল্যাণের দিক দিয়া চিন্তা করিলে ইহাতে হিন্দুদের অসন্তুষ্টির কোন কারণ থাকিবে না। হিন্দু মুসলমানকে এবং মুসলমান হিন্দুকে বুঝিতে না পারিলে, বুঝিয়া উভয়েই মধ্যে মৈত্রী বিধানের একটা পথ পরিকল্পনা করিতে না পারিলে, এ দেশের কোন প্রকার স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে না। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত উদার ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে, তবেই উভয় সম্প্রদায় দেশের মঙ্গল সাধনে সমব্রতী হইতে পারিবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি মুসলমানেরা নিজস্ব ভাবধারা আমদানী করিতে না পারিল, তাহা হইলে হিন্দুরা তাঁহাদিগকে চিনিবেন, জানিবেন, বুঝিবেন কিরূপে? বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে; কেননা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দুরই সাহিত্য। মুসলমানকেও অতঃপর বাঙ্গলার মারফতে স্বকীয়স্বরূপ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে হইবে। যে ভাষা কেবলমাত্র হিন্দু চিন্তার বাহন, তাহা দ্বারা মুসলমানের সকল চিন্তা, সকল ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। এজন্য মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ অবাধে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত হওয়া আবশ্যিক। হিন্দু পণ্ডিত ইহাতে নিশ্চয়ই নাসিকা কুণ্ঠিত করিয়া বলিবেন, ঐ সকল স্লেচ্ছ ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে পাইবে না। প্রধানতঃ এই জন্যই হিন্দুর সহিত মুসলমানের বনিবনাও হইতেছে না। অবশ্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া যথেষ্ট ভাবে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহাতে আপত্তি করা অন্যায় নহে; কিন্তু যেখানে মুসলমানী পরিভাষার অর্থ ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু ভ্রাতারা এটুকুও মানতে রাজী নহেন।

দুঃখের বিষয়, মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও এমন দুই চারিজন আছেন, যাহারা মুসলমানদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসকে সন্ধীর্ণতা পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের নিজের দৃষ্টি এতই সন্ধীর্ণ অথবা স্বজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান এতই অল্প যে, পরের কু-যুক্তিকে তাহারা সহজেই পরম সু-

যুক্তি বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। তাহারা ভুলিয়া যান যে হিন্দুরা মুখে যত বড় বড় কথা বলুন না কেন, কার্য্যতঃ তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করিয়া চুনোপুটি সাহিত্যিক পর্যন্ত কেহই বাঙ্গলা সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতাকে বর্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-সভ্যতার জয়-গৌরব ঘোষণার জন্য বৃহত্তর ভারত আবিষ্কারের কল্পনায় অধীর হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও সাগর পাড়ি দিতে ক্রটি করিতেছেন না। ইহাতে যদি তাঁহাদের সন্ধীর্ণতা প্রকাশ না পায়, তবে মুসলমান বেচারারা তাঁহাদের সভ্যতার ছাপ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গে লাগাইয়া দিতে চাহিলে, তাহাকে সন্ধীর্ণতা বলা হইবে কেন? পরলোকগত গিরিশচন্দ্র সেন ভিন্ন অন্য কোন খ্যাতনামা হিন্দু বা ব্রাহ্ম সাহিত্যিক এ যাবৎ ইসলামী সভ্যতাকে ভালরূপে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। কেবল হিন্দু সভ্যতা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত। ইহাতে যদি তাঁহাদের সন্ধীর্ণতা প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসী মুসলমানদিগকে সন্ধীর্ণদৃষ্টি বলা হইবে কোন অপরাধে?

যে সুযোগের অভাবে বাঙ্গালী হিন্দুদের সহিত আমাদের প্রকৃত পরিচয় হইতেছে না, আমরা ইচ্ছা করিলেই যখন তাহাদিগকে সে সুযোগ করিয়া দিতে পারি, তখন আমরা তাহা করিব না কেন? হিন্দুরা যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে তাঁহাদের সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইতেছেন; আমরা মুসলমান সাহিত্যিকেরাও তেমনই ইসলামী সভ্যতার উপকরণগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তাহা না করিলে আমাদের কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং যাহারা বাঙলা ভাষায় মুসলমানী সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা কোন মতেই নিন্দার পাত্র নহেন, বরং সর্বথা প্রশংসা পাইবার অধিকারী।

আমরা নানা কারণে স্বতন্ত্রভাবে বাঙলা সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেও একটি বিষয়ে আমাদের সাবধান হইতে হইবে; বর্তমান যুগের হিন্দু-সেবিত সাহিত্যের ভাষা ও আমাদের ভাষায় যাহাতে গুরুতর রকমের পার্থক্য না ঘটে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কেন না, ঐ রূপ বৃহৎ পার্থক্য ঘটিলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমরা আবশ্যিক মত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু ঐরূপ শব্দ ব্যবহারে যেন আমাদের অতি লোভ না জন্মে। আমাদের এরূপ সাহিত্য সৃষ্টির নামে একেবারে ‘আমির হামজা’ বা ‘ছহিবড় সোনাভান’ বা ‘সুখ্য উজ্জ্বল বিবির কেচ্ছা’ রচনা করা কোন মতেই সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবশ্য আমাদের সমাজে দুই একজন লোক এমন আছেন যাহারা কোন ব্যক্তিকে ‘দয়ার পাত্র’ মনে না করিয়া ‘কাবেলে ব্রহ্ম’ মনে

করিলে ইসলামী-ভাব প্রকাশ পাইল বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা নিজেরাই দয়ার পাত্র, এবং বড়ই সুখের বিষয়, ইহাদের সংখ্যা, প্রতিপত্তি ও সাহিত্যিক যোগ্যতা নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। আমরা বাঙলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব আনয়ন করিতে যতই উৎসুক হই না কেন, এই রূপ উৎকট মনোভাব বর্জন না করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিত্যব্যবহার্য্য-নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কেবলা, জায়নামাজ, আল্লা, রসুল, পীর, ওলি, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, বেদাৎ প্রভৃতি শত শত ইসলামী পারিভাষিক শব্দ কোন মতেই বর্জন করা যাইতে পারিবে না। কেন না বাঙলা ভাষায় ঐ সকল শব্দের অনুবাদ হওয়া অসম্ভব। এই ভাবে উভয় দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি কোরআন। ইহার নিম্নে বিশ্বস্ত হাদিসের স্থান। তারপর ফেকা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ইসলামের এই সকল উৎস হইতে ভাবধারা সংগ্রহ করিয়া বাঙলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। তবেই আমাদের সাহিত্য-সাধনা সফল ও সার্থক হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, মুসলমান ও হিন্দু যদি এই ভাবে পৃথক সাহিত্য-চর্চায় ব্যাপ্ত হয়, তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন কবে হইবে, কিরূপে হইবে? আমাদের মনে হয়, এ যাবৎ মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলিলে অল্পকাল পরেই হিন্দুরাও তেমনই মুসলমানদের নিজস্ব ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচয় লাভ করিবেন। এই সময় হইতে উভয় সম্প্রদায় এক যোগে, একইভাবে সমবেত শক্তি প্রয়োগে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যা করিতে পারিবেন।

মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা-শক্তিশালী সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। হিন্দু ভ্রাতারাও ক্রমে ক্রমে মোসলেম-সেবিত সাহিত্যের প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইবেন। ইহার ফলে পণ্ডিতদিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। বাঙলায় এক শক্তিশালী সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে।’

(লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সপ্তগাত্রে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সনে)

নয়া সাহিত্যের বুনিয়াদ

মুজিবুর রহমান খাঁ



সাহিত্য আমাদের জীবনের প্রকাশ এবং আমাদের স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। আমাদের জীবন থেকে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি এবং আমাদের স্বপ্নে যে আদর্শের ছবি আঁকি, তাকেই সাহিত্যে আমরা সুন্দরের ভাষায় রূপ দেই। জীবনে আমরা অনেকে কামিয়াব হই, অনেকেই হতে পারি না এবং পরিপূর্ণভাবে কোন আদর্শ জীবনের ভিতর কেউই সফল ও সার্থক করতেও পারে না। বাস্তবের রুঢ় আঘাতে জীবনে আমরা পরাজিত হলেও আমাদের স্বপ্নের এলাকায় আমরা সকলেই অপরাজ্যেয় শাহানশাহ্। সেখানে আমরা সকলেই সার্বভৌম। সেখানে অধিকারের ও অনধিকারের সীমানা বলে কিছু নেই। সেখানে খুশীমত আমরা গড়ি এবং ভাঙ্গি। স্বপ্নেই আমাদের সকল সাধ তার চরম সার্থকতার সন্ধান পায়। আবার সাহিত্য আমাদের সে স্বপ্ন সাধেরই রূপায়ণ। তবে এখানে যেন একটা ভুল না করা হয়। সাহিত্য ছিন্নমূল অবাস্তব কিছু নয়। সাহিত্যের স্বপ্নলোক প্রত্যক্ষভাবে অবাস্তবের হলেও পরোক্ষভাবে তা আমাদের বাস্তব জীবনের সম্প্রসারিত কল্পলোক। বাস্তবের ব্যর্থতা সেখানে শুধু মুক্তি ও স্বাধীনতার অনুকূল পরিবেশে সার্থকতার ফুলে-ফলে ভরে উঠে। সুতরাং এ বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে দূরত্ব থাকলেও আসলে এ দুই-এর মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। বাস্তব জীবনে মানুষের মন যেন খাঁচায় বন্দী এবং সাহিত্যে সে মুক্তপক্ষ। সোজা কথায় বলা যায়, স্বপ্নের রঙীন গুল জীবনের গুলিস্তান থেকেই রস গ্রহণ করে থাকে। স্বপ্ন জিন্দেগীরই উপরতলার উর্ধ্বলোক মাত্র। জীবন হতে সে অবিজ্ঞান। এক কথায় সাহিত্য জীবনের আকাশ ও বাস্তবের স্বপ্ন।

আসল কথায় ফিরে আসা যাক। বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক প্রথম কথায় সাহিত্যিক, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশী এবং তৃতীয়ত মুসলমান। তার জীবনে ও স্বপ্নে ইসলামের প্রভাব আছে। বাঙ্গালীত্বের রং আছে এবং সুন্দরের প্রতি তার আনুগত্যের বন্ধন আছে। এছাড়া সে যমানার মানুষ, তার জীবন ও স্বপ্নে সে যমানার প্রশ্ন ও সমস্যার গ্রন্থিবন্ধন রয়েছে। এ অবস্থায় তার সাহিত্য কি হবে, তার উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। অবাস্তব চিন্তাবিলাসী ছাড়া সকলেই একথা মেনে নিয়েছে যে, জীবনে ও স্বপ্নে বাংলার মুসলমান ও হিন্দু এক নয়, স্বতন্ত্র। তাদের তমদ্দুনিক পরিচয়কে স্বাভাবিক দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করলে বলতে হয়, তারা যেন দুটি স্বতন্ত্র জগতের

অধিবাসী। এ দুটি জগত কাছাকাছি এবং ঘেঁষাঘেঁষি করে বহুদিন ধরে একত্রে অবস্থান করলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যের সীমারেখা কখনও অস্পষ্ট ও অসত্য হয়ে পড়েনি। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সত্য এবং মাঝে মাঝে মুসলমান হিন্দুর এবং হিন্দু মুসলমানের এলাকায় প্রবেশ করেছে। ফলে সেখানে তাতে অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে এবং মিলিত হওয়ার প্রস্তাব নতুনতর সমস্যা নিয়ে মাথা উদ্ধত করে দিয়েছে, একদল মুসলমান সাহিত্যিক তাই হিন্দুদেরকে দোষী সাব্যস্ত করতে চান, তা সকলেরই জানা কথা। কিন্তু এজন্য হিন্দুর দোষ দিতে যাওয়ার মত পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না। হিন্দুরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে তার সুর ও প্রকাশকে তার মনের মত করে রাঙিয়ে নিয়েছে এবং তা সে ঠিকই করেছে। ইহা না করে আর উপায় ছিল না বলেই সে তা করেছে। বাংলা জবানকে সে সংস্কৃত করে ফেলেছে, কিন্তু তা না করে তার কি-ই বা গতি ছিল। কোন জাতি তার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিদ্রোহ করতে পারে না। সে অন্যের গরজ ও লাভ-ক্ষতির দিকে তাকিয়ে তার তমদ্দনের তাগিদ, তার জাতীয় অন্তরাত্মার কামনাকেই সাহিত্যে কণ্ঠরোধ করতে পারে না। হিন্দু সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যকে তাঁদের জাতীয়ভাবে রঞ্জিত করছেন কারণ এটা তাঁরা করতে বাধ্য এবং এ করেছেন বলেই তাঁরা এমন সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করতে কামিয়াব হয়েছেন। তা না করলে তারা আত্মহত্যা করতেন। মুসলমানের গরজে হিন্দু সাহিত্যিকেরা আত্মহত্যা করতে অসম্মত হয়েছেন এজন্য আর যাই বলি না কেন, হিন্দু সাহিত্যিকদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না।

দোষ যদি কাউকে দেওয়ার থাকে তবে তাঁরা বাংলার একদল মুসলমান সাহিত্যিককে। এসব মুসলমান সাহিত্যিক নিজেদের জবান ভুলে নিজেদের তমদ্দন, প্রতিভা, স্বপ্ন ও আদর্শের কথা না ভেবে হিন্দু সাহিত্যের উজ্জ্বল চেরাগের দিকে প্রজাপতির মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এঁরা তাই হিন্দুদের অনুকরণে যেসব বাংলা লিখলেন, সেসব বাংলা সংস্কৃত বাহুল্যে হিন্দুদের রচনাকেও ছাড়িয়ে গেল। একজন খ্যাতনামা ও প্রবীণ মুসলমান কবি এক সাহিত্যসভায় খোলাখুলি সে যুগের মুসলমান লেখকদের মনোভাব জানিয়ে গিয়েছেন : সেকালের হিন্দুরা মনে করত যে মুসলমান বাংলা লিখতে জানে না, তাই আমরা জোর করে হিন্দুয়ানী বাংলায় ওস্তাদী দেখাতাম।

এ শ্রেণীর সাহিত্যিক মনোভাব এখনও মুসলমানের ভিতর প্রবল। মুসলমানের তমদ্দনিক জাগরণের ভীতি আজ হিন্দু সমাজকে যতখানি চঞ্চল করে তোলে নি, তার চাইতেও বেশী চঞ্চল করে তুলেছে এসব অনুকরণ সর্বস্ব কয়েকজন সাহিত্যিককে। বাংলার একদল মুসলমান সাহিত্যিক এ কথাটাই আজ বোঝাতে যাচ্ছেন যে, আমাদের সাহিত্যে আমাদের জীবন ও স্বপ্নের কথা, আমাদের জবান ও আমাদের

তমদুনের পোশাকে রসোত্তীর্ণ করে নিবেদন করতে হবে। আত্মঘাতী পরানুকরণের পথ হতে আমাদের সাহিত্যকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে ফিরাতে হবে।

শুধু একটা ব্যাপারে সত্যিকার হিন্দু এবং মুসলমান সাহিত্যিক এক হতে পারেন। সেটা হল সৌন্দর্য সৃষ্টির দৃষ্টিতে। সৃষ্টির সৌন্দর্য বিচার হবে রসের দিক হতে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বাংলাদেশী প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির বাইরে থাকে এর এই পরিচয় কিন্তু তার মূলদেশ থাকে অন্যত্র। প্রথম দৃষ্টিতে সাহিত্য সুন্দর হলেই সার্থক হল সত্য, কিন্তু সাহিত্য সুন্দর ও সার্থক হয় না এবং হতেও পারে না যদি না তার রসের যোগান আসে জাতির জীবন থেকে, তার তমদুনের অন্তঃসলীলা হতে। জীবনে ও তমদুনে যারা ভিন্ন, তাদের সৃষ্টি ও রসমূলও ভিন্ন। এই ব্যবধানকেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এ চেষ্টা আমরা অনেক করেছি এবং আমাদের সাহিত্যিক গুলিস্তানে এ নিয়ে অনেক গোলমালই আমরা বাঁধিয়েছি, ফুল আমরা ফোটাতে পারি নি। ফুল ফোটানোর সাধনাই যদি আমাদের সাহিত্যের বড় সাধনা হয় তবে এ গোলমালে আমাদের লাভ কি? সহজ সরল পন্থার ডাক এবার মেনে নেওয়াই হবে আমাদের আজ ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

আমরা হিন্দু মুসলমান এক হতে পারি নি, সমাজে আমরা আলাদা হয়ে আছি এবং সাহিত্যেও এতদিন ঝগড়াই করেছে। এ অভিজ্ঞতাকে বুদ্ধিমানের মত আমাদের কাজে লাগাতে হবে। যে পথ ধরে আমরা সমস্যার মীমাংসা করতে গিয়েছি, সে পথে আমাদের মীমাংসা ও মিলন এত দিনের চেষ্টায়ও সম্ভব হল না, কেন হল না, তার কারণও আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমাদের প্রতিভার সহজাত প্রবণতায়ই আমরা এক হতে পারি নি। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে যদি সত্যিকার কোন সৃষ্টি আমরা আশা করি, তবে তাকে আজ ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ স্বাধীনতাই সাহিত্যের প্রাণ, অনুকরণ দাসত্বেরই নামান্তর। নিজেদের তমদুনের প্রতি অবিশ্বাস এবং অপরের প্রতি অত্যধিক উচ্চ ধারণা পোষণের ফলে অনুকরণের প্রবৃত্তি জাগে। সাহিত্যের শৈশবে অনুকরণ তার শিক্ষার ও উৎকর্ষের ধাপরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তার আদ্যন্ত অনুকরণই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়ে পড়ে, তবে সে সাহিত্যে বড় সৃষ্টির আশা করা যেতে পারে না।

ইংরেজ আসার পর হিন্দু বাংলা সাহিত্যে এগিয়ে গেল। মুসলমানেরা তারপর যখন লিখতে আরম্ভ করল, তখন নানা কারণে হিন্দুদের কিছুটা অনুকরণ না করে আর পথ রইল না। শিক্ষানবিসীর কাজটা সঞ্চয়ের প্রথম ধাপ, তাই অনুকরণকে ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু অনুকরণেরও একটা সীমা আছে। অনুকরণের পথ ধরে একদল মুসলমান লেখককে সে পথে চিরদিন চলার জন্য আহ্বান করলেন। বহুদিন পূর্ব থেকেই এ অনুকরণের অন্ধ চেষ্টা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। আরও উচিত

ছিল হিন্দুদের নিকট হতে শিক্ষানবিসী ও অনুকরণের ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে নিজেদের জাতীয় সাহিত্যকে পুনর্গঠিত করার জন্য সুপ্রয়োগ।

হিন্দু সাহিত্যিকেরাও একদিন ইংরাজী পড়তেন এবং ইংরাজী লিখতেন। মাইকেল এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁদের মধ্যে কারো কারো ইংরাজী রচনার সুখ্যাতি ছিল। মাইকেলও একদিন স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি একজন মস্তবড় ইংরাজ কবি হবেন।

বাংলা সাহিত্যের হাল আমলের মূল প্রদর্শক যদিও এঁরা নন, তবু আর্টবাদী সাহিত্যের এরাই জনক; আর্টপৌরে বাংলা সাহিত্যকে কাব্য ও কথা সাহিত্যের রসালোকের পথে এরাই মুক্তি দিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই নবজন্মে এসব ইংরাজী নবিসদের ভূমিকা যে কত বড় তা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁরা বাংলা রচনার পশ্চাছুমিতে হিন্দু তমদ্দুনকেই রাখলেন এবং ইংরাজী টেকনিক, প্রকাশভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের পুনর্গঠনের ব্যাপারে অনেকখানি কাজে লাগালেন। হিন্দু বাংলা সাহিত্যের এই রেনেসাঁর মূলে কি করে ইংরাজী সাহিত্য সক্রিয় হয়েছিল, তা আজ আমাদের চিন্তা করবার প্রয়োজন আছে। বাংলা হিন্দু সাহিত্যের ভিতর আমাদের আত্মবিলোপের সাধনা আজ সর্বত্রও ত্যাগ করতে হবে। আমাদের সাহিত্যের নতুন বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে। এই পুনর্গঠনের দিনে আমাদের হিন্দু বাঙলা নবিস ও বিদেশী সাহিত্যের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। যমানার ভাবধারার সাথে আমাদের জাতীয় ভাবধারার যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আমরা এতদিন হিন্দু বাংলা সাহিত্যকে আমাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করে বহুদিন বহু ভুলের ফসল কুড়িয়েছি। সে ভুল আমাদের দূর হোক সেই হবে খুশীর কথা।

কিন্তু আমাদের বাঞ্ছিত নয়া রচনায় এতদিনের ভুল ও ব্যর্থতার শিক্ষাকে আমরা যেন কাজে লাগাতে পারি, অতীতের হিন্দু ইংরাজী নবিস সাহিত্যিক-দেরকে যেন আমরা স্মরণ করি। হিন্দু বাংলা সাহিত্যের অনুকরণ থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করেছি, আমাদের সাহিত্যিক পুনর্গঠনে যেন তাকে কাজে লাগাই। বিদেশ হতে যে জ্ঞান আমরা আহরণ করেছি, তাকেও যেন আমরা আপন করে লই। এ যদি করতে পারি তবে অতীতের ভুলের ফসল থেকেও আমাদের উপযোগী অনেক সোনা দানা কুড়িয়ে পাব। শিক্ষা গ্রহণের স্তর থেকে সৃষ্টির স্তরে এ ভাবেই আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব সমৃদ্ধ হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্যের সংগ্রহ ও সম্বলকে উপাদান হিসেবে আমরা গ্রহণ করব। তবে আমাদের জাতীয় প্রতিভার ও স্বপ্নসাধের অনুসরণ ও রূপায়ণ হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। তবেই আমাদের সাহিত্য সাধনায় সাফল্যের ফসল ফলবে।

আধুনিক সাহিত্যের ভাষা

মোহিতলাল মজুমদার



প্রায় এক শতাব্দীর কর্ষণ ও অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাষার যে রূপ দাঁড়াইয়াছিল, যে রূপটিকে আশ্রয় করিয়া বাংলার কবি-সাহিত্যিক রসসৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলেন, আজ যেন তাহাকে বর্জন করিবার একটা প্রবৃত্তি, বড় হইতে ছোট-সকলের ভিতরেই দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি?

নবতম সাহিত্যিক আদর্শ বা অতিশয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভা ইহার কারণ হইতে পারে না। কারণ, ভাষার ধাতু-প্রকৃতি-তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণ-প্রবৃত্তি-প্রত্যেক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিধান করে; এই হিসাবে ভাষা সাহিত্যের অধীন নয়, সাহিত্যই ভাষার অধীন। ভাষার প্রকৃতি জাতি অন্তর-প্রকৃতির সহিত অভিন্ন; সাহিত্যের ভাষা-জাতির ভাষা, জাতির রস-চেতনার উপরেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হয়; ভাষার সহিত সেই রসিকতার নাড়ীর যোগ আছে। ব্যক্তি-প্রতিভা যতই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হউক, একেবারে ভুঁইফোড় হইতে পারে না-অতি বড় কবি-প্রতিভারও একটা বংশক্রম আছে। ভাষার যে পটভূমিকার উপরে প্রতিভা তাহার প্রাণের রং ফলাইয়া থাকে, তাহাতে সে রং ফুটিত না-যদি সেই পটবস্ত্রখানি সমগ্র জাতির বংশপরম্পরাগত ভাব চেতনার নিত্য প্রবাহে মার্জিত ও বিশদ হইয়া না উঠিত। কবির চেতনা মূলে এই জাতীয়-ভাব-চেতনায় অনুগত-কবি-শক্তি যতই ব্যক্তি বলিয়া মনে হউক, তাহাতে সমগ্র জাতির মগ্ন-চৈতন্য স্ফূর্তি পাইয়া থাকে। সাহিত্যের ভাষা জাতির প্রাণ এ মনঃপ্রকৃতিবশে একটা বিশিষ্ট আকার লাভ করে; তাহা কৃত্রিম নয়, তাহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়া যায় না- তাহার মূলে জীবনের মতই একটা সত্যকার শক্তি সক্রিয় হইয়া আছে। এইজন্য, কোনও জাতির ভাষায় যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া থাকে- বচন-রচনার ভঙ্গি, শব্দ-অর্থের সঙ্গতি-প্রথা, উচ্চারণ-ধ্বনি-মূলক শব্দবিন্যাস, শব্দের ভাবধ্বনি বা ধ্বনিমূলক ভাব-ব্যঞ্জনার বিশিষ্ট রীতি- সেই সকলই তাহার প্রাণের গতিচ্ছন্দের অনুরূপ। এই সকল লক্ষণে ভাষার যে প্রকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে-কোনও ব্যক্তি বিশেষ বা লেখক-গোষ্ঠীর দ্বারা তাহার পরিবর্তন-চেষ্টা নিতান্তই জবরদস্তিমূলক অত্যাচার। ইংরেজীতে যাহাকে style বলে তাহা লেখকের নিজস্ব বটে, কিন্তু তাহা যদি ভাষার মূলে আঘাত করে, তবে তাহা style-ও নহে তাহা লেখকের মুদাদোষ। পূর্বেই বলিয়াছি, ভাষা ব্যক্তির নহে-জাতির;

কেবল, তাহাই নয়, জাতির সর্ব-সম্প্রদায়ের মিলন-ভূমি এই ভাষা। জাতির সমষ্টিগত আত্মা এই ভাষাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে; তাই ভাষায় যে সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহারই সাহায্যে যুগ-যুগান্তর বাহিত একটি অখণ্ড চেতন্য, বহু জন্মের জাতিস্মরণতার মত অক্ষুণ্ণ থাকে। ভাষাই সাহিত্যের সৃষ্টি ও স্থিতির নিদান।

ভাষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন দুই কারণে হইতে পারে—প্রথম, ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিপ্লব বাক্যরচনার অক্ষমতা, দ্বিতীয়, ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও লেখকের নিজ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার আগ্রহ—অতি উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবশে জাতীয় রীতি বর্জন করিয়া, একটা নবধর্ম-প্রচারের মত কীর্তি অর্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা। ভাষায় যে অনাচার প্রবল হইয়াছে তাহার মূলে এই দুই কারণ বিদ্যমান, এবং এই দুই কারণেরও মূলে যে এক গভীরতর কারণ আছে তাহার নাম—জাতির আত্মবৈষ্টিতা।

কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। তথাপি একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য-সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল—সেই সাধনার সেই পরিণতির মধ্যেই ভাষাগত আদর্শের বিনাশ-বীজও নিহিত ছিল, এবং আজও তাহা সক্রিয় রহিয়াছে—অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। অতএব এই দুই কারণকেই এক সঙ্গে ধরিতে হয়। যাঁহারা বাংলা ভাষার বর্তমান রূপান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং নবীন লেখকদিগকেই এজন্য দায়ী করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ ব্যাধির নিদান আলোচনা করেন নাই।

সকলেই জানেন, গত-যুগের শেষ ভাগে অর্থাৎ এই অতি-আধুনিক অনাচার প্রকট হইবার অনতিপূর্বে, বাংলা গদ্যরীতি লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের ঘোষণা-মন্ত্র ছিল এই যে বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই আসল বাংলা ভাষা, সাহিত্য গড়িতে হইবে সেই ভাষায়; অপর যে ভাষা সাহিত্যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহা পণ্ডিতী সাধুভাষা, অতএব তাহা কৃত্রিম অর্থাৎ সাহিত্যে আজকাল যে বস্তু বা বস্তু-তন্ত্র চলিতেছে, তাহার সূত্রপাত ভাষা লইয়া; ইহাই ভাষা-ঘটিত বাস্তববাদ। অলঙ্কৃত বা সুসংস্কৃত ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে উন্নত কবি কল্পনাও কৃত্রিম। বস্তু-তান্ত্রিক সাহিত্য যে জীবন-সত্যকে আদর্শ করিয়াছে তাহার তুলনায় বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেমন মিথ্যা, কথ্য ভাষার তুলনায় সাহিত্যিক সাধুভাষাও সেইরূপ কৃত্রিম। কিন্তু রহস্যের কথা এই যে আন্দোলনকারীরা রবীন্দ্রনাথেরই ভক্ত অনুচর,—সাহিত্যের ভাষা পরিবর্তন যে দেহের বেশ-পরিবর্তন নয়, এই রসিকজনেরা তাহা বিন্মত হইয়া, যে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকেও ধারণ করিয়া আছে, সেই সাহিত্যের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। গদ্যরীতি সম্বন্ধে সহসা

এই যে আন্দোলন, ইহারও পূর্বে বাংলা পদ্যে রবীন্দ্রনাথ চল্‌তি-ভাষার ছন্দ বা বাংলা-ছড়ার ছন্দকে আধুনিক গীতিকাব্যের কাজে লাগাইয়াছিলেন-ছড়ার ছন্দকে কাব্যছন্দে উন্নীত করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই নূতন ধরনের গীতিকাব্যের ভাষায় চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য-রচনার সঙ্কেত করিয়া থাকিবে। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা, এবং তাহারই লিপিবদ্ধ রূপ বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে, ও শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা করিয়াছিল।

গদ্যে বা পদ্যে, রবীন্দ্রনাথ যে নবত্বের স্পৃহা তাঁহার অধুনাতন রচনায় ব্যক্ত করেন-তাহার প্রেরণাও যেমন স্বতন্ত্র, তাহার অভিব্যক্তিও তেমনই। অতএব, এই নব-আন্দোলনের নায়করূপে, অথবা প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে রবীন্দ্রনাথকে খাড়া করিয়া যে বল সঞ্চয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে তাহা অর্থহীন। ঝাঁটি সাহিত্যের ভাষা, বা উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার শব্দ-বিগ্রহ, প্রতিভার প্রেরণায় যে নূতনতর দীপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইতে ভাষার আদর্শ-নিরূপণ বা রীতি পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ভাষাকে যাহারা জড় মৃৎ-পিণ্ডের মত যে কোনও ছাঁচে ফেলিয়া নব-নব ভঙ্গির উদ্ভাবনা করিতে চায়, তাহারা প্রতিভাহীন বলিয়া, ভাষার দিব্যমূর্তির সন্ধান পায় না। গদ্যে যাহারা চল্‌তি ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল-সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বরভঙ্গিতে আধো-আধো টানা-টানা উচ্চারণে যেধরনের কথাবার্তা হয়, ইহা সেই ভাষা; ইহাতে ‘ককনি’-উচ্চারণযুক্ত ‘ককনি’-বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনই ইহা বাঙ্গালী-সন্তানের মুখের বুলিও নহে।

এই ভাষাই খাড়া করা হইল পুঁথির ভাষার বিরুদ্ধে। পুঁথির ভাষার অপরাধ-তাহা পণ্ডিতের ভাষা অর্থাৎ পুঁথি লিখিতে হইবে মুখের বুলিতে, কারণ যাহারা পুঁথি পড়িবে তাহারা পণ্ডিতীর ধার ধারিবে না। সাহিত্যের সাধুভাষাকেও আমরা মাতৃভাষা বলিয়া থাকি; যদি সে ধারণা ভুল হয়-পণ্ডিতী পিতৃভাষা যদি বর্জন করিতেই হয়, তবে, এ ভাষাও কি বাঙ্গালী-মেয়েদের ভাষা? বাংলা সাহিত্য কি বাঙ্গালার ব্রতকথা-জাতীয় বস্ত্র? যুক্তির দিক দিয়া যেমনই হউক-দেখা গেল, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বা ইডিয়ম ইহার আদর্শ নহে, এ ভাষা সাধুভাষাই বটে তবে সে সাধু-‘পণ্ডিত’ নয়-‘বাবু’, এ ভাষার বচনভঙ্গি, ইহার কায়দা ও প্যাঁচ পণ্ডিতকেও হার মানায়। যে ভাষা একদিন পদ্যে, ও পরে গদ্যে সমস্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিক ভাষা ছিল-সর্ব প্রদেশে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-বিনিময়ের ভাষারূপে যে ভাষা বাংলা সাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছিল, সেই ভাষা বাংলা নহে; সে ভাষায় যাহা কিছু রচিত হইয়াছে তাহা কৃত্রিমতা-দোষ-দুষ্ট!

এতকাল পরে বাংলা সাহিত্যের ঝাঁটি ভাষা আবিস্কৃত হইল। রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’ নামক উপন্যাসে এই ভাষার প্রৌঢ় রূপ অনেকে দেখিয়াছেন—তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঝাঁটি মাতৃভাষাভাষী বাঙ্গালী আধুনিক ভাষায় এখনও যাহার দখল তেমন হয় নাই, এবং ইংরেজীতেও যে সুপণ্ডিত নয়— তাহার পক্ষে, বন্ধিমের কোনও উপন্যাস, না এই ‘শেষের কবিতা’, কোনখানি অধিকতর সুখপাঠ্য? সাধুভাষা যদি নিতান্তই বি-ভাষা হয়, তবে সে ভাষায় এতদিন এমন সকল রচনা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? এখনও সকল উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস সেই ভাষাতেই রচিত হয় কেন? বাঙ্গালীই বা সেই সকল গ্রন্থে তাহার রস-পিপাসা মিটায় কেমন করিয়া? সংস্কৃত, সাধু, পণ্ডিতী—যে নামই তাহাকে দেওয়া হউক, কেবল গালি দিলেই সত্য কখনও মিথ্যা হইয়া যায় না।

বাংলা গদ্য-সরস্বতীর এক চরণ প্রাকৃত-বাংলার কলধনিমুখর রাজহংসটির উপর, এবং অপর চরণ সাধুভাষার সুসংস্কৃত, গাঢ়বন্ধ, শুচি-শ্রী ও সৌরভময় সহস্রদল পদ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যে দিন হইতে ভাষার এই দুই বিপরীত স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছে সেইদিন হইতেই বাংলা গদ্য আপন প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব শ্রী শক্তি লাভ করিয়াছে; তাহার সংস্কৃত জাতি ও প্রাকৃত গোত্র, দুইয়ের ধর্ম্মই বজায় রাখিয়া একাধারে সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত পদপদ্ধতির কাঠামোখানাই তাহার জাতি-কুল রক্ষা করিয়াছে; পণ্ডিতের ঘরে ভূমিষ্ঠ না হইলে তাহার যে কি দশা হইত, তাহা আজিকার স্বৈচ্ছাচারদৃষ্টে অনুমান করা দুরূহ নয়। সেই বাগ্-বৈভব ও বাক্-পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়াই প্রাকৃত বাংলার শ্রীহীন অথচ জীবন্ত বচনরাশি ভাব-অর্থ ও রসের আধার হইয়া উঠিল। বাংলা গদ্যের সেই সাধুরীতিই উত্তরোত্তর কথ্য-বাংলার বচনরাশিকে আত্মসাৎ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন সর্ব্বভাবে প্রকাশক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। সে গদ্য যে সাধুত্ব বর্জন করে নাই, তার কারণ—সাধুই হোক আর অসাধুই হোক, বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে আজও তাহাই সহজ-সুন্দর, তাহাই প্রাণবান ও গতিমান, সংবর্দ্ধনশীল ও সর্বর্বতোমুখী।

ঝাঁটি-বাংলা ব্যবহার করার কথাই যদি হয়, তবে সে দিক দিয়াও এই নূতন ভাষার নূতনত্ব কিছুই নাই। বরং দেখা যাইতেছে, সাধুরীতির লেখকেরা যে পরিমাণে ও যেরূপে বিপুলভাবে এই সকল বুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, আধুনিক ভাষার লেখকেরা তাহা করেন না, করিতে পারেন না। বাংলা বুলি না জানাই তার একটা কারণ বটে; কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ভঙ্গিমাযুক্ত হইলেই ভাষা ঝাঁটি হয় না, এবং ভঙ্গিমাহীন হইলেও, অর্থাৎ পদ্ধতি ‘সাধু’ হইলেও সে ভাষা ঝাঁটি বাংলার ছাপ বহন করিতে পারে। আধুনিক ভঙ্গিমাযুক্ত হইলেই ভাষা ঝাঁটি হয় না এবং ভঙ্গিমাহীন হইলেও অর্থাৎ পদ্ধতি ‘সাধু’ হইলেও সে ভাষা ঝাঁটি বাংলার ছাপ বহন করিতে

পারে। আধুনিক ভঙ্গিবাগীশেরা নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারবশে, কেহ বা সংস্কৃত, কেহ বা প্রকট ইংরেজীরীতির পক্ষপাতী। ইহাতে আর যাহাই হউক, কথ্যভাষার বড়াই করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না, এতবড় গুণ্যদের গুণ্যদীর কথাই স্বতন্ত্র। অপর দুই একজন যাহারা সাধু ভাষাকেই উচ্চারণ বদলাইয়া 'চলতি' নামে চালাইয়া থাকেন, তাহাদের কথাও বলি না—যদিও এই নাটের গুরু তাহারাই; অপর যাহারা এই নূতন ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকেন, খাঁটি বাংলা-বুলি তাহাদের জানা নাই, কেবল ক্রিয়াপদগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তাহাদের একমাত্র বাহাদুরী। এই ক্রিয়াপদের খর্ব্বভাসাধনই যেমন এ ভাষার একমাত্র মৌলিক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই, এই রঙ্গপথেই যত অনাচার প্রবেশ করিতেছে।

ভাষাতত্ত্ববিদ স্বীকার করিবেন—ভাষামর্খবিদের তো কথাই নাই—যে, ভাষার ধ্বনি রূপই তাহার আসল রূপ; কেবল শব্দ-অর্থের সঙ্গতি নয়, এই ধ্বনিই ভাষার আত্মা। ভাষার শব্দ-বিন্যাসে, প্রত্যেক বর্ণটির মধ্য দিয়া এক অখণ্ড ধ্বনিস্রোত বহিয়া থাকে; ইহা এমনই অখণ্ড যে, কোনও অংশে যদি এই ধ্বনি-স্বভাব আহত হয় তবে সমগ্র বাক্-প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। বাংলা গদ্যের যে বৈশিষ্ট্য, তাহাও ধ্বনি-রূপের বৈশিষ্ট্য—বাক্যযোজনার কেবল ব্যাকরণ অভিধান ঠিক থাকিলেই চলিবে না, সেই বিশিষ্ট ধ্বনি-রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। ইহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, ভাষায় যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এসম্বন্ধে তাহার সংস্কার জন্মিয়া উঠে। বরং এই ধ্বনি-রূপকে অস্বীকার করাইতে হইলে নানা যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয়, তাহাতেও একটা প্রাণহীন কৃত্রিম অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। বাংলাভাষার যে ধ্বনি প্রকৃতির উপর বাংলা-গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাক্যের কোনও অঙ্গে তাহার ব্যভিচার ঘটিলে সারাদেহ অসুস্থ হয়। সাধু বা সাহিত্যিক বাংলার সংস্কৃত শব্দ ও বাক্-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা বুলি যে ভাবে অন্বিত হইয়াছে তাহার ধ্বনি-রূপ প্রাকৃত নয়—সংস্কৃত। বাংলা পয়ার যেমন প্রাকৃত-অপভ্রংশের ধ্বনি-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা সংস্কৃতও নয়, বাংলা-বুলির ধ্বনিও নয়, বরং দূরসম্পর্কে সংস্কৃতেরই আত্মীয়, তেমনই বাংলা গদ্যের বাক্যচ্ছন্দ কথ্যভাষার ধ্বনি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা যে ভাষায় লিখিয়া থাকি—নব্য লেখকেরাও যে ভাষা লিখিয়া থাকেন, তার বুলিও প্রধানত সংস্কৃত বা সাধু, তাহার ধ্বনি-প্রকৃতিকে জোর করিয়া কথ্যভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গাইয়া লওয়া যায় না। লিখিব সাধুভাষায়, ভঙ্গিমা করিব বাংলা বুলির—এবং তাহারই খাতিরে উচ্চারণ বাকাইয়া ক্রিয়াপদের স্থানে টক্ টক্ শব্দ করিব, এ অনাচারে ভাষা পীড়িত হয়, তাহার ধ্বনি-ধর্ম নষ্ট হয়। সেই ধ্বনি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই রচনার বাগবন্ধনও শিথিল হয়; তখন শব্দযোজনার রীতি বা শব্দের শয্যা-গুণ সম্বন্ধে লেখকের কোনও সংস্কারই আর থাকে না; যেখানে-সেখানে যে কোনও শব্দ ব্যবহার করিতে এবং শব্দ-যোজনাকালে ভাষার রীতি ভঙ্গ করিতে কিছুমাত্র বাধে

না; কারণ, ঐ খণ্ডিত ক্রিয়াপদের আঘাতে বাক্যের ধ্বনিগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। আধুনিক বাংলা গদ্যের যে দুর্গতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, ইহাই তাহার মূল কারণ। যাহারা সাধুরীতি ত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া, সাধুভাষার ধ্বনি-সঙ্গতি নষ্ট করিয়াছে, অথচ বিশুদ্ধ বাংলা-বুলি যাহাদের আয়ত্ত নহে, তাহারা ই সর্ববিধ অনাচারে গা ভাসাইয়াছে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ ভাষার একটা রীতি-বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন-‘সবুজপত্র’ তাহার বাহন হইয়াছিল; শুধু বাহন নয়, ভাষার সংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়া রীতিমত আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে একদিন যেমন নব্য সম্প্রদায় উন্নত ও বিশুদ্ধ আদর্শের ঘোষণা করিয়াছিলেন, বাংলাভাষার সংস্কার-কামনায় ঠিক সেইরূপ এক পৃথক আদর্শের মহিমা ঘোষিত হইল-ইহাও যেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নব্যতন্ত্রের আক্রোশ। বাংলাভাষার বিরুদ্ধে ‘সংস্কৃত’ ও ‘পণ্ডিতী’ ইত্যাকার গালি বর্ষিত হইতে লাগিল, ইহাদের প্রধান আপত্তিই যেন এই যে, ভাষার ভিতরেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য থাকিবে কেন? সাধুভাষার মধ্যে যে শ্রী ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা বিবেচনার যোগ্য নয়, সেরীতি রসসৃষ্টির পক্ষে যতই অনুকূল হউক-স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রত্ব, চৌদ্দ-আনা অংশে, সেই রীতির উপরেই নির্ভর করিলেও-পৌত্তলিক বঙ্কিম যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কুসংস্কার-মুক্ত অভিজাত-সম্প্রদায়, সেই ধূপধূনাগন্ধী সংস্কৃতমন্ত্রানুকারী ভাষা সহ্য করিবেন না। কথাটা যে এমন করিয়াই বলিতে হইল তজ্জন্য আমিও দুঃখিত, কিন্তু সাধুভাষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নিতান্তই আক্রোশমূলক বলিয়া মনে হয়, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের একটা অকারণ বিরাগ ছাড়া ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এতদিন ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করি নাই; কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল-প্রেরণা বুঝি। সকলের উপরে তিনি আর্টিস্ট- এই কথাটি না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথকে কেহই বুঝিতে পারিবে না। এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিব। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক নহেন, কিন্তু মিষ্টিক-কবিতা লিখিয়াছেন; অথচ mysticism- জীবনের উপলব্ধি, কায়মনঃপ্রাণে উহার সাধনা করিতে হয়, যাহারা মিষ্টিক তাহারা ঠিক কবিও নহে, তাহাদের মনঃপ্রকৃতি চিন্তের ধাতুই-স্বতন্ত্র। কিন্তু যিনি এতবড় আর্টিস্ট, আর্টের উপাদান হিসাবে সকলই তাঁহার বশীভূত, কিছুই তাঁহার আর্ট সাধনার বহির্ভূত নহে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিলাম, এ প্রসঙ্গে ইহাই যথেষ্ট। এতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা সত্ত্বেও, সঙ্গীতই রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। কেবল সঙ্গীতবিদ বলিয়া নয়-এ হেন সঙ্গীত-প্রাণ ব্যক্তির কোনও স্থির মত বা বন্ধ-সংস্কার থাকিতে পারে না-অবন্ধনই তাঁহার স্বভাব, সঙ্গীতাত্মক সুখমা প্রীতিই তাঁহার প্রাণের একমাত্র

বন্ধন; আর কোন ধর্মই তাঁহার নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে সূক্ষ্ম বিতর্ক বা বিশ্লেষণ-শক্তি ও প্রবল ভাবুকতার পরিচয় আছে তাহার পশ্চাতে কোনও মতবাদী ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় নাই। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে যদি কোনও শৃঙ্খলা থাকে, তবে তাহা বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলা, পরস্পরের মধ্যে যেখানে যত অসঙ্গতি সেখানেই তাঁহার মন একটা শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য ব্যাকুল; এইজন্য, বাহ্যিক ঐক্য বা সঙ্গতিরক্ষার জন্য তাঁহার কোনও উদ্বেগ নাই; বিরোধ ও বৈচিত্র্যই তাঁহার আনন্দ-বিধান করে। এই জন্যই বলিয়াছি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে *artist par excellence*, রবীন্দ্রনাথ তাহাই; তাঁহার প্রতিভা মূলে সঙ্গীতপ্রধান। এ হেন ব্যক্তির কোনও বিধি বা আদর্শ-প্রচারের প্রবৃত্তি অথবা যোগ্যতা থাকিতে পারে না; বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্যের উপযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সে কার্যের উপযুক্ত নহেন; এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান স্রষ্টা হইলেও, তিনি এ সাহিত্যের নায়ক নহেন। আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ইদানীং বাংলা ভাষার উপরে যে নূতন নূতন নম্রা কাটিতেছেন— পুরাতন রীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এবং নূতন ভঙ্গিমার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নূতনও নহে, অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু সহসা ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি এমন সুস্পষ্ট মতবাদ প্রচার করিতেছেন যে তাহাতে মনে হয়, তিনি বাংলা সাহিত্যকে ভাষান্তরিত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহার এই মত যথার্থ হইলে বিগত শতাব্দীর সাহিত্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বরচিত গদ্য-পদ্যের প্রায় সমগ্র উৎকৃষ্ট অংশ বাতিল হইয়া যায়। টলষ্টয় শেষ বয়সে আর্টের নূতন আদর্শ স্থাপনার্থে যাহা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও বৃদ্ধবয়সে ভাষার নবাবিষ্কৃত ভঙ্গির খাতিরে সাহিত্যের সেইরূপ প্রাণদণ্ড করিতে চান। আর্টিষ্টের পক্ষপাত বুঝি-রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যলোভী মন ভাষারও নানা ভঙ্গি সন্ধান করিবে, ইহাতে বিম্বিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এতদিন পরে মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ যেন এই ভাষার বিষয়ে ধর্মাস্তুর গ্রহণ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন—তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মত স্রষ্টা ও শিল্পী যদি অবশেষে বাংলা ভাষার এই গতিই নির্ধারণ করেন তবে ভাষা-বিভ্রাটের আর বাকি কি?

পূর্বে বলিয়াছি, এই নূতন ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে কবিতায় আমদানী করিয়াছিলেন—‘ক্ষণিকা’র ভাষা ও ছন্দ বাংলা গীতিকাব্যে এক নূতন সম্পদ ও সম্ভাবনারূপে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বাংলা গদ্যেও নূতন রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন বহুপূর্বেই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে, এবং ভাষার ভঙ্গি-বৈচিত্র্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যশিল্পীর সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, বরং সঙ্গত ও স্বাভাবিক। উপলক্ষ বা বিষয়-বিশেষে, এই মৌখিক বাক-ভঙ্গিই অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে হইতে পারে; তা ছাড়া, আটপৌরে পোষাকের মত ভাষারও যদি আর একটি ছাঁদ থাকে, মন্দ কি? কিন্তু গদ্যের এই রীতিও এমন প্রশস্ত নহে যে

তাহাকেই সাহিত্যের রীতি করিতে হইবে—যে রীতি সাহিত্যের রীতি হইয়া আছে, তাহার তুল্য ক্ষমতা ইহার নাই, রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের প্রাণপণ চেষ্টাতেও প্রমাণ হয় নাই যে এই রীতিই শ্রেষ্ঠ, ইহার জন্য পুরাতন রীতি পরিত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা পরে, যাহা বলিতেছিলাম। ‘সবুজ পত্র’ একটা coterie-র মুখপত্ররূপে দেখা দিল, এই coterie বাংলা ভাষার রীতি পরিবর্তন করিতে চাহিল। এই coterie-র সহিত রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন—যথেষ্ট উৎসাহও দিয়া থাকিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম-বোধ তখনও অটুট, তাহার সাহিত্যিক coterie তাহাকে বাড়াবাড়ি করিতে দিল না। ‘সবুজপত্রে’ প্রকাশিত সেকালের গল্পগুলির ভাষাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ‘কণিকা’-রচনা কালে ভাষা ও ছন্দের নূতন রীতি রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিয়াছিল—গীতিকাব্যের প্রেরণা—বিশেষে এই ভঙ্গির যে একটি খাঁটি সাহিত্যিক উপযোগিতা আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তখনও তিনি এই ভঙ্গিকে সর্বোৎসাহী করিতে চাহেন নাই। তাই ‘সবুজপত্রে’র যুগে, রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনায়, আকালিক বসন্তসমাগমের মত, কবিত্বের যে অতি প্রবল ও আকস্মিক জোয়ার আসিয়াছিল, তাহার ফলে আমরা যে কবিতাগুলি পাইয়াছি—যাহা ‘সবুজপত্রে’ প্রকাশিত ও ‘বলাকা’র সংগৃহীত হইয়াছিল—তন্মধ্যে যেগুলি ভাবৈশ্বর্য্যে ও গীতি-গৌরবে-শ্রেষ্ঠ, সেগুলি সাধুভাষার সঙ্গীতে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিন যদি এই মতবাদ তাহাকে পাইয়া বসিত, তাহা হইলে ‘বলাকা’র সেই কবিতাগুলি জন্মলাভ করিত না। সেই coterie-র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও, ভাষার সেই নব-আদর্শ ঘোষণার যুগে, বাঙ্গালী-কবি বাংলা ভাষার আসল ধ্বনি-রূপকে স্বীকার করিয়াছিলেন। coterie-র প্রভাবে কবিতার ভঙ্গি হইল এইরূপ—

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামী তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন। বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আর-রে আমরা কাঁচা।

অথবা—

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনাখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।

উপরি-উদ্ধৃত কবিতার অংশগুলিতে কেবল বাক্যই আছে-ছন্দও আছে, সুর নাই। আমার মনে হয়, উগ্র মতবাদের প্ররোচনায় যাহা হইয়া থাকে, এখানে তাহাই হইয়াছে-বুলি ও ছন্দের জোরটাই বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কথ্যভাষা কাব্যরসসিক্ত হইলে, অর্থাৎ তাহাতে কবির প্রাণের সুর লাগিলে, বাংলা গীতিকবিতার যে রূপ ফুটিয়া উঠে, বাংলা সাহিত্যে তাহা নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেই ভাষা ও ছন্দের যতই উন্নতি হউক তদ্বারা গোপীযন্ত্র বা একতারার কাজই চলিতে পারে, বঙ্গভারতীর সগুহরার স্থান সে পূরণ করিতে পারে না। সেই সগুহরার আওয়াজ যে কিরূপ, ‘বলাকা’ হইতেই তাহার কিছু উদাহরণ দিব-

হে সন্ধ্যাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়

চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ

সৌন্দর্যে ভুলায়ে।

কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে

করিলে বরণ

রূপাহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে

প্রেষসীরে

যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে

সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে

অনন্তের কানে।

প্রেমের করুণ কোমলতা

ফুটিল তা

সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

সহসা গুনিবু সেইক্ষণে

সঙ্ক্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে

মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল দূর হ’তে দূরে দূরান্তরে।

হে হংস-বলাকা,

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অটুহাসে

বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ঐ পক্ষধ্বনি,

শব্দময়ী অক্ষর-রমণী,
গেল চলি' স্তম্ভতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন

—এ যেন গৃহকোণের বদ্ধ বাতাস হইতে একেবারে সাগরকূলের মুক্ত হাওয়ায়
ছাড়া-পাওয়া! এ হংস-বলাকা আর কেহ নয়-বাংলা পয়ারছন্দের সাধুভাষা; সেই
ছন্দের সেই সুর কবিকে মাতাল করিয়াছে। সাধুরীতির এ ছন্দ আর কখনও এমন
করিয়া কবিকে উতলা করে নাই, এই কবিতাগুলির মধ্যেই বার বার সেই কথা
বলিয়াছেন। যখন শুনি—

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা।

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

এই তব হৃদয়ের ছবি
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত
উঠিয়াছে অলঙ্কার পানে—

—তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ভাষা-ছন্দের কোন্ 'অপূর্ব অদ্ভুত' সঙ্গীত 'এই
নব মেঘদূত' রচনা করিয়াছে। কবির জীবনে এমন বহুবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহাই
শেষবার, এমন আর পরে ঘটে নাই।

'সবুজপত্রের' যুগে অর্থাৎ 'বলাকা'র কবিতাগুলি ও নূতন গল্পগুলি লিখিবার
কালে, ভাষার রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন যে দিকেই ঝুঁকিয়া থাকুক, তাঁহার কবি-
চিন্তা বা অন্তরের বাণী-প্রেরণা সাধুভাষাকেই বরণ করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি।
সত্য বটে, তাহার পরে তাঁহার পদ্য, ও বিশেষ করিয়া গদ্য রচনার ভাষা, উত্তরোত্তর
নূতনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—তাহাতে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; কারণ
পূর্বেই বলিয়াছি, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের খেলাল-খুশীর স্বাধীনতা আমরা মানিয়া লওয়াই
সঙ্গত মনে করি। মানুষের যেমন, তেমনই কবিরও জীবনে একটা শেষ বা পরিণাম
আছে। দেহে যৌবনের মত-মানসজীবনেও প্রতিভার পূর্ণফুর্তির একটা কাল আছে,

তারপর জরুর আক্রমণ অনিবার্য। সকল কবির জীবনেই প্রতিভার পূর্ণোদয়ের শেষে অস্ত-কাল উপস্থিত হয়, রবীন্দ্র-প্রতিভাও সে নিয়মের বহির্ভূত নয়। ‘বলাকা’য় আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার শেষ দীপ্তি দেখিয়াছি, তারপর হইতে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাতে আর্টিস্টের মনস্তিার পরিচয় আছে—যিনি আজন্ম বাণীর সাধনা করিয়াছেন, তাহার চিরাভ্যস্ত লিপি-কুশলতা নানা ভঙ্গিয়ায় নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভঙ্গিই তাহার প্রাণ, মানস-বিলাসের কারুকলাই তাহার প্রধান উপজীব্য, তাহাতে স্রষ্টার আত্মোৎসর্গ নাই, শিল্পীর আত্মসচেতন বিলাসলীলা আছে। স্রষ্টা ও কবি প্রকৃতির নিয়মে জরাগ্রস্ত হইলেও, শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানস-পিপাসা এখনও মরে নাই, এই অবস্থা ক্রমেই আরও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সত্তর বৎসর পার হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানস-শক্তি যে এখনও অটুট আছে, ইহাই বিশ্বয়কর, এতকাল ধরিয়া মনের এই সজীবতা একালে আমাদের দেশে অতিশয় বিরল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি-প্রতিভা হারাইয়াছেন (এ বয়সে তাহা কিছুমাত্র অগৌরবের নহে), তিনি বাণীর নিগূঢ় রহস্য, ভাব ও রূপের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, দৃষ্টি ও সৃষ্টির অভেদ-তত্ত্ব-কবিচিন্তের সেই পরম উপলব্ধিকে—উপেক্ষা করিয়া, এক্ষণে বাণীকে কেবল কেলি-কলার সহচরীরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিভা যাহাদের নাই, দিব্য-প্রেরণার অবস্থায় বাণীর জ্যোতির্ময়ী প্রসন্নমূর্তি যাহাদের সম্মুখে কখনও আবির্ভূত হইবে না, ঝাঁটি বাংলা বুলি যাহারা বলিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষকরূপে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত-বাংলার নামে একটা ভাষা-যাহা ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক কোনও হিসাবেই গ্রাহ্য নহে—তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছেন।

১৩৩৮ সালে ‘পরিচয়’ নামক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকাখানিকে ‘সবুজপত্র’র সাক্ষাৎ বংশধর বলা যাইতে পারে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—‘সবুজপত্র’ বাংলাভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। ...এর পূর্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে ছিল ষিড়িকির রাস্তায় অন্দরমহলে।... একবার যেমনি একে আত্ম-প্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জ্বর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

এই উক্তির কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য, প্রথম দুইটি কথা একত্রে লওয়া যাক। ঝাঁটি সাহিত্যের প্রয়োজনে চলতি ভাষার সহজ প্রাণ-শক্তির আবশ্যক হইল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আগে হয় নাই কেন? ইহার দখল ত কেহ ঠেকাইয়া রাখে নাই! যে চলতি-ভাষা লোক-সাহিত্যে এবং গ্রাম্য গীতিকাব্যে অষ্টাদশ শতকের

রামপ্রসাদ হইতে ঊনবিংশ শতকে টপ্পা-কবি পর্য্যন্ত— অপ্রতিহতভাবে স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, তাহার সহজ প্রাণশক্তি বাঙ্গালী ত অস্বীকার করে নাই! কিন্তু সেই সহজ প্রাণশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-পাদে নব্য-বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—দাদরায়ের ছড়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই উপভোগ করিতেন নব্য-সমাজে তাহা কৃতিকর হয় নাই। এই সহজ প্রাণশক্তি মৌখিক ভাষামাত্রেরই আছে, কিন্তু সেই ভাষার রচনা করিবার প্রবৃত্তি কোনও সাহিত্যিক বাঙ্গালীর কখনও হয় নাই; কেবল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়;—মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র, এমন কি ঈশ্বরগুপ্তের মত বাঙ্গালীও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। এখন কথা হইতেছে, ‘এই প্রাণের জোর’ কি কেবল পণ্ডিতগণের অত্যাচারেই সাহিত্যে আপনাকে জাহির করিতে পারে নাই? গত যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ—যিনি সাধুভাষাকেই আশ্রয় করিয়া নিজের কবি-প্রতিভাকে সার্থক করিয়াছেন—বাংলা গদ্যের সেই অন্যতম উৎকর্ষ বিধাতা রবীন্দ্রনাথ—আজ এতকাল পরে সাধুভাষার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন কেন? বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া গত যুগের বাংলা-সাহিত্যের সেই পুনরুজ্জীবন-কাহিনী, এবং সেই সঙ্গে নিজের কীর্তিকেও বিন্মত হইয়া রবীন্দ্রনাথ আজ এই ভাষাবিক্রান্ত ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? সাহিত্যের ইতিহাসে দুই-চারি জন এমন প্রতিভাশালী কবি-লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহারা যেন যাদুশক্তির বলে ভাষাকে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন, বিকলাঙ্গ অবস্থা হইতে সহসা একটা বাড় ধাপে তুলিয়া দিয়াছেন। তৎপূর্বে ভাষার যে অসংস্কৃত রূপ ছিল, এই সকল লেখক তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তিকে—ভাষার নিজস্ব প্রাণ-প্রবৃত্তিকেই, প্রতিভাবলে ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া দেন। বাংলাভাষাও আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত সেইরূপেই ক্রমবিস্তারিত হইয়াছে, সর্বকালের কবি-সাহিত্যিক ভাষার যে রূপটিকে ধরিয়া আছেন তাহা প্রাকৃত বা কথ্যরীতি নহে—ইহার কারণ অতিশয় সুস্পষ্ট। বাঙ্গালী জাতির জীবন চিরদিনই গ্রাম্য; কিন্তু এই জীবনে যেখানেই যতটুকু আর্য্য-সংস্কৃতি স্পর্শ ঘটিয়াছে—শাস্ত্রের উপদেশ বা পুরাণগুলির ভাব-প্রেরণা হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, সেখানেই, সেই সংস্কৃতির প্রভাবে তাহার গ্রাম্যতা যতটুকু মার্জিত হইয়াছে, সাহিত্যের ভাষাও ততটুকু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রভাবের বশে, এই সংস্কৃতির ফলেই, বাঙ্গালী যখন গল্প বলিতে বা গান করিতে বসিয়াছে, তখনই ভাষার গ্রাম্যতাকে কিয়ৎ পরিমাণে শোধন করিয়া লইয়াছে; কথ্য-ভাষার ভঙ্গিতে তাহার সাহিত্য-প্রেরণা কখনও আরাম পায় নাই। আমাদের ভাষা কোনও একটা প্রাকৃতের অপভ্রংশ বটে, তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ক্রমশ ক্ষুদ্রতর হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্যরচনা করিতে শুরু করিলাম, তখনই এই অপভ্রংশকে—তাহার প্রকৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, একটা সংস্কৃত রূপে বাঁধিয়া লইয়াছি। এই ভাষা

বলি—এক ছন্দে বা ভঙ্গিতে, লিখি—আর এক ছন্দে, আর এক ভঙ্গিতে; মনে হয় যেন দুইটা ভাষা। কিন্তু ইহা লইয়া কেহ সমস্যায় বা সংকটে পড়ে নাই, এ পার্থক্য কোন লেখককে পীড়া দেয় নাই; বরং এই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভঙ্গিটুকু প্রতিভাহীন লেখককেও সাহিত্য-রচনায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছিল। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশই এই ভাষার গুণে সাহিত্যপদ পাইয়াছে। অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু যেমন ক্ষুদ্র তেমনই বৈচিত্র্যহীন, অথচ তাহাই সাহিত্যের উপকরণরূপে কবিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ—সেগুলিকে ভাষা ও ছন্দের-মর্যাদা দান করিবার স্পৃহা। পারিবারিক জীবনের দুই একটি বাঁধা-ধরা সুখ-দুঃখের একই কথা, ধর্ম লইয়া সামাজিক বিবাদ, অতি তুচ্ছ দাম্পত্য কলহ, মাহাত্ম্যহীন দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা, নারীদের বৈশবাস, অলঙ্কার ও নাক-চোখের মামুলী বর্ণনা, পায়স-পিষ্টক ও নানাবিধ ব্যঞ্জননের তালিকা—এই ধরনের বিষয়বস্তুই এক যুগ ধরিয়া এতগুলো লেখকের কবি-প্রেরণার উপজীব্য যে কি করিয়া হয়, তাহার আর কোনও কারণ নির্দেশ করা যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষার মোহ যেমন অনেক অসাহিত্যিককে সাহিত্যিক করিয়া তুলিতেছে, এককালে এই কথ্যভাষা বা dialect-এর অমার্জিত ও ধ্বনিসৌষ্ঠবহীন রীতিকে বর্জন করিয়া ভাষার এই ভদ্ররূপের চর্চাই বহু লেখকের সাহিত্য-সাধনার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। ভাষার এই সাহিত্যিক ভঙ্গিকে কৃত্রিম বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিবার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষামাত্রই কৃত্রিম। কবি যে ভাষায় লেখেন, অরসিক অ-কবি তাহাকে কৃত্রিম মনে করিবে-ই, চিরদিনই করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-পাঠকালে সে রচনা যে রীতিরই হউক—হাস্যবেগ অনুভব করে, এমন শ্রোতার অভাব কখনই হইবে না; অথচ রবীন্দ্রনাথ-কথিত ‘প্রাণের জোর’ যে ভাষার প্রধান সম্পদ, ইহারা সকলেই সেই কথ্যভাষাই বলিয়া থাকে। কাজেই কৃত্রিমতার কথা ছাড়িয়া দিলাম। এই সাধুভাষা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা, এই ভাষা যদি বাঙ্গালী ঋজিয়া না পাইত, তবে তাহার আদিম গ্রাম্যতা এখনও অক্ষুণ্ণ থাকিত। যদি এই ভাষা বিজ্ঞাতীয় হয়, তবে বাঙ্গালী এতকাল ধরিয়া যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহা সাহিত্যই নয়। এ ভাষা ঋটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্ম-হিসাবে বাঙ্গালী এক জাতি, কিন্তু ভাব-চিন্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। ঋটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রাকৃত-বাংলা নয়—বারো-আনা সংস্কৃত।

রবীন্দ্রনাথ এযাবৎ-প্রচলিত গদ্যরীতির জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতকে দায়ী করিয়াছেন। এই গদ্যের জন্য উক্ত পণ্ডিতগণকে দায়ী করার অর্থ অবশ্য ইহাই যে, এই পণ্ডিতেরাই যখন এ ভাষার জন্মদাতা তখন এ ভাষা ঋটি বাংলা

হইতেই পারে না-বরং তাঁহাদের পঞ্জিতী শত্রুতার ফলে বাংলাগদ্যের স্বভাবহানি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আধুনিক যুগে বাঙ্গালীর যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে একজন মাত্র যুগাবতার আছেন, তিনি রামমোহন রায়; বাংলা গদ্যের স্রষ্টাও তিনি। তাহাই না হয় মানিলাম, কিন্তু গদ্যসৃষ্টির যাহা কিছু গৌরব তাহার ভাগী হইবেন রামমোহন আর ইহার জন্য যত-কিছু অপরাধ তাহার ভার বহিতে হইবে গরীব পণ্ডিতগণের-এ কেমন সুবিচার? হিন্দু পণ্ডিতদের যত দোষ- যত আক্রোশ তাঁহাদের উপরে। পূর্বে বলিয়াছি, সাধুভাষার প্রতি এক দলের এই যে বিরাগ, ইহার মূলে যেন একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা কমপ্লেক্স আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে বাঙ্গালীর সুপ্ত প্রতিভা যখন নূতন করিয়া সাড়া দিল, তখন বাংলাভাষার-কি গদ্যে কি পদ্যে-অপরিসীম দারিদ্র্য তাহাকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা বাংলা ভাষার যে সুমার্জিত কলাসম্মত রসনিপুণ ভঙ্গি ও বিস্তৃত রীতির প্রথম পরিচয় পাই-ভাষার সেই সাহিত্যিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় পাইল না, রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও সামাজিক অব্যবস্থার ফলে সকলেই বিপর্যস্ত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে যে জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল, যে নূতন সংস্কৃতি এ জাতির স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ধারা বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিশয় অগভীর হইয়া উঠিল-সাহিত্যে শ্রোতধারার পরিবর্তে কূপ-পঙ্কলের সৃষ্টি হইল। পূর্ব-যুগের সাহিত্য ক্রমশ যে আদর্শে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, ভারতচন্দ্রের ভাষায় যে সরল-স্বচ্ছ সুমার্জিত গাঢ়বন্ধ-শ্রী ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম-যাহার মূলে ছিল শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্যানুসৃত বৈদম্ব্য, পরবর্তী কালে ভাষার সে আদর্শ টিকিল না, কারণ সে সংস্কৃতিই লোপ পাইতে বসিল; বাণী আর সাধনার বস্তু রহিল না, কবি-প্রতিভা স্বচ্ছন্দজাত লতাগুল্লোর মত মাঠবাট ছাইয়া ফেলিল; বাংলা-সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল যুগ স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী হইয়া সহসা অন্তর্হিত হইল। বাণী-সাধনার সেই আদর্শ যদি আরও কিছুকাল টিকিয়া থাকিতে পারিত, এবং ভারতচন্দ্রের সেই সাধনা যদি অব্যাহত থাকিয়া আরও শক্তিশালী প্রতিভার অভ্যুদয়ে স্বাভাবিক সুপরিণতি লাভ করিত, তাহা হইলে বোধ হয়, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে আমরা কবিওয়ালার গান ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার পরিবর্তে এমন কিছু পাইতাম, যাহাতে নবযুগের সাহিত্য-প্রেরণা সুসম্পন্ন ভাষা ও সুমার্জিত রীতির অভাবে এমন দিশাহারা হইত না।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সেকালে বাঙ্গালীর সেই নবজাত প্রতিভা সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বাংলাভাষাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল-সংস্কৃতের সাহায্যেই এক মহাসংকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

‘বিষবৃক্ষ’, ‘কপালকুন্ডলা’র যে রস-কল্পনা, তাহার বাহন হইল বঙ্কিমী-ভাষা- এ ভাষা সেই কাব্যশ্রেণীর প্রয়োজনেই জন্মলাভ করিয়াছিল। যে ভাষায় দেব-দেবীর জীবনীতে গ্রাম্য জীবনের কাহিনী রচনা করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, সেভাষায় সেক্সপীরীয় ট্রাজেডির মত কাব্যরস- সৃষ্টি করা কোনও কালের কবির পক্ষেই সম্ভব নয়। রসের আদর্শই যদি বদলাইয়া যায় তবে কোন কথাই নাই, নতুবা, আজিকার দিনেও সেই ধরনের সাহিত্য খাঁটি কথ্যবাংলার ভঙ্গিতে রচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ কথা যিনি বুঝিতে পারিবেন না তাঁহার সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে, সাহিত্যের আলোচনা নিষ্ফল। মিলটনের মহাকাব্যের সঙ্গীত বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া প্রাণে পৌছিয়াছে, সে সঙ্গীতের উদার উদাস্ত ধ্বনি, ঈশ্বরগুণ ও কবিওয়ালার যুগের একজন বাণী-বরপুত্রকে আকুল করিয়াছে। কানে যাহা বাজিতেছে ভাষায় তাহাকে ধরিবার উপায় নাই, সে যুগের সে ভাষায় তাহা কল্পনা করাও যায় না। প্রতিভা পথ দেখাইল-দৈবী প্রজ্ঞার বলে অসাধ্য সাধন হইল; এতবড় বিশ্বয়কর কীর্তি বোধ হয় কোন সাহিত্যের ইতিহাসে নাই। সংস্কৃতের সাহায্যে ভাষাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইল যে, কাশীদাসী-পয়ারের ছাঁদে অমিত্রাক্ষরের সাগরতরঙ্গ অপূর্ব কালকল্লোলে প্রভাবিত হইতে লাগিল এসে-সঙ্গীতে বাঙ্গালী যেন অর্দ্ধরায়ে নিদ্রোচ্চিত হইয়া কান পাতিয়া রহিল; বাংলা ছন্দের, তথা বাংলা কাব্যের গতি ফিরিল; আজিও সে সঙ্গীত বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে বিরাজ করিতেছে। গদ্যে ও পদ্যে এই দুই মহাপ্রতিভার উদয় না হইলে নব্য বাংলা সাহিত্য এত শীঘ্র এমন ভাবে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইত না।

এই নব্য-সাহিত্যের ভাষা এবং তৎপূর্ববর্তী সাহিত্যের ভাষা তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বাংলা ভাষা যেন একটি সরল সুসজ্জিত ভঙ্গি লাভ করিয়াছে। এতদিনে, যে একমাত্র পথে তাহার শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব সেই পথে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করিয়াছে। শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য যেমন সংস্কৃতের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, তেমনই শব্দযোজনানীতি বা ভাষার গাঁথনি দৃঢ় করিবার জন্য অনেক পরিমাণে সংস্কৃত-আদর্শ অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। তথাপি ভাষার ভঙ্গি সেই পুরাতন বাংলা ভঙ্গি-সেই ভঙ্গিতে শক্তি ও শ্রী সম্পাদন করিয়াছে সংস্কৃত শব্দসম্পদ ও ধ্বনিমন্ত্র। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের চর্চা করিতেন-যাঁহারা ভারতচন্দ্র, দত্তরায় ও ঈশ্বরগুণের ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা ‘মেঘনাদবধে’র প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ছিলেন। এখনকার দিনে, যাঁহারা বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যের সহিত অধিকতর পরিচিত, তাঁহারা ইরবীন্দ্রনাথের কাব্যরস উপভোগ করিয়া থাকেন। ভাষার ভঙ্গিই ইহার একমাত্র কারণ নয় তাহা জানি-কিন্তু সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগেই বাংলা-ভাষা পীড়িত হইয়া

উঠে; এবং লঘু ও সরল সুপ্রচলিত শব্দের বহুল প্রয়োগেই ভাষার ঝাঁকি ভঙ্গি যে অক্ষত থাকে—এ ধারণা ভুল। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, আমরা বাংলা কাব্যের যে ভাষা-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মূল-ভঙ্গি অবিকৃত রাখিয়া ভাবকল্পনা ও ধ্বনিব্যঞ্জনার তারতম্য অনুসারে, ভাষা অতিশয় গাঢ় বা অতিশয় তরল হইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। মধুসূদনের শব্দচয়নরীতি রবীন্দ্রনাথেও অক্ষুণ্ণ আছে—ভাবকল্পনা ও ধ্বনি-বিন্যাসের তারতম্য-হেতু তাহার সংস্কৃত-ভঙ্গির পার্থক্য ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কল্পনার ভাষা যতই সুললিত হউক, তাহার রীতি মধুসূদনের অপেক্ষা ঝাঁকি নহে, বরং তাহার উপর ইংরেজীর প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। এককালে রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙ্গালী পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে নাই—এখনও সর্বসাধারণের চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার কারণ সবটা না হইলেও, কতকটা ইহাই। মাইকেলের কাব্যের শব্দ-দুরূহতা যতটা না বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনভ্যন্ত ভঙ্গি তদপেক্ষা অধিক বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক সমসাময়িক কবি একদা রঙ্গ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন—‘ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাষা ইংরেজীতে ভাঙ্গা। ড্যাফোডিল-পুষ্পে যেন মনসার পূজা।’—তাহা সর্বৈব মিথ্যা নহে। এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই ‘যে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ঘটিয়াছে বলিয়া যাঁহারা সাধুরীতির প্রতি সদয় নহেন মাইকেল-বঙ্কিমের ভাষাকে যাঁহারা ঝাঁকি বাংলার বিকৃতি বলিয়া মনে করেন, এবং ভাষার অতি আধুনিক ভঙ্গি দেখিয়া যাঁহারা আশান্বিত ও উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে বাংলার সংস্কৃত-বর্জিত কথ্যভাষার আদর্শ ততটাই অস্বাস্থ্যকর, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সাহিত্যের ইতিহাসে বার বার পাওয়া গিয়াছে—আজ তাহাই আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। কথ্যভাষার ইডিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কৃতের সাহায্য কতখানি লওয়া যাইতে পারে নব্যযুগের সাহিত্য সাধনায় তাহার পরীক্ষা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে—তাহার ফলে আমরা যে ভাষা পাইয়াছি তাহা যদি ঝাঁকি বাংলা নয় বলিয়া বর্জন করিতে হয়, তবে বাংলাসাহিত্যের অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য্য। এই তথাকথিত পণ্ডিতী-ভাষাই যে ঝাঁকি বাঙ্গালী-প্রতিভার সৃষ্টি, এবং সেই হেতু তাহা ঝাঁকি বাংলা—একথা বুঝিতে হইলে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস বুঝিতে হইবে, সে ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহ লেখে নাই বলিয়া অতিশয় ভ্রান্ত মতবাদ প্রশ্রয় পাইতেছে। কথ্যভাষা বলিতে যাঁহা বুঝায় তাহা হইতে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয় নাই; ইহা একটা দৈবাধীন ঘটনা নহে। সাহিত্যের আদি স্রষ্টা যাঁহারা, কথ্যভাষার মজ্জাগত দুর্বলতাই তাঁহাদের নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল, সাহিত্যের যে উৎকৃষ্ট আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার উপযোগী শব্দ-সম্পদ বা ধ্বনি-প্রকৃতি সে ভাষার আয়ত্ত নহে বলিয়াই, তাঁহারা ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া

তুলিয়াছিলেন-তাহা ভদ্র বা সাধুরীতিই বটে, কিন্তু তাহা বাংলা। সে আদর্শ যে সর্বপ্রকারে কল্যাণকর হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই-সেই সংস্কৃতির ফলে আমরা গ্রাম্যবর্ষরতা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে গদ্যসৃষ্টির প্রয়াস চলিয়াছিল তাহা শুধুই গদ্যরীতির উদ্ভাবনা নহে- বাংলাভাষার জনান্তর-প্রাপ্তির সাধনা। এই গদ্য যখন পূর্ণাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ট হইল তখনই আমরা গীত-সুরবর্জিত ভাষার ছন্দকে লাভ করিলাম; ইহার পূর্বে বাক্যছন্দকে আশ্রয় করিয়াই কোনও সাহিত্য-সৃষ্টি হয় নাই। এই বাক্যছন্দের আবিষ্কারই অভূতপূর্বভাবে কাব্যছন্দকে গানের প্রভাব হইতে মুক্তি দিল। মধুসূদন পয়ারকে যে নূতন যতি ও ছন্দে বাঁধিয়া দিলেন-যাহার ফলে কাব্যছন্দ চিরদিনের জন্য নূতন চালে চলিতে আরম্ভ করিল-সেই নূতন ছন্দোভঙ্গি বাক্যছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সেই ছন্দ হইতেই মধুসূদন তাঁহার অমর ছন্দ গড়িবার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। মধুসূদনের পরে হেম-নবীনের রচনায় এই গদ্যভঙ্গি আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দ-সঙ্গীত ও কাব্য-কলার প্রতিভা তেমন পরিপক্ব না হওয়ায়, তাঁহাদের অধিকাংশ রচনাই গদ্যময়-গদ্যের ভাষাই যতিমাত্রায় সজ্জিত ও মিলযুক্ত হইয়া বক্তৃতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে, গদ্য ও পদ্য এখনও এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, আজও গদ্যরচনায় কাব্যের সুর অতি সহজেই আসিয়া পড়ে; গদ্যে কাব্যের সুর না বাজিলে বাঙ্গালীর কান তৃপ্ত হয় না।

বাংলা ভাষার যে অভিনব রূপের কথা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে একটা কথা পুনরায় স্মরণ করাইতে চাই। ভাষার এই যে সংস্কৃত-ভঙ্গি, ইহার মূল প্রয়োজন-যাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে-ভাবসংহতিমূলক শব্দযোজনা, এবং ধ্বনি-ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যলাভ। উৎকৃষ্ট রসের আধার হইতে হইলে ভাষার এ গুণ অপরিহার্য। বাংলা গদ্য আরও পরিণতি লাভ করিল রবীন্দ্রনাথের যুগে-তখন এই rhythm বা ধ্বনিস্পন্দ বজায় রাখিয়া ভাষা বহুল পরিমাণে কথ্য-জবান বা ইডিয়ম আত্মসাৎ করিবার সামর্থ্য লাভ করিল। বলা বাহুল্য, ভাষার এই গতি ও প্রবৃত্তি নির্দ্বারিত করিয়া দেন বঙ্কিমচন্দ্র; বিদ্যাসাগরী ও আলালী উভয় ভঙ্গির পৃথক ও বিশিষ্ট গুণ এক আধারে মিলাইয়া, ভাবকে ভাষার অধীন না করিয়া, ভাষাকেই ভাবের অধীন করিয়া-সাহিত্যের যাহা প্রধান ধর্ম সেই প্রকাশ-শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়া, বৈয়াকরণ বা ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের অতিরিক্ত শুচিবায়ু-রোগ পরিহার করিয়া-বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-গদ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভাষাকে জীবধর্মী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর প্রাণের আবেগে নিরন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া সেই জীবন্ত বাণী-দেহ রবীন্দ্রনাথের যুগে সুদৃঢ়, সুবলয়িত ও সুমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

যে রীতির উদ্ভাবনায়, গুরুগম্ভীর পদযোজনা এবং সহজ সরল বাকপদ্ধতির সমন্বয়ে, একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ সম্ভব হইয়াছে—যাহার ফলে বাংলা গদ্য ভাব, অর্থ ও ধ্বনি-ব্যাঞ্জনার সর্ববিধ প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে— ‘an instrument of many stops’ হইতে পারিয়াছে—সেরীতি ‘সাধু’ও নয় ‘কথা’ও নয়; তাহার নাম আদর্শ-বাংলা-গদ্যরীতি; এই রীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন প্রতিভাশালী লেখকের প্রতিভায় ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমী-যুগের এই যে গদ্য-যাহাকে ‘অসাধু’-অপবাদ দিবার জন্যই এক্ষণে বেশী করিয়া ‘সাধু’ বলা হয়—এই গদ্যের ভাষা ও ধ্বনিসম্পদ আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে সাহিত্য-পদবীতে আরুঢ় করিয়াছে। ভাষার এই গঠন ও তজ্জনিত ধ্বনি গৌরব যদি বাঙ্গালীর সাধ্যায়ত্ত না হইত, তবে আজ আমরা জগতের সাহিত্য-সভায় যেটুকু স্থান দাবী করিতেছি, তাহাও সম্ভব হইত না। যে রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা বিশ্বের সমক্ষে খাড়া করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, সেই রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হয় এই গদ্যকে আশ্রয় করিয়া, এবং তাঁহার সমগ্র কাব্য কীর্তির মহনীয় অংশ এই রীতি ও এই ধ্বনি-ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই এই গদ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন—১৫ হইতে ২১/২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই নিজ শক্তির পরিচয় পাইয়া সাহিত্যসাধনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে, এমন কি, তাহার অনেক পরেও, কবিতা রচনায় তিনি তাদৃশ সাফল্য লাভ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের এই ঘটনা অর্থহীন নহে। তারপর তিনি বিহারীলালের আদর্শে যে ভাষা ও সুর লইয়া গীতকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে সেই ভঙ্গি একরূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিহারী-লালের কাব্যমন্ত্রটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া তিনি বাংলাকাব্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাতে সাধুভাষা ও তাহার ধ্বনি-বিন্যাস তাঁহার বাণীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তাঁহার কাব্যের ভাষাও কালিদাসের বাংলা সংস্করণ, এবং তাহার প্রধান ছন্দ-ভঙ্গি হইল পয়ার কিম্বা মাত্রাবৃত্ত পয়ার। মধুসূদন যেমন পয়ারকেই—অর্থাৎ বাংলা-কাব্যের বনিয়াদী ভদ্র ছন্দটিকেই সর্বকর্মের উপযোগী করিয়া বিচিত্র ধ্বনি-সম্পদে মণ্ডিত করিলেন, তাহাতে নাটক ও কাহিনী জাতীয় কাব্যে কবি-কল্পনা মুক্তিলাভ করিল; তেমনই, রবীন্দ্রনাথও সেই পয়ারকেই গীতিকাব্যের উপযোগী সুর-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিবার কৌশলটি আবিষ্কার করিয়া কাব্যের অপর রূপটি উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। বাংলায় এতদিন কবিতার আকারে গান রচিত হইত, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আমরা বাংলায় কাব্যের বহু-বিচিত্র গীতি-ছন্দ লাভ করিলাম। মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য, তাহা এমনই

করিয়া সাধুভাষা ও সাধু-ভঙ্গির সেবা দ্বারা, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব হইয়া উঠিয়াছিল।

অতঃপর ভাষার এই রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অতিশয় আধুনিক মত যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি আবার ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফলে তিনি এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহা মানিয়া লইলে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের মূলোৎপাটন করিতে হয়। কথ্য ও সাধুভাষার আসল প্রভেদ উভয়ের ধ্বনি-প্রকৃতির মধ্যে; এই ধ্বনিই ভাষার সর্বস্ব, বিশেষত নবযুগের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই ধ্বনির ঐশ্বর্যবিধান। ভাবব্যঞ্জনার অতি নিগূঢ় তত্ত্ব ভাষার ধ্বনি-রূপের মধ্যেই নিহিত আছে। ভাবসংহতি এবং রসাত্মক ধ্বনিবিন্যাসের প্রয়োজনে সেযুগের প্রতিভা ভাষার সংস্কৃত-আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ গ্রাম্য সাহিত্যের কথ্যভাষা বা চলতি-বুলির ধ্বনিপ্রকৃতিই দীন। বস্তুত ভাষাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-রচনার উপযোগী করিয়া তোলাই সে যুগের সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার সমাধানই সে যুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সাধনালঙ্ক ফলের সবটুকু আঙ্গসাৎ করিয়া তবে বাংলার বাণীমন্দিরে পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এককাল পরে, সাহিত্যিক জীবনের অবসানে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাছন্দের আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে গতযুগের সমগ্র সাহিত্য অবদম্ব হইয়া পড়ে। এই আলোচনায় তিনি চলতি ভাষার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিয়া তাহাকে এতখানি গৌরব দান করিতে প্রস্তুত যে, অতঃপর সাহিত্য-রচনায় সাধুভাষার প্রয়োজনই অস্বীকার করিতে হয়। চলতি-ভাষার প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি সাধুভাষার প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই। ১৩৩৮ সালের ‘পরিচয়’ পত্রিকায় তিনি বাংলা-ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, ফিমি ব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকুতীনাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য-বৃদ্ধির জন্য নয়, মর্যাদা রক্ষার জন্য।

১৩৩৮ সালে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। প্রাকৃত-বাংলার প্রতি পক্ষপাত থাকিলেও তখন তিনি সংস্কৃত-বাংলার রাজ-মর্যাদা স্বীকার করিতেন, এবং বাংলাভাষায় এই দুই প্রকার ধ্বনিকেই ক্ষেত্রভেদে সমান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন; ‘শুদ্ধির গোময়-লেপনে’—অর্থাৎ চলতি-ভাষার রীতিই যে বিত্তকীর্তি—এই অজুহাতে, সমস্ত একাকার করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু গত বৈশাখের (১৩৪১ সাল) ‘উদয়ন’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে—‘আমরা ভূমি পেলেই খুশী রব, ঘুমি খেলে আর বাঁচব না’—ঈশ্বরগুণের এই ছড়াটি উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

কেবল এর হাসিটা নয়, হৃন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ্য কোরে দেখবার বিষয়। অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হোত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ যখন সাক্ষ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে শেষে গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হোতেই—কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে।
রঘুকুলের শত্রু যিনি, রক্ষকুলের নিধি।
—এর গাষ্ঠীর্যের ক্রটি ঘটেছে একথা মানব না।’

এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গত যুগের সমগ্র সাহিত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সেকালের লেখকেরা গোড়াতেই ভুল করিয়াছিলেন; মধুসূদনের নৃতন ভাষা ও হৃন্দের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাহা অপেক্ষা এই ভাষা ও হৃন্দের গাষ্ঠীর্য কম নয়।

‘গাষ্ঠীর্যের ক্রটি ঘটেছে একথা মানব না’—এই যুক্তিই কি যথেষ্ট? এই যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া কোনও সাহিত্যিক সন্দীপ যদি ‘বলাকা’ কবিতাটির রীতি বদলাইয়া দেয়, অথবা ঘটং ঘটং করিয়া তাল-চৌকা হৃন্দে ‘সাজাহান’ কবিতাটি পড়িতে থাকে, তবে তাহার সেই বীরত্বব্যঞ্জনায় ‘বলাকা’র কবিতাগুরির সুর কি অক্ষুণ্ণ থাকিবে? রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ-বধের মাত্র কয়েক ছত্র এই অপূর্ব হৃন্দে প্যারাক্রেজ করিয়াছেন, সমগ্র মেঘনাদ-বধ কাব্যখানি একটানা এই ভেক-প্রলম্বী হৃন্দে রচনা করিলে কেমন হয়, তাঁহাকে লিখিয়া দেখিতে বলি না—কল্পনা করিতে বলি।

এই বক্তৃতাটিতে, গদ্যেও চলতি-ভাষার প্রতাপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যুক্তি ও দৃষ্টান্তের কোনটাই বাকী রাখেন নাই। সাধুভাষার প্রতি সর্বোচ্চ কটাক্ষ করিয়া এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—

‘যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজীর মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার হৃন্দে, জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্ত-বর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃত-বাংলার হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্ত-বর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে।’

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিটি সাধুভাষার বিরুদ্ধে যে একটি আক্রোশমূলক অপবাদ তাহা এতখানি আলোচনার পরে বলা নিশ্চয়োজন। এই উক্তিটির মধ্যে কয়েকটি অতিশয় অযথার্থ কথা আছে। ‘অভিধান ঘেঁটে যুক্ত-বর্ণের আয়োজন’-ইহা কোন্ যুগের সাধুভাষার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? যদি তৎসম শব্দ ব্যবহার করিলেই ‘অভিধান-ঘাঁটা’ হয়, তবে বাংলাভাষা দাঁড়াইবে কিসের উপর? ‘অভিধানে’র শব্দগুলো বাদ দিয়া যে খাঁটি গৌড়ী রীতির উদ্ভব হইবে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য-রচনাগুলি তর্জমা করা সম্ভব? -করিলে রবীন্দ্রনাথকে আর চেনা যাইবে? এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি যে কথা বলিয়াছেন- ‘বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে’- তাহা আদৌ সত্য নহে। হসন্তের জোর আর যুক্তবর্ণের জোর, এই দুইয়ের প্রকৃতিই-স্বতন্ত্র-এইজন্যই একই ভাষা দুইটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে; যদি এক হইত, তবে ভাষার এই দুই রীতি লইয়া কোন সমস্যাই থাকিত না। এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই; তথাপি যাহাদের কেবল ছন্দ-জ্ঞান নয়-ছন্দবোধও আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, হসন্তের ও যুক্তবর্ণের বিন্যাস-জনিত ছন্দধ্বনি এক নহে; রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত, ও ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতার ধ্বনি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একটি সাধুরীতির পয়ার-জাতীয় ছন্দেরই রূপভেদ, অপরটি চলে চল্টি-ভাষার চালে। অতএব রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিও যথার্থ নহে।

এইবার সংক্ষেপে দুইচারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রাকৃত বা চল্টি-বাংলার যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহা যে সাহিত্যের প্রয়োজনে নহে, একথা সাহিত্যিকমাত্রেরই স্বীকার করিবেন। তথাকথিত প্রাকৃত-রীতিও যে খাঁটি বাংলা নয়, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না-খাঁটি বাংলা কেহ লেখে না, এবং সম্ভবত আজিকার দিনে কেহ বলেও না। যে বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহারথীগণ চল্টি-বাংলা বলিয়া খাড়া করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা কৃত্রিম ভাষা কল্পনা করাই যায় না-সাধুভাষা তাহার তুলনায় অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বাংলাভাষার যে দুইটা রীতি, কি ছন্দে কি রচনা-ভঙ্গীতে, ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার না করিলে, এবং একই ভাষার পক্ষে এই দ্বৈত-পদ্ধতি যতই অদ্ভুত বলিয়াই মনে হউক, এই দুই রীতির মধ্যে কোনটি প্রশস্ত রীতি-সর্ববিধ ভাবব্যঞ্জনার পক্ষে, এবং পূর্ণশক্তি ও সৌন্দর্য্য-গুণের আধার হিসাবে, কোন্ রীতি সুপরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে-সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র আর নাই। যাহাকে খাঁটি কথ্যরীতি বলা যাইতে পারে-সেভাষা মৌখিক বক্তৃতা, উপদেশ, রূপকথা, বৈঠকী আলোচনার ভাষা হইতে পারে; বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা-অনুসারে সাধু বা চল্টি ভাষার ব্যবহার লেখকের রুচি অনুযায়ী হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু সাহিত্যরসিকমাত্রেরই স্বীকার করিবেন-

সাধুভাষায় সকল কাজই চলিতে পারে, চলতি ভাষা একেবারে বর্জন করিলেও ক্ষতি নাই। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতম উৎকৃষ্ট গল্প ও উপন্যাস ইহার সাক্ষী। কিন্তু চলতি-ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতিই এমনই যে, তাহাতে ভাব-চিন্তা বা কল্পনার বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করা যায় না। স্থানাভাবে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিব, এবং ইচ্ছা করিয়াই একটি কবিতার উল্লেখ করিব। রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ কবিতাটি সকলেই পড়িয়াছেন, এবং সম্ভবত অনেকেই ইহার আবৃত্তিও শুনিয়াছেন। এই কবিতাটি সাধুভাষায় ও সাধুছন্দে রচিত। ইহার কথাবস্তু ও বর্ণনায়, ভাবের মত-ভাষারও সকল স্তর সন্নিবিষ্ট আছে; অতি সহজ ও সরল নাটকীয় কথাবার্তা হইতে ভাবকবিত্ব উচ্চাঙ্গের অলঙ্কৃত বাণী একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহে মিলিত হইয়া এই রচনাটিকে একটি অনবদ্য কাব্য-রূপ দান করিয়াছে। এত সরল, এত জীবন্ত অথচ এমন রস-গভীর কথা-চিত্র অঙ্কিত করিবার পক্ষে সাধুরীতি কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করে নাই, বরং অন্য রীতিতে তাহার ধ্বনিব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হইত, ‘টরেটকা’-ছন্দে ও কথ্যভাষার ভঙ্গিতে উহা যে কি হইত, তাহা কল্পনা করাও যায় না। গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ভাষার এই সাধু-রীতিই প্রশস্ত রীতি, তাহা বর্জন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই-বরং সে রীতি না করিলে সাহিত্যসৃষ্টিই বাধা পাইবে। এই সাধুরীতিকে সাধু বা পণ্ডিতী-রীতি বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কোনও কারণ নাই-এই রীতিই বাঙ্গালীর চিন্ত-প্রকর্ষের নিদান, ইহাই তাহার ভাবচিন্তা ও কল্পনাকে মার্জিত, তাহার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে অব্যাহত, এবং মনের মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও ঋজু করিয়াছে। ভাষার রীতি একটা খেলা বা খেলার বস্তু নয়-ব্যক্তিবিশেষের খুশী বা বিলাস-বাসনা যদি এমন করিয়া কোনও জাতির ভাষাকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে চায়, ও পারে-তবে সে জাতির মৃত্যু অবধারিত। বাঙ্গালী কি সত্যই মরিতে বসিয়াছে?

(লেখক : জন্ম ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ কাঁচড়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ এবং মৃত্যু ২৬ জুলাই ১৯৫২ সাল)

বাংলা সাহিত্যে ইসলাম

সৈয়দ আলী আহসান



ইসলাম কবে থেকে আরম্ভ হল অর্থাৎ কখন থেকে ইসলাম চর্চা বাংলা সাহিত্যের বিষয় হিসাবে পরিগণিত হল সেই ইতিহাস আলোচনা করার পূর্বে বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব কখন হল এবং কখন থেকে ইসলামের আদর্শ বাংলা কাব্যে বা সাহিত্যে এল সেই ধারাক্রম নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে ইতিহাসপূর্ব সময়ের দিকেও কিছুটা দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। আমি ইতিহাসপূর্ব মানে খৃষ্টপূর্ব সময়ের কথা বলছি। ভারতবর্ষে তখন বৈদিক যুগ, আর্যরা এখানে এসে একটা স্থায়ী অবস্থিতি নিয়েছেন। আর্যরা ইরানে ছিলেন, আফগানিস্তানে ছিলেন, পরে ভারত-ভূমিতে, উত্তরাঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন। অঞ্চলটি ছিল গঙ্গাবিধৌত। সেখানে অবস্থিতি গ্রহণ করার পর ক্রমান্বয়ে ভারতের সর্বত্র তারা অধিকার বিস্তারিত করতে লাগলেন। সেই সময় ভারতের পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি রাজ্যের সংবাদ শোনা যায়। একটি হচ্ছে অঙ্গ, একটি হচ্ছে বঙ্গ, একটি সমতট, একটি কলিঙ্গ, আর একটি হচ্ছে প্রাগজ্যোতিষ— যা গঠিত ছিল আসাম-বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রভৃতি জায়গা নিয়ে। বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলটাই তৎকালীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণে খুলনা এবং সুন্দরবনের সমস্ত এলাকাটা সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এ অঞ্চল সমতট বলেই পরিচিত ছিল। আর্যরা ভারতবর্ষে এসে একটি যজ্ঞের আহ্বান জানায়। তৎকালীন নিয়মে যজ্ঞের আহ্বান ছিল আনুগত্যের আহ্বান। আর্যরা আপন অধিকার বিস্তারের জন্য আনুগত্যের আহ্বান জানায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সকলেই এই আনুগত্য স্বীকার করে এবং যজ্ঞে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়। একমাত্র বঙ্গ অঞ্চলের লোকেরা এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। তারা আর্যদের বহিরাগত হিসাবে গণ্য করেছিল এবং এ কারণেই তাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। আর্যরা সে কারণে এদেরকে অনার্য বলে অভিহিত করল। তারপরে বহুদিন পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি, এই অঞ্চল জয়ের জন্য আর্যরা চেষ্টা করে কিন্তু পুরোপুরি জয় তারা করতে পারেনি। এখানে অনবরত যুদ্ধ-বিদ্রোহ হয়েছে, বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থেকেছে, কিন্তু স্থিতিশীল আর্য শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যও এই অঞ্চলটিকে পূর্ণভাবে আপন আয়ত্তে আনতে পারেনি।

তাহলে দেখতে পাই, খৃষ্টপূর্ব কালে একটি সময়ে বঙ্গভূমির লোকেরা 'আর্যদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল, এতে তাদের সাহসী চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটেছিল। পরে বহুদিন পর্যন্ত নানাবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে স্থানীয় লোকেরা ৮ম শতকে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা হিসাবে নির্বাচন করে। গোপাল, তারপর ধর্মপাল, বিগ্রহপাল এবং আরও অনেকে একের পর এক রাজা হন। এভাবে পাল বংশের একটা ধারা এদেশে চলতে থাকে। এরা কিন্তু বঙ্গ অঞ্চলের অধিবাসী অর্থাৎ বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের অধিবাসী এবং এদের বড় পরিচয় এরা হিন্দু নয়, এরা বৌদ্ধ। সেই সময় এই অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছিল। তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীভেদ ছিল। বৌদ্ধরা এসে এই শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এবং তারা অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীদের পাণি গ্রহণ করেছেন। এ রকম ঘটনার প্রধান উদাহরণ হচ্ছেন সরহপাদ। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। পরে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। সরহপাদ শেষ পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন সাধারণ মানুষের একজন হবার জন্যে। তিনি এক শবর রমণীকে বিবাহ করেন এবং তার সঙ্গে জীবন যাপন করতে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে তিনি এই শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

সেই সময়কার একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তা বঙ্গ-ভূমির ঘটনা নয়, কিন্তু ইসলামের ঘটনা। আর তা ঘটেছিল মধ্য এশিয়ায় তুখারিস্তানে। আরব সেনারা তুখারিস্তান অঞ্চল দখল করেছিল অষ্টম শতকের দিকে। তুখারিস্তান ছিল বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা। এর কিছুকাল পূর্বে সিদ্ধু প্রদেশে ইসলাম এসে গেছে, ইরান ইসলামের করতলগত হয়েছে। তুখারিস্তানে যখন মুসলমানরা এসে গেলেন সেই সময় তুখারিস্তানের বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ ও বিহার থেকে বহুলোক বিহারের, বাংলাদেশের এবং অন্যান্য বিদ্যাপীঠে পাঠক্রম চালাবার জন্যে আসেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহপা'র যে 'দোহাকোষ' সম্পাদনা করেছেন তার ভূমিকায় বলেছেন : এই তুখারিস্তান থেকে ভিক্ষুরা বাংলাদেশে যখন এসেছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের যে প্রতাপ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সংবাদ এখানে এনেছিলেন। এতে বোঝা যায়, ইসলামের সংগে বাংলাদেশের গৌণ সংযোগ সেই ৮ম শতকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন যে, রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালে সরহপাদ যখন বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন তখন সরাসরি ইসলাম এখানে এসেছিল, এ কথাটি ঠিক নয়। তবে ইসলাম যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ছে সেই সংবাদ এখানে এসেছিল। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা। তারপরে আর একটি সংবাদ আছে। ধর্মপাল যখন এখানে রাজত্ব করছেন সেই সময় আরবদেশ থেকে

(কোন বিশেষ আরবদেশ থেকে তা বলা হয়নি) একজন রাষ্ট্রদূত ধর্মপালের রাজসভায় এসেছিলেন এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করে এই সম্পর্কে আলোচনা লিখেছেন। এই সংবাদটি ভারতের বিদ্যাক্ষন থেকে প্রকাশিত ড. কে. এম. মুন্সী সম্পাদিত 'দি হিষ্টরী এন্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল' গ্রন্থের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, আরবদের সংগে এই অঞ্চলের যোগাযোগ বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৮ম শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি মনে করা হয় যে, আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরব ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে এসেছিল এবং ৮ম শতকে তো অবশ্যই এসেছিল, চট্টগ্রামেও এসেছিল। এই সংবাদটি আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এখানে সংবাদ হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে, মধ্য এশিয়ায় তুখারিস্তান অঞ্চলে প্রতাপী আরব সেনার বিজয় এবং সেই সংবাদ বিভিন্ন ভিক্ষু কর্তৃক আনীত হয়ে বাংলাদেশে প্রচার। এই ভিক্ষুরা বিহারের বিক্রমশীলায় এসেছিলেন, নালন্দা বিদ্যাপীঠে এসেছিলেন এবং রাজশাহীতে যে শালবন বিহার ছিল সেখানেও তাঁরা এসেছিলেন। সুতরাং এসব অঞ্চলে তারা এসে এই সংবাদগুলো প্রচার করেছেন। এই সূত্রে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পাদিত সরহপা'র দৌহাকোষের সূত্রপাতে আমরা লক্ষ্য করি, সরহপাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, জৈনবাদের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এমন কি বৌদ্ধ আচার-নিষ্ঠার বিরুদ্ধেও তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, এই যে আচার, এই আচারের মধ্য দিয়ে মানুষ কখনো মুক্তি পায় না, মানুষের মুক্তি হয় সকল মানুষকে এক হিসেবে বিবেচনা করলে এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে : একটা পরম সত্যকে আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই মানুষের মুক্তি হয়। এই তত্ত্বটা মূলত: গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, এটা 'কিছু ইসলামের তত্ত্ব অর্থাৎ ইসলাম বলছে কোন মূর্তির মধ্যে আল্লাহ নেই। কোন বিশেষ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ নেই। আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে। তিনি স্রষ্টা অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছুই অস্তিত্ব আছে সবই শূন্য। কিছুই নেই আসলে। কারণ এগুলো থাকে না। মানুষ যেদিন এই সমস্ত অস্তিত্বকে অতিক্রম করে যেতে পারবে, সেদিনই সে আল্লাহর সংগে মিলিত হতে পারবে। বৌদ্ধরা কিছু পুরোপুরি এ কথাটা বলে না। কেননা তারা শূন্যবাদের উপর নিজেদের স্থিতিটা রেখেছে। তারা বলে, সংসার এবং অ-সংসার দুই-ই এক। অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব দুই-ই এক। যাকে আমরা অস্তিত্ব বলছি সেটাই অনস্তিত্ব। সুতরাং আমরা সাধনা করব শূন্যের, মহাশূন্যের, অতিশূন্যের। এগুলো জটিল তত্ত্ব। আমি এই জটিল তত্ত্বের মধ্যে যাব না। কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়নের বক্তব্য হচ্ছে, যেভাবেই হোক, ইসলামের কিছুটা প্রতিফলন গৌণভাবে হলেও এদেশের মানুষের চিন্তার মধ্যে সেই সময় এসে থাকতে পারে এবং সরহপার

মধ্যে তো অবশ্যই আসতে পারে। কারণ ‘সরহপা’ অত্যন্ত আত্মহী পুরুষ ছিলেন, উদার পুরুষ ছিলেন। পৃথিবীর যেখানেই যে সত্য এসেছে সে সত্যকে তিনি জ্ঞানবার আশ্রয় গ্রহণ পেয়েছিলেন। তিনি যে বিদ্রোহী ছিলেন তার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব বাদ দিয়ে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কিন্তু বিবাহ করেনা। তারা আজীবন কুমার থাকে। কিন্তু নালন্দা বিদ্যাপীঠ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নিম্ন শ্রেণীর একটি রমণীর সংসর্গ করলেন এটাও প্রতিবাদ। অর্থাৎ সাধারণের একজন হবার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন। এই যে ভক্তিটা, এই ভক্তিটার মধ্য দিয়ে শ্রেণীবিভেদটা দূর করবার একটা প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি, যে শ্রেণীবিভেদটা ইসলাম পৃথিবী থেকে সর্বপ্রথম দূর করেছিল। বৌদ্ধরা অর্থাৎ পাল রাজবংশীয়রা এদেশে রাজত্ব করেছিলেন অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। তারা কিন্তু সকলেই এই অঞ্চলের লোক ছিলেন, বাংলা ভাষাভাষী লোক ছিলেন। এই সময়ই বাংলা ভাষা ক্রমান্বয়ে রূপ পেতে থাকে। এর শেষের দিকে সেন রাজবংশ প্রতাপাবিত হয়। প্রধানত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে, পরে তারা পূর্ব বঙ্গে চলে আসেন, একাদশ-দ্বাদশ শতকের দিকে। কিন্তু সেন রাজবংশ যেখানে মাত্র পঞ্চাশ বছর এ অঞ্চলে রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে পাল বংশ পাঁচ’শ বছর রাজত্ব করেছিল। সেন রাজবংশের পতনের একটি কারণ আছে। এটাও রাহুল সাংকৃত্যায়ন আলোচনা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের পণ্ডিতেরা এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। সেনরা কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন। এরা ছিল বহিরাগত। এখানে বৌদ্ধদের সময় অর্থাৎ পাল রাজবংশের সময়ে যে শ্রেণীভেদ দূর করবার একটা চেষ্টা ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তারা শ্রেণীভেদ তৈরী করবার চেষ্টা করলেন কান্যকুব্জ থেকে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এলো এ উদ্দেশ্যে যে, তারা এ অঞ্চলের মানুষকে শিক্ষা দেবে, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবে, তাদের বলিষ্ঠ করবে, প্রাণবন্ত করবে, আদর্শবাদী করবে, এই ছিল তাদের কাম্য। এর ফলে সধারণ মানুষের নিশ্চয়ই বিপদ এসেছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকদের, অজ্ঞ শ্রেণীর লোকদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার একটি গৌণ প্রমাণ আমরা পাই, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না। গৌণ প্রমাণটি হচ্ছে, সপ্তদশ অষ্টারোহী নিয়ে ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজী তের শতকের প্রথমদিকে বাংলাদেশ জয় করেন। কি করে সতেরজন অষ্টারোহী নিয়ে একজন লোক একটি দেশ জয় করতে পারেন? রাহুল সাংকৃত্যায়ন ধারণা করেছেন যে, এর কারণ হচ্ছে রাজন্যবর্গ যারা ছিলেন, প্রশাসক যারা ছিলেন, স্থানীয় সাধারণ নিম্নবর্ণের জনসাধারণ তাদের সমর্থন করেনি। তাদের পক্ষে দাঁড়ায়নি। রাজা বিচ্ছিন্ন ছিলেন জনসাধারণ থেকে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে রাজাকে সমর্থন করার জন্য দেশের মানুষেরা এগিয়ে আসেনি। তার ফলেই রাজা দুর্বল হয়ে পলায়ন করেন।

তাছাড়া রাজার ব্রাহ্মণরাও রাজার কাছে গল্প করেছিল যে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর হাতেই তার পতন হবে। তাহলে দেখা যায়, রাজা যে ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণরাই আবার বিদেশীদের অর্থ সাহায্য পেয়ে বিদেশীদের সপক্ষে কথা বলেছিল। সুতরাং সেন রাজবংশ এখানে প্রতাপী হতে পারেনি, প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এখানকার জনসাধারণ তাদের অগ্রাহ্য করেছে। প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম তখনই এদেশে উপস্থিত হয়। এর আগে কিন্তু অলি-আউলিয়া-পীর-ফকির এদেশে এসেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। কিছু কিছু অঞ্চলে ইসলাম ততদিনে কায়মও হয়ে গেছে। তার একটি প্রমাণ আমরা পাই ডাকের বচনে। একে প্রবাদবচনও বলা হয়। এগুলি কৃষি সম্পর্কিত। খনার বচন যে রকম। কি করে কলা গাছ রোপণ করতে হয়, কোন সময় ধান কাটতে হয়, আমন ধান কখন রোপণ করতে হয়, এ সমস্ত কথাবার্তা। অনেকটা ছড়ার মত। আমাদের দেশে, আসামে, উড়িষ্যায় এই তিন অঞ্চলে এগুলোর অসম্ভব রকম প্রচার হয়েছিল এবং এই ‘ডাকের বচন’ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এই অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল। আসামের সাহিত্য একাডেমী থেকে প্রকাশিত অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে ডাকের বচন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন: একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে, এই ডাকের বচনের মধ্যে কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দ এসে গেছে। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের সময়কালে ডাকের বচনের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দ এল কি করে? তারা ধারণা করেছেন, সম্ভবত এ ডাকের বচনগুলো অনেক পরের রচনা। আবার বলেছেন, ডাকের বচন তো আগেও ছিলো। পরে রচনা সংশোধিত হয়ে আরবী ফারসী শব্দ চলে আসতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, সম্ভবত আরবদেশ থেকে ব্যবসাসূত্রে যারা এসেছেন অথবা পীর-অলি-আউলিয়া যারা এসেছেন, সে সময় জনগণের সাথে কথাবার্তা সংলাপ তাঁদের করতে হয়েছে। তাঁরা সেই সময়ে এই অঞ্চলে যে ভাষা ছিল তা আয়ত্ত করেছিলেন এবং তার মধ্যে কিছু আরবী ফারসী শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন। এখানকার লোকেরাও সেই শব্দগুলো গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সাধারণ লোকদের কৃষিভিত্তিক যে তত্ত্ব সে তত্ত্বের মধ্যে কিছু আরবী ফারসী শব্দ চলে আসতে পারে। এসেছেও। যাই হোক, বখতিয়ার খিলজী যখন এলেন, তখন থেকে এ অঞ্চলের মুক্তি ঘটল। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, পাল রাজবংশ রাজ্য শাসন করেছিল এ অঞ্চলে সুস্থিরভাবে তিনশ বছর। আর পরবর্তী দু’শ বছর কিছুটা অস্থিরভাবে। সর্বমোট পাঁচশ’ বছর তারা রাজত্ব করেছে। দীর্ঘ পাঁচশ বছরের রাজত্ব কম কথা নয়। এরা কিন্তু এক সময় ভারতবর্ষের একেবারে পশ্চিম অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান পালদের অধীনস্থ হয়েছিল। পরে আবার সংকুচিত হয়ে যায়। সেনদের প্রতাপে তারা

পরাজিত হয়। পরে মুসলমানরা আসে। এর পরে বাংলাদেশে স্বাধীন নবাবী আমল শুরু হয়। সেটাও প্রায় পাঁচশ বছর। এই দীর্ঘ সময়টাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা (যেমন ড. সুকুমার সেন) বলেছেন, ‘বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ’ এবং তার উপর নির্ভর করে আমাদের বাংলাদেশের পণ্ডিতরাও এটাকে ‘অন্ধকার যুগ’ বলে ঘোষণা করে থাকেন অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ-চতুর্দশ এই সমস্ত শতকগুলোকে তারা ‘অন্ধকার যুগ’ বলে থাকেন। তারা বলেন, নবাবী আমলের সূত্রপাতের যুগটা ‘অন্ধকার যুগ’ ছিল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ সেই সময় এই দেশে আরবী চর্চা, আরবী শিক্ষার একটি প্রবল ধারা প্রবাহিত ছিল। মসজিদের মধ্যে, বিভিন্ন প্রস্তর-ফলকের মধ্যে আরবী ক্যালিগ্রাফী বা হস্তলিখন শিল্পের একটা অসাধারণ নিদর্শন আমরা সে সময় পাই। বড় বড় মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। আমরা বলতে পারি, বাংলা ভাষার চর্চা অতটা না হলেও সংস্কৃতি এবং শিল্পের চর্চা কিন্তু এ অঞ্চলে তখন হয়েছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবেই আমাদের বিচার করতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য সামগ্রিকভাবে সব ক’টাকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের লোকেরা অগ্রগামী ছিল এবং এরা যথেষ্ট প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়েছে। আমরা আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করি, সেটা হলো মুসলমান রাজন্যবর্গ এই অঞ্চলে একটা স্থিতিশীলতা স্থাপন করেছিল। মুসলমান মানে পাঠান, তুর্কী। এরা কিন্তু স্থানীয় লোক হয়ে গিয়েছিল। এরা বহিরাগত ছিল না। কেননা এ স্থানের সাথে তারা নিজেরা একটা সাযুজ্য নির্মাণ করেছিল যেটা মোগলরা করেনি। এরা করেছিল বলেই এর কতকগুলো নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। চৈতন্যের যখন আবির্ভাব হয় হোসেন শাহ তখন এদেশের সুলতান। চৈতন্যের দু’জন শিষ্য ছিলেন সনাতন এবং রূপ গোস্বামী। তারা হোসেন শাহের দরবারে মন্ত্রী ছিলেন, গোস্বামী ছিলেন ফারসী এবং আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত। চৈতন্যের বিভিন্ন লীলাবৈচিত্র্য, বিভিন্ন দশা, উনাদশ দশা, অভিসারের ভঙ্গি, সাধনভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে গোস্বামী ‘উজ্জ্বল নীলমণি’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ‘উজ্জ্বল নীলমণি’ গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজীতে যাকে বলে কোডিফিকেশন অর্থাৎ সাধনতত্ত্ব, তারই একটা রূপ দেবার প্রচেষ্টা সেখানে লক্ষ্য করা যায়। এই রূপ দেবার প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে সুফী প্রভাব লক্ষ্য করি। সুফীদের মরমী ভাবে রয়েছে আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যবন্ধন, একটা সম্পর্ক সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ আল্লাহকে পাবার চেষ্টা করছে, আল্লাহ মানুষকে আকর্ষণ করছেন। সুতরাং আল্লাহ হচ্ছেন প্রিয়তমা এবং মানুষ হচ্ছে প্রেমিক। প্রেমিক তার প্রিয়তমাকে পাবার জন্যে যে ব্যাকুল হচ্ছে—সুফী কবিদের কবিতার মধ্যে আমরা এর নিদর্শন দেখতে

পাই। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যেও মানুষ হচ্ছে প্রেমিকা এবং আল্লাহ হচ্ছে প্রেমিক পুরুষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা। রাধিকা হচ্ছে জীবাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে পরমাত্মা। এই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে সম্পর্ক এটা সম্পূর্ণভাবেই সুফীতত্ত্ব থেকে এসেছে। এটি সুফীতত্ত্বের একটা ভিন্নরূপ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করেছেন। সে অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকার মধ্যে তিনি বৈষ্ণব রূপতত্ত্বের সঙ্গে সুফী রূপতত্ত্বের একটা বিশ্লেষণ করেছেন। এই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব তৈরী হয়েছে সুফী রসতত্ত্ব থেকে।

এভাবে ইসলামের একটা সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে লক্ষ্য করি। মুসলমান কবি-সাহিত্যিক এ সময়ে আসেনি ঠিকই, কিন্তু ইসলামের প্রভাবটা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে তখনই এসে গেছে। আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে এই, শ্রীচৈতন্য সর্বল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এটা প্রেমধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। নিম্নশ্রেণীর মানুষকে তিনি আপন দলভুক্ত করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, একটি ভক্তিদ্বারার প্রবর্তন করেন। এই ভক্তিদ্বারার মধ্যে সব মানুষই এক হতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল, তখন নিম্নশ্রেণীর, নিম্নবর্ণের যেসব হিন্দু সমাজে অবজ্ঞাত হওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন-তাদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে সরিয়ে আনা অথবা ভবিষ্যতে হিন্দুরা যাতে ইসলাম ধর্মে না গিয়ে হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকে, সে উদ্দেশ্যে হিন্দু ধর্মের পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।

হিন্দু-ধর্মের ক্ষেত্রে চৈতন্যের দানটাকে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। 'চৈতন্য চরিতামৃতের' মধ্যে আছে যে, একদিন চৈতন্য নাম-সংকীর্তন করতে পথে বের হলে স্থানীয় কাজী তার শিষ্যদের আক্রমণ করেছিলেন। পরে চৈতন্য যখন দলবল নিয়ে সেই কাজীর বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন কাজী চৈতন্যের পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। 'চৈতন্য চরিতামৃতের' মধ্যে চৈতন্যকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মুসলমানদের এরকম লঘুভাবে দেখানো হয়েছে। একটি কথা বলা দরকার, চৈতন্য যে গ্রামে সংকীর্তন করতেন, সেই গ্রামটির নাম ছিল রামকেলী। সেই গ্রামটা হোসেন শাহ চৈতন্যকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনি এই গ্রামের মধ্যে নাম-সংকীর্তন করুন, কেউ আপনাকে কোন বাধা দেবে না। তাই হোসেন শাহের শাসন আমলে চৈতন্যের অনুসারীদের উপর কাজীদের অত্যাচারের কথাটা একটা মিথ্যা প্রচারণা। মূলত বলা যেতে পারে, মুসলমান নৃপতির সহায়তা নিয়েই শ্রীচৈতন্য ধর্ম প্রচারে সক্ষম হয়েছিলেন। এটাকে ধর্ম প্রচার বলা অবশ্য ঠিক নয়, বরং বলা যায় যে তিনি

সংকীৰ্তন প্রচাৰে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে আমরা দেখি, ~~ইসলাম~~ প্রতাপী পৰিচয় এই অঞ্চলের মধ্যে আছে। এক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ, চতুৰ্দশ ও পঞ্চদশ শতকে কিছু রাজনৈতিকভাবে, ভৌগোলিকভাবে এখনকার বাংলাদেশ অথবা পূৰ্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে যে ভৌগোলিক অবস্থা, তা তখন ছিল না। তখন বঙ্গ, আসাম, বিহার, বিহারের পূৰ্বাঞ্চল, উড়িষ্যা এগুলো একই শাসন-অঞ্চলের মধ্যে ছিল। তখন মুসলমান নৃপতিদের শাসন সম্পূৰ্ণ অঞ্চলের মধ্যেই বিস্তৃত ছিল। যেমন শেরশাহের কথা বলা যায়। শেরশাহ ছিলেন পাঠান, এই অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি বিহারের সাসারাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বাংলা-বিহার উড়িষ্যায় শের শাহের রাজত্ব ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাও তো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় নবাব ছিলেন। সুতরাং ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এই যে বিস্তার, এই কথাই আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই সময় আরবী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আরবী সাহিত্য বৰ্তমান হিন্দি সাহিত্যের আদিৰূপ। আরবী ভাষার যারা কবি তারা প্রধানত মুসলমান ছিলেন। মালিক মোহাম্মদ জায়সী, মনঝন, মোল্লা দাউদ প্রমুখের নাম এখানে বলা যায়। মোল্লা দাউদের ‘চান্দায়ন’, মনঝনের ‘মধুগালত’, মালিক মোহাম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবত’ তারপরেও এ ধরনের অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। এই কাব্যগুলোর মধ্যে সুফীতত্ত্ব এবং কবিদের গীৰপৰম্পরায় বিশ্লেষণ আছে, রসুলের প্রতি নিবেদন আছে, রসুলের বর্ণনা আছে এবং ইসলামের আদৰ্শকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আছে। যারা করেছেন তারা মুসলমান এবং তারা সুফীসাধক ছিলেন। এই সমস্ত কাব্যগুলোর অধিকাংশই প্রেমকাব্য। সুফীদের যে প্রেমতত্ত্ব আছে, সেই প্রেমতত্ত্ব। ভারতবর্ষে তখন যে ভক্তি ধারা প্রচাৰিত হয়েছিল, সেই ভক্তি ধারার মধ্যে তিনটি ভক্তি ধারা প্রবল ছিল। একটি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি ধারা, আরেকটি হচ্ছে রাম ভক্তিধারা, অন্যটি হচ্ছে নিৰ্গুণ ভক্তিধারা। নিৰ্গুণ ভক্তিধারা হচ্ছে মুসলমানদের। কারণ আল্লাহ সমস্ত গুণের উৰ্ধ্বে। তিনি নিৰ্গুণ। নিৰ্গুণ মানে তাঁর কোন গুণ নেই, সেই অৰ্থে নয় বরং তিনি সমস্ত গুণের উৰ্ধ্বে। গুণ তো মানুষেরই অৰ্থাৎ মানুষের এই গুণ আছে, সেই গুণ আছে, এটা করে, ওটা করে; কিন্তু আল্লাহ সমস্ত গুণের সমাহার; সুতরাং তিনি নিৰ্গুণ। সমস্ত রং-এর সমাহার, সুতরাং সাদা। এই যে শুভ্র সূর্যের আলো এর মধ্যে অনেক রং আছে। কিন্তু সমস্ত রং-এর সমাহার বলে একটি রংই দেখা যায়, অৰ্থাৎ একে রংহীন মনে হচ্ছে। সাদাকে যেমন আমরা রংহীন বলি, তেমনই আল্লাহ হচ্ছেন নিৰ্গুণ। সেই নিৰ্গুণ ভক্তিধারার সাধক কারা? কবিরা। তিনি মুসলমান। মালিক মুহাম্মদ জায়সী, মোল্লা দাউদ-এঁরা নিৰ্গুণ সাধনতত্ত্বের সাধক। আরো রয়েছেন বাবা ফরিদ। বাবা ফরিদ ছিলেন পাঞ্জাবের কবি। তিনি নিৰ্গুণ ভক্তিধারার কবি। দাদু-দয়াল নিৰ্গুণ ভক্তিধারার কবি। কিন্তু এর মধ্যে একজন এসেছিলেন যিনি মুসলমান নন কিন্তু নিৰ্গুণ ভক্তিধারার কবি। তিনি হচ্ছেন গুরু নানক। গুরু নানকের একটি কথা এখানে

একটা ধর্ম

মধ্যে বাবা ফরিদের অনেক গান আছে। তিনি এক ইসলামের দ্বারা অভিভূত হয়েই তাঁর নতুন গান লেখেন। পরবর্তীকালে গুরু গোবিন্দের সময় এটা একটা পরিণত হয়। কিন্তু গুরু নানকের সময় এটা ধর্মই ছিল, এটা সুফীতত্ত্ব ছিল, একটা নিষ্ঠা ভক্তিতত্ত্ব ছিল। যাই হোক, বাবা ফরিদ হিন্দুদের মধ্যে আমরা কৃষ্ণ ভক্তিদ্বারা লক্ষ্য করি এবং রাম ভক্তিদ্বারা লক্ষ্য করি অবাস্তবী হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে।

রাম ভক্তিদ্বারার বিরাট কাব্য হচ্ছে তুলসী দাসের 'রাম চরিত মানস'। আর আমাদের দেশে কৃষ্ণ ভক্তিদ্বারার পরিচয় হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর সবই কৃষ্ণ ভক্তিদ্বারার। কিন্তু সেখানেও ইসলামের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই ঐ ভক্তিদ্বারার কাব্য উৎসারিত হয়েছে। কিছু কিছু মুসলমানও অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন। সেখানে তারা রসূলকে নিয়ে এসেছেন। তবে তা আমাদের আলোচনার মধ্যে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা বলতে চাই, সামগ্রিকভাবে যদি বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা করি, তবে প্রাথমিক যুগ যেটার কথা আগেই বলেছি এবং মধ্যযুগের যে ধারার আমি বর্ণনা দিচ্ছি সে ধারার মধ্যেও ইসলামের প্রভাব, প্রচার আমরা লক্ষ্য করি। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিই কিন্তু মুসলমান। হিন্দুদের কবি যারা এ অঞ্চলে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মুকুন্দ রাম, যিনি অনেক পরের কালের কবি। তাছাড়া কাশীরাম দাস, কৃষ্ণিবাস রয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকজন প্রধান কবি হচ্ছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান কবি কারা? ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ করে প্রবল প্রভাবে মুসলমান কবিরা এসেছেন-সৈয়দ সুলতান, আলাওল, দৌলত উজির, দৌলত কাজী ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁরা অসাধারণ শক্তিশালী কবি ছিলেন। তাঁরা ইসলামের কথা প্রচার করেছেন। সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ সুলতানের কাব্যের মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম ইসলামের ইতিহাসের একটা ধারাক্রম কাব্যরূপে প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করি। তিনি 'নবী বংশ' রচনা করলেন। এটি একটি দীর্ঘ কাব্য। 'নবী বংশ'র মধ্যে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে রসূল (স.) পর্যন্ত নবীদের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে রসূলের (স.) অংশ যে অধ্যায়ে রয়েছে তা অসাধারণ কাব্যগুণে গুণান্বিত। রসূল (স.)-কে তিনি মানবিক গুণসম্পন্ন করেছেন, দেবতা বানাননি, হিন্দুরা যে রকম বানায়। সেখানে ওফাতে রসূল অংশের মধ্যে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, রসূল (স.) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তাঁর কন্যা ফাতেমাতুজ্জ জোহরা তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার কারণ, 'মোর চিত্ত বৃক্ষ ফল, তুমি স্নিগ্ধ সুশীতল, হৃদয় লতায় তুমি কলি' অর্থাৎ আমার চিত্ত বৃক্ষ ফল হচ্ছে তুমি। সুশীতল সুগন্ধ তুমি। আমার হৃদয় লতার মধ্যে তুমি

কলি।’ এই যে অসাধারণ ব্যক্তাবহ কাব্য, এটা মধ্যযুগে একেবারে অসম্ভব। অনেক পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে দেখি পুত্রের সংগে নিজের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন: ‘হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কুসুম, তাহারে ছিড়িলে কাল, বিফল হৃদয় ডোবে শোক সাগরে। মৃণাল যেথা জলে, যবে কুবলয় ধন কেহ লয় হরি।’

কাব্যসুধমায়, কাব্য-অলঙ্কারে, ভাবপ্রকল্পের মধ্যে এবং ধর্মচিন্তা ও বিশ্বাসে আলাওলের সমতুল্য কবি মধ্যযুগেও খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিতরা মধ্যযুগের এই মুসলমান কবিদের কাব্যচর্চাকে কোন মর্খাদা দিচ্ছেন না, বরং সেই কাব্যচর্চা অত্যন্ত তুচ্ছ, সাধারণ ইত্যাদি বলে এগুলোকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন। তারা বলবার চেষ্টা করছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে, এই বাংলাদেশের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের জন্য দু’টি মাত্র তাৎপর্যবহ ঘটনা আছে। একটি হচ্ছে চৈতন্যের আবির্ভাব, আরেকটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। চৈতন্যের আবির্ভাব অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আলাওলের আবির্ভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে এদেশে ইসলামের আবির্ভাব। কারণ ইসলাম না এলে এদেশের সাহিত্যধারায় এ ধরনের পরিবর্তন আসত না। যেমন হিন্দুদের সাহিত্যের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, তেমনি মুসলমানদের সাহিত্যের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। এদেশে ইসলামের প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী নামে এমন এক সাহিত্য তৈরী হয়েছিল যাকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই গ্রহণ করতে পেরেছিল। ইসলামের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব নির্মিত হতো না এবং সেই সাধন পদ্ধতির সাহায্যে সকল মানুষকে এক করবার একটা প্রবণতাও দেখা দিত না। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের জন্য সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হচ্ছে ইসলামের আবির্ভাব এবং ইসলামের প্রভাবে সাহিত্যের নবরূপায়ণ। আমি ইসলাম ধর্মের কথা বলছি বলে মুসলমান এবং হিন্দুকে আলাদাভাবে ধরছি না। ইসলামের প্রভাবে হিন্দু সাহিত্যও বলিষ্ঠ হয়েছে। মুসলমানদের সাহিত্য তো বলিষ্ঠ হয়েছেই! একেবারে আধুনিক কালের কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফারসীতে পণ্ডিত ছিলেন, হাফিজের কাব্যাবলী তিনি পাঠ করতেন। পিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর প্রবলভাবে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের, পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচীন বৈদিক এবং উপনিষদের হিন্দু ধর্মে যেতে চেয়েছিলেন যেখানে এক ঈশ্বরের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের শাসন ব্যবস্থাকে গ্রাহ্য করেননি। এই যে রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্তি, এই প্রযুক্তি ইসলামের সাহায্যেই হয়েছে। যেমন রাজা রামমোহন রায়। ‘তোহাফাতুল মুয়াহেদীন’ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে রাজা রামমোহন রায় আল্লাহর যে একক স্বরূপ, সেই একক স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। এটা ইসলামের প্রভাবেই ঘটেছে। এই যে পরিবর্তন, এই ইসলামের

সাহায্যেই এসেছে। সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব, বাংলা সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে ইসলামের প্রভাবে। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় হিন্দী সাহিত্যে, পাঞ্জাবী সাহিত্যে, সিন্ধী সাহিত্যে, সকল সাহিত্যেই পরিবর্তন ঘটেছে ইসলামের কারণে। উত্তর ভারতে, দক্ষিণ ভারতে অবশ্য ইসলামের প্রভাব তেমন ছিল না। সিন্ধী সাহিত্যে ইসলাম এসেছিল ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে। তখন থেকে অদ্যাবধি সেটা মুসলমান দেশ। মাঝখানে বৃটিশ আমলে একটি বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থা সেখানে ছিল। সামগ্রিকভাবে সিন্ধী সাহিত্যটা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অংশ গ্রহণে ইসলামের প্রভাবে পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। সে সময় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের মধ্যেও তা এসেছে, পশতু সাহিত্যের মধ্যেও এসেছে। ঐ অঞ্চলটা অবশ্য মুসলমান অধ্যুষিত ছিল। আরবী সাহিত্যের সামগ্রিক মধ্যযুগীয় রূপটাই হচ্ছে মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত এবং মুসলমানদের দ্বারা শাসিত, মুসলমান আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমরা যদি বলি, মধ্যযুগের আরম্ভকালে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতকে হিন্দী ভাষার প্রথম কবি অর্থাৎ অপভ্রংশ ভাষার, হিন্দীর আদিরূপ পশ্চিমী-অপভ্রংশের প্রথম কবি কে ছিলেন? তিনি আবদুর রহমান। মুলতানের অধিবাসী। তাঁর ‘সননেহ রাসক’ নামক এক ধরনের কাব্যে আমরা দেখি, (সননেহ মানে সন্দেশ বা বার্তা), একজন প্রোষিতভর্তৃকা অর্থাৎ রমণী, যার স্বামী বিদেশে আছে, সে স্বামীর জন্যে তার বেদনার কথা নিবেদন করছে। একজন পথিক যাচ্ছিল। সেই পথিককে দাঁড়াতে বলে সে তার কাছে বলছে : তুমি আমার স্বামীকে বলো আমি কি অবস্থায় আছি। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ এলো। প্রতি মাসে তার যে মানসিক অবস্থা হলো, তার বিবরণ তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে এই অঞ্চলে সাহিত্যের আদি অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত ইসলামের শাসন নয়, ইসলামের প্রত্যয়টা এসেছে, ইসলামের প্রয়োগ এসেছে। ইসলামের ভক্তি এসেছে। এই আনন্দ, নির্মাণ ইসলামই নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং বাংলা ভাষার ধারাটা পূর্ণভাবে যদি আমাদের আলোচনা করতে হয়, তবে ইসলামের এই প্রত্যয়ের সাহায্যেই সেগুলো আলোচনা করা সহজ হবে এবং সুন্দর হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সেই আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে অর্থাৎ অপভ্রংশ কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে যাত্রাপথ তার মধ্যে ইসলামের প্রত্যয় একটি প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে এবং ইসলাম এই অঞ্চলের যে শ্রেণীভেদটা দূর করলো, যে বিশ্বাস আনলো মানুষের মনের মধ্যে, আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠিত করলো এবং আল্লাহর সংগে মিলিত হবার যে সাধনার কথা বললো, সেগুলোর দ্বারাই বাংলা সাহিত্য প্রভাবান্বিত হয়েছে। এ প্রভাব মধ্যযুগে ছিল সামগ্রিকভাবে, আধুনিক যুগে ততোটা না হলেও অনেকটা।

(লেখকের জন্ম ২৬ মার্চ ১৯২২, আলোকদিয়া, মাগুরা এবং মৃত্যু ২০০২)

আমাদের বাংলা আবুল মনসুর আহমদ



আমাদের নিজস্ব কালচার বিকাশের ও নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই আমাদের নিজস্ব ভাষা। আমাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা, এ কথা আজ যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় দুই কারণে। এক কারণ ঐতিহাসিক। অপর কারণ রাজনৈতিক।

ঐতিহাসিক কারণ বাংলা সাহিত্যের পিতা আসলে বাংলার নবাব-বাদশারাই। সে হিসাবে বাংলা বাঙালী মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু প্রায় দুই শ বছরের ইংরাজ শাসনে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটয়াছে। সে পরিবর্তন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন উন্নত করিয়াছে, তেমনি মুসলমানদের নিকট হইতে অনেক-অনেক দূরে নিয়াও গিয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা একটি আধুনিক উন্নতিশীল ভাষা হইয়াছে।

অন্যান্য আধুনিক ভাষার মত বাংলাও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ভাষা। কাজেই অনবরত তার প্রসার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ঘটতে থাকিবে।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পণ্ডিত ভাষা। উনিশ শতকের শেষদিক হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর দ্বিজেন ঠাকুর ও রবি ঠাকুরের শক্তিশালী কলমের জোরে ভদ্রলোকের পণ্ডিত বাংলা জনগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইবার চেষ্টা করে। এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও এ চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের ‘দুর্গেশ নন্দিনী’র ভাষা এবং শেষ দিককার ‘দেবী চৌধুরানী’র ভাষার পার্থক্যই এর প্রমাণ।

যা হউক দ্বিজেন ঠাকুর রবি ঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাষা হইতে পারিয়াছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরাও এবং তাদের ভাষাও যে জনগণের ভাষা, এ সত্য হয়ত ঐ মনীষীদের নিকট ধরাই পড়ে নাই।

তারপর নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়া ধূমকেতুর মত বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আকাশে উদ্ভিত হন এবং মুসলিম-বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার সফল চেষ্টা করেন। নজরুলের এই চেষ্টার বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে, তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার কালচারের পার্থক্যও তাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বাংলা ভাগ হইয়া

দুই দেশ না হইলে অতঃপর বাংলা ভাষা কি রূপ নিত, আজ সে আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু তার ইশারা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

রাজনৈতিক কারণ একেবারে আধুনিক। আজ বাংলা ভাগ হইয়াছে। এক বাংলা দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ নিয়াছে। এতে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার কি পরিবর্তন হইয়াছে, এইটাই আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে। এ বিচার সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করিতে গেলে আমাদের আগে বিবেচনা করিতে হইবে দুইটা কথা :

এক. বাংলা ভাগ হওয়ার আগেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-বাংলার ভাষা ও হিন্দু-বাংলার ভাষায় একটা পার্থক্য ছিল। মুসলমান লেখকরা সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রয়োজনের খাতিরে প্রচলিত বহু-সংখ্যক মুসলমানী শব্দ সাহিত্যে চালু করিয়াছিলেন। হিন্দু লেখকরা তা মানিয়া লন নাই।

দুই. বাটোয়ারার আগে বাংলার রাজধানী কলিকাতা সুতরাং সাহিত্যিক কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখন সে জায়গা দখল করিয়াছে ঢাকা।

পরিবর্তনের তাৎপর্য

এই দুইটা কথার তাৎপর্য আমাদের বুঝিতে হইবে। অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সাহিত্যে গোটা-কতক মুসলমানী শব্দ ঢুকাইয়া দিলেই তা মুসলিম কালচারের বাহক সাহিত্য হইয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাল-ভাল বই-এ হিন্দু চরিত্রগুলির জায়গায় মুসলমান নাম বসাইয়া দিলেই ওগুলি মুসলিম চরিত্র হইয়া যাইবে না। তাতে মুসলিম-সাহিত্যও হইবে না। বরং রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভার তাতে অপমানই করা হইবে।

পক্ষান্তরে 'বাংগাল' বা 'মুসলমান' বলিয়া নিজেদের বাপ-দাদার আমলের মুখের লক্ষ্যগুলি বাদ দিলেই আমরা 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' হইয়া যাইব না। গোশতের বদলে 'মাংস', আগার বদলে 'ডিম', জনাবের বদলে 'সুধী', আরযের বদলে 'নিবেদন', তসলিমবাদ এর বদলে 'সবিনয়', দাওয়াত-নামার বদলে 'নিমন্ত্রণ-পত্র', শাদি-মোবারকের বদলে 'শুভ বিবাহ' ব্যবহার করিলেই আমরা 'সত্য' 'কৃষ্টিবান' ও 'সুধী বিদগ্ধ' হইলাম, নইলে হইলাম না, এমন ধারণা হীনমন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টিক চেতনা ও রেনেসাঁর জন্য এটা অন্তত ইংগিত। আমাদের তরুণ 'প্রগতি'-বাদীদের মধ্যে ইদানীং এই বাতিক খুব জোরসে দেখা দিয়াছে। এটা আশংকার কথা।

আমি বলি না যে গোশতের বদলে 'মাংস' আগার বদলে 'ডিম' এমন কি পানির বদলে 'জল' বলা চলিবে না। বরঞ্চ আমার মত এই যে এইগুলি সমার্থ-বোধক বাংলা প্রতিশব্দ। সাহিত্যে উভয় শব্দই ব্যবহার করা হইবে প্রয়োজন মত। কিন্তু এর একটা

‘ছাড়িয়া’ আরেকটা ‘ধরিতে’ যাওয়াতেই আমার যত আপত্তি। পাক-বাংলার বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় ভাষা-বিজ্ঞানের যে কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে সে সব কথা আমি একটু পরে বলিতেছি। এখানে শুধু সেই গঠন-রূপায়ণের কৃষ্টিক বুনিয়াদ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ ‘ছাড়া’ ‘ধরা’ মধ্যে একটা হীনমন্যতা ও পরাজিতের মনোভাব লুকাইয়া আছে। উপরের শব্দ-জোড়াগুলির মধ্যে একটা আরেকটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথাও যেমন বলা যায় না, একটা মুসলমানের অপরটা হিন্দুর একথাও বলা যায় না। আসলে কোনও শব্দেরই ধর্মীয় কোনও রূপ নাই। উপরের শব্দগুলির ত নাই-ই। দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘গোশত’ ‘আগা’ ও ‘পানি’ এই তিনটা শব্দের কথাই ধরা যাক। এর একটাও আরবী নয়, ইসলামীও নয়। জোড়ার প্রতিশব্দগুলিও তেমনি ইসলাম-বিরোধী বা হিন্দুয়ানীও নয়।

শব্দের কৃষ্টিক ইমেজ

তথাপি বাংলাদেশে এই সব শব্দের কৃষ্টিক রূপ বা ইমেজ আছে। সব ভাষাতেই অনেক শব্দের, এমনি কি বেশির ভাগ শব্দেরই, এক-একটা ইমেজ থাকে। সে সব শব্দের সাথে কালচারের অন্তর্নিহিত গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। তেমনি আমাদের বিচার্য তিনটি শব্দের জোড়ার মধ্যেও কালচারের ইমেজ আছে। তার ফলে গোশত, আগা ও পানির মধ্যে ‘ইসলামত্ব’ নাই বটে, কিন্তু ‘মুসলমানত্ব’ আছে। অর্থাৎ জোড়ার এক কাতারের শব্দগুলি এক কালচারের লোকেরা অর্থাৎ হিন্দুরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। জোড়ার অপর কাতারের শব্দগুলি অপর কালচারের লোকেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বহু যুগের ব্যবহারে শব্দগুলি তাই এক-একটা কালচারের আইডেনটিটি বা কৃষ্টিক সুখ্যাতি পাইয়া গিয়াছে। সোজা কথায় একটা হিন্দুর মুখের কথা অপরটা মুসলমানের মুখের কথা, এই তাদের পরিচয়। সুতরাং আমরা যদি ‘পানি’ ছাড়িয়া ‘জল’ ধরি তবে আমরা ধর্মচ্যুত হইব না সত্য কিন্তু ঐতিহ্যচ্যুত হইব নিশ্চয়ই। এর পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে। সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্ররা তা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ ঐ সব ‘মুসলমানী’ শব্দ এবং ঐ ধরনের আরও অনেক শব্দ এক দিক হইতে হিন্দুদের মুখের ভাষার চেয়ে সত্য-সত্যই শ্রেষ্ঠ বাংলা। এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ-গম্যতার ভাষিক প্রয়োজন ও প্রসারতার জাতীয় প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সে প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তান হওয়ার আগেও ছিল। এখন আরও বাড়িয়াছে।

আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

‘গোশত’ ‘আগু’ ও ‘পানি’ ইত্যাদি ‘মুসলমানী’ বাংলা শব্দগুলি বাংলার বাইরের গোটা পাক-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বুঝে, ব্যবহারও করে। ঐ তিনটি শব্দ এবং চাচা চাচী ফুফা ফুফু খালু খালা ইত্যাদি সম্বন্ধ-বাচক, লহ রগ রেশা নাশতা বদনা ইত্যাদি হাজারো বস্তু-বাচক শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। এই বিচারে পাক-বাংলার মুসলমানের মুখের বাংলাকে একরূপ নিখিল পাক-ভারতের ভাষা বলা যাইতে পারে। উনিশ শ তেতাল্লিশ সালে কলিকাতার এক সাহিত্য-সভার ভাষণে আমি হিন্দু সাহিত্যিক বন্ধুদের মুসলমানদের মুখের বাংলাকে সাহিত্যে বর্জন না করিয়া বরঞ্চ উহাকে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ভাষারূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের বাংলা হিন্দুর মুখের বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। মুসলমান বাংগালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল এইরূপ : ‘ফজরের আউয়াল ওয়াকতে উঠিয়া ফুফু-আম্মা চাচীজীকে কহিলেন : আমাকে জলদি এক বদনা পানি দাও। আমি পায়খানা ফিরিয়া গোসল করিয়া নামায পড়িয়া নাশতা খাইব।’ হিন্দু বাংগালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল এইরূপ : ‘অতি ভোর বেলা উঠিয়া পিসিমা খুড়া মশায়কে বলিলেন : আমাকে শীগগির এক গাডু জল দাও। আমি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া চ্যান করার পর সন্ধ্যা করিয়া মাধান্নি খাইব।’

আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের ঐ বাংলা ভাষা বিহার হইতে পেশওয়ার এবং অযোধ্যা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী বুঝিবে। পক্ষান্তরে হিন্দুর মুখের ঐ বাংলা বাংলাদেশের বাইরের হিন্দুরাও বুঝিবে না, অন্যে তো পরের কথা।

আমি জোরের সাথেই বলিতে পারি আমার পঁচিশ বছরের আগের ঐ কথা আজও তেমনি সত্য রহিয়াছে। পাক-বাংলার তরুণরা আত্মসম্মানী হইলে চিরকাল তা সত্য থাকিবে।

ভাষা সমস্যার অপর দিক

তৃতীয়তঃ এর আরেকটা দিক আছে। পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের জাতীয় কর্তব্য দাঁড়াইয়াছে দুইটি। এক. পাক-বাংলায় পাকিস্তানী নেশন গড়া। দুই. পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যথা-সম্ভব সাদৃশ্য আনয়ন করা। প্রায় পঞ্চাশ লাখ ভারতীয় মুসলমান মোহাজের পাক-বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে। কালক্রমে ভাষিক ও কৃষ্টিক সমাজ জীবনে এরা আমাদের মধ্যে মিশিয়া যাইবে। আমাদের ভাষিক ঐতিহ্য এ কাজ সহজ করিবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্য ‘ছাড়িয়া’ শান্তিনিকেতনী ঐতিহ্য ‘ধরিতে’ যাই তবে আমরা পাক-বাংলার জাতীয়তা গঠনের কাজেই বাধা জন্মাইব।

চতুর্থতঃ পাক-জাতীয়তার সংহতির কথা। আমরা বাংলাকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষিক ও কৃষ্টিক স্বকীয়তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু বাংলা ভাষাকে মুসলিম-ঐতিহ্যহীন শান্তিনিকেতনী উৎকলী বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভাষিক ব্যবধান আরও না বাড়াই, সেদিকে আমাদের সচেতন থাকিতে হইবে। আমাদের আধুনিক প্রগতিবাদীরা আমাদের ভাষাকে 'স্নাতকোত্তর' করাইয়া যে গতিতে প্রগতির দিকে নিতেছেন, তাতে আমরা পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের নৈকট্য লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু অবাংলাপী পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিকট হইতে আমরা বহুদূরে সরিয়া যাইতেছি।

রাজধানীর পরিবর্তন

তারপর ধরুন রাজধানী পরিবর্তনের কথা। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য-কেন্দ্র ছিল যেমন কলিকাতা, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য-কেন্দ্র হইবে তেমনি ঢাকা। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্য ভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই। তাতে ভয় পাইবার কিছু না। গোড়াতে কলিকাতারও ছিল না। জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-বাংলার জিলা-সমূহের কথ্য ভাষার মিশ্রণে ও সমন্বয়ে যেমন একটি 'কোলকাতায়' কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কলিকাতার কথ্য ভাষা পশ্চিম-বাংলার তথা গোটা বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় তেমনি ঢাকায় পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জিলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি 'ঢাকাইয়া' কথ্য বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা হইবে। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুত্রী ডায়ালেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল, আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্টও তেমনি ঢাকাইয়া বাংলার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।

আমাদের দুইটি কাজ

আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা-নায়ক হিসাবে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের তাই করিতে হইবে দুইটি কাজ। প্রথমতঃ পূর্ব-বাংলার প্রাচীন সভ্য মানুষের নয়া রাষ্ট্র ও নয়া জাতি গঠনে সাহায্য করার জন্য তাদের নয়া যিন্দিগির ও নয়া কালচারের ধারক ও বাহক নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেই সাহিত্যের মিডিয়াম রূপে পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চলের বোধগম্য ও ব্যবহারোপযোগী একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ উভয় কাজ চলিবে স্বভাবতই এক সাথে।

এ কাজটি খুবই সোজা, আবার খুবই কঠিন। সোজা এই জন্য যে এ কাজের নথির আছে। পশ্চিম-বাংলার সাহিত্যিকরা যেমন পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর সাধারণ কথ্য ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করিয়াছেন, আমরাও যদি তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানী মধ্যবিস্তৃত সাধারণ কথ্য ভাষাকেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিতে পারি, তবেই আমাদের কাজ সারা হইল। মধ্যবিস্তৃত ভাষা মানে শিক্ষিত সমাজের সফিসটিকেটেড উচ্চারণ-ভংগি। কথ্য ভাষাকে দেশের সর্বত্র জনগণের বোধগম্য করার জন্যই এটা দরকার।

পঞ্চাশতের এই কাজটিই কঠিন এই জন্য যে সাহিত্যিকরাও সাধারণ মানুষের মতই অভ্যাসের দাস। এঁরাও অনুকরণে গৌরব বোধ করেন। এঁরাও হীনমন্যতার ব্যারামে ভুগিতেছেন। কথাটা একটু খোলাখুলিই বলা যাক। বাংলাদেশ অখণ্ড থাকিতে কলিকাতা রাজধানী থাকাকালে আমরা কথায় ও লেখায় পশ্চিম-বাংলার ভালমন্দ সবই অনুকরণ করিতাম। এটা ছিল স্বাভাবি। এই কারণে ততদিন আমরা ‘খাইছির বদলে ‘খেয়েছি’ খাইতেছি’র বদলে খাচ্ছি’ ‘করি নাই’র বদলে ‘করি নি’ লিখিতাম এবং বলিবার চেষ্টা করিতাম। তার উপর ক্রিয়াপদ ছাড়াও বিশেষ্যের বেলাতে তা করিতে গিয়া ‘ইচ্ছা’র বদলে ‘ইচ্ছে’ ‘হিসাবে’র বদলে ‘হিসেব’, ‘নিকাশের’ স্থলে ‘নিকেশ’ ‘মিঠা’র জায়গায় ‘মিঠে’, ‘তুলো’র জায়গায় ‘তুলো’, ‘সূতা’র জায়গায় ‘সূতো’ লিখিতাম ও বলিবার চেষ্টা করিতাম।

এটা তখন দোষের ছিল না। কিন্তু এখন দোষের। লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় এই যে আজো আমরা তাই করি। আমরা ভুলিয়া যাই যে যে-স্বাভাবিকতা সাহিত্যের প্রাণ, আমাদের এই বিবেক-বুদ্ধিহীন অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তা সেই স্বাভাবিকতাকেই বিদ্রূপ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের তখনকার ভাষা ছিল কলিকাতার বাংলা। সেই কারণেই এখনকার ভাষা আমাদের ঢাকাইয়া বাংলা।

ঢাকাইয়া বাংলা

পশ্চিম ও পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষার পার্থক্যের অনেকখানিই ক্রিয়াপদে সীমাবদ্ধ। তবে ক্রিয়াপদ ছাড়াও অনেক বিশেষ্য প্রভৃতি পদেও আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। আবার মুসলমানী শব্দ ছাড়াও নিছক দেশী শব্দেও বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। উচ্চারণেই সে পার্থক্য বেশী প্রকট। ‘তুলো’ ‘ইচ্ছে’ প্রভৃতি শব্দের কথা আগেই কহিয়াছি। এগুলি একান্তই উচ্চারণ বিকৃতি এবং স্থানিক। এগুলির অনুকরণ শুধু অনাবশ্যক নয়, অবৈজ্ঞানিকও। পশ্চিম-বাংলার যে সব ভাই হিজরত করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে আসিয়াছেন, তাঁরা এক পুরুষ বা আরও কিছুকাল এই বিকৃত উচ্চারণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বাংগালরাও তাঁদের অনুকরণ করিয়া শব্দ

বিকৃত করিব, এর কোন মানে নাই। সুতরাং আমাদের সাহিত্যকে স্বাভাবিক ও আমাদের জনগণের সাহিত্য করিতে হইলে জনগণের স্বাভাবিক ভাষায় লিখিতে হইবে। স্বাভাবিক ভাষা কি, কিভাবে তা গঠিত হইবে, কি তার রূপ হইবে, এসব কথার নির্ভুল বিচার করিতে গেলে আমাদের এই কয়টা কথা মনে রাখিতে হইবে :

(১) ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভাব কলিকাতার বদলে এখন ঢাকা হইতে হইবে।

(২) পদ্মার পশ্চিম পারের আমাদের যে সব জিলা এতদিন রাষ্ট্রীয় কারণে নিজেদের 'বাংলা' হইতে স্বতন্ত্র ভাবিত, 'অধিকতর ভদ্র' পশ্চিম-বাংলার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া গৌরব বোধ করিত এবং শ্রেণ্যের জন্য স্বভাবতই কলিকাতার দিকে চাহিয়া থাকিত, তারা এখন ঢাকার দিকে নয়র দিতে শুরু করিয়াছে স্বাভাবিক কারণেই।

(৩) প্রায় চল্লিশ লাখের মত পশ্চিম-বাংগালী মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাসেন্দা হইয়াছেন। সমাজ-সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থান দখল করিয়া আছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথ্য ভাষায়, সুতরাং সাহিত্যে, এঁদের প্রভাবের ছাপ থাকিবেই।

(৪) কথ্য ভাষার দিক হইতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক বাংলার মধ্যে যে প্রকট পার্থক্য দেখা যায়, তার বেশীর ভাগই উচ্চারণে সীমাবদ্ধ।

(৫) প্রায় দশ লাখের মত উর্দু-ভাষী অবাংগালী পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাসেন্দা বনিয়া গিয়াছেন। তাঁদেরও প্রভাব আমাদের কথ্য ভাষায় পড়িবে।

(৬) রাজধানী ঢাকায় বাটোয়ারার আগের মুদতে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মত বাংলা-ভাষী কোন প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।

(৭) ঢাকা শহরে বাটোয়ারার প্রাক্কালের যুগের বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-বাংলাবাসী প্রভাবশালী কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল না।

সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যেমন হইবে স্বাভাবিক কথ্য ভাষা তেমনি সেটা হইবে উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের সৃষ্টি ও হরেক ভাষার সংমিশ্রণের ফল এক নয়া ভাষা। সে ভাষার সৃষ্টিকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধু আমাদের সাহিত্যিকদের নয়রেই সে বিপুল নির্মাণ-কার্য আজো ধরা পড়ে নাই।

ফর্মেন্টড স্তর

অথচ সাহিত্যিকদেরই কাজ এই সৃষ্টি-কার্যে এই থোথে সকল শক্তি ও মনীষা দিয়া সাহায্য করা। আমাদের পাড়াগায়ে প্রচলিত হাজার-হাজার শব্দ অবহেলিত এবং অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সব শব্দ আমাদের সাহিত্যের সম্পদ হইতে

পারে। এই সমস্ত শব্দের সংযোগে আমাদের ভাষা হইবে সম্পদশালী। তার গতি হইবে চঞ্চল ও বেশবান। তার প্রাণ-শক্তি হইবে প্রচুর। জীবন্ত ভাষার ঘ্রোথ ও প্রসারের শেষ নাই। শুনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী ভাষায় প্রায় পঁচিশ হাজার নতুন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ লেখক ও সাহিত্যিকরা দুই বাহু মেলাইয়া ঐসব শব্দ নিজের ভাষার গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষার এই ইলাস্টিসিটি এই প্রসারণ-ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইংরাজের রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অবসান হওয়ার পরেও দুনিয়ায় ইংরাজী ভাষার সাম্রাজ্য একটুকুও সংকীর্ণ হয় নাই।

আমাদের নয়া ভাষা গঠনে অমনি উদার বাস্তববাদী হইতে হইবে আমাদের। আমি আগেই বলিয়াছি আমাদের রাজধানী তথা অন্যান্য শহরের মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর বাংলায় ভদ্রলোকের কথ্য ভাষাই হইবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। তাঁরা তাঁদের আফিসে-আদালতে, ক্লাবে-বৈঠকখানায় স্কুলে-কলেজে যে ভাষায় কথা কন, যে সব শব্দ ও ক্রিয়াপদ যে স্বর-ভংগিতে যে বাক-প্রণালীতে ব্যবহার করেন সেইটাই হইবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা এখনও ফর্মেটিভ স্তরে। একটা মডেল বাক্য নেওয়া যাক।

কেতাবী বাংলা- তুলার বাজার এমন মহার্ঘ আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হইতেছে না। পালের অভাবে নৌকার ফ্লেক দেওয়া যাইতেছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কিনা বন্ধ। কুমারদের তাতে বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। দুই মুঠা ভাতের জন্য তারা পৈত্রিক জীবিকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তবে ভিক্ষা করিয়া খাইবার ইচ্ছা তাদের নাই। স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইয়া-পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখবার জন্য তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরিয়াছে। কাঠ কুড়াইবার উদ্দেশ্যে তারা কুড়াল-হাতে নদী পার হইয়া সুন্দরবনে যায় খুব সকাল বেলা। সারাদিন পরে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

পশ্চিম বাংলার বাংলা- তুলার বাজার এমন মাগুগি আর দেখি নি। তুলার অভাবে সূতার কলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হচ্ছে না। পাল ছাড়া নৌকোর ফ্লেক দেয়া যাচ্ছে না। ফলে হাঁড়ি পতিল বেচা-কেনা বন্ধ। কুমারদের তাতে বড় অসুবিধে হয়েছে। দুমুঠো ভাতের আশায় তারা পৈত্রিক ব্যবসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষে করে খাবার ইচ্ছে তাদের নেই। মাগ-ছেলেকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরেছে। কাঠ কুড়োবার উদ্দেশ্যে তারা কুড়াল-হাতে নদী পেরিয়ে সুন্দর বনে যায় খুব সকালে। সারাদিন পরে বিকেল-সন্ধ্যায় কাঠ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

পূর্ব-বাংলার বাংলা- তুলার বাজার এমন মংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হইয়া গেছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হইতেছে না। পাল ছাড়া

নৌকার ক্ষেপ দেওয়া যা'তেছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কিনা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হৈছে। দুই মুঠা ভাতের আশায় তারা খান্দানী পেশা থনে বার হৈয়া আসছে। তবে ভিক্ষা কৈরা খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরুর-কবিলারে খাওয়া'য়া পরা'য়া বাঁচা'য়া রাখবার লাগি তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরছে। কাঠ কুড়া'বার মতলবে তারা নদী পার হৈয়া সুন্দরবনে যায় খুব সকালে। সারাদিন পরে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ লৈয়া ঘরে ফি'রা আসে।

ক্রিয়াপদে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব

এই মডেল বাক্যটিতে আপনারা লক্ষ্য করিবেন 'তুলা' 'সূতা' 'নৌকা' 'মুঠা' 'দেওয়া' 'অসুবিধা' 'কুড়াইবার' 'বিকাল' 'সন্ধ্যা' 'ইচ্ছা' 'কুড়াল' 'গুলি' 'নাই' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যাপারে কেতাবী বাংলা ও পূর্ব-বাংলার বাংলার মধ্যে ছবছ মিল আছে। পশ্চিম-বাংলা এখানে অনর্থক শব্দগুলিকে বিকৃত করিয়াছে। সুতরাং এই শব্দগুলির বেলায় এবং অনুরূপ আরও অনেক শব্দের বেলায় পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত ভাষা অধিকতর 'সাধু' সভ্য ও সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য। এ সব শব্দের ব্যবহারে পশ্চিম-বাংলার অনুকরণ করা অর্থহীন নকল নবিসি মাত্র।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়াছে ক্রিয়াপদ নিয়া। 'ছাইড়া' ও 'ছেড়ে', 'হৈয়া' ও 'হয়ে', 'খাইছি' ও 'খেয়েছি', 'খাইতেছি' ও 'খাচ্ছি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ও অনুরূপ হাজারো ক্রিয়াপদের কোনটা লেখায় ইন্তেমালা করিব, সেটা ঠিক করা বাস্তবিকই কঠিন কাজ। কারণ শুধু 'হৈয়া' 'কৈরা'ই পূর্ব-পাকিস্তানের শব্দ, 'হয়ে' 'করে' পূর্ব-পাকিস্তানের শব্দ নয়, এ কথা কওয়া চলে না। পদ্মার পশ্চিম পারের, বিশেষতঃ খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়ার, লোকেরা ঐ সব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথ্য ভাষায় এঁদের প্রভাব ও প্রাক-পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এই দুই-এর সমন্বয় আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষায় যে শক্ত মোচড় দিতেছে এবং আরও দিবে, তাতে সন্দেহ নাই। তাতে আমাদের কথ্য ভাষা সুতরাং সাহিত্যের ভাষা, যে একটা খিচুড়ি হইবে, তাতেও সন্দেহ নাই। আপত্তি থাকিবার কারণও নাই। শুধু সেটা জগা-খিচুড়ি না হইলেই হইল। সে ভাষা নিশ্চয়ই জগা-খিচুড়ি না হইয়া বরঞ্চ ভুনি-খিচুড়ি হইবে যদি আমরা নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন না করি :

জগা বনাম ভুনি খিচুড়ি

(১) ভাষায় নতুন জটিলতার আমদানি না করা, যথা :

'করিতেছি' অর্থে 'করতেছি' না বলিয়া 'করছি' বা 'কচ্ছি' বলা, 'দেখিতেছি' অর্থে 'দেখতেছি' না বলিয়া 'দেখছি' বলা, 'বলিতেছি' অর্থে 'বলতেছি' না বলিয়া

‘বলছি’ বলা ইত্যাদি। এতে ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতা বাড়িতেছে। কারণ ‘করছি’ ‘দেখছি’ বলা, পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ জিলায় ‘সম্পন্ন বর্তমান কালে’র ক্রিয়া বুঝায় অর্থাৎ কাজগুলি হইয়া গিয়াছে। যদিও ঐ প্রকার ব্যবহারে পশ্চিম বাংলায় শব্দের প্রথম হরফে এবং পূর্ব-বাংলায় শেষ হরফে জোর বা এম্ফেট্‌ দেওয়া হয়, তবু শুধু ঐ এম্ফেট্‌য়ের পার্থক্য দিয়া পূর্ব-বাংলার জনগণকে অর্থের পার্থক্য বুঝান যাইবে না। সে চেষ্টাও অনাবশ্যক। কারণ পূর্ব-বাংলার প্রচলিত ‘করতেছি’ ‘দেখতেছি’ শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলার লোকেরাও বলিতে ও বুঝিতে পারে।

(২) বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণকে হুবহু ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা না করা, যথা : শুনাকে ‘শোনা’, ‘ইচ্ছাকে’ ‘ইচ্ছে’, করবেনকে ‘কোরবেনা’ করবকে ‘কোরবো’, হলকে ‘হলো’, দেইকে ‘দি’, নাইকে ‘নি’, করতেছে ‘কন্তে’, পারতেকে ‘পাস্তে’ ইত্যাদি। যদিও বলিবার সময় আমরা অনেকেই ঐ রকমই উচ্চারণ করিয়া থাকি, তবু বানানের সময় ঐ উচ্চারণকে হরফে ফুটাইয়া তুলিবার দরকার নাই। ওটা উচ্চারণের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যেমন ধরুন কোন-কোন অঞ্চলের লোক লেখে ‘প্রথম’ ‘প্রস্তাব’, কিন্তু বলিবার সময় বলে ‘পেরথম’ ‘পেরেস্তাব’ ইত্যাদি। এইভাবে উচ্চারণের ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নিলে আমরা ‘করব’ লিখিয়াও ‘করবো’ বা ‘কৈরা’, ‘হয়ে’ লিখিয়াও ‘হোয়ে’ বা ‘হৈয়া’ উচ্চারণ করিতে পারিব এবং জটিলতা এড়াইয়াও আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ কথ্য ভাষা সৃষ্টি করিতে পারিব।

(৩) পশ্চিম-বাংলার অনুকরণে ‘ইয়া’ যুক্ত ক্রিয়াপদকে অতিরিক্ত মোচড়াইবার চেষ্টা না করা যথা :

সরাইয়া স্থলে ‘সরায়ে’র বদলে ‘সরিয়ে’, পরাইয়া স্থলে ‘পরায়ের বদলে ‘পরিয়ে’, পড়াইয়া স্থলে ‘পড়ায়ের বদলে ‘পড়িয়ে’, বেড়াইয়া স্থলে ‘বেড়ায়ের বদলে ‘বেড়িয়ে’, বাহির হইয়া স্থলে ‘বার হয়ে’র ‘বেরিয়ে’, পার হইয়া স্থলে ‘পার হয়ে’র বদলে ‘পেরিয়ে’ ইত্যাদি। এই সব বিকৃতিতে ক্রিয়া পদকে অনাবশ্যকভাবে মূল ধাতু হইতে এতদূরে সরাইয়া দেওয়া হয় যে চিনিবার উপায় থাকে না।

পক্ষান্তরে উক্ত ‘সরায়ে’ ‘পড়ায়ের বদলে ‘বেড়ায়ের বদলে ‘পরায়ের বদলে ‘পরিয়ে’, পড়াইয়া স্থলে ‘পড়ায়ের বদলে ‘পড়িয়ে’, বেড়াইয়া স্থলে ‘বেড়ায়ের বদলে ‘বেড়িয়ে’, বাহির হইয়া স্থলে ‘বার হয়ে’র ‘বেরিয়ে’, পার হইয়া স্থলে ‘পার হয়ে’র বদলে ‘পেরিয়ে’ ইত্যাদি। এই সব বিকৃতিতে ক্রিয়া পদকে অনাবশ্যকভাবে মূল ধাতু হইতে এতদূরে সরাইয়া দেওয়া হয় যে চিনিবার উপায় থাকে না।

উঠবে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের এই ভাষিক আপোস আমাদের ভাষার উন্নতি বিধান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

আপোস ফর্মুলা

এই আপোস-ফর্মুলা গ্রহণ করিলে উপরের ঐ মডেল বাক্যটি এই রূপ ধারণ করিবে :

তুলার বাজার এমন মংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হচ্ছে না। পাল ছাড়া নৌকায় ক্ষেপ দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কেনা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হয়েছে। দু মুঠা ভাতের আশায় তারা খান্দানী পেশা খনে বার হয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষা করে খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরু-কবিলারে খাওয়ায়ে-পরায়ে বাঁচায়ে রাখবার জন্য তারা লাকড়ির পেশা ধরেছে। কাঠ কুড়াবার মতলবে তারা কুড়াল-হাতে নদী পার হয়ে সুন্দরবনে যায় খুব সকালে। সারাদিন বাদে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ নিয়া ঘরে ফিরে আসে।

বলা বাহুল্য উপরের মডেল বাক্যটি আমার সাজেশান মাত্র। এ সাজেশানের আসল মতলব এই যে সাধারণ শব্দই হউক আর ক্রিয়া পদই হউক কথা বলিবার সময় শিক্ষিত বক্তার মুখে সহজে বিনা-চেষ্টায় বিনা-কৃত্রিমতায় আপনা-আপনি যা আসিয়া পড়ে তাই শুদ্ধ ভাষা। বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে যা সত্য, পশ্চিম-বাংলার ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেও অবিকল তাই সত্য। আমি অনেক শিক্ষিত লোক ও কবি-সাহিত্যিকের মুখে একই বাক্যে একবার ‘খেয়েছি’ আবার ‘খাইছি’ ইত্যাদি দুমিশালী ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখিয়াছি। এটাকে আমি দোষের মনে করি না। আমাদের মুখের কথা বাংলা বোধ হয় এইভাবেই তার ফর্মেটিভ মুদ্রত পার হইবে এবং হয়ত এই রূপেই স্ট্যান্ডার্ডাইজড হইবে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে রাজধানীর বাংলা শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের বৈঠকখানায় কুলে-কলেজে ও আফিস-আদালতে মোটামুটি এই ধরনের দুমিশালী ভাষাতেই কথা বলেন এবং চট্টগ্রাম হইতে রাজশাহী ও সিলেট হইতে খুলনা পর্যন্ত সারা পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সকলে এই ভাষা বোঝেন।

পরিভাষা-সমস্যা

আমাদের ভাষা-সমস্যার আরেক দিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের সুধী সমাজের একাংশের ধারণা। আমরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছি। মাতৃভাষার মারফতে ছাত্রদের আমরা সকল শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সংকল্প নিয়াছি। তা

করিতে গেলে ক্লাসে বাংলায় ঐ ঐ বিষয়ে লেকচার দিতে হইবে এবং বই-পুস্তক লিখিতে হইবে। কাজেই প্রশ্ন উঠিয়াছে আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই তাঁদের অভিমত। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কিছু-কিছু পরিভাষা তাঁরা সৃষ্টিও করিয়াছেন।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে পরিভাষার প্রশ্ন আসলে একটা সমস্যাই নয়। আমাদের ভাষায় ইংরাজী বা বিদেশী যে সব শব্দ চালু হইয়া গিয়াছে, ও-গুলির বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার চেষ্টা নিছক পাগলামি। এমন শব্দ কথা বলার অপরাধে আমার মাফ করিবেন আপনারা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন শব্দও আমি খুঁজিয়া পাই না। ‘কাগজ’ ‘কলম’ ‘দোয়াত’ ইত্যাদি শব্দ আরবী এই অজুহাতে এক সময়ে হিন্দু পণ্ডিতরা এ সব শব্দ বাংলায় ব্যবহার করিবেন না বলিয়া জিদ করিয়াছিলেন এবং পরিভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় ‘ভূর্জ-পত্র’ ‘লেখনী’ ও ‘মস্যাধার’ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনারা কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চান? আপনারা কি ট্রেন স্টিমার টিকেট রেল ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশন ভোট প্রেসিডেন্ট মেম্বর জজ কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতে চান? নিশ্চয়ই চান না! তবে আবার পরিভাষা কি? যা আমাদের ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, যে সব শব্দ আমরা দিনরাত নিজেদের কথাবার্তায় ব্যবহার করি বুঝি এবং বুঝাই, সে সবই বাংলা শব্দ। একটি দৃষ্টান্ত দেই :

‘আগামী মার্চ মাসে আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের জেনারেল ইলেকশন হইবে। আমার বাবা প্রেসিডেন্টের ক্যানডিডেট হইয়াছেন। কাজেই ভোটারদের ক্যানভাস করিতে আমাকে কয়েকটা মিটিং করিতে হইবে। সেজন্য আমি স্কুলে কয়েক দিনের ছুটি চাহিয়া হেডমাস্টারের নিকট এপ্লাই করিয়াছি।’

এটা কি বাংলা ভাষা নয়? পূর্ব-পাকিস্তানে এমন কোনো শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোক আছে কি যে এটা বলে না, বুঝে না?

চলতি শব্দই বাংলা শব্দ

স্কুল-কলেজের বাহিরে যেটা চলে ভিতরে তা চলিবে না কেন? কলেজের ভিতরের একটা দৃষ্টান্ত নেন।

‘আমাদের কলেজের ইকনমিকসের প্রফেসার গতকাল ক্লাসে খুব ভাল লেকচার দিয়াছিলেন। লেকচারটা তিনি খুব স্টাডি করিয়াই দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ওটা এত ইন্টারেস্টিং হইয়াছিল যে আমরা সবাই তার ডিটেলড নোট নিয়াছি। তাতে প্রিটেস্টে পাস করা আমাদের অনেকের পক্ষেই খুব ইজি হইবে।’

এটা কি বাংলা ভাষা নয়? এই ভাষায় যদি প্রফেসররা লেকচার দেন, তবে কার কি অসুবিধা হইবে? যেমন করিয়া আমরা কলেজ ক্লাস হসপিটাল প্রেসক্রিপশন অপারেশন মেডিসিন ট্রিটমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সরে রেডিওলজি কার্ডিওগ্রাফ থার্মোমিটার স্টেথিসকোপ ইত্যাদি টার্ম আমাদের কথাবার্তায় ও লেখাপড়ায় ইস্তমাল করি, তেমনি করিয়া আমরা যদি সমস্ত মেডিক্যাল লজিক্যাল বোটানিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল ও সাইকলজিক্যাল টার্ম লেখায় ও কথায় ব্যবহার করি, তবে তাতে দোষ কি? অসুবিধা কোথায়?

দেশী ভাষায় প্রতিশব্দের তালাসে মানুষ গোড়ামির কোন স্তরে যাইতে পারে, তা দেখিয়াছিলাম আমি কলিকাতায়। আপনাদের হয়ত অনেকেই জানেন যে ‘ইস্বেহাদ’ সম্পাদনা উপলক্ষে পাকিস্তান হওয়ার পরেও প্রায় তিন বৎসর কাল আমার কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল। সেই সময় পশ্চিম-বাংলা সরকার ডাক্তার সুনীতি চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে একটি পরিভাষা কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণের এক সভা হইয়াছিল। তাতে আমারেও ডাকা হইয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট শুনিয়া আমাদের চক্ষু একদম চড়ক গাছ। তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন হাইকোর্ট এডভোকেট সেক্রেটারিয়েট মিনিষ্টার সেক্রেটারি মিলিটারি ক্যাবিনেট এসেম্বলি হোস্টেল রেজুৱেন্ট টুর্নামেন্ট ভ্যানিটিব্যাগ ইত্যাদি সুপ্রচলিত শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছিলেন। আমিই ঐ রিপোর্টের প্রতিবাদে বক্তৃতা করি প্রথম।

সভায় সমবেত শিক্ষাবিদগণ ঐ রিপোর্টের বিরুদ্ধে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে আমার মত পাকিস্তানী বাংলালীর সমর্থনে অধিকাংশ বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ রিপোর্ট সে সভায় গৃহীত হইতে পারে নাই।

কিন্তু দেশ-প্রেমের উদ্দীপনা ও কৃত্রিম জাতীয়তা-বোধের গোড়ামি সেখানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে জনমতের রাজনৈতিক চাপে পশ্চিম-বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐ রিপোর্ট বা অনুরূপ অন্যান্য রিপোর্ট গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে আজ ভারতে কাগজে-কলমে চীফ মিনিষ্টারকে মুখ্যমন্ত্রী, আইন পরিষদকে বিধান সভা, কর্পোরেশনকে পৌরসভা, ভ্যানিটিব্যাগকে ‘ফুটানি কি ডিবিয়া’, অল-ইন্ডিয়া রেডিওকে ‘অখিল ভারত আকাশবাণী’, অল-ইন্ডিয়া টেনিস টুর্নামেন্টকে ‘অখিল ভারত ঘেচুগেণ্ডু ঝাপট বলিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এসব অস্বাভাবিকতা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতের জনগণ তাদের কথায় এবং লেখায় কিছুতেই এসব কষ্ট-কল্পিত কৃত্রিমতা মানিয়া নিতে পারে নাই।

কৃত্রিমতা অচল

আমাদের ভাষায়ও যদি আমরা অমন কোন কৃত্রিমতার আমদানি করি, তবে কালের স্রোতে তা ধুইয়া-মুছিয়া এবং জনমতের চাপে তা পিষিয়া যাইবেই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য অতি সোজা। পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টায় সাহিত্যিকদের প্রতিভার অপচয় না করিয়া যে সব বিদেশী শব্দ আমাদের কথাবার্তায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি অকাতরে বই-পুস্তকে ও গোটা সাহিত্যে চালু করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এবং আফিস-আদালতের অফিসাররা তাঁদের যাঁর-তাঁর এলাকায় কথা বলিবার সময় যে সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন, লিখিবার সময়ও বাংলা হরফে সেই সব শব্দ ব্যবহার করিবেন। এতে গৌরব হানি হইবে না। ভাষার বিন্দুমাত্র অবনতি ঘটবে না। বরঞ্চ তাতে আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িয়া যাইবে। এই ইলাস্ট্রিসিটি ভাষাকে দ্রুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিণত করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি উপসংহারে এই আরজ করিব যে আপনারা বিশাল ঐতিহ্যের অধিকারী এক নয়া জাতির কালচারেল রেনেসাঁর আর্কিটেক্ট ও ইনজিনিয়ার। আপনাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বুকের বল, প্রাণের সাহস, মনের উদারতা ও চিন্তার সবলতা আপনাদের দায়িত্বের উপযোগী হইতেই হইবে। অতীতের ভুল শুধরাইবার সংকল্পে দৃঢ়তা, নয়া পথে পা বাড়াইবার বিপদকে বরণ করিয়া নিবার দুর্বীর জিদ, ব্যক্তিগত সুখ-সম্পদ ও আরাম-আয়াসে উপেক্ষা, যদি আমরা আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে নয়া জাতি গড়িবার অধিকারী আমরা নই, মাথা হেঁট করিয়া সে সত্য আমাদের মানিয়া নেওয়া উচিত। নয়া কালচার ও নয়া ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

আপনারা দৃষ্টির সেই স্বচ্ছতা, চিন্তার সেই সবলতা এবং প্রাণের সেই সাহস নিয়া আগুয়ান হন, আপনাদের হাতে নয়া কৃষ্টি ফলে-ফুলে মঞ্জুরিত হইয়া উঠুক, আমাদের রাষ্ট্র দুনিয়ার সভ্য রাষ্ট্র-পুঞ্জের দরবারে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের মাতৃভাষা সম্পদশালী ইলাস্টিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া একদিকে আমাদের জনগণের মুখের কথা ও মনের ভাবের বাহক হউক, অপরদিকে সে ভাষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ ও প্রসারের উপযোগী মিডিয়াম হউক, সে ভাষা আধুনিক ও উন্নত পাক-বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী করুক, আদ্যার দরগায় এই মোনাজাত করিয়া আমি বক্তৃতার উপসংহার করিলাম।

(১৯৫৮ সালের ৩রা মে চাটগায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণ)

আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

মনিরউদ্দিন ইউসুফ



কালানুক্রমে ইতিহাসের ধারা বেয়ে যে-বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ চলে আসছে তাকেই সম্মিলিতভাবে ঐতিহ্য বলা হয়। নদীস্রোতের মতো ঐতিহ্য কোন লক্ষ্যের দিকে সতত ধাবমান। এই ঐতিহ্যের ফলশ্রুতিকেই বলা হয় সংস্কৃতি। তাই, কোন সুকৃতির পরিচয় পেতে হলে তা যে-ঐতিহ্য-তরঙ্গের ফল, সে-ঐতিহ্যকে জানতে হবে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি কি, তার উত্তর রয়েছে, এর ঐতিহ্য কি, তারই মধ্যে। সুতরাং বাংলাদেশের ঐতিহ্যের স্বরূপকে জানতে হলে সর্বোপরি বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হবে। আর সেই সংগে বুঝতে হবে সেই ইতিবৃত্তের সম্ভাবনাময় তাৎপর্যকে। ঐতিহ্য চলতে চলতে সংস্কৃতির জন্ম দেয়, আর সংস্কৃতি রূপান্তরিত হতে হতেই অগ্রগামী হয় লক্ষ্যের দিকে।

মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হলেও ইতিহাস নদীস্রোতের মতোই সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজকে ও জাতিকে নবীভূত করে চলে। এই নবীভবন না থাকলে ইতিহাসের চলাকে অগ্রগতি নাম দেওয়া সার্থক হতো না। ধরা যাক, হাজার বছর আগে আমাদের সমাজের যে-রূপ ছিল, সে-রূপকে নিয়েই ইতিহাসের তৎকালীন চলা শুরু হলেও পরবর্তীকালে সেই একই রূপ অব্যাহত থাকেনি, রূপান্তর লাভ করেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সমাজ ও জাতির রূপান্তরে দুটি বিষয় প্রধানত কাজ করে : এক. ভিতরের প্রবণতা, দুই. বাইরের প্রভাব। ভিতরের প্রবণতা তার প্রয়োজনের তাগিদেই বাইরের প্রভাবকে আত্মস্থ করে রূপান্তরিত হয়— এ যেন স্বেচ্ছারূপান্তর। এ-রূপান্তর তাপের চাপে অসহায়ভাবে পানির বাষ্পে রূপান্তরের অনুরূপ নয়। বস্তু ও মানুষের সমীকরণে মানুষের বেলায় স্বাধীন ইচ্ছার গুরুত্ব যে অসামান্য, তা মনে রাখতে হবে। জোর করে চাপিয়ে দিলে কিংবা নির্বোধ অনুকরণ দ্বারা সংস্কৃতির বাঞ্ছিত রূপান্তর সম্ভব হয় না। এই কটি কথা মনে রেখে যদি বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়, তবে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণা স্পষ্টতর হবে।

শশাঙ্কের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজবংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শতাধিক বছরের ভাঙনকে রোধ করতে পারেনি। ফলে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে কিছুটা অভিভূত করে

বাংলাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে ও কালক্রমে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গোপাল নামক এক ব্যক্তি ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে বুদ্ধানুসারী পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ প্রায় তিনশত বছর ধরে বাংলাদেশ শাসন করায় সাধারণভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সেখানে এক স্থায়ী সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জানা যায় যে, পালরাজগণ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। ফলে, বাংলাদেশের এক বড় অংশ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল থেকেই পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বত্র ও বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ছড়িয়েছিল, তা অব্যাহত থেকে যায়। এই অবস্থায় আমরা ধীরে ধীরে ইতিহাসের পূর্ণালোকিত যুগে প্রবেশ করি।

একাদশ শতকের শেষভাগে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে পশ্চিম বাংলাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ উত্তরোত্তর প্রবলভাবে অনুভূত হতে থাকে। বৌদ্ধদের প্রতি বৈরীতাবাপন্ন এই রাজবংশের শাসনকালে বৌদ্ধ জনসাধারণ তাদের মজ্জাগত সমাজ-সাম্যবাদী ধারণা নিয়ে মুক্তির কাল গুণতে থাকে। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকেন সমদর্শী মুসলিম সুফিগণ। বাংলাদেশের জনসাধারণ তখন এইসব পীর-দরবেশের আন্তানার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতেন; কিন্তু তখনও ভীতি ও শঙ্কার অবসান হয়নি। সেনরাজগণের আচরিত ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের বজ্রমুষ্টি তখনও বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। অবশেষে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে গৌড়ে মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও ক্রমান্বয়ে সারাদেশে তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই সময়ে বাংলাদেশে আসে বিপুল-বিস্তার ও সম্ভাবনাময় এক সামাজিক ও জাতীয় রূপান্তরের যুগ। এই রূপান্তরের সম্যক পর্যালোচনার পূর্বে পালবংশের আমল থেকে মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক রূপ কি ছিল, তার সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত কোন্ দিকে ছিল এবং সর্বোপরি, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মতবাদ যে যুগল ধারায় প্রবাহিত ছিল, তাদের প্রবণতা ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল ইত্যাদি কিঞ্চিৎ বিশদভাবেই আলোচনা করা আবশ্যিক।

সপ্তম-অষ্টম থেকে শুরু করে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়শ' বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ কিভাবে জীবন যাপন করতেন, তাঁদের উপর ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রভাবই বা কিরূপ ছিল ইত্যাদির কোন প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাই, সেই সময়কার ইতিহাস ক্ষীণভাবে জানতে হলেও তৎকালীন স্ট্র সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে ১৯০৭ সালে

‘চর্য্যচর্য্যবিনিচ্চয়’ নামে এক বৌদ্ধ গীতিকা-কোষ ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা বাংলাভাষার প্রাচীনতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হই, তেমনই তৎকালীন সমাজ সম্পর্কেও কিছুটা জানতে পারি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিক এই পুস্তকের গীতিকাগুলির প্রাচীনতার সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করেছেন হাজার খ্রীষ্টাব্দকে। কিন্তু ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নানা কারণে এই গীতিকাগুলিকে সপ্তম শতকের প্রায় শুরু থেকে দশম-একাদশ শতকের রচনা বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমরা শহীদুল্লাহ সাহেবের মতকেই প্রাধান্য দিতে চাই এ-কারণে যে, এই বৌদ্ধ গীতিকাগুলির সর্বপ্রাচীন সময়টা বহুত গুণ সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের যুগ। এই যুগেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে কিছুটা স্তিমিত করে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়। পূর্বে বলেছি যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী দিগ্বিজয়ী শশাঙ্কের স্বল্পকালস্থায়ী রাজ্যকাল সে-প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধাবদ্ধ করতে পারেনি।

চর্য্যগীতিকাগুলিতে আমরা সমাজের যে-চিত্র পাই তা সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, চর্য্যার কবিগণ বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন শৈবতাত্ত্বিক সেইসব কাপালিকের সমগোত্রীয় যাঁরা এক অকথিত দৈহিক আনন্দ শিহরণের জন্য সমাজ সংসার ত্যাগ করতেন। শৈবতাত্ত্বিকগণ শবারুঢ় হয়ে ধ্যান, নরবলি প্রভৃতি সাধন প্রণালীর দ্বারা দেবীর কৃপালাভে ধন্য হতেন ও তার ফলে তাঁদের লভ্য হোত এক অসামাজিক দৈহিক উল্লাস। ‘চর্য্যচর্য্যবিনিচ্চয়’ বৌদ্ধতাত্ত্বিকদের রচিত একপ্রকার গুহ্য সাধন পন্থা-নির্দেশক গীতিকার সমষ্টি। এইসব গীতিকা প্রমাণ করে যে, ইতিপূর্বে বৌদ্ধচিন্তা উত্তর ভারতের অন্যত্র হিন্দুচিন্তার সংগে যে আপোষে প্রবৃত্ত হয়েছিল, বাংলাদেশে তা বৌদ্ধ গুহ্য সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাত্ত্বিক সাধনা হিন্দু যোগসাধনার সমান্তরাল পথ ধরেই বৌদ্ধ মহাযান পন্থার একটি দিকের বিকাশকে চিহ্নিত করেছে। বৌদ্ধ মহাযান চিন্তা, ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে, ব্রাহ্মণ্যবাদের সংগে আপোষেই জন্মলাভ করেছিল, ফলে স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত দেবদেবী ও বর্ণবৈষম্যহীন সমাজচিন্তা, যা হীনযান মতবাদে কিছুটা রক্ষিত হয়েছে, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের এইসব গীতিকায় অনুপস্থিত। নীচে বিভিন্ন সময়ে রচিত চর্য্যগীতির কতিপয় পদ উদ্ধৃত করে দেখাবার প্রয়াস পেলাম :

১। কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।

দিঢ় করিও মহাসুখ পরিমাণ।

লুই ভনই শুরু পুছিঅ জান ॥

[কায়্যা শ্রেষ্ঠ তরুণর অনুরূপ, পাঁচটি তার ডাল। কাল চঞ্চল চিন্তেই প্রবেশ করে। চিন্তকে দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও কিভাবে কি করতে হয়]

এখানে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জগৎকে আমরা লাভ করি, সিদ্ধাচার্য তা পরিত্যাগ করতে বলছেন। অন্য কেউ নয়, একমাত্র গুরুই এ-পথের নির্দেশ দান করতে পারেন। এ-মনোভাব সমাজ জীবনের সমর্থক নয়।

২। আংগন ঘরপণ সুন ভো বি আতি।

কানেট চোরে নিল অধরাতি ॥

স সুরা নিয়া লে বহুড়া জাগই।

কানেট চোরে নিল কা গই মাড়াই ॥

দিবসহি বহুড়ী কাউছি ডর ভাই।

রাতি ভইলে কামরু জাই।

আইসনী চর্যা কুকুরী পাঁএ গাইল ॥

কোড়ি মাঝে একু হি অহি সমাইল ॥

[ওগো বাদ্যকরী, শোন, ঘরের মধ্যে অংগন। অন্য-রাতে 'কানেট' চোরে নিলো। স্বপ্নর ঘুমিয়ে গেছে, বধু জেগে আছে। চোরে কানেট নিল, আর কি খোঁজ করবে। দিনের বেলা বউটি কাকের ভয়ে ভীত হয়, কিন্তু রাত হলেই সে কামরূপ চলে যায়। এমন চর্যা গাইছেন কুকুরীপাদ। কোটি জনের মধ্যে কেবল একজনের হৃদয়েই তা প্রবেশ করে।]

প্রতীক-সমর্পিত এই কথা সিদ্ধাদের সাধনার পরিভাষায় পরিকীর্ণ। পদকর্তা নিজেই বলেন, কোটি জনের মধ্যে একজনের হৃদয়ে এর মর্মভাব প্রবেশ করবে। রাত্রিতে অভিসার, দিনের বেলায় কাকের ভয়, দেহের মধ্যে আবদ্ধ থেকে মহাসুখ লাভ করা-সবই ইংগিত করে সমাজ-সম্পর্কহীন এক নির্জনতার দিকে।

৩। নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিআ খাটে।

আলমা ডমরু বাজই বীর নাদে ॥

কাহু কাপালী জোই পইব আচারে।

দেহ নঅরি বিহরই একারে ॥

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।

রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥

রাগ দেশ মোহ লইআ হার।

পরম মোখ লভই মুক্তি হার ॥

মারি সাসু ননন্দ ঘরে সালী।

মাঅ মারি কাহু ভঅই কবালী ॥

[নাড়িশক্তি দৃঢ়ভাবে খাট ধরে আছে। অনাহত ডমরু বাজে বীর নাদে। কাপালিক কাহ্ন যোগ দ্বারা দেহ-নগরীতে প্রবিষ্ট হয়ে একাকারে বিহার করে। আলি কালি চরণে ঘন্টা নূপুর হয়েছে, রবি শশীকে যোগী তার কর্ণকুণ্ডল করলো। রাগ-দ্বেষ, মোহ ছাই করে সে পরম মোক্ষের মুক্তিহার করলো। শাশুড়ী, ননদ ও শালীকে এবং মাকে মেরে কানু কাপালিক হোল।]

আলি কালি দ্বারা সমাজকে ও রবি শশী দ্বারা সামাজিক ভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে। গীতিকার বলেছেন, এসব কিছুই তাঁর ভাবনার বিষয় নয়, এগুলি তাঁর আভরণ মাত্র। তিনি কাপালিক যোগী, শাশুড়ী, ননদ, শালী এমন কি মা-কে মেরেও লাভ করেন নির্বাণানন্দ।

এই গীতিকায় সমাজকে সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধাচার্যগণ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁদেরকে সমাজের উপর নির্ভরশীল হতে হতো, তাই তাঁদের গীতিকায় সমাজচিত্রও এসেছে, এসেছে বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশেরও বর্ণনা।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ না করে মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'চর্যাগীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে একটি বর্ণনা তৈরী করে নীচে সন্নিবিষ্ট করা হলো:

বিভিন্ন সময়ে লেখা এইসব গীতিকার মধ্য দিয়ে প্রথমেই ভেসে উঠেছে, নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক সুন্দর চিত্র; তার মধ্যে আছে অরণ্য, কোথাও ছোটখাট টিলা, সমতলভূমির উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে কত নদী। অনেক দূর পর্যন্ত নদীগুলিতে জোয়ার আসে, ফলে, সব সময় দু'তীরে থাকে কাদা, কিন্তু মাঝখানে অথৈ জল। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা আছে, ছোটগুলির উপর আছে সাঁকো।

চর্যাগীতিকায় সমাজের যে চিত্র পাই, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশে সেন আমলে তো বটেই, পালদের সময়েও সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সবাই ছিল শূদ্র। কারণ, পৌরাণিক আৰ্যধর্ম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বীকেই ব্রাহ্মণগণ 'শূদ্র' বলে নির্দিষ্ট করতেন। সিদ্ধাচার্যগণ মূলত বৌদ্ধ হওয়ার কারণে সমাজের নীচুতলার শূদ্রদেরকে মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান করলেও, নিজেদের পূর্বজন্মের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বীয় ব্রাহ্মণ্য-মাহাত্ম্যের কথা বলতে ভুলেননি। এতে বুঝা যায়, তাঁদের অবচেতন মনে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব অব্যাহতই ছিল। এ মনোভাব বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী।

জন্মান্তরবাদকে কেন্দ্র করে পূর্ণ জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে বর্ণাশ্রম বিরোধী বৌদ্ধদেরকেও শেষ পর্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্মের কাছে দণ্ডবৎ হতে হয়েছিল। কিন্তু

বাংলাদেশের গোটা বৌদ্ধসমাজ কি তা মেনে নিতে পেরেছিল? তারাও কি এই সিদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতো সমাজ-বিবর্তনের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল? আগেই বলেছি, এর উত্তর 'চর্যাচর্যবিনিচয়'-এ পাওয়া যাবে না। কারণ এই গীতিকাগুলির যাঁরা রচয়িতা তাঁরা মহাযান শাখার তান্ত্রিক যোগী। তন্ত্র মূলত অনার্য দেবতা শিবকে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার পর তাঁর পূর্ব রূপাশ্রিত পূজার এক অভিনব ধরন। বিস্তুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদ তাই তন্ত্রকে চিরদিন স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের বাইরে রেখেছে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সেখানে ঋষি নয়, সে বামাচারী কাপালিক, সে শূদ্র। মনে রাখা আবশ্যিক যে, বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের এই বিচ্যুতি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ সমাজের পরিচয় নির্দেশ করে না। কারণ, সিদ্ধাচার্যগণ এক অসামাজিক গৃহসাধন পন্থার অনুসারী। এরূপ গৃহসাধনা কখনই বৃহত্তর সমাজে আচরণীয় হয় না; একথা সব দেশে সব কালেই সত্য।

পূর্বে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা পালযুগ থেকে শুরু করে মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাধারণ বৌদ্ধ অধিবাসীর মনোভাব কি ছিল, তা আমরা সরাসরি কোন সূত্র থেকে জানতে পারি না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধ ও জৈন বিহার ছড়িয়ে ছিল। গুপ্তদের সময় থেকে যে-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলায় প্রবেশ করেছিল, বৌদ্ধধর্মের জোয়ার তাকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি; তখন থেকে উভয় ধারা পাশাপাশিই বয়ে চলেছিল।

হিন্দুরাজ শশাঙ্কেরও পরবর্তীকালে সেন-রাজবংশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দরুন বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ যে জবরদস্তিমূলকভাবেই জনসাধারণের ঘাড়ে চেপে বসেছিল তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়, মুসলমানদের আগমনে বাংলাদেশের নীচুস্তরের সাধারণ মানুষের দলে দলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে। এই ঐতিহাসিক সত্য যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের চেয়ে জোরালো। নীচু স্তরের এই সব সাধারণ মানুষ যে ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্দেশিত শূদ্র কিংবা বৌদ্ধ জনসাধারণ, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বৌদ্ধ গীতিকাগুলিতেও এইসব মানুষকে আমরা সমাজে জেলে, তাঁতি, শবর, ডোম এমন কি গন্ধবণিকরূপে দেখতে পাই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও অন্ত্যজ হিন্দুরাও সমাজের এই স্তরেই অবস্থান করতো। ফলে, ধর্মান্তরের স্রোত যখন এলো তখন বৌদ্ধ-হিন্দু নির্বিশেষে সমাজের গোটা নীচু স্তরটাই নূতনের বন্যায় প্রাবিত হয়ে গেলো। ধর্মান্তরের এই সর্বগ্রাসী রূপকে আমরা বিপ্লব বলে গণ্য করতে পারি ও তাকে দেখতে পারি ঐতিহ্যের রূপান্তর বলে। কারণ, কোন জেলে কিংবা শবর (শিকারী) ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, সে তার পারিবারিক বৃত্তিতে অবস্থান করলেও তার মনের অবস্থানের যে পরিবর্তন

হোত, তা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, ধর্ম বা মতবাদ গোটা মানুষটিকে যেভাবে পরিবর্তিত করে, তেমন আর কিছু নয়। তখন সে তেমন ঐতিহ্যকেই নিজের করে নেয়, যার চতুর্কে সে নিজেকে তুলে নিয়ে এসেছে বলে গর্ব বোধ করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মজ্জাগতভাবে সমাজ-সাম্যবাদী ছিল বলে তারা এমনই এক সচল ও সবল জীবনস্রোতের অপেক্ষায় দিন গুণছিল, যা তাদের সেই সাম্যবাদী ও দেববিরোধী মূল জীবন ব্যবস্থাকে ধারণ করতে পারে। মুসলমানগণ তা তাদের জন্য নিয়ে এলো। হিন্দু প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের আগমন যে তাদের জন্য মুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল, তা ‘নিরঞ্জনের রুম্মা’ নামক পরবর্তীকালের এক রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ নিজেদের জন্য যে ঐতিহ্যকে গ্রহণ করলো, তা বাংলাদেশের সীমার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত (এখানে বলা আবশ্যিক যে, বাংলাদেশের হিন্দুরা যে ঐতিহ্যের অনুসারী, তাও বাংলার সীমায় আবদ্ধ নয়, সুদূর-পাঞ্জাব ও উত্তর-দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর হিন্দু-ঐতিহ্যেরই তা অন্তর্ভুক্ত)। ঐতিহ্যের দিগন্ত যত বিস্তৃত হয়, তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিও হয় তত বেশী। কাজেই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখন তার ঐতিহ্যের সীমা আরব ও ইরান পর্যন্ত প্রসারিত করে দিল, তখন তার জীবনেও এলো সমৃদ্ধতর এক যুগ।

বলেছি, সংস্কৃতি ঐতিহ্য-বৃক্ষেরই ফল। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ যখন এইভাবে নিজের ঐতিহ্যের ধারা পরিবর্তনে সক্ষম হোল, তখনই তার সংস্কৃতিরও রূপান্তর শুরু হয়ে গেলো। সে গর্ব ও গৌরববোধ করতে থাকলো এমন সব ব্যক্তিত্ব, কাহিনী, ঘটনা ও বস্তুকে নিয়ে, যা তার নিজ ভাষার সাহিত্যে ও গানে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, তার অন্তরে স্থায়ী আসন করে নিলো। ফলে, তার পরিবর্তিত জীবনকে অবলম্বন করে সংস্কৃতির ধারা যে-খাতে বইলো, সে-খাত ছিল ব্রাহ্মণ্য ধারা থেকে অনেক দূরে।

বিদ্যাপতি তাঁর ‘কীর্তিলতায়’ হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের এই পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘হিন্দু মুসলমানের বাস কাছাকাছি হলেও তারা একে অন্যের ধর্মকে উপহাস করে, তাদের উপাসনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র, ধর্মগ্রন্থ আলাদা, উপদেষ্টা ভিন্ন, এক সমাজে মেলামেশা চলে, অপর সমাজে ভেদবুদ্ধি বড়।’ (স্বরূপের সন্ধান- ড. আনিসুজ্জামান)

সমৃদ্ধতর ঐতিহ্যের এমন কি ধারা, সংস্কৃতির এমন কি রূপ মুসলমানরা নিয়ে এলো, যা হাজারো বছরের পুরোনো ব্রাহ্মণ্যবাদকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তাদের চোখের সামনেই বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে ব্রাহ্মণ্যবাদের আওতার বাইরে নিয়ে এলো?

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা। দেব নয়, দেবী নয়, ফেরেশতা নয়, মানুষই শ্রেষ্ঠ। সে তার কর্তব্য সমাপন দ্বারা নিঃসন্দেহেই সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হতে পারে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বাহ্যিক কিংবা আন্তরিক কোন প্রভেদই এখানে স্বীকৃত নয়। ঝাঁটি মানবতার এই ডাকেই বাংলাদেশের মানুষ সাড়া দিয়েছিল এবং তার ফলে, তাদের মূল্যবোধে এসেছিল এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তারা তখন দেখেছিল, অর্জুন-যুধিষ্ঠির কেউ সেই নতুন মূল্যবোধের প্রতীক নয়, তাঁরা বরং পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদেরই ধারক ও প্রচারক। এ কারণেই মানুষের মনে ঐতিহ্যের ধারা তখন থেকেই এক পরিবর্তিত খাতে বইতে শুরু করলো। সংস্কৃতির রূপান্তরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের দুর্গেও প্রবেশ করলো সেই বন্যার জল। কিন্তু তারা এর কিছুটা গ্রহণ করেই দুর্গ-প্রাচীরের ফাটলের মেরামতে লেগে গেলো! বাংলা-সাহিত্যে সে-প্রাণপণ প্রয়াস গোপন থাকেনি।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর ‘মুসলিম বাংলা সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে সংস্কৃত-চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ থেকে স্বার্থ-পণ্ডিত রঘুনন্দন ও নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতৃত্ব করতেন। সংহিতার ব্যবস্থায় ও ন্যায়ের প্রাচীর-বন্ধনে তাঁরা হিন্দু সমাজকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। তবু ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে নুলো পঞ্চানন ‘গোষ্ঠী কথা’ নামক গ্রন্থে লিখলেন—

এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম।

বড় বড় ঘর যত হইল নিধুম ॥

হিন্দু সমাজের প্রাচীর গায়ে ‘মেলবন্ধন’ রূপ মেরামত সত্ত্বেও নুলো পঞ্চাননের এই উক্তি স্মরণীয়। হিন্দু সমাজের ভিতর মুসলিম বিপ্লব যে-বন্যা বইয়ে দিয়েছিল ‘প্রেমবিলাস’ নামক আরেকটি গ্রন্থে তার স্বাক্ষর এইভাবে চিহ্নিত হয়েছে—

কলিকালে লোক সব বড় দুরাচার

প্রধান কারণ তার যবন অধিকার।

এখানে যবন অর্থ মুসলমান এবং লোকেরা ‘দুরাচার’ দ্বারা লেখক হিন্দু সমাজের দেব-ভক্তি ও বর্ণবিভেদ অবলুপ্তির আশংকার কথাই বলেছেন।

কিন্তু ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়। সে যুগের খ্যাতনামা কবি চণ্ডীদাসই হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিপ্লব-দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলতে পেরেছিলেন,

শুন হে মানুষ ভাই,

সবার উপরে মানুষ সত্য,

তাহার উপরে নাই।

হিন্দু সমাজের মধ্যে যখন এরূপ বিক্ষোভ, তখনই চৈতন্য দেবের আবির্ভাব (১৪৮৫-১৫৩৩)। তিনি নবদ্বীপে ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত’ প্রচারে ব্রতী হন। তাঁর এই মতবাদের মধ্যেই মুসলিম ভাবধারা তটবিপ্লাবিনী হয়ে প্রবেশ করে। পূর্বে একেই আমি ভিন্ন সংস্কৃতির কল্যাণকর উপাদানের অনুপ্রবেশের পরেও মূল সংস্কৃতির আসল পরিচয় অব্যাহত থাকা বলেছি। তাই, শ্রীচৈতন্যদেবকে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ সে সময়ে হিন্দুরাই মুসলমান কাজীর কাছে শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন—

আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।

যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই ॥

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।

তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ।

পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।

গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥

নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌর হরি।

হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥

কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বারবার।

এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে বস্তুত মানব-প্রেমকেই অঙ্গীকার করে নিচ্ছিলেন। এই মানব-প্রেমই সনাতন হিন্দু ধর্মের পণ্ডিতদের কাছে হিন্দুধর্ম ভেঙে ফেলার অনুরূপ বলে বোধ হয়েছিল। কারণ, তাঁরা ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে আকাশ পাতাল তফাৎ গড়ে তুলেছিলেন, নিমাইর প্রেমান্দোলনে তা ভেসে যাচ্ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-সমাজ অবশ্য কালক্রমে মুসলিম প্রভাব আত্মস্থ করা সত্ত্বেও মূল ঐতিহ্য-ধারা থেকে বিচ্যুত না হওয়ার কারণে বর্ণভেদ বেড়ে ফেলতে পারেনি।

শ্রীচৈতন্য বিদগ্ধ হিন্দু-সমাজের প্রতিভূরূপে মুসলিম-প্রভাব আত্মস্থ করেও নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। গ্রাম্য-সমাজের চিত্র ফুটেছে যে সব মঙ্গলকাব্যে, সেগুলিতে মুসলিম-প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েও তার মূল পৌরাণিক পরিচয়কে প্রায় অবিকৃতই রেখেছে। অন্যদিকে—

... গৌরী শিবকে তাঁর হাড়ের কণ্ঠমালা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। শিব জানান যে, গৌরী সাত বার মরেছিলেন। প্রত্যেক মৃত্যুর পরে গৌরীর যে হাড় অবশিষ্ট ছিল, স্মৃতিরক্ষার্থে তাই দিয়ে শিবের কণ্ঠমালা তৈরী হয়েছে। গৌরী প্রশ্ন করেন—

তুমি কেনে তর গোসাঞি আমি কেনে মরি,

হেন তবু কহ দেব যুগে যুগে তরি।

শিব তখন বললেন, ‘শুহ্য কথা এখানে বলা ঠিক হবে না, চল ক্ষীরোদসাগরে যাই, সেখানে টংগের উপরে বসে নির্জনে বলবো।’ সিদ্ধাচার্যদের গুরু মীননাথ তা টের পেয়ে মৎস্যরূপ ধরে টংগের নীচে থেকে শুহ্য কথা শুনতে পেলেন। এদিকে ব্রহ্মজ্ঞান শুনতে শুনতে গৌরীর নিদ্রাবেশ হলো। দেবীর মত হুঁ হুঁ করে মীননাথ শিবের মুখ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান শুনতে নিলেন। এমন সময় সহসা নিদ্রাভংগে গৌরী প্রশ্ন করলেন, ‘কই, মহাজ্ঞান তো শুনলাম না।’ শিব আশ্চর্য হয়ে দেখেন, মীননাথ গোপনে সব জ্ঞান শিখে নিয়ে সন্তুর্পণে সরে পড়ছেন। শিব অভিশাপ দিলেন, মীননাথ একদা ব্রহ্মজ্ঞান বিস্মৃত হবে। অতঃপর গৌরীর ছলনায় ও মোহিনীর কটাক্ষপাতে মীননাথ-শিষ্য গোরক্ষনাথ ছাড়া আর সকল সিদ্ধার ব্রহ্মচার্যসংঘম বিচলিত হলে তারা শাপগ্রস্ত হলেন। হাড়িপা গোপীচন্দ্র রাজার বাড়ীতে হাড়ীর কাজ করতে লাগলেন ও পরে বন্দী হলেন এবং মীননাথ কদলী নামক এক নারী-অধ্যুষিত নগরে কামাসক্ত হয়ে কালান্তিপাত করতে লাগলেন।

গোরক্ষনাথকে এখন গুরু মীননাথের মোহভংগ করতে হবে, গুরু-কে মনে করিয়ে দিতে হবে পূর্বস্মৃতি, মানবজীবনের প্রধান কর্তব্যের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ঠিক যেমন সূক্ষিগণ মানবাত্মাকে ‘আলাতুবেরবিকুম’ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) আয়াতের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। গোরক্ষনাথ বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কেলি-নিরত গুরুর নিকটবর্তী হলেন, কিন্তু গুরুর সামনে যাওয়ার অনুমতি নেই। গোরক্ষনাথ তখন ফটক থেকে ‘মাদলের বোলে’ গুরুকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। ‘গোরক্ষ বিজয়’ কাব্যের এই সর্বাপেক্ষা নাটকীয় মুহূর্তটি রূপ ও ভাব উভয় দিক থেকেই মোলানা জালালুদ্দীন রুমীর ‘মসনবী’ কাব্যের সূচনায় মানবাত্মাকে সচেতন করে তোলার জন্য যে-বংশীধ্বনির কথা বলা হয়েছে, তারই অনুরূপ। মাদলের আওয়াজ মীননাথের কানে প্রবেশ করা মাত্র, তার মনে ভাবান্তর হোল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।

তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বলে ॥

কিন্তু এমন গূঢ় কথা-জীবনের পরম সত্যের কথা কি কথায় বলা যায়? তত্ত্বকথা যে নাচে-গানেই শোনাতে হয়। তাই—

হাতে তালে কহি কথা যতি গোর খাই।

মাদলের সানে কথা গুরুরে বুঝাই ॥

ডিমিকে ডিমিকি করি মাদলে দিল হাত।

সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ ॥

নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে।

কায়া সাধ কায়া সাধ মন্দিরায় বোলে ॥

রুমীর বংশীধ্বনীও মোহন্থ মানবাত্মাকে মুক্ত করতে চায়। বাঁশীর ডাকে সচকিত মানবাত্মা আত্মস্থ হয়। রুমী বলেন—

বন্দ বুগ্ সল বাশ আযাদ অয়ুপেসর
চন্দ বাশী বন্দ সীম ও বন্দ যর।

[হে বৎস, কারাগার চূর্ণ করে মুক্ত হও, কত কাল তুমি রজত-কাঞ্চনের নিগড়ে বন্দী হয়ে থাকবে?]

এই বন্ধনযুক্তির ডাকই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বাউল গানে রূপ পরিগ্রহ করতে চেয়েছে।

অবশেষে গোরক্ষনাথের বিজয় সূচিত হোল। গুরু মীননাথের মোহভঙ্গ করতে তিনি সক্ষম হলেন। বৌদ্ধ জনসাধারণ কি এইভাবে মুসলিম ভাবধারার আশ্রয় গ্রহণ করে শিবের অভিশাপকে জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন? আমরা আগে বলেছি যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগণই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের শূদ্রত্ব দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন সবার আগে। মোহভঙ্গের সেই ইতিকথা নতুন সংস্কৃতি-ধারায় এসে মিশেছে।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনীতেও রয়েছে একই মোহভঙ্গের ইতিহাস। সেখানে হাড়িপার শিষ্য রাজমাতা ময়নামতী পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রকে রাজ্যপাট ত্যাগ করে মনুষ্যজন্ম সফল করতে উদ্বুদ্ধ করেন। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মা পুত্রকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। ময়নামতী কামনা করেছিলেন পুত্রের জন্য অনন্ত জীবন।

জানা যায়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এই কাহিনী বাংলাদেশের বাইরে সুদূর পাজ্রাব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এ-কাহিনী ও তার তাৎপর্যের জনপ্রিয়তা, বস্তুত বৈষ্ণব ধর্মমতের চেয়েও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বাংলাদেশের বাউলদের মধ্যে। সংসার-ত্যাগের এই প্রবণতা এখনও লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এমন মোহ ভঙ্গের কাহিনীই যখন মুসলমান লেখকের হাতে পড়েছে, তখন তার তাৎপর্য হয়েছে অন্যরূপ, যাত্রা হয়েছে ভিন্ন পথে। ঐতিহ্যের বৈলক্ষণ্য সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুনিয়ার সব কিছুই বর্জনীয় নয়, সংগত বস্তুর ভোগাধিকার মানুষের জন্য শুধু কাম্যই নয়, তা অপরিহার্য।

তেমন সব কাহিনীর মধ্যে শাহ্ সগীরের ‘ইউসুফ-জোলেখা’ সর্বপ্রাচীন। ‘ইউসুফ-জোলেখার মূল কাহিনী কুরআনের ‘সুন্দরতম’ কাহিনী এবং তা দুনিয়ায় কর্মরত মানবাত্মার পরীক্ষা ও সংযমের এক শিক্ষাপূর্ণ রূপকান্বিত ব্যাখ্যা। শাহ্ মুহাম্মদ সগীরের পর যে মুসলমান কবি হিন্দু-উপাখ্যানের আধারে আধ্যাত্মিক রূপের সঞ্চারণ করেছিলেন, তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্বাধিক শক্তিমান

কবিদের অন্যতম দৌলত কাজী। দৌলত কাজীর প্রধান কাব্য ‘লৌরচন্দ্রালীর’ উপাখ্যানাংশ সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

গোহারী দেশের রাজা লোরের সংগে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ময়নামতীর বিয়ে হয়। পতি-পত্নী সুখেই আছেন, এমন সময় এক ভ্রাম্যমান যোগী এসে লোরকে মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রালীর চিত্র দেখিয়ে বললো, রাজকন্যা অনুঢ়া নয়, তবে স্বামী তার নপুংসক। রাজকন্যা সর্বতোভাবে লোরের যোগ্যা। যোগীর কথায় লোরের চোখে অনুরাগের অঞ্জন লাগলো। সে চলে গেল মোহরা দেশে। সেখানে লোর-চন্দ্রালীর মিলন হোল’ চন্দ্রালীর নপুংসক স্বামী লোরের সংগে যুদ্ধে প্রাণ হারালো। লোর মোহরা-রাজ্যের অধিকর্তা হয়ে চন্দ্রালীকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলো। এদিকে বিরহিণী ময়নার রূপগুণের খ্যাতি শুনে প্রতিবেশী এক রাজার পুত্র ময়নামতীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে দূতীর সাহায্যে তাকে বশ করতে কৃতসংকল্প হোল। দূতী তার ছলনার জাল বিস্তার করে চলে, কিন্তু ময়না রাজি হয় না। সে এক ব্রাহ্মণের সংগে শুকপাখীকে দিয়ে খবর পাঠায়। ব্রাহ্মণের কৌশলে শুকের কথায় লোরের মনে জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। রাজা লোর তখন পুত্রের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে চন্দ্রালীকে নিয়ে ফিরে আসে ময়নার কাছে। লোর ও ময়নামতীর পুনর্মিলন ঘটে।

কাহিনীটি স্পষ্টতঃই রূপক। লোর মানবাখ্যা সংসারের মোহে ডুলে যায় তার দায়িত্ব। অতঃপর ব্রাহ্মণ ও শুকের নির্দেশে তার মনে জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি; তার মোহ ভঙ্গ হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, যে-সংসারের হাতছানিতে লোর তার কর্তব্য থেকে বিচলিত হোল, ফিরে আসার সময় সেই-সংসারের সবটাই তাকে ছেড়ে আসতে হয়নি; চন্দ্রালী তার সংগে এসেছে। সূফী-পন্থার বা ইসলাম-সমর্থিত আধ্যাত্মিকতার এই-ই হোল বৈশিষ্ট্য। এই দুনিয়ার সব কিছুই বর্জনীয় নয়, এ সম্পর্কে রুমী তার ‘মসনবী’তে বলেন—

চীন্ত দুন্‌য়া আয্‌ খুদা গাফেল বুদন্‌,
নয়্‌ কামাশ ও নুকরা ও ফরযন্দ ও মন্‌ ।
মাল রা গর্‌ বহরে দ্বী বাশী হুমূল,
নি’মূ মালুন্‌ সালেছন্‌ খান্‌দিশ রসূল ।
আব দর্‌ কশতি হালাকে কশ্‌ তিয়স্‌ত্‌
আব আন্দর যেরে কশ্‌তী পশ্‌তিয়স্‌ত্‌ ।

[দুনিয়া কি? আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন থাকা; সম্পত্তি, রজতকাঞ্চন ও পুত্র-পরিজন দুনিয়া নয়। ধন সম্পদ যদি ধর্মের অনুগত হয় তবে, রসূল বলেন, সেই-

সম্পদ পুণ্যের উৎস। জল নৌকা-মধ্যে প্রবিশ্ট হলে তা নৌকার ধ্বংসের কারণ হয়; অথচ এই জলই নৌকার নীচে তার গতির সহায়ক।]

কিন্তু ময়নার প্রতিবেশী রাজপুত্রের প্রেমাশক্তি প্রবৃত্তিরই অসংগত দাবী; সুতরাং ময়না তা গ্রহণ করতে পারে না। সে সুযুক্তির সংগে মিথ্যা-প্রেমিকের কামনার অন্যায়তা প্রমাণ করেছে। ময়নার মনে ক্রোধ নেই; মিথ্যাকে বর্জন করার জন্য আত্মপ্রকাশও নেই। ময়নার এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অত্যুচ্চ সূক্ষী ভাবধারার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ময়না দূতীকে সম্বোধন করে বলে—

মোহর সোনা আর গুণের সায়র
মধুরমুরতি বেশ।
সো মধু তেজিয়ে কৈসে বিষ পানাও
ভালপাঞি কহ উপদেশ ॥
তুমি বড়পাপিনী পাপ শুনা আসি
ধরমকরা আসি বাম।
পাতক ঘাতক ধাঞি মোর চিন্তসি
জাগিল করহ নিশাম।
দূরন্ত দূরতি দূতীপণা দূর কর
চিহ্ন মোহোর কল্যাণ।

[আমার সুন্দর নাগর গুণের সাগর, তার দেহ সৌন্দর্যমধুর। সেই মধু ছেড়ে আমি কি বিষ পান করবো? ওগো ধনি, তুমি আমাকে তাই বল ॥ তোমার প্রস্তাব পাপ-সম্ভূত, সুতরাং তুমি পাপিনী; তুমি আমার ধর্ম নাশ করবে? হে ধনি, আমার জাতিকূল নির্মূলকারী এই পাতক-সম্পর্কে তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখ ॥ হে ধনি, তুমি দূরন্ত দূতীপণা ছেড়ে আমার কল্যাণের কথা একটু চিন্তা কর।]

দূতীপনার মুখে সতীত্বের আত্মরক্ষার চিত্র বাংলা-সাহিত্যে আরো অনেক আছে, কিন্তু ময়নার যুক্তি-প্রধান, শাস্তসংযত ব্যবহার অপূর্ব। লোর চন্দ্রালীর মতো আরেকটি প্রতীক-সমৃদ্ধ কাহিনী হোল আলাওলের ‘পদ্মাবতী’। এই কাব্যটি জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাব্যের মুক্ত অনুবাদ। আলাওলের রচিত ‘দারাসেকান্দরনামা’, আবদুল হাকিম ও গরীবুল্লাহর ‘ইউসুফ জোলেখা’ দৌলত উজির বাহরাম খানের ‘লায়লী-মজনু’, নওয়াজিশ খানের ‘গুলে বাকাওলী’, স্পষ্টত সেই সেই নামের ফারসী কাব্যের অনুসরণে রচিত। মুসলিম ঐতিহ্যের ধারাটি বাংলাদেশে কি ভংগিতে প্রবেশ করেছে তা এই সব গ্রন্থ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ কবিদের উপর আরব-ইরানীয় সাহিত্যের সরাসরি প্রভাব নানা কারণে সম্ভব নয়। সেখানে এই প্রভাব এসেছে দেশব্যাপী

মুসলিম সংস্কৃতি-মণ্ডলের সাধারণ আবহাওয়া থেকে। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নয়, গ্রামীণ কাহিনীগুলিতে কীর্তিত হয়েছে মানুষেরই চরিত্রের মহিমা। দেবদেবীর অবতারত্ব পরিত্যক্ত হওয়ার সংগে সংগে সেখানে মানুষ তার স্বাভাবিক সুখ-দুঃখ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সেই সুখ দুঃখের উর্ধ্বে দেবতার ইচ্ছা অনিচ্ছার এতটুকু লীলাও আর অবশিষ্ট নেই। আচরণ ও প্রবণতার সকল দায়িত্ব মানুষই গ্রহণ করেছে। তাই এইসব কাহিনীতে বাঙলা-সাহিত্যের সফল ট্রাজেডির জন্য হয়েছে এবং যে বিলক্ষণ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারা একদা বাঙলাদেশে প্রবেশ করেছিল, তাই এতদিনে বিপুল-বিস্তার হয়ে সারাদেশের গোটা সমতলকে আলিঙ্গন করে বইতে শুরু করেছে। এ ঐতিহ্য আপন করে নিয়েছে বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী-বিল গাছ-পালা পশুপাখী ও সর্বোপরি মানুষকে, সে শুধু বাতিল করেছে মানুষের মানবত্বের অবমাননাকে, পরিত্যাগ করেছে বর্ণভেদের ক্রোধ ও পৌত্তলিকতাকে।

এইসব কাহিনীতে তাই চরিত্র হয়েছে মূল আকর্ষণ। এ-কারণে, নায়ক যখন তার দায়িত্ব ও নায়িকা যখন তার সতীত্ব রক্ষায় তৎপর হয়, তখনই আসে কাহিনীর চরম মুহূর্ত। বিপরীতমুখী চরিত্রের দ্বারা সৃষ্টি হয় নাটকীয় সংঘাত। ‘মহ্মা-নদেরচাঁদ’ তাদের মানবিক প্রেমের সার্থকতাকে যখন বিশ্ব-প্রকৃতির আনুকূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছে, তখনই তাদের চোখের সামনে ঝলসে উঠছে হুমরা বেদের ‘বিষলক্ষে’র ছুরি। কোন প্রাক্তন নয়, উর্ধ্বের কোন দেবতার ইংগিত নয়, একটি মানুষের ঈর্ষা ও অসূয়ার ফলে দুটি নিষ্কলঙ্ক তরুণ-তরুণীর জীবনের অবসান ঘটে গেল। এই মানবিক স্বার্থই এ-সব কাহিনীর প্রাণ। এই প্রবণতাই বাংলা সাহিত্যে নতুন সংস্কৃতির অবদান।

বাংলাদেশের জনপদ সংস্কৃতির পরিচয়স্থলরূপে কেউ কেউ সত্যপীর, গাজী-পীর, সোনাভান প্রভৃতি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের কিছু পুঁথির উদাহরণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বস্তুত এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, এগুলি কাহিনী-কাব্যের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ স্রোত। পীর পূজার গণীবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রের ভিতরেই এদের অবস্থান। সূফীবাদ তথ্য ইসলামের এটি অপপ্রয়োগের দিক-যার প্রভাব অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে চিরাচরিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকেই জিইয়ে রেখেছিল। এগুলি যেমন স্থূল, তেমনই অনুকরণসর্বস্ব; নতুনের কোন পরিচয় এ-গুলিতে নেই। পীর ফকীরদের অলৌকিক কার্যকলাপ এখানে দেবদেবীর ঐশ্বর্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে মাত্র। এখানে সব কিছুই অবিশ্বাস্য ও অস্বস্তিকর। এখানে গাজী জিন্দাপীরের মাতার নাম পদ্মাবতী, পিতার নাম শাহা সেকান্দর; সেখানে আরবের রসূল বংশজাত মহাবীর হানিফা স্বীয় প্রতিপক্ষ খুঁজে পান সোনাভান নামক এক

বিশালবপু নারীর মধ্যে। এইসব কাহিনীর কবিতাও অঙ্গ-মূৰ্খ। ‘আল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ শব্দের পার্থক্যও তারা জানেনা।

এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই।

সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোসাই ॥

সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়।

বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

এ এক বদ্ধ পঙ্কল, এর থেকে কোন ধারা নির্গত হতে পারে না। এমনই এক সামাজিক বন্ধ্যাত্তোর ভিতর দিয়ে রাজ্যহারা পরাজিত মুসলমান উনিশ শতকে প্রবেশ করেছিল।

উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা-সাহিত্যে আধুনিকতার শুরু। এই সময় থেকেই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাউল গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ দুটি ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। বাউল গানে যে-সংসার বিমুক্ততার প্রকাশ, তা পরাজিত হতাশ মুসলমানের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং বাউলগান বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মধ্যেই বেশী প্রচলিত। অন্যদিকে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ সংখ্যালঘু সংস্কৃতির ধারাটাই তটপ্লাবিনী হয়েছে। মনে রাখা আবশ্যিক যে, বাংলাদেশ থেকে সিন্তানা পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজ্যহারা মুসলমান যখন কাঁদছে, তখন বাংলা সাহিত্য সমুদ্রাসিত হয়ে উঠেছে নব জীবনের বালার্ককিরণে। মাইকেল, বঙ্কিম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় একশো বছর, বাংলা সাহিত্যে এমন এক প্লাবন বয়ে গেছে, যাতে সাময়িকভাবে ধুয়ে মুছে গেছে সকল ধারার তটরেখা। এই সময়টোতেই স্বীয় ঐতিহ্যে গর্বিত কলিকাতা কেন্দ্রিক বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ গোটা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তাঁদেরই সংস্কৃতি বলে জাহির করেছেন ও মুসলমানের প্রায় সাতশো বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুচ্ছ ক্ষুদ্র এমন কি হীন বলে বেমালুম উড়িয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ সোৎসাহ হংকারের মুখে কিছু কিছু লেখক মোহগ্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেও দেশের সংখ্যাগুরু মানুষ তা মেনে নিতে পারেনি। তাদের সচেতন অংশে অচিরেই প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। তারা তখন সঙ্গতভাবেই বলেছিল, বাংলা সাহিত্য আমাদেরও; তোমাদের লেখায় যে চিত্র ফুটেছে, তা তোমাদের সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় হতে পারে; কিন্তু তোমার আমার মিলিত সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি মোটেও নয়। বলা বাহুল্য যে, নিজের সংস্কৃতিকে জোর করে অপরের ঘাড়ে চাপাবার এই মনোভাব ও দাবী মধ্যযুগীয়। কারণ, যে সাহিত্যে

দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের চরিত্র অনুপস্থিত, এমন কি তার অতীত, তার আদর্শ ধিক্কৃত, সে-সাহিত্য কি করে ধিক্কৃত সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে?

এক শ্রেণীর লেখকের এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের জোরালো প্রতিবাদ হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান তখনই সমৃদ্ধ কোন সাহিত্য তৈরী করতে পারেনি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে নজরুল ইসলাম ও মওলানা আকরম খাঁর লেখার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যে তার নিজস্ব মুখ প্রতিবিম্বিত দেখলো। তারপর ক্রমে ক্রমে বন্যার জল সরে গেলে, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সেই দুই পুরাতন ধারা আবার তাদের নিজস্ব গতি নিয়ে জেগে উঠলো। দেখা গেলো, ধারা দুটি পূর্ব-পরিচিত দুই বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই পৃথক পরিচয় বহন করেছে-যার ইতিহাস চলে গেছে ইসলামপূর্ব যুগেরও বৌদ্ধ আমল পর্যন্ত।

উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য ভারাক্রান্ত করতে চাই না, কারণ উদাহরণ সবারই জানা আছে। তবে এতটুকু অবশ্যই বলবো যে, উদাহরণ ও সুস্পষ্ট পার্থক্য-চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও, আমাদের মধ্যে কারও কারও মোহভঙ্গ হয় না, তাঁরা অত্যধিক উদারতা ও সরলতার প্রভাবে অভিন্ন সংস্কৃতির কথা এখনও বলেই চলেছেন। অবহিত হওয়া আবশ্যিক যে, বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নেওয়ায় হীনতা ও অনুদারতা কিছু নেই। সংকীর্ণতা ও অনুদারতা এবং বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করার মধ্যেই- এই অস্বীকার এক পক্ষে প্রভূমনোভাব, অন্যপক্ষে দাস্যমনোভাবেরই লক্ষণ। এই দুই মনোভাবের একটিও স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়।

এইজন্যই আমরা বাংলাদেশের প্রধান সংস্কৃতির পাশাপাশি উপজাতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংগে হিন্দু সংস্কৃতিকেও স্বীকার করে নেয়ার পক্ষপাতী। তবে সংগতভাবেই সেসব সংস্কৃতিকে আমরা সংখ্যালঘু মানুষের সংস্কৃতি বলে শ্রদ্ধার সংগে চিত্রিত করবো।

এতে ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা যেমন প্রকাশ পাবে, তেমনই মানব-জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিলে বিশ্ব-বিধানের একটি বড় সত্যকেই অঙ্গীকার করে নেওয়ার প্রবণতা প্রশ্রয় পাবে সকলের মধ্যে।

পূর্বে বলেছি, ঐতিহ্য এক চলমান ধারা- নতুন নতুন দানের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত এক লক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে চলে। উৎস সুনির্দিষ্ট বলে নব নব উপধারার সৃষ্টি হলেও সেই-ধারার মূল প্রকৃতির বিলুপ্তি ঘটে না, হয় মাত্র এর রূপান্তর। এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, মানব-স্বার্থই আমাদের সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় হয়েছে। তাই মানবতার সীমাহীন সমুদ্রের দিকেই তার যাত্রা। এই যাত্রাই

তার চলমানতার স্বাক্ষর বহন করছে। এখানেই আসে গ্রহণ-বর্জনেরও প্রয়োজনের কথা।

আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় তাই কোন নিষ্ক্রিয় প্রশান্তির নয়। কালের প্রগতির সঙ্গে যোগ দিয়ে ও ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তকে নিয়ন্ত্রণ করে এক আদর্শ পৃথিবী সৃষ্টি করার দিকেই আমাদের যাত্রা। এখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত বলে, একে আধ্যাত্মিক মাধ্যম বা পুরোহিত প্রথা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্বাধিকার লাভকে সংগত বলে মনে করা যেতে পারে না।

আমাদের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া তিনটি বিষয়ের অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। এক. প্রকৃতি। দুই. ইতিহাস। তিন. গোটা মানবিক অভিজ্ঞতা। তাই আমরা লীলা বিলাসী হয়ে বাস্তব ঘটনাবলীর দিকে উদাসীন থাকতে পারি না।

গোটা মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্যে ইয়োরোপের বর্তমান সংস্কৃতির অবদান প্রধানতম স্থান অধিকার করে আছে। কারণ এ-সংস্কৃতিরও মূল কথা হচ্ছে বাস্তবতা। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের পথ ধরে যখন তার যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন এবং তারও পূর্বে ইয়োরোপীয় চিন্তা বিজ্ঞানের প্রেরণা পেয়েছিল মুসলমানদের থেকে। উপাদানের এই উত্তরাধিকার সূত্রেই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিকে অংশত মুসলিম সংস্কৃতির এক উন্নততর বিকাশ বলে মনে হবে। কিন্তু বহু ইয়োরোপীয় লেখকের স্বীকৃতি সত্ত্বেও আজ আর আমরা এ কথাটি সরাসরি বলতে পারছি না। তবে বর্তমানে আমাদের তরুণ সমাজে ধর্মের নবরূপ সম্পর্কে যে-আগ্রহ দেখা দিয়েছে তাতে এ কথা স্পষ্ট যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম জগতে যে স্থবিরতা এবং গৌড়ামি প্রশ্রয় পেয়েছিল তাকে পেছনে ফেলে মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বহুদূর এগিয়ে গেছে; নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে মানুষের জীবনে এবং তাদের সমাধানের পথও চিহ্নিত হচ্ছে। এই মানবযাত্রায় শরিক হতে হলে আর সেই সংগে এই মানবধারাকে নিজের সাংস্কৃতিক স্রোতের সহমর্মী বলে চিনে নিতে হলে আমাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রবণতাকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। বুঝতে হবে ইয়োরোপীয় চিন্তার কোন ধারাটি মুসলিম চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করছে আর কোনটিতে রয়েছে গ্রীক চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ।

বলাবাহুল্য যে, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির এহেন মূল্যায়ন বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ। তবে আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক উপাদান তাতে কি আছে, তা আবিষ্কার করা তেমন কঠিন নয়। প্রকৃতিকে জানতে হলে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা ইসলামের একটি মৌলিক প্রতীতি। গ্রীকচিন্তা আসলে বিমূর্ত ও কল্পনাবিলাসী। আধুনিক ইয়োরোপ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছে,

ইন্দ্রিয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তাকে কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় প্রকৃতি জয়ে এতখানি সাফল্য এনে দিয়েছে। আমাদেরকে প্রকৃতি জয়ে সামর্থ্য অর্জন করতে হলে ইয়োরোপের এই ধারারই অনুসরণ করতে হবে, কারণ এই ধারা একদিন আমাদের সংস্কৃতি ধারা থেকেই পুষ্টিলাভ করেছিল।

কিন্তু ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও সংস্কৃতির মূল বৈলক্ষণ্য হোল, ইন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকার প্রবণতা। গ্রীক ও রোমান চিন্তা যত বিমূর্তই হোক না কেন, সামাজিকভাবে তারা দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল-আত্মার কাল-অতিক্রমী বিশ্বততর শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল না। আত্মায় বিশ্বাসী সফ্রেটিসকে তাই বিষপানে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল আলোকোদ্ভাসিত এথেন্সেই। গ্রীসের বিমূর্ত ও কল্পনাবিলাসী চিন্তা থেকে বাস্তববাদী মুসলিম চিন্তায় রূপান্তর লাভের পর ইয়োরোপীয় চিন্তা মানব-সম্পর্ক-নির্মাণে আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেনি। তাই, সভ্যতার এই দ্বিপ্রহরেও ইয়োরোপ মানব সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর আশাবাদ পোষণ করতে পারছে না। ইয়োরোপের কবিকুল বলছেন, আমাদের সংস্কৃতি এক উষ্ম মরুভূমিতে এসে আত্মহত্যা করতে বসেছে, মানব-স্বার্থ সেখানে হচ্ছে দিন দিন অবহেলিত।

আমরা আমাদের সংস্কৃতির মূল-প্রকৃতির অনুসরণে এই হতাশাকে অতিক্রম করে এক আদর্শ মানব সমাজ নির্মাণে অগ্রসর হতে চাই, আমরা কালের দাস না হয়ে তার প্রভু হতে চাই, আমরা প্রকৃতির উপাদানকে আত্মসাৎ করে নব বলে বলীয়ান নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই। আমরা মানব-সভ্যতার গোটা অবদানকে ‘মানুষ’ সৃষ্টির অব্যাহত স্রোত রূপেই অবলোকন করি।

আমরা চাই, প্রত্যেকটি সংস্কৃতি তার সৌন্দর্যের সমারোহে মানব সভ্যতার সেই সুদিনকে নিকটতম করুক, যেদিন মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বेष থাকবে না, যেদিন গোলাপ-চামেলী-কেয়া-কদম্ব সবই তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করবে এবং প্রাকৃতিক বিধানের মতই সকল বৈচিত্র্যকে নিয়ে আমরা রচনা করবো এমন এক অখণ্ড মানব সভ্যতা যেখানে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকশিত ও বিবর্তিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

আমরা কালকে ও প্রকৃতিকে আমাদের সেই উদ্দেশ্যের অনুগত করেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। বিশ্ব-জোড়া মানুষের এই মহান স্বপ্নের সঙ্গী হওয়াকেই আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছি এবং একেই আমরা অভিহিত করেছি, এক মহান লক্ষ্যের দিকে সতত এগিয়ে যাওয়া বলে।

যেসব বঙ্গভে জন্মি হিংসে বঙ্গোবাণী

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ



পুঁথি-সাহিত্যের উদ্ভব এবং আরবী ফারসী শব্দসংবলিত ঘরোয়া জবানের বা চলতি ভাষার পুঁথি-সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। বাংলা কাব্যের সুপ্রাচীন ইতিহাস থেকেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর যুগে কাব্যের ভাষা প্রধানত সংস্কৃতানুসারী হলেও সে-যুগেও কিছু-কিছু আরবী-ফারসী-উর্দু ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় বিষয় এবং ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, কাব্যে আরবী-ফারসী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার ব্যাপকতা পায়। এর কারণ ও পটভূমি উল্লেখ করে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, ‘গত পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙলা ভাষাটা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আরবী ও ফারসী সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যে জ্ঞান তাহাদের নিত্যকর্মের জন্য অপরিহার্য। আমাদের যেমন সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আরবী ও ফারসীর সঙ্গে তাহাদের কতকটা তাই।’

উপরোক্ত পটভূমি ও বক্তব্যের কথা মনে রাখলে এবং এর বাস্তবতা বিস্মৃত না হলে, মধ্যযুগের হিন্দুকবিরা কেন প্রধানত সংস্কৃতানুসারী ছিলেন আর মুসলমান কবিরা কেন আরবী-ফারসীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন তা অনুধাবন করা যাবে। বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ ও রূপান্তরের কারণেও এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বহুবিধ কারণে আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের গভীর সম্পর্ক থাকলেও আরবী-ফারসী-উর্দু ইত্যাদি ভাষা কোনোকালেই দেশের বৃহত্তম জনগণের মুখের ভাষা ছিল না, যেমন ছিল না সংস্কৃত। সংস্কৃত ও ফারসী চর্চা ছিল প্রধানত শিক্ষিত মহল ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংস্কৃত ও ফারসী কাব্যের অনুবাদ-বিশেষত ধর্মীয় গ্রন্থাদি এবং রোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ জনগণ উপভোগ করতেন। আরবী-ফারসীর সঙ্গে ঐতিহ্যিক কারণে গভীর সংযোগ বা সম্বন্ধ থাকলেও, মুসলমান জনগণ তথা এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী কখনো সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু ইত্যাদি ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা জ্ঞান করেননি। উল্লেখ্য, মধ্যযুগেই বৃহত্তর জনগণের কাছে

পৌছানোর প্রয়োজনে আরবী-ফারসী-উর্দু থেকে পুঁথি-কেতাব বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা মুসলমান কবিরা উপলব্ধি করেন।

বাংলা ভাষার রূপরীতি নিয়ে অর্থাৎ তা সংস্কৃতানুসারী হবে, নাকি আরবী-ফারসী শব্দসমবিত্ত হবে-এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিভর্ক, মতদ্বৈততা থাকলেও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা, জ্ঞান-চর্চা মুসলমান লেখকদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান কবিরা যে অনেকেই শুধু সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কাব্য চর্চা করেছেন, ধর্মীয় গোঁড়ামীর নামে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন, তা-ই নয়, এ ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে দ্বিধাবাগীও উচ্চারণ করেছেন। সেকালেই 'নূরনামা'র লেখক নোয়াখালীর সন্দীপ নিবাসী কবি আবদুল হাকিম লিখেছেন-

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গোবাণী।

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥

দেশী-ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ না যায় ॥

ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু ও মুসলমান কবিদের অনেকের প্রচেষ্টায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে-ভাষা সংস্কৃতবহুল হয়ে ওঠে, এবং জনজীবনে বিশেষত মুসলমান জনজীবনে প্রচলিত আরবী-ফারসী ঘরোয়া জবান সাহিত্যে ব্যবহার প্রায় অবসিত হয়ে যায়। এই পটভূমিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক পুঁথি কাব্যে ও ভাষা-সমস্যার উল্লেখ এবং তার সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে সংস্কৃত শব্দসমবিত্ত 'আসল বাঙালা' জনগণের মুখের ভাষা ছিল না, এ-সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের পুঁথি-সাহিত্যে :

'এই পুঁথির শায়ের ছিল

আশু জামানার।

সংস্কৃত সাধুভাষা হইল তৈয়ার ॥

পড়িতে বুঝিতে লোকে

বড়ই কসেদ্বা।

এ-কারণে অধিন রচে

চলিত বাঙালা ॥

চলিত বাঙালায় কেদ্বা

করিনু তৈয়ার।

সকলে বুঝিবে ভাই
কারণে ইহার ॥
আসল বাঙালা সবে
বুঝিতে না পারে ।
এ খাতেরে লিখিলাম
শোন বেরাদরে ॥

বাংলার মুসলমানের ভাষা-সমস্যা যে তার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সমস্যারই অঙ্গীভূত এ সত্য শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম দ্বিজ্ঞানমণ্ডলীই উচ্চারণ করেননি, মুসলিম পুঁথিকাররাও স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করে গেছেন। ১১০২ সালে রচিত এবং ১১৯৮ সালে মুদ্রিত ‘তাজকেরাতুল বাঙলা’ শীর্ষক পুঁথির রচয়িতা পূর্ববঙ্গ নিবাসী আবদুল ওহাব লিখেছেন—

শুন যত মোমেনান খেয়াল করিয়া ।
মোছলমান বাঙালার
আহালজারিয়া ॥
আহলে হনুদ ও মোমেন সবের ।
এক ভাষা আছিলেক
সে দোনজাতের ॥
বাংলা জ্বান তারে বলিত সকলে ।
লিখিত পড়িত সবে
খুশি খোশ হালে ॥

কিন্তু ক্রমে ঘটবেক এমন হালাত ।
হনুদ কোশেব কৈল
হইতে তফান ॥
বাঙ্গালা জ্বান মধ্যে
আনিলেক ছারা ॥
কোফরী শেরেকী বাত
ভরিল তাহারা
তা দেখি মোজেজ
লোকেরা এছলামের ।
ছাড়িলে সে ভাষা ভাই
ঈমান খাতের ॥

রচিতে করিল গুরু দোভাষী জবান ।

আবী ফার্সী উর্দু আদি

মিলিত জবান ॥

পুঁথিকার উপরোক্ত কবিতাংশে বাংলা কাব্যের ভাষার বিবর্তনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। তাঁরও বক্তব্য যে, আদিতে বাংলা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ভাষাই ছিল এক অর্থাৎ ‘বাংলা জবান’ কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই ‘বাংলা জবান’-এ ‘কোফরী শেরেকী বাত ভরিল তাহারা’। এই পটভূমিতেই অষ্টাদশ শতকের মুসলমান কবিরাও ‘দোভাষী জবান’ অর্থাৎ ‘আবী ফার্সী উর্দু আদি মিলিত জবান’ কাব্যে ব্যবহার করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ যুগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খ্রীষ্টান মিশনারী ও সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলা ভাষার-বিশেষত বাংলা গদ্যের সংস্কৃতানুসারী রীতি প্রবর্তন না করলে আরবী-ফারসী শব্দ সংবলিত চলতি ভাষাই যে বাংলা সাহিত্যের ভাষা হতো সে কথা পণ্ডিত-গবেষকরাও উচ্চারণ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, ‘যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।’ (বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ২৮৫) তা যে হতে পারে নি, তার কারণ, বহুদিন পর্যন্ত মুসলমান রাজদরবারে ফারসী রাজভাষার সম্মান পাচ্ছিলো বলে সেই আমলের অন্যান্য দেশীয় ভাষার মতো বাংলাও ছিল ফারসী শব্দবহুল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশের শাসনসভার ব্রিটিশ শক্তির হাতে চলে যায়। তাই স্বাভাবিক যে, বিজয়ী ইংরেজ বিজিত মুসলমান শাসকদের রাজনীতি, সংস্কৃতি, আদব-কায়দা এবং ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। আরবী-ফারসী বর্জিত সংস্কৃতগন্ধী বাংলা ভাষার উন্নয়নে ইংরাজদের এই উৎসাহ ছিল বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করার বহুবিধ কারসাজির অন্যতম।’

মধুসূদনের কাছে আমরা অনেক বেশি ঋণী

এবনে গোলাম সামাদ



আমাদের দেশে রবীন্দ্র পূজার শেষ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আমরা মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৩-১৮৭৩) কাছে অনেক বেশি ঋণী। তাকে বলা যেতে পারে, আমাদের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা। আমাদের জাতিসত্তা গঠনের অন্যতম উপাদান হলো ভাষা। আর এই ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন রেখেছেন বিশেষ অবদান। যে গদ্যে আমরা এখন লিখি, সেই চলতি গদ্যের প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, মধুসূদনের লেখা নাটকের সংলাপে। এর আগে কোনো নাট্যকার চলতি বাংলাকে নাটকের সংলাপে ব্যবহার করেননি। মধুসূদন চেয়েছেন, নাটকে নতুন ভাব ও আঙ্গিক এনে দিতে। তার নিজের কথায়—

‘অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ় বঙ্গে নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।’

মধুসূদন বাড়লা নাটকে এনেছিলেন যুগান্তর। করেছিলেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তিনি লিখেছেন মঞ্চ সফল নাটক। মধুসূদনের মধ্যে নানাভাবেই ফুটে উঠেছে দেশপ্রেম। সে যুগে যা ছিল যথেষ্ট বিরল। তিনি বলেছেন—

আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত, জগতে,
পরাদীনতা, হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে।

মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্রের লেখা নীল দর্পণ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তার লক্ষ্য ছিল, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের অবসানে ব্রিটিশ জনমতকে পক্ষে আনা। আর এতে তিনি বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলেন। মধুসূদন চেয়েছিলেন, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে এ দেশের কৃষিজীবী মানুষকে বাঁচাতে। তিনি চাননি সাহিত্যিক হিসেবে সমাজের প্রতি তার কর্তব্যকে অবহেলা করতে। কেবল দেশপ্রেম দিয়ে অবশ্য কোনো কবির কাব্য কৃতীর বিচার হতে পারে না। কবির কাব্য দক্ষতার বিচারে আসে তার প্রকাশ ক্ষমতার বিচার। এ ক্ষেত্রে মধুসূদন ছিলেন যথেষ্ট অগ্রসর। কাব্যের মধ্যে থাকে আমাদের আবেগকে ধরার বিশেষ প্রচেষ্টা। আর তাই বলা হয়, কাব্য হলো রসধর্মী বাক্যের সমষ্টি। মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ভক্তি ও ঘৃণা অনুভব করে, সাহিত্যিকরা চান

যার অনুভূতিকে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে। আর সেটা দিতে পারাতেই ফুটে ওঠে একজন সাহিত্যিকের কৃতীর পরিচয়। যখন আমরা পড়ি—

ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বান্ধি নীড় থাকে সুখে।

তখন আমাদের মনে জেগে উঠতে চায় নীড় বাঁধার, সুখী হওয়ার বিশেষ অনুভব। এর আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ এরকম উপমা ব্যবহার করেননি, যেভাবে করেছেন মধুসূদন। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে বিকাশ ঘটেছে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের। যার একটা বিশেষ উপকরণ হয়েছে মুসলিম বিদ্বেষ। কিন্তু মধুসূদন করেছিলেন হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ, গ্রহণ করেছিলেন খ্রিষ্টান ধর্ম। তিনি চাননি তার সাহিত্যে এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদকে লালন করতে, আর সেই সাথে মুসলিম বিদ্বেষকে ঠাঁই দিতে। বিংশ শতাব্দীতে যে হিন্দু মুসলমান সমস্যা, তীব্র আকার ধারণ করে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার বীজ নিহিত ছিল হিন্দু জাগরণের মধ্যে। কিন্তু মধুসূদন ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি এর সাথে জড়িত ছিলেন না। মধুসূদন মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না। যেমন ছিলেন অনেক হিন্দু সাহিত্যিক। তার রচিত ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ’ গ্রন্থসনে আমরা দেখতে পাই মুসলিমপ্রীতি।

এই গ্রন্থসনে মধুসূদন একজন চরিত্রহীন ধর্মদ্রোহী হিন্দু বৃদ্ধের কাহিনী বিবৃত করেছেন। উন্মোচিত করতে চেয়েছেন হিন্দু সমাজের প্রাচীনপন্থীদের পাপ ও ভগ্নামিকে। অন্যদিকে মুসলিম চরিত্রকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন অনেক নিষ্কলুষভাবে, যারা ধর্মকে মানে কিন্তু ধার্মিকতার ভান করে বড়াই করে না, যারা অনেক সংযত চরিত্রের লোক। মধুসূদন তার রচিত আর একটি গ্রন্থসন, ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ এর এক জায়গায় মুসলমানদের বলেছেন— তারা মদ্যপায়ী নয়, তারা অনেক সংযত। কিন্তু হিন্দু তরুণরা মদ খেয়ে ফুর্তি করাকেই ভাবছে আধুনিকতা, যা তাদের করে তুলছে উন্মার্গগামী। তারা সমাজজীবনে সৃষ্টি করছে একই সাথে যৌন বিশৃঙ্খলা। ধরাচ্ছে পরিবার প্রথায় ভাঙন। মধুসূদন ইউরোপীয় সভ্যতার যুক্তিবাদকে মানলেও, মানতে চায়নি তার ভোগবাদের অতি প্রবণতাকে। কিন্তু তিনি তা বলে, তথাকথিত আর্থ জীবনযাপন পদ্ধতিকেও করেননি প্রশংসা। যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন আর্থদের চেয়ে অনার্যদের প্রতি দেখিয়েছেন অধিক প্রীতি। রামের চেয়ে রাবণ পেয়েছেন তার কাছে বর্ধিত মর্যাদা। তিনি দিয়েছেন কনকলংকার উজ্জ্বল বর্ণনা; আর্থ সভ্যতার নয়। মধুসূদনের কাছে রাম প্রতিভাত হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে। পক্ষান্তরে রাবণ

চিত্রিত হয়েছেন দেশপ্রেমিক হিসেবে, যিনি রামের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন দেশ রক্ষার জন্য। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে গিয়ে মধুসূদন তাকে সাজিয়েছেন নিজের মতো করে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মুসলমান কবিদের ওপর মধুসূদনের প্রভাব পড়েছে বেশি। একপর্যায়ে মধুসূদনকে তারা ভেবেছেন কাব্য চর্চার আদর্শ। এর বিশেষ দৃষ্টান্ত হলেন কবি কায়কোবাদ। যার আসল নাম হলো মোহাম্মদ কাজেম। ইনি মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুসরণে লেখেন মহাশ্মশান কাব্য। যার বিষয়বস্তু হলো পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতনের কাহিনী। মধুসূদন তার নাটক রচনায় ইউরোপীয় কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের নাম পরিচয় দিয়েছেন বদলিয়ে। তাদের করে নিয়েছেন এই উপমহাদেশের মানুষ। যেটা তিনি করতে পেরেছেন তার আপন প্রতিভার গুণে। মধুসূদন তার পদ্মাবতী নাটক রচনায় পুরাণের একটি প্রসিদ্ধ কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই কাহিনীকে করে তুলতে চেয়েছেন এই উপমহাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণীয়। যেটা অন্য কেউ ঠিক ওইভাবে করতে পারেননি। মধুসূদন অনুপ্রাণিত হয়েছেন ইউরোপীয় ধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখতে। তিনি গ্রহণ করেছেন সনেট কাব্যরীতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও থেকেছে তার স্বকীয়তার ছাপ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ আর সনেট হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষার অঙ্গ। থাকেনি বিদেশী হয়ে।

মধুসূদন জন্মেছিলেন যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে। যা তার সময় ছিল দুর্গম গওগ্রাম। সেখান থেকে মধুসূদন যান কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। পরে যান বিলাতে ও ফ্রান্সে। যথেষ্ট উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি। শিখেছিলেন অনেক ভাষা। তার ব্যক্তিগত প্রতিভাকে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই। মধুসূদনের ওপর পড়েছিল ইউরোপের বিরাট প্রভাব। কিন্তু এই প্রভাব ছিল অস্তিবাচক, নেতিবাচক নয়। মধুসূদন ঢাকাবাসীদের এক অভ্যর্থনায় বলেছিলেন, ‘আমার স্বপক্ষে, আপনাদের আর যেকোনো ভ্রমই হোক, আমি সাহেব হইয়াছি এই ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায্য। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ঘরে ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আরশি রাখিয়া দিয়েছি, এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমনই বলবৎ হয়, আরশিতে মুখ দেখি, আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালী নহে, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।’

এ ছিল মধুসূদনের নিজের সম্পর্কে নিজের মন্তব্য। মধুসূদন তার দেশকে কখনো ভোলেননি। ফ্রান্সে ভারসাই শহরে বসে তার গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কপোতাক্ষ নদকে নিয়ে লিখেছেন কবিতা। করেছেন স্মৃতি মন্ডন। মধুসূদন

ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখা ছেড়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন বাঙলা ভাষায়। বলেন, ‘হে বঙ্গ ভাষারে ...ভ্রমণ।’ এভাবে মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে গৌরব মধুসূদনের আগে আর কাউকে সেভাবে করতে দেখা যায়নি। মধুসূদনের মধ্যে তাই খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের জাতীয়তাবোধের উৎসকে। কিন্তু সেটাকে এখন আমরা স্বীকার করতে চাচ্ছি না, আমরা বোঝাতে চাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ হলেন আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলেননি। তিনি স্বাধীন ভারতের ভাষা হিন্দি হওয়া উচিত বলেই করেছিলেন মন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ গর্ব করতেন তার পূর্ব পুরুষ এসেছিলেন উত্তর ভারতের কনৌজ থেকে। ঠাকুর পরিবারের ধমনীতে আছে কনৌজ ব্রাহ্মণের রক্ত। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের প্রকাশ আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই, তার লেখা ‘শিবাজি-উৎসব’ নামক কবিতায়। এই কবিতায় তিনি বলেছেন— শিবাজি চেয়েছিলেন হিন্দুত্বের ভিত্তিতে ভারতজুড়ে এক ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাঙালিরা সেটা বোঝেননি। না বুঝে করেছে ভুল। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা—

সেদিন গুনিনি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ শির পাতি লব।

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ ধ্যানমন্ত্রে তব।

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন— দরিদ্রের বল।

এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন করিব সম্মল ॥

মারাঠির সাথে আছি, হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো ‘জয়তু শিবাজি’।

মারাঠির সাথে আছি, হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূর্ব দক্ষিণে ও বামে

একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব এক পুণ্য নামে ॥

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তাবোধের সাথে বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধের সামান্যতম মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে মধুসূদনের জাতীয়তাবোধের সাথে আমাদের জাতীয়তাবোধের মিল অনেক সহজে খুঁজে পেতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশে মধুসূদনের চর্চা নেই। তার নাটক অভিনয় করি না আমরা। সরকারিভাবে পালিত হয় না মধুসূদনের জন্মদিন। কিন্তু পালিত হয় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতে গিয়ে চুক্তি করে এসেছেন, আগামী বছর একই সাথে ভারত ও বাংলাদেশে পালিত হবে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। জানি না, এরকম জন্মজয়ন্তী পালনের সার্থকতা কোথায়। আমরা কি চাচ্ছি বাংলাদেশে রবীন্দ্র জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে? আমরা কি চাচ্ছি ভারত ও বাংলাদেশকে এক করে দিতে! প্রশ্নটা উঠছে খুব সঙ্গত কারণেই।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

অধ্যাপক আবদুল গফুর



১৯৪৭ সালে তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রায় সর্বসম্মত দাবী এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দের সম্মতির ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। এই লাহোর প্রস্তাব ছিল হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত এ উপমহাদেশের শত শত বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির ফসল। লাহোর প্রস্তাবের দু'টি দিক ছিল: এক. উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করা, দুই. উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম এলাকাসমূহের সমন্বয়ে একাধিক পৃথক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দ ছিল না। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের যে অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে হিন্দু সংবাদপত্রগুলোই প্রথম এটাকে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব বলে উল্লেখ করে এবং মুসলিম লীগও পরবর্তীকালে এ নামকরণ মেনে নেয়। ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্স কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব আংশিক সংশোধনের মারফত উপমহাদেশের দুই প্রান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের সমবায়ে একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে একটিমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন মুসলিম-বাংলার কৃতী সন্তান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সেদিন উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু-ব্রিটিশ অশুভ আঁতাভের মুকাবিলায় বৃহত্তর মুসলিম সংহতির প্রয়োজনে এই সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, এরূপ ধারণা করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।

লাহোর প্রস্তাবে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত করার কথা বলা হলেও এ প্রস্তাবের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। এ প্রস্তাব বরং ছিল সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার একটি বাস্তব প্রচেষ্টা মাত্র। লাহোর প্রস্তাবের যারা প্রবক্তা, শেরে বাংলা, কয়েদে আজম প্রমুখ, তাঁরা সবাই জীবনভর হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁদের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে দেশ বিভাগ দাবী করতে বাধ্য হন। এই দাবী হিন্দু

নেতৃত্ব মুখে স্বীকার করলেও পরবর্তীকালে অবশ্য প্রমাণিত হয়— তাঁরা কখনও এ দাবী অন্তর থেকে স্বীকার করেননি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত এই চব্বিশ বৎসর নানা কারণেই জাতির ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম শাসনের অবসানের পর উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত ছিল দেশী-বিদেশী অমুসলিম শক্তির মুকাবিলায় স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংগ্রাম, যার শেষ পর্যায়ে এ সংগ্রাম মুসলিম নব জাগরণের আন্দোলনে উন্নীত হয়েছিল। এক হিসাবে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত ছিল যেন এই রেনেসাঁ থেকে পচাদপদসরণের পালা। একটা দুর্ভাগ্যজনক ভুল বোঝাবুঝি, আত্ম-বিস্মৃতি, অবिवেচনা ও বিদ্বেষ হলাহলের পরিণতিতে একটি রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মাধ্যমে উন্ময়নশীল মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বিধাবিশক্তি। চিত্রের এ হচ্ছে একটি দিক। চিত্রের আরেক দিকে এ হচ্ছে বৈষম্য, অবিচার, অত্যাচারের অবসানে স্বাধীনতার এক নব উদ্বোধন—পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নবতর স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সংযোজন। উপমহাদেশের পরিস্থিতির বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে হলেও একটি স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর নবতর পদচারণা। শতাব্দীর ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অনিচ্ছয়তার আশংকায় দোদুল্যমান মনে হলেও দুঃসাহসিকতার অভিধায় উচ্চকিত এক নব অভিযাত্রা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার ভূমিকা ছিল যে কোন বিচারে গৌরবদীপ্ত। বাংলাদেশ শুধু পাকিস্তান আন্দোলনকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরই জন্ম দেয়নি, পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপকও ছিলেন বাংলার কৃতী সম্ভান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। বৃটিশ-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন বাংলার মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাই সেই চরম দিনগুলোতে পাকিস্তান আন্দোলনে কায়েদে আজমের হাতকে সর্বাধিক শক্তিশালী করেছিল, কিন্তু পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন দেখা গেল এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বাংলার স্থান হয়ে গেল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। প্রশাসন, সেনাবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্রই তাদের এই দুর্বল অবস্থান বাঙ্গালীদের কারো কারো মনে যদি অভিমান সৃষ্টি করে থাকে, তবে তাকে অস্বাভাবিক বা অসংগত বলা যাবে না।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার বিশিষ্ট ভূমিকার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যায়—পরাজিততার অভিলাষ বাংলাকেই সবচাইতে অধিক সহ্য করতে হয়। আর যেহেতু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পূর্বে এদেশের শাসনকর্তা (নবাব) ছিলেন মুসলমান, তাই ইংরেজ রাজত্বে বাংলার মুসলমানদেরই সর্বাধিক বৈষম্য-বঞ্চনা ও শোষণ-নিপীড়নের শিকার হতে হয়। ইংরেজদের এসব শোষণ-

নিপীড়নে সহযোগী শক্তি হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা দেয় এক শ্রেণীর হিন্দু। তাই বৃটিশ-হিন্দু যৌথ শোষণ-নিপীড়নের যন্ত্রণা বাংলার মুসলমান যতটা সহ্য করেছে, ততটা অন্যেরা করেনি। বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হবার এটা ছিল বড় কারণ। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এই প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তান থেকে বাংলার মুসলমানদের পাবার আশা ছিল বিরী। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে তারা পেয়েছে যথেষ্ট কম।

এই কম পাবার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা প্রদেশ) হিসাবে যে অঞ্চল চিহ্নিত হয়, তা ইংরেজদের চক্রান্তে বিভাগ-পূর্ব আমলে ছিল একটি চরমভাবে অবহেলিত অনুন্নত অঞ্চল। মুসলিম শাসনামলে যে বাংলায় ছিল গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, মাঠ ভরা সবুজের সমারোহ, যে বাংলার মসলিন সমেত গোটা বস্ত্রশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় হতো—সেই বাংলার বস্ত্রশিল্প একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হলো। দুনিয়ার সেরা পাট উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পূর্ববঙ্গ বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও পাটকল সব পরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হলো ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে। পূর্ববঙ্গকে পরিণত করা হলো কলিকাতাসহ হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বঙ্গের হিষ্টারল্যাণ্ড।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় দেখা গেল নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনসংখ্যার মেজরিটি অংশ পূর্ববঙ্গের হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান অনেক পেছনে। বৃটিশ শাসনকালেই পাজ্রাবে গড়ে উঠেছিল একটি অতি উন্নত সেচ ব্যবস্থা, যার ফলে সুফল পড়েছিল সেখানকার কৃষির উপরে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৩টি বস্ত্র কলের এবং ১১টি চিনি কলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল দেশের পশ্চিমাঞ্চলে। এ ছাড়া সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে অবাঙালী মুসলমানদের অবস্থা বাঙালী মুসলমানদের অবস্থা হতে পূর্ব থেকেই উন্নত ছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় প্রশাসনে প্রথম দিকে তাদের প্রভাব ছিল প্রবল। সেনাবাহিনীতেও একই অবস্থা। উপমহাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশ থেকে মোহাজির হিসাবে আগত মুসলমানদের অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকতে এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব গোড়া থেকেই অধিক অনুভূত হলো। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে এই বৈষম্য নিয়েই পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়। এ সবার ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি গোড়া থেকেই সৃষ্টি হওয়াটা ছিল প্রায় অবশ্যজ্ঞাবী।

পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের মাতৃভাষার পার্থক্য পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পথ আরও সুগম করে দেয়। কিন্তু যে কারণটি দুই অঞ্চলের পার্থক্যকে বাড়িয়ে তুলতে সর্বাধিক সাহায্য করে—সেটা হলো উভয় অঞ্চলের

মধ্যকার বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান। প্রায় পনের শত বাইশ মাইল শত্রুভাবাপন্ন দেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন দু'টি পৃথক ভূখণ্ডের সমবায়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের নজীর ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এ কাজ এমনিতেই ছিল দুর্লভ এবং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভূখণ্ড, ভাষা, আবহাওয়া প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও দু'অঞ্চলের মধ্যে যে বন্ধুটি বন্ধন অটুট রাখতে পারতো, তা হলো ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামের বাস্তব অনুসরণ। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচারের নীতি প্রতিষ্ঠায় ততটা উৎসাহ বোধ করেননি। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পাকিস্তানে ইসলামের ন্যায়নীতি কায়ম করা হবে বলে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়ম করা এমনিতেই যথেষ্ট সুকঠিন কাজ। তদুপরি পাকিস্তানের মত দু'টি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডভিত্তিক রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্যও প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান ত্যাগী নেতৃত্বের, পাকিস্তানে যার অভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ দুটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পৃথক ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে যে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে সন্তা গলাবাজি যত করেছেন, উপমহাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ টিকিয়ে রাখার জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তার তুলনায় যথেষ্ট কম। একান্তর-পূর্ববর্তী (অবিভক্ত) পাকিস্তানের মত চ্যালেঞ্জিং রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা তো দূরের কথা, একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতার প্রমাণও তাঁরা দিতে পারেননি— এ এক ঐতিহাসিক সত্য। ফলে কায়দে আজমের মত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তিরোধানের পর হতেই পাকিস্তানে যে নেতৃত্ব সঙ্কট শুরু হয়, তা থেকে জাতি কখনও মুক্ত হতে পারেনি।

এগুলো ছিল যেখানে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, সেখানে পাকিস্তানের বৈদেশিক সমস্যা ছিল গোড়া থেকেই কঠিনতর এবং এক হিসাবে জটিলতর। অবতীর্ণ ধর্মাদর্শের যে সর্বশেষ ও আধুনিকতম রূপ ইসলাম নামে পরিচিত, তা আধুনিকতম হবার সুবাদে পূর্ববর্তী ধর্ম সম্প্রদায়সমূহের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। ইসলামের প্রসার ঘটেছে এসব ধর্মাদর্শের ব্যর্থতার পটভূমিতে। তাই তাদের ইসলামবিরোধী স্ফোভ, বিদ্বেষ ও মর্মবেদনার যৌথ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ইতিহাসের বহু ঘটনাতেই। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল আধুনিক বিশ্বের অন্যতম মুসলিম নব জাগরণ আন্দোলনের ফলশ্রুতি, তাই ক্রুসেডের উত্তরসূরি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্তরসূরি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক অলিখিত আঁতাতে আবদ্ধ হয় গোড়া থেকেই। উনিশশো সাতচল্লিশের

নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন মাখামাখি আদপেই ছিল দু'টি কায়মী স্বার্থের আঁতাত, শুধু দু'জন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব মাত্র নয়। এ আঁতাতের প্রথম ফলশ্রুতিতে কায়দে আজমের আশীর্বাদপুষ্ট বসু-সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাকে গান্ধী এই বলে নস্যাৎ করে দেন যে, এই পরিকল্পনা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হলে সার্বভৌম বাংলার সংস্কৃতি হিসাবে হিন্দু উপনিষদের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীর এই অন্যায় প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র বসু এক পত্রে তাঁকে লিখেন : 'যে কংগ্রেস একদা মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, তা দ্রুত একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে দেখে আমি মর্মাহত।' (In Retrospection, Abul Hashim p. 161)।

১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা যে বৃটিশ সমর্থনও লাভ করেছিল সে খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। এ বিষয়ে কমরুদ্দিন আহমদ বলেন : Jinnah, however, soon found out that the idea of partitioning Panjab and Bengal was engineered by Lord Mountbatten and it was futile to convince the leaders of Congress of Shikhs regarding the danger of partitioning the provinces. Mountbatten later on admitted his part in his address to Royal Empire Society in London on 6th October 1948." (Vide-"A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh"-Kamruddin Ahmad, 4th edition, 1975, p. 83).

এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর ভূমিকা ছিল আরও তাৎপর্যপূর্ণ। তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর এক পত্রের জবাবে ১৯৪৭ সালের মে মাসে নেহেরু তাঁকে যে চিঠি লিখেন, তাতে তিনি বলেন : 'অখণ্ড ভারতের নীতিকে আমরা জলাঞ্জলি দিয়েছি, একথা সত্য নয়। তবে আমরা কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। ভারত বিভাগ মেনে নেব আমরা একটি শর্তে যে, বাংলা ও পান্জাবকে বিভক্ত করতে হবে। কারণ একমাত্র এ পথেই অখণ্ড ভারত পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে।' ('রাজবিরোধী আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী'- জামালুদ্দিন আহমদ চৌধুরী)।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বৃটিশ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রতিফলন ঘটেছিল কুখ্যাত র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ, যার মাধ্যমে বেশ কতকগুলো মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলা অন্যায়ভাবে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। মোটের উপর পাকিস্তান যাতে আঁতুড় ঘরেই ধ্বংস হয়ে যায় তার জন্য বৃটিশ ও কংগ্রেস কারোরই কোনো চেষ্টার ক্রটি ছিল না। এই যেখানে বাস্তব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সেখানে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের যে প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও সাবধানতার পরিচয় দানের

প্রয়োজন ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তা তাঁরা দিতে পারেন নি এবং তাঁরা এ ব্যর্থতার পরিচয় দেন বলতে গেলে গোড়া থেকেই।

সর্বপ্রথম যে ক্ষেত্রে পাকিস্তানী শাসকবর্গের এই ব্যর্থতার প্রমাণ প্রকটভাবে ধরা পড়ে, তা হলো রাষ্ট্রভাষা। যে-কোনো জনগোষ্ঠীর উন্নতি ও বিকাশের জন্য মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, এ স্বাভাবিক সত্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কুরআনেও। পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলার দাবীকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানী শাসকবর্গ চাইলেন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দিতে। উর্দু ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান ঐতিহাসিক এবং ইসলামী উপাদানেও উর্দু ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সেই সুবাদে বাংলায় বহু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই ছিলেন উর্দুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধাশীলতার সুযোগ নিয়ে মুদ্রা, মানিঅর্ডার ফর্ম, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে ইংরেজির পাশাপাশি শুধু উর্দু ব্যবহারের প্রচেষ্টা হলো। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইংরেজ সচিব মি. গুডইন স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়ার সার্ভিস পরীক্ষার যে বিষয়সূচী ছিল তার মধ্যে ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দী, এমন কি সংস্কৃত ও ল্যাটিনের মত মৃত ভাষাও অন্তর্ভুক্ত হয়— কিন্তু ছিল না পাকিস্তানের মেজরিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা। বাংলার প্রতি এ ধরনের অবহেলার প্রতিবাদে সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বরেই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তখনই এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের কারসাজি বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আন্দোলন জোরদার হলে তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। আন্দোলনকারীদের মূল দাবী ছিল বাংলাকে উর্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদি ও শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে বাংলা ভাষা। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কায়েদে আজম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে একটি জনসভায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কনভোকেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উপরে বক্তৃতা দেন। পরবর্তীতে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকেও তাদের দাবীর বিরোধিতা করেন। নেতৃবৃন্দ কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে অটল থাকেন। ঢাকা ত্যাগের পর থেকে ঐ বছরের ১১ই সেপ্টেম্বরে তাঁর ইস্তেকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কায়েদে আজম আর কোন কথা বলেছেন বলে জানা যায় না। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাক্কের লিখিত ‘সাংবাদিকের রোজনামচা’ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়— কায়েদে আজম পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে নাকি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তবে কায়েদে আজম তাঁর ভুল বুঝলেও ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে পুনরায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এ সময় বুকোর

তাজ্জা রক্ত ঢেলে বাংলার তরুণ ছেলেরা ১৯৫২ সালে ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়।

ভাষা আন্দোলনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বসূরী বলে অভিহিত করা হয়। কারণ ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই পরবর্তীকালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যা ১৯৭০ সালে স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং আরও পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো রাতে টিঙ্কা শাহীর বর্বর হামলার পরিণতিতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

ভাষা আন্দোলনের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এর মাধ্যমেই লাহোর প্রস্তাবের কঠোর বাস্তবতা সকলের সামনে নতুন করে ধরা পড়ে। ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন অবস্থার প্রয়োজনে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল মিলে এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন থাকলেও লাহোর প্রস্তাবের মর্মকথা যদি স্মরণ রাখা হতো, তাহলে পরবর্তীকালের অনেক দুর্ঘটনা, অনেক রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যেমন এই বাস্তবতার কথা প্রথম বিবেচনায়ই আনা হয়নি, তেমনি হয়নি আরও অনেক প্রশ্নে।

শাসনতন্ত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টাও ছিল এমনি এক প্রশ্ন। পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালে গণপরিষদে যে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির খসড়া পেশ করেন, তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে সিদ্ধু, সীমান্ত প্রভৃতির ন্যায় মাত্র একটি প্রদেশ হিসাবে বিবেচনার চেষ্টা করা হয়, যা ছিল লাহোর প্রস্তাবের মর্মবাণীর সম্পূর্ণ বিরোধী। এর প্রতিবাদে ঢাকায় একটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে একটি অঞ্চল হিসাবে গণ্য করে ফেডারেল শাসনতান্ত্রিক মূলনীতির বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবীর ভিত্তিতে যে ঐতিহাসিক ব্যালট যুদ্ধ পরিচালিত হয়, তাতেও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। নির্বাচন-যুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়, কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কল্যাণে গণতন্ত্রের ধারা প্রতিহত হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রথমে সিভিল ব্যুরোক্র্যাসী, পরে মিলিটারী ব্যুরোক্র্যাসীর প্রভাব প্রকট হতে থাকে। এই সুবাদে প্রথমে গোলাম মোহাম্মদ, পরে ইক্কান্দার মীর্জা এবং সর্বশেষে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান দেশের সর্বময় ক্ষমতা কজা করেন। পাকিস্তান আমলে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সূচিত হয় প্রথম দশকে। দ্বিতীয় দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। এমনিতে কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকার ফলে উন্নয়নের

সুযোগ-সুবিধা প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলের জন্য উন্মুক্ত হয়, তদুপরি পশ্চিমা-অধ্যুষিত সেনাবাহিনী ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে মেজরিটির সুবাদে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের প্রভাব প্রবলতর হবার কথা, অথচ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উভয় অঞ্চলের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বদলে প্যারিটির নীতি গৃহীত হয়। আরও পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে পশ্চিমা প্রভাবিত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার ফলে অবস্থা আরও নাজুক হতে থাকে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক রংগমঞ্চ হতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধানের ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে এডভেনচারিষ্টদের উপদ্রব বেড়ে যায় বহুশুণে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা কখনও পূরণ হয়নি। ফলে আইউব খান কর্তৃক প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়া এবং ১৯৬৪ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে প্রবল গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। একই প্রশ্নে ইতিপূর্বে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে একইভাবে প্রবল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হওয়া এবং পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে একই সঙ্গে সমগ্র পাকিস্তানের বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান পাকিস্তানের তেইশ বৎসরের ইতিহাসে সেই ছিল প্রথম। যে হিসাবে সাধারণ বিচারে এর ফলাফল অবিভক্ত পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য ভাল হবারই কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ এই আন্দোলন ও আন্দোলন-পরবর্তী নির্বাচন দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি স্বতন্ত্র ও আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী নেতৃত্বের জন্ম দেয়— যার একটি পূর্বাঞ্চল, আরেকটি পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

এই দুই নেতৃত্বের মধ্যমণি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে শেষ কথা বলবার মুহূর্তে হয়ত এখনও আসেনি। কারণ তাঁদের সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের অভাবই এ ব্যাপারে বড় বাধা। শেখ সাহেব নিজে পাকিস্তান আন্দোলনে বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। তিনি পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া নিয়ে আগাগোড়া লড়েছেন, তবে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কখনও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গড়তে চান, এসব কথা প্রকাশ্যে বলেন নি। বরং ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলতেন, ছয় দফা পাকিস্তানকে জোরদার করার লক্ষ্যে প্রণীত। এমন কি সত্তরের নির্বাচনে জয়লাভের পরও একাধিক সমাবেশে তিনি তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেছেন 'জয় বাংলা' 'জয় পাকিস্তান' বলে। অথচ সেই শেখ সাহেবই বাহাঙ্গুরের দশই জানুয়ারী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে ঘোষণা করলেন যে, তিনি সাতচল্লিশ সাল

থেকেই এ দিনটির স্বপ্ন দেখছিলেন। আবার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সময়ে বলা হতো, তিনি কখনও গোপনে ভারতে যাননি এবং এ মামলা ছিল একটা মিথ্যা সাজানো মামলা। অথচ পরবর্তীকালে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে, তিনি গোপনে ভারতে গিয়েছিলেন।

এখানে কাউকে বড় বা ছোট করার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন প্রকৃত সত্য কোনটি, তা উদ্ধার করা। কারণ একই সাথে পরস্পরবিরোধী দু'টি কথা সত্য হতে পারে না। একান্তরের পঁচিশে মার্চের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কি বিষয় আলোচিত হয়, তাও এ প্রসঙ্গে প্রামাণ্যভাবে জানা দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ব্যাপারেও পরস্পরবিরোধী দাবী পাওয়া গেছে।

অনুরূপ সমস্যা ভুট্টো সম্পর্কেও। ভুট্টো পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ভুট্টো যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আইউব খানের কাঁধে সওয়ার হয়ে ধুমকেতুর মত ঝড়ের গতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এটা ঠিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি ছিলেন? পাকিস্তানের জন্য বাহ্যত তাঁর মায়াকান্নার অস্ত ছিল না। যে পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন হলে হাজার বছর ধরে ঘাস খেয়ে হলেও তিনি এটম বোমা বানাতে চেয়েছিলেন, সেই পাকিস্তান ভাঙার পেছনে তাঁর দান তো ছিল সবার চাইতেও অনেক বেশী। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন যখন তুংগে তখন তিনিও পশ্চিম পাকিস্তানে আরেক 'স্বাধিকার' আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার শ্লোগান ছিল— 'হাম মাশরেকী পাকিস্তান কি গোলামী কভু নেহি বরদাশত করুংগা।' অর্থাৎ আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দাসত্ব কখনও সহ্য করব না। পূর্ব পাকিস্তান যখন আত্মরক্ষার জন্য স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যস্ত, তখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে গোলাম করবার এমন কোন ফিকিরে ছিল যে তার বিরুদ্ধে এই অযাচিত হুংকার? এ কি তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুত্বের রায় অস্বীকার করবার পূর্ব প্রস্তুতি নয়? এই আলোকেই কি নির্বাচনোত্তর কালে এক দেশে দু'টি মেজরিটি পার্টির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তিনি দু'জন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের দাবী জানিয়েছিলেন? একান্তরের পহেলা মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান পার্লামেন্টের অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের যোগদানের বিরুদ্ধে ভুট্টোর হুঁশিয়ারী তাঁর পাকিস্তান প্রীতির প্রমাণ দেয় না। সর্বোপরি ভারতের যে বিমান লাহোর বিমান বন্দরে হাইজ্যাকের ফলে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণার সুযোগ পান, তা কি ভুট্টো ও ইন্দিরার একটি পাতানো খেলা ছিল না? কারণ উক্ত বিমান লাহোরে ছিনতাই হওয়ার পর ভুট্টো স্বয়ং বিমান বন্দরে গিয়ে ছিনতাইকারীদের বাহবা দেন এবং তাদের সাথে একান্তে কথা বলেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে উক্ত ছিনতাইকারীরা প্রকৃতপক্ষে ছিল ভারতীয় গুপ্তচর।

উনিশশো সত্তরের নির্বাচন একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিল যে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের একত্রে বসবাসের দিন শেষ হয়ে গেছে। সত্তর সালাই পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার চিত্র চূড়ান্তভাবে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। এই পশ্চাদপদতার কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে দায়ী করা যায় :

- ক. বৃটিশ আমল থেকেই কৃষি ও শিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনামূলক পশ্চাদপদতা,
- খ. পার্টিশন কাউন্সিল কর্তৃক সম্পত্তির বুক ভ্যালু-ভিত্তি মূল্য নির্ধারণের কারণে গোড়াতেই পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত হওয়া,
- গ. পশ্চিম পাকিস্তানে দুই দু'টি কেন্দ্রীয় রাজধানী নির্মাণে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিতা,
- ঘ. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার অধিকাংশের প্রধান দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান,
- ঙ. কেন্দ্রীয় অফিসাদিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাধিক্য এবং
- চ. দেশরক্ষা বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য।

দেশে গণতন্ত্র থাকলে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাধিক্যের সুবাদে সুবিচার আশা করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় পাকিস্তানের ২৪ বৎসর কার্যত বেসামরিক ও সামরিক ব্যুরোক্র্যাট শাসনাধীন ছিল। এর ফলে উভয় অঞ্চলের মধ্যকার বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বেশী। বৈষম্য থেকে বঞ্জনাবোধ, বঞ্জনাবোধ থেকে প্রতিকার ও প্রতিশোধ স্পৃহা, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে পারস্পরিক অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে হিংসাবিদ্বেষ-সংঘাত ছিল অনেকখানি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তবুও বলতে হয়, বঞ্জনাবোধ তো ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ভুট্টোর সত্তর-একাত্তরের বক্তৃতায় পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী বিষোদগারের উৎস কোথায়? এ কি কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের সংকীর্ণ তাকিদ না বিদেশী মদদপুষ্ট অন্য কিছু?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আসে অনিবার্যভাবে— পরস্পর বিদায়ের মনোভাব যদি উভয় পক্ষের মধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে আপোসে কি দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা সম্ভব হতো না? এর জন্য কি রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ একান্তই অনিবার্য হয়ে পড়েছিল? এমন যুদ্ধ কি না করলেই চলতো না, যার শেষ মীমাংসার কর্তৃত্ব যাবে এমন এক শক্তির হাতে, উপমহাদেশের বহু শতাব্দীর ইতিহাসে যার মুসলিমবিদ্বেষ সুপ্রমাণিত? আমাদের মনে পড়ে, সত্তরের শেষ দিক থেকেই মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী বারবার বলেছেন আপোসে মিলেমিশে দেশ ভাগ করে নিতে। সাতচল্লিশে দু'টি অতি পুরাতন প্রতিপক্ষ যদি আপোসে সাবেক ভারতবর্ষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পেরে থাকে, একাত্তরে কেন অনুরূপ বিভাগ সম্ভব হয়নি? এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কি প্রয়োজন পড়েছিল শুধু অনিচ্ছুক জনগণের চোখকে ফাঁকি দিতে? উনশাশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের খুব কম সংখ্যকই পাকিস্তানের বিরোধী ছিল। পঁচিশে মার্চের কালো রাতে নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বর আক্রমণের পর খুব কম লোকই পাকিস্তানের সমর্থক ছিল। উভয় অঞ্চলের জনগণের মন পরস্পরের

বিরুদ্ধে চিরতরে বিষিয়ে দেবার লক্ষ্যে এই পাতানো খেলায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কার সাথে আর কার কার যোগসাজস ছিল তা জানা প্রকৃত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্যই আজ অপরিহার্য।

নেতাদের যার মনে যা-ই থাকুক না কেন, বাংলার দামাল ছেলেরা ঘটনার আকস্মিকতায় কিন্তু এতটুকু মুষড়ে পড়েনি, যেমন কর্তব্য নির্ধারণে এতটুকু ভুল করেনি বাংলার মুক্তিকামী জনগণ। একান্তরের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ যে কোন বিচারে ছিল একটি অসম যুদ্ধ। একটি দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার প্রতিরোধের পেছনে জনগণের শক্ত মনোবল না থাকলে এ যুদ্ধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো। তা যে হয়নি তার কারণ জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে তাদের এ সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তারা এও জানত জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামে আত্মাহর মদদ অবশ্যস্বাবী। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ। যারা এ যুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে, তারা ছাড়াও প্রায় নয় কোটি মানুষ সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নানা পর্যায়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কেউ খাবার দিয়ে, কেউ আশ্রয় দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ অস্ত্র দিয়ে কেউ, পরামর্শ দিয়ে, কেউ শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে গোপন খবরাদি সরবরাহ করে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এই যুদ্ধে शामिल থাকার সন্দেহে বাংলার কত মানুষ যে পশ্চিমা বাহিনীর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছে, কত বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ধ্বংস হয়েছে, কত লোক গৃহহারা হয়ে স্বদেশে পরবাসী হয়ে বনে-জংগলে রাতের পর রাত কাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই যুদ্ধের কারণে যারা দেশ ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে, তাদেরও অনেকেই বিদেশ-বিভূঁইয়ে শান্তিতে থাকতে পারেনি। যুদ্ধের গতিধারাকে বিদেশী শক্তি বারবার নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছে, বহু মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দী ও হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে, তবুও চরম ধৈর্য সহকারে সব কষ্ট স্বীকার করে হলেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। বিদেশী জমিনে বিদেশী শক্তির মনোমত লোকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে, বৈষম্য করা হয়েছে শত শত মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে, তবুও মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া হতো, যে জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তনে চেষ্টা করে না, আত্মাহও তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। আত্মাহর এই বাণীর আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধারা নয়টি মাস ধরে লড়ে যান এক অনন্য যুদ্ধ- মুক্তি ও স্বাধীনতার অন্বেষণে জালিমের জুলুমের দাঁতভাঙা জবাব দিতে। অবশেষে একান্তরের ষোলই ডিসেম্বরে এলো তাদের ঈলিত দিন- যেদিন পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় স্বীকারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হলো স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। নয় মাসের দুঃখ-স্বপ্ন ঘেরা অমানিশার অবসানে মুক্তির আলোয় ঝলমল করে উঠল একটি জাতি।

‘ভাষা সৃষ্টির দু’টি তত্ত্ব ও ‘পিজিন-ক্রিয়োল’-ভাষা পরিচয়

ডক্টর এস.এম. লুৎফর রহমান



বর্তমান লেখক তাঁর ‘বাঙালীর লিপি-ভাষা বানান ও জাতির ব্যক্তিক্রমী ইতিহাস’ (তিন খণ্ড) এর প্রথম খণ্ডে দাবী করেছেন— ‘মুছলমানরাই বাঙ্গালা ভাষার আদি ওয়ালেদ’ বা জনক। ২০০৪ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশের পর, কেউ কেউ মৌখিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন— ‘এ একেবারে অসম্ভব। কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী একটা ভাষা সৃষ্টি করতে পারে না।’ যদিও লিখিতভাবে কেউ এ বক্তব্য তুলে ধরেননি; তথাপি সেই নীরব প্রতিবাদীদের সংশয় দূর করা জরুরী। আর সে কারণেই বর্তমান প্রবন্ধে ভাষা-সৃষ্টির নানা তত্ত্বের মধ্যে লাবোভের ও আই, এফ, হ্যানকক-এর দু’টি তত্ত্বের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। লাবোভ প্রচুর গবেষণার পর ১৯৮১-তে নতুন ভাষা-সৃষ্টিকে ‘ভাষা-বদল’ বা Language Change বলে নির্দেশ করেছেন এবং এ-বদল দু’রকমে ঘটে বলে অভিমত দিয়েছেন। অন্যদিকে, হ্যানকক ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তাঁর ব্যাপক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পিজিন-ক্রিয়োল ভাষারূপসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান নিবন্ধে এ দু’জনের গবেষণালব্ধ দু’রকমের দু’টি তত্ত্বের দ্বারা এক একটি জনকওমে কিভাবে ভাষা-বদল ঘটে বা নতুন ভাষা সৃষ্টি হয়, তা ব্যাখ্যা করা হবে। তা থেকে বাঙালা ভাষার উৎস-নির্দেশ ও বাঙালা ভাষার সৃষ্টি-বদলে আদি যুগের মুছলিম জনকওমের ভূমিকার স্বরূপ কিরূপ ছিল- তাও বোঝা যাবে।

শুধু তাই নয়। উক্ত দু’জনের গবেষণালব্ধ তত্ত্বের সাহায্যে ভারতের অপরাপর স্থানে, মোগল ও মোগল-পূর্ব আমলেও কিভাবে মুছলিমরা নতুন নতুন ভাষারূপ সৃষ্টি করে, ভারতের আদিম ভাষাগুলোর কতটা বদল ঘটিয়েছিল- তাও জানা যাবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, বিশ্বভাষার আধুনিক বিকাশধারার দিকে তাকালে এ কথা, না কবুল করা যায় না যে, ১৮ শতকের ইউরোপীয় বণিক পুঁজি ১৯ শতকের শেষভাগে শিল্প পুঁজিতে রূপান্তর ও প্রত্যক্ষভাবে উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের বিকাশের সাথে তাল রেখেই দুনিয়া জোড়া ইংরেজী-ফরাসী ও জার্মান ভাষাভিত্তিক-ভাষারাজনীতির বিকাশ ঘটে। পুঁজি ও শাসন শোষণের নানামুখী বিকাশের সাথে তাল রেখেই গড়ে তোলা হয়েছে নানামুখী তত্ত্ব ও মতবাদ। দিন যত এগিয়েছে, ততই সে-সব তত্ত্ব ও মতবাদ হ’য়েছে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর; জটিল থেকে জটিলতর। পুঁজিবাদী

সভ্যতার শ্রম-বিভাজনের সাথে সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ভাষা বিভাজনে ও তত্ত্বের পর তত্ত্ব বিস্তারনের তাই বিরাম নেই। ইতোপূর্বে উল্লিখিত ভাষা রূপ বদল তত্ত্বের বেলায়ও দেখা দিয়েছে একই দশা। ‘নতুন বোতলে পুরানো মদ’ তো আছেই, সেই সাথে যোগ করা হয়েছে- আরও অনেক কিছু; যার সাথে বাস্তবতার মিল আছে খুব অল্পই।

বর্তমান ‘বিশ্বায়নে’র আমলে, এসব কথা মনে রেখে ‘ভাষা-সৃষ্টি’ (Creation of Language) থেকে ‘ভাষা-বদল’ (Language Change) তত্ত্বের সর্ব শেষ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হিসেবে লাবোভের মতবাদের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। ‘সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞানী’ রোনাল্ড ওয়ার্ধাঘ (Ronald Wardhaugh) তাঁর ‘ভাষা-বদল’ বিষয়ক মতবাদের পরিচয় দিতে লিখেছেন-

‘Labov (1981) has pointed out how difficult it is to get the right kinds of data on which to base claims about linguistic change in progress and how easy it is to make either false claims or incorrect predictions, giving several instances of the latter from Switzerland, Paris, and Philadelphia (pp. 177-8). He stresses the importance of having good data on which to base claims. Such data can come from studies of a community conducted at different times. Since individual, such age-grading must also be taken into account because this process is an independent one. Labov insists that the best studies of change in progress look for different kinds of data sources, are very much concerned with assessing the accuracy of these sources, and are quite cautious in the claims they make. However, he adds that careful surveys of the current state of affairs also enable a good deal of the past [to] be reconstructed from the present if we look into the matter deeply enough’ (p. 196). That is, the relationship between diachronic (historical) matters and synchronic (descriptive) ones is a two-way relationship. There is what Labov calls a ‘dynamic dimension’ to synchronic structure, so that the past helps to explain the present and the present helps to explain the past.

After conducting a number of investigations of sound changes in progress, Labov (1972b, pp. 178-80) proposes a rather detailed outline of what he considers to be the basic mechanism of sound change. The mechanism has thirteen stages, and Labov points out that the first eight deal with what he calls change from below, that is, change from below conscious awareness, whereas the last five deal with change from above, that is, change brought about consciously. The thirteen stages are as follows,

1. The sound changes usually originated with a restricted subgroup of the speech community, at a time when the separate identity of this group had been weakened... The linguistic form which began to shift was often a marker of regional status with an irregular distribution within the community. At this stage, the form is an undefined linguistic variable.

2. The changes began as generalizations of the linguistic form to all members of the subgroup; we may refer to this stage as change from pattern of stylistic variation in the speech of those who use it, affecting all items in a given word class. The linguistic variable is an indicator, defined as a function of group membership.

3. Succeeding generations of speakers within the same subgroup, responding to the same social pressures, carried the linguistic variable further along the process of change, beyond the model set by their parents, we may refer to this stage as hypercorrection from below...

4. To the extent that the values of the original subgroup were adopted by other groups in the speech community, the sound change with its associated value of group membership spread to these adopting groups...

5. The limits of the spread of the sound change were the limits of the speech community...

6. As the sound change with its associated values reached the limits of its expansion, the linguistic variable became one of the norms which defined the speech community, and all members of the speech community reacted in a uniform manner to its use (without necessarily being aware of it). The variable is now a marker, and begins to show stylistic variation.

7. The movement of the linguistic variable within the linguistic system always led to readjustments in the distribution of other elements within phonological space.

8. The structural readjustments led to further sound changes which were associated with the original change. However, other subgroups which entered the speech community in the interim adopted the older sound change as a part of the community norms, and treated the newer sound change as stage 1. This recycling stage appears to be the highest source for the continual origination of new changes...

9. If the group in which the change originated was not the highest-status group in the speech community, members of the highest-status group eventually stigmatized the changed form...

10. This stigmatization initiated change from above, a sporadic and irregular correction of the changed forms towards the model of the highest status group—that is, the prestige model. This prestige model is now the pattern which speakers hear themselves using...

11. If the prestige model of the highest-status group does not correspond to a form used by the other groups in some word class, the other groups will show a second type of hypercorrection, shifting their careful speech to a form further from the changed form than the target set by the prestige group. We may call this stage hypercorrection from above.

12. Under extreme stigmatization, a form may become the over topic of social comment, and may eventually disappear. It is thus a stereotype...

13. If the change originated in the highest-status group of the community, it became a prestige model for all members of the speech community. The changed form was then adopted in more careful forms of speech by all other groups in proportion to their contact with users of the prestige model, and to a lesser extent, in casual speech.

উপরের দীর্ঘ কোটেশানের পહેলা প্যারার দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায়—ক্রমবর্ধমান ভাষাতাত্ত্বিক রদবদলের সঠিক তথ্য উপাত্ত পাওয়া কত কঠিন। এ বিষয়ে নানা রকম তথ্য উপাত্তের উৎসের যথার্থতা নির্ণয় দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও লাবোভ ভেবেছেন, ভাষাগত বর্তমান অবস্থার সযত্ন জরীপ-অতীত-অবস্থার অনেকটাই পুনর্গঠনে সহায়ক হতে পারে। বিষয়টির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করলে, ভাষা বিশেষের দু’রকম চরিত্র দেখা যায়। একটা হ’ল ডায়ক্রমিক বা ঐতিহাসিক, অপরটা সিনক্রনিক বা বর্ণনামূলক। (descriptive)। তিনি ভাষার এ দু’রকম চরিত্র ব্যাখ্যাকালে বলেছেন—এদের প্রত্যেকের রয়েছে—টু-ওয়ে সম্পর্ক; যা যে কোন ভাষার অতীত অবস্থা; বর্তমান অবস্থার—ব্যাখ্যায় সাহায্য করে; আর বর্তমান করে—অতীতকে ব্যাখ্যাদানে সহায়তা।

পরবর্তী প্যারায় ওয়ার্দ্‌ফ লিখেছেন—লাবোভ ধ্বনি-বদলের প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ঐ বদলাবদলের বেসিক কলাকৌশলের একটি বিস্তৃত খসড়া তৈরী করেছেন। এ বদল প্রক্রিয়ার আছে ১৩টি স্তর। তার প্রথম আটটি নিচের থেকে বদল আর পরের ৫টি উপর থেকে বদল। প্রথম অংশকে অসচেতন বদল; আর দ্বিতীয় অংশকে ‘সচেতনভাবে বদল’ও বলা যায়।

লাবোভ-এর ঐ তেরটি সূত্র একটি ‘বৃত্তবদ্ধ ভাষিক উপজনগোষ্ঠী- (a restricted sub-group of a speech community)’র ওপর প্রয়োগ করলে কি ঘটে এবং অতীতেই বা কি ঘটেছে বলে মনে করা চলে—এবার তা দেখা যেতে পারে।

ক. নিচের থেকে বদল (change from below)

এ স্তরে ক্রিয়াশীল লাবোভের প্রস্তাবিত আটটি সূত্রের প্রথমটি হ’ল—‘সাধারণভাবে একটি ‘বৃত্তবদ্ধ (Restricted) ভাষিক জনগোষ্ঠী (speech com-

munity)’র কোন উপগোত্রে (sub-group) ধ্বনি বদল সেই সময়-ই সূচিত হয়, যখন এ গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র-সত্ত্বা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর তা প্রায়শঃ বিবেচিত হয় একটা মর্যাদার চিহ্ন রূপে- যা ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ... এপর্যায়ে ঐ রূপটি হয়- অনির্দিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনশীল রূপ।’

২. লাবোভ দ্বিতীয় সূত্রে ব’লেছেন- ‘পরিবর্তন শুরু হয়- ঐ উপগোষ্ঠীর’ সমস্ত জনমানুষের ভাষাতাত্ত্বিক রূপের সাধারণী করণের মত। আমরা এ পর্যায়কে ব’লতে পারি ‘নিচের থেকে বদল’। অর্থাৎ সামাজিক সচেতনতার নিম্নস্তরের বদল (অসচেতন বদল)। এ ভিন্নতা, যারা এ ভাষায় কথা বলে, তাদের ভাষার- এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দের সমস্ত আইটেম আক্রান্ত ক’রে রীতিগত রূপান্তরের কোন প্যাটার্ন তৈরী করে না। (এ ক্ষেত্রে) ভাষাতাত্ত্বিক রূপবদল একটা নির্দেশক, যা ঐ গোষ্ঠী সদস্যদের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দেয়।’

৩. লাবোভের তৃতীয় সূত্রে বলা হ’য়েছে- ‘এক-ই জনগোষ্ঠীর পরবর্তী বংশধরেরা, এক-ই রকম সামাজিক চাপের কারণে, ভাষাতাত্ত্বিক রূপবদলের ঐ ধারা তাদের পিতামাতাদের তৈরী মডেল ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা এ পর্যায়কে বলতে পারি- ‘নিচের দিক থেকে অতিক্রিয় সংশোধন’ (দ্রুত সূক্ষ্ম উন্নয়ন)।

৪. চতুর্থ সূত্রে লাবোভের কথা হ’ল- ‘এ পর্যায়ে ঐ ভাষাজনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মূল উপগোষ্ঠীর মূল্যবোধ; অন্যান্য গোষ্ঠী কর্তৃক অভিযোজিত হয়। ভাষার ধ্বনিবদল ও তার সাথে যুক্ত ‘মূল্যবোধ’- অভিযোজনকারী- গোষ্ঠীসমূহের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

৫. ধ্বনিবদল ছড়িয়ে পড়ার এই সীমাই হ’ল- কোন ভাষিক জনকণ্ডমেরও নির্দিষ্ট সীমা।...

৬. যেহেতু ধ্বনিবদলের সাথে যুক্ত আবশ্যকতার (Value) সীমা পৌছায়, তার বিস্তৃতির সীমা পর্যন্ত। ফলে, ভাষাতাত্ত্বিক ভিন্নতা হ’য়ে ওঠে সেই ‘নিয়মনীতি, যা ঐ ভাষাগোষ্ঠীকে সংজ্ঞায়িত করে। এ জন্য ঐ ভাষাকণ্ডমের সবাই তার ব্যবহারে সমভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় (যদিও নিশ্চিত রূপে এর কোন কিছু না জেনেই)। তারপর এই ‘ভিন্ন ভাষারূপ’ (Variable) হ’য়ে দাঁড়ায় একটা চিহ্নরূপ (marker), যা দেখতে শুরু করে- ভাষার ভিন্নতা।

৭. (নির্দিষ্ট একটা) ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে ভাষাতাত্ত্বিক ভিন্নতার এই সম্ভাবন সর্বদাই শব্দবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদান বিতরণ ও পুনঃসংযোজনের পথ দেখায়।’

৮. লাবোভের মতে- ‘আঙ্গিকগত পুনর্যোজ্যতা মূল-পরিবর্তনের সাথে যুক্ত থেকে আরও ধ্বনিতাত্ত্বিক বদলের সূচনা করে। তারপর অন্য যে সব জনগোষ্ঠী, এই

ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তারা মধ্যবর্তীকালে, ঐ জনকণ্ডমের নিয়ম নীতির একটা অংশ রূপেই প্রাচীন এর ধনি বদলকে করে অভিযোজন। আর নতুন নতুন ধনিবদল বিবেচিত হয় প্রথম পর্যায় হিসেবে। এ পুনঃচক্রায়ণ পর্যায় অবিরামভাবে নতুন নতুন বদলের প্রাথমিক উৎস রূপে দেখা দেয়।’

এই হ’ল লাবোভের ভাষা-বদলের প্রথম স্তরের আটটি সূত্র। এবার তাঁর দ্বিতীয় স্তরের পাঁচটি সূত্রের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

খ. উপর থেকে বদল (Change from above)

৯. লাবোভের মতে— ‘ঐ ভাষা-সমাজের যে-গোষ্ঠীর মধ্যে এ পরিবর্তনের সূচনা হয়, তারা যদি ‘উচ্চতম সামাজিক মর্যাদা’র লোক না হয়; (তাহ’লে) উচ্চতম সামাজিক মর্যাদার লোকেরা অবশেষে পরিবর্তিত অবস্থার নিন্দাবাদ করে।’ (তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়)।

১০. লাবোভ ব’লতে চেয়েছেন— ‘এই প্রত্যাখ্যান (নিন্দাবাদ) উপর থেকে বদল-এর সূচনা করে। এ হ’ল একটি বিক্ষিপ্ত এবং উচ্চতম সামাজিক মর্যাদার লোকদের— আদর্শের দিকে পরিবর্তিত রূপের অসম সংশোধন; আসলে যা— তাদের প্রেক্ষিজ মডেল (সম্মানজনক আদর্শ)। তারপর সেই প্রেক্ষিজ মডেলটি হ’য়ে দাঁড়ায় একটি আদর্শ (pattern), যা ঐ ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ব’লতে শোনে।’...

১১. লাবোভের মতে— ‘যদি উচ্চতম স্ট্যাটাসগোষ্ঠীর লোকদের ঐ মর্যাদাজনক ভাষারূপ (prestige model), অপরাপর গোষ্ঠীর কয়েক রকম শব্দ ব্যবহারের ধরনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়; তখন ঐ সব গোষ্ঠী একটা দ্বিতীয় রকম অতিক্রিয় সংশোধন ফুটিয়ে তোলে। প্রেক্ষিজ-রূপের লোকেরা তখন তাদের সমস্ত লালিত ভাষা, এমন এক রূপে বদলায় যা ‘টাগেটি-সেট-এর পরিবর্তিত রূপ অপেক্ষা আরও বেশী বদলানো একটা রূপ। আমরা এ পর্যায়কে উপর মহলের ‘অতিক্রিয় সংশোধন’ ব’লতে পারি।’

১২. লাবোভ আরও ব’লেছেন— ‘চরম প্রতিরোধের (নিন্দাবাদ) মুখে, একটা ভাষারূপ (form) হয়তো সামাজিকভাবে সমালোচনার প্রকাশ্য বিষয়ে পরিণত হতে পারে, আবার তা চ’লেও যেতে পারে। এ হ’ল— একটা গৎ-বাঁধা... (ব্যাপার)।’

১৩. লাবোভের সর্বশেষ অভিমত হ’ল— ‘যদি ঐ সমাজের উচ্চতম মর্যাদাবান গোষ্ঠীতে পরিবর্তনটির সূচনা হয়, তাহ’লে তা ঐ ভাষা-সমাজের সবার জন্য হ’য়ে দাঁড়ায় একটি মর্যাদাবান ভাষাদর্শ (Prestige model)। (আর এই) পরিবর্তিত রূপটি তখন আধিক্যের সচেতন কথ্য ভাষা রূপে, অপর সকল গোষ্ঠীতে সেই অনুপাতে অভিযোজিত হয়, যে অনুপাতে ‘প্রেক্ষিজ মডেল’ ব্যবহারকারীদের সাথে তাদের সংযোগ ঘটে। সাধারণ কথাবার্তায় সে-অভিযোজন ঘটে সামান্যই।

১৯৭০-এর দশকে উইলিয়াম লাবোভ নিউইয়র্কের ব্যবসায়িক স্টোরে কাজ-
করা শ্রমিক ও ম্যাসাচুসেটস-এর পূর্ব উপকূলের একটা দ্বীপের জেলেদের উচ্চারণ
(‘র’, ও দ্বিধ্বনি-অই (ai), অউ (au)-এর) ওপর গবেষণা করে ইংরেজী ভাষার
ধ্বনি-বদলের যে দু’টি তত্ত্ব-‘নিচের থেকে বদল’ ও ‘উপর থেকে বদল’- হাজির
করেছেন; তা পরবর্তী কালে সমালোচনার মুখে পড়েছে।^২ তা সত্ত্বেও তাঁর মতবাদের
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও সারত্ব আছে। ‘ভাষাসৃষ্টি’ বা ভাষাবদলে’র ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব ও
ব্যাখ্যা ভিন্ন যুগে ও পরিবেশে যে প্রয়োগ করা চলে, তা পরে প্রমাণিত হবে।

১২ ১

এবার ভাষা-সৃষ্টি বা ভাষার মিশ্ররূপ সৃষ্টির নতুন তত্ত্ব হিসেবে ইউরো-
আমেরিকান সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ‘পিজিন’- ‘ক্রিয়োল’ ভাষারূপ নিয়ে
আলোচনা করা আবশ্যিক।

ডেভিড ক্রিষ্টাল লাবোভের তত্ত্ব আলোচনার পর পিজিন- (Pidgins) ভাষার
পরিচয় দিতে লিখেছেন-

“A pidgin is not a language which has broken downs nor is it the result of baby talk, Laziness, corruption, primitive thought processes, or mental deficiency. On the contrary, pidgins are demonstrably creative adaptations of natural languages, with a structure and rules of their own. Along with creoles they are evidence of a fundamental process of linguistic change, as languages come into contact with each other, producing new rarities whose structures and uses contract and expand. They provided the clearest evidence of language being created and shaped by society for its own ends, as people adapt to new social circumstances. This emphasis on processes of change is reflected in the terms pidginization and creolization”

তারপর ডেভিড ক্রিষ্টাল- ‘ক্রিয়োল’ ভাষার পরিচয় দিতে লিখেছেন, “A creole is a pidgin language which has become the mother tongue of a community a definition which emphasizes that pidgins and creoles are two stages in a single process of linguistic development. First within a community, increasing

numbers of people begin to use pidgin as their principal means of communication. As a consequence, their children hear it more than any other language, and gradually it takes on the status of a mother tongue for them. Within a generation or two, native language use becomes consolidated and widespread. The result is a creole or creolized language.”

মি. ক্রিস্টাল একটি ভাষার পিজিন থেকে ‘ক্রিয়ল’ রূপান্তরের বিষয় ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—“The switch from pidgin to creole involves a major expansion in the structural linguistic resources available—especially in vocabulary, grammar, and style, which now have to cope with the every day demands made upon a mother tongue by its speakers. There is also a highly significant shift in the overall patterns of language use found in the community. Pidgins are by their nature auxiliary languages learned alongside vernacular languages which are much more developed in structure and use. Creoles, by contrast, are vernaculars in their own right. When a creole language develops it is usually at the expense of other languages spoken in the area, but then it too can come under attack.”^৫

একই ভাষার আদিম অবস্থার এই ‘পিজিন’ ও ‘ক্রিয়ল’ রূপের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাব্য কারণ ও তার পরিণাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডেভিড লিখেছেন—“The main source of conflict is likely to be with the standard form of the language from which it derives, and with which it usually co-exists. The standard language has the status which comes with social prestige, education and wealth; the creole has no such status; its roots lying in a history of subservience and slavery. Inevitably creole speakers find themselves under great pressure to change their speech in the direction of the standard a process known as creolization.”^৬ এমনি ভাবে, আলোচ্য ভাষা ধারায় ক্রমান্বয়ে আরও অনেক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং সেই ভাষা রূপও বদলায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে ‘পিজিন’ ও ‘ক্রিয়ল’ ভাষা-রূপ নিয়ে এর বেশী আলোচনার দরকার নেই। কারণ ১৭ থেকে ১৯ শতক অবধি ইউরোপ আমেরিকায়, ব্রিটিশ ও

আমেরিকান ইংরেজী, পর্তুগীজ, ফরাসী ভাষার সাথে নানা এলাকার নানা ভাষার মিলন-মিশ্রণে যেসব ‘পিজিন’ ও ‘ক্রিয়োল’ ভাষা-রূপের সৃষ্টি হয়েছে- তার সংখ্যা শতাধিক। আয়ান এফ হ্যানকক (Ian F, Hancock),এর যে-তালিকা তৈরী করেছেন, তার ভিত্তিতে, নিম্নোক্ত বিবরণ লক্ষণীয় :

ক. ইংরেজী ভাষা ভিত্তিক পিজিন ক্রিয়োল

১. হাওয়ালান পিজিন: এর জন্ম ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক (English based) হলেও তাতে চীনা, জাপানী, হাওয়ালান, পর্তুগীজ এবং ফিলিপাইনী ভাষার প্রভাব আছে।’

২. পিটকারনেস ক্রিয়োল: এর জন্ম ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক। তবে তাতে তাহিতীয় ভাষার প্রভাব আছে।’

৩. আমেরিভিয়ান পিজিন: ‘ইংরেজী ভাষাভিত্তিক এ ভাষা আমেরিকায় (U.S.A) এক সময় ব্যাপকভাবে চালু ছিল ১৭ শতকের ব্যবসায়ী ও রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে।’

৪. শুন্সাহ: এও ইংরেজী-ভিত্তিক ক্রিয়োল। আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে চালু ছিল। পশ্চিম আফ্রিকান কিছু ভাষারও প্রভাব ছিল এতে।’

৫. বেলিজ ক্রিয়োল: ‘লিঙ্গুয়া-ফ্রাংকা রূপে মফঃস্বল (rural) এলাকায় প্রচলিত এবং ইংরেজী ভাষার ভিত্তিতে গঠিত।’

৬. ক্যারিবিয়ান ক্রিয়োল (Carilibeian Creole English): ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩০টি ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক ‘ক্রিয়োল’ ভাষারূপ রয়েছে। কোন কোনটির আছে নানা রকম ভিন্নতাও। এগুলোর মধ্যে জ্যামাইকান ক্রিয়োল, সব থেকে বড়। ২০ লক্ষ লোক তাতে কথা বলে। ত্রিনিদাদ-ক্রিয়োল ও টোবাগো-ক্রিয়োল এর আওতায়।

৭. শ্রানান ক্রিয়োল (Sranan Creols): ‘সুরিনাম ও তার নিকটবর্তী উপকূলীয় এলাকায় (বন্দরে) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা রূপে এই ইংরেজীভিত্তিক ভাষারূপ প্রচলিত।’

৮. ইংলিশ-বুশ-নিগ্রো ক্রিয়োল (English-Bush-Negro Creole): সুরিনাম এর বনি (Aluku), জুকা (D-juka) বা Aucan-এর ইংরেজী ভাষাভিত্তিক উপভাষা (dialect)। এর মধ্যে এক মাত্র জুকা-ক্রিয়লের লিপি-লেখন পদ্ধতি (syllabic writing system) উদ্ভাবন করতে পেরেছে।’

৯. গায়ানা ক্রিয়োল (Guyanese Creole/Creoles): ইংরেজী ভাষাভিত্তিক এ ভাষারূপ গায়ানায় চালু আছে। এর সাথে নিকটবর্তী অপরাপর ক্রিয়লেরও যোগ আছে। যেমন বারব্যাডোস ক্রিয়োল ও সিয়েরা লিয়ন ক্রিয়োল।

১০. অ্যাংলো-রোমানী ক্রিয়োল (Anglo-Romani Creole):

ইংরেজী এবং রোমানী মিশানো এ ভাষারূপ ব্যবহার করে বৃটেনের বেদেরা (Gypsy of Britain).

১১. গাম্বিয়ান-ক্রিয়ো (Aku) ক্রিয়োল (Gambian krio (Aku) ক্রিয়োল: 'ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক এ ভাষারূপ গাম্বিয়া দ্বিতীয় ভাষা রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কোথাও কোথাও প্রথম ভাষা রূপেও ব্যবহার করা হয়। ইংরেজীর প্রভাবে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।'

১২. ক্রিয়ো (krio) ক্রিয়োল : সিয়েরা লিওন-এর ফ্রীটাউন এলাকায় ইংরেজী ভিত্তিক এ ভাষারূপ প্রথম ভাষা রূপে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ভাষা রূপে এর বহুল প্রচার আছে। এর একটা প্রাচীন ধরনের ভিন্নরূপ চালু আছে লাইবেরিয়ায়।'

১৩. (আ)মেরিকো ((A) Merico) : 'লাইবেরীয় উপকূলে উপনিবেশিতদের মধ্যে ইংরেজী-ভিত্তিক এই ভাষারূপ দেখা যায়।

১৪. কুরু ইংরেজী (Kru English) পিজিন : ইংরেজী-ভিত্তিক গড়ে ওঠা এ ভাষা-রূপ লাইবেরিয়ার উপকূলবাসী কুরু কওমের জেলেরা ব্যবহার করে। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল এলাকায়ও এ ভাষা বলতে দেখা যায়।

১৫. পশ্চিম আফ্রিকান পিজিন ইংরেজী (West African Pidgin English) ইংরেজী ভিত্তিক পিজিন ভাষারূপ সারা পশ্চিম আফ্রিকার সবখানে দেখা যায়। যেমন ঘানা, টোগো, নাইজেরিয়া, ফার্নান্দো, মেরিকো, ক্যামেরুন ইত্যাদি। এসব জায়গায় এর ক্রিয়োল রূপও চালু আছে। এগুলোকে বলা হয়েছে- A mutu-ally intelligible chain of English-based pidgin”

১৬. ক্যামেরুন পিজিন ইংলিশ (Cameroon pidgin English): এ হল- একটা ইংরেজী-ভিত্তিক পিজিন কোন কোন মফঃস্বল (urban) এলাকায় এর ক্রিয়োল রূপও দেখা যায়, ক্যামেরুন-এর দ্বিতীয় ভাষা রূপে এর ব্যবহার লক্ষণীয়। ২০ লাখ লোকে কথা বলে। পূর্ব নাইজেরিয়া ও ফার্নান্দোতে এ ভাষা সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ব্যবহৃত হয়।'

১৭. সেন্ট হেলেনা ক্রিয়োল (St Helena Creole): 'সেন্ট হেলেনা-দ্বীপের আধিবাসীদের ইংরেজী-ভিত্তিক ভাষারূপ। কেউ কেউ একে পিজিনও বলেন।'

১৮. মাদ্রাজ পিজিন (Madras Pidgin) : এটি 'ইংরেজী-ভিত্তিক পিজিন। দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রচুর প্রভাব দেখা যায়। বৃটিশ শাসন-আমলে এ-ভাষারূপের জন্ম। এখনও কোন কোন মফঃস্বল এলাকায় চালু আছে।

১৯. চীনা উপকূলীয় পিজিন (China Coast Pidgin) : এটিও একটা ইংরেজী-ভিত্তিক ভাষারূপ। হংকং এবং চীনের উপকূলীয় এলাকায় এক সময় এ ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। এখন প্রায় লোপ পেয়েছে।

২০. বাম্বু-ইংরেজী পিজিন (Bamboo-English) : একটি ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক পিজিন। কোরীয় যুদ্ধের সময় কোরিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল। এখন প্রায় নেই বললে চলে।’

২১. জাপানী-পিজিন (Japanese Pidgin) : এটাও ইংরেজীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি ভাষারূপ। ১৯ শতকের জাপানের বন্দরগুলোয় শোনা যেত। ১৯৪০-এর দশকে আমেরিকার দখলে থাকা এলাকাগুলোতেও এ ভাষারূপ দেখা যেত। এখন আর নেই।’

২২. ভিয়েতনাম পিজিন (Vietnam Pidgin) : ‘ইংরেজী-ভিত্তিক এ ভাষারূপ স্থানীয় অধিবাসীর সঙ্গে আমেরিকান কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠে। এখন নেই।’

২৩. টোক পিসিন (Tok Pisin) বা নয়া মেলানেশীয় (Neo-Melanesian): একটি ইংরেজী-ভিত্তিক পিজিন; স্থানীয় পাপুয়ানভাষা-প্রভাবিত। পাপুয়া নিউগিনিতে প্রায় ১০ লাখ লোক এ-ভাষায় কথা বলে। কোন কোন এলাকায় এ-ভাষার ক্রিয়োল-রূপও দেখা যায়।’

২৪. সলোমন দ্বীপীয় পিজিন (Solomon Islands Pidgin): ‘ইংরেজী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ভাষারূপ সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও তার আশপাশ এলাকায় কথিত হয়। কোন কোন স্থানে এর ক্রিয়োল রূপেরও দেখা মেলে।’

২৫. বিছলামা (Bislama-Beach-la-Mar) পিজিন: একটা ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক ভাষারূপ। এতে স্থানীয় ভাষার ব্যাপক প্রভাব আছে। ফিজির ভানুটু-র লোকেরা বলে। এর চারপাশের এলাকার-এ একটা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা।’

২৬. ব্যাগোট ক্রিয়োল ইংরেজী (Bagot Creole English) : ‘একটি ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক পিজিন। অস্ট্রেলীয় পিজিন থেকে পয়দা। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডার্কইন জলাধার-এর নিকটস্থ ব্যাগোট আদিবাসীরা এ-ভাষায় কথা বলে।’

২৭. অস্ট্রেলীয় পিজিন (Australian Pidgin) : ‘একটি ইংরেজি ভাষা-ভিত্তিক পিজিন। এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—...which may have developed out of Neo-Melanesian, it is possible that the influence was in the other direction, with New Guinea plantation workers carrying the pidgin back home.

২৮. নরফোকী ক্রিয়োল (Norfolkese Creole): ‘একটি ইংরেজী ভাষা-ভিত্তিক ক্রিয়োল। পিটকারনিজ (Pitcairnese) থেকে পয়দা। ১৯ শতকে পিটকারনী দ্বীপ থেকে নরফোক দ্বীপে গিয়ে বসবাসকারীরা এ ভাষায় কথা বলত।

২৯. মাওরি পিজিন (Maori Pigine) : এও ‘একটি ইংরেজী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পিজিন। নিউজিল্যান্ডে উপনিবেশ তৈরীর গোড়ার দিকে এ-ভাষারূপ ফুটে ওঠে। এখন আর এতে কেউ কথা বলে না।

উপরে ইংরেজী ভাষার ভিত্তিতে (English-based) গড়ে ওঠা ছোট-বড়, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ৬৮টি পিজিন ক্রিয়োল ভাষারূপের মোখতছর নাম-ধাম তুলে ধরা হলো।

এবার ফরাসী ভাষার ভিত্তিতে (French-based) গঠিত কতিপয় পিজিন-ক্রিয়োল ভাষার নাম-পরিচয় তুলে ধরা হবে।

খ. ফরাসী ভাষা-ভিত্তিক পিজিন ক্রিয়োল:

১. লুইজিয়ানা ক্রিয়োল (Louisiana Creole French): একটি ফরাসী-ভাষা ভিত্তিক ক্রিয়োল। এখনও পূর্ব লুইজিয়ানায় বলতে শোনা যায়। কিন্তু ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে।’

২. হাইতিয়ান ফরাসী ক্রিয়োল (Haitian-French Creole) : ‘হাইতিতে প্রচলিত ক্রিয়োল। ফরাসী-ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ভাষার তিনটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ (Varieties) আছে। প্রায় ৪০ লাখ লোক তাতে কথা বলে।’

৩. অ্যান্টিলিজ ক্রিয়োল (Antillean Creole): ‘ফরাসী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ-ভাষারূপ ব্যবহার করে গ্রেনাদা (Grenada), গুয়াডালুপ (Guadeloupe), ডোমিনিকা (Dominica) মার্টিনিক (Martinique) সেন্টে লুসিয়া (Saint Lucia) ত্রিনিদাদ (Trinidad) ও টোবাগো (Tobago) দ্বীপগুলোর অধিবাসীরা।’ তার মানে, এই ক্রিয়োলের সাতটা আলাদা আলাদা ভাষারূপ আছে।

৪. ফরাসী-গায়েনা ক্রিয়োল (French Guyana Creole): ‘ফরাসী-ভাষার ভিত্তিতে সৃষ্ট এ-ভাষারূপের ওপর কিছু পর্তুগীজ প্রভাবও আছে। ক্রিয়োলটি গায়েনা ও তার উপকূলীয় এলাকার ৫০ হাজার লোকে ব্যবহার করে।’

৫. ফ্রান্সো-স্প্যানিশ পিজিন (Franco-Spanish Pidgin): ‘বুয়েনোস এয়ারিস’ (Buenos Aires) এর কিছু কিছু লোক এ-ভাষারূপ ব্যবহার করে। কেউ কেউ এ ভাষার নাম ‘ফ্রাগনোল’ (Fragnol) বলে থাকেন।’

৬. উত্তর আফ্রিকান ফরাসী পিজিন (North African Pidgin French) : এটিও ‘একটি ফরাসী ভাষা-ভিত্তিক পিজিন ভাষারূপ। ভাষারূপটি ‘পেটিট মাউরেস্ক (Petit Mauresque) নামে পরিচিত।’

৭. পেটিট নাগ্রি (Petit Negre) পিজিন : ‘ফরাসী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ভাষা রূপটি প্রধানতঃ আইভরি কোস্ট (Ivory Coast)-এর সৈনিকরা ব্যবহার করে। ফরাসী দখলদাররা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল এলাকায়ও এ ভাষা ব্যবহার করত।’

৮. সাঙ্গো (Sango) পিজিন: মধ্য আফ্রিকান রিপাবলিক (Central African Republic), এবং ক্যামেরুন (Cameroon) ও চাদ (Chad)-এর কোন কোন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে এ ভাষারূপ চালু আছে। এ হ'ল 'নগবন্দি' (Ngbandi) ভাষার একটি ভিন্ন রূপ। এতে ফরাসী শব্দাবলীর প্রভাব বেশী।'

৯. রিইউনিয়ন নাইস (Reunion nais) ক্রিয়োল: 'ফরাসী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ভাষারূপ, রিইউনিয়ন-এর ২ লাখেরও বেশী লোক ব্যবহার করে।'

১০. মরিশীয়ান - ফরাসী ক্রিয়োল (Mauritian- French Creole): মরিশাস-এর প্রায় সবাই এ ভাষায় কথা বলে। এ ছাড়া, মাদাগাস্কার ও কমোরস (Comoros) দ্বীপ পুঞ্জের কিছু কিছু লোকও এ ভাষারূপ ব্যবহার করে। এখন এর ওপর ইংরেজী ভাষার প্রভাব বাড়ছে।'

১১. রড্রিগস ক্রিয়োল (Rodrigus Creole): 'ফরাসী ভাষা-ভিত্তিক এই 'ক্রিয়োল ভাষারূপ মরিশাস-এর নিকটস্থ রড্রিগস দ্বীপের লোকেরা ব্যবহার করে। তারা সংখ্যায় প্রায় সতের হাজার।'

১২. সাইকেলোয়িস (Seychellois) ক্রিয়োল: 'ফরাসী ভাষা-ভিত্তিক এ-ক্রিয়োল সাইকেলোয়িস ও অপরাপর কয়েকটি (সন্নিহিত) দ্বীপের লোকেরা ব্যবহার করে। তারা সংখ্যায় প্রায় ৪০ হাজার।'

১৩. তাই বয় (Tai Boy) পিজিন: 'একটি ফরাসী-ভাষা ভিত্তিক পিজিন। ফরাসী দখলদারিত্বের সময় গড়ে ওঠা এ ভাষা ভিয়েতনামে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এখন নেই বললেও চলে।'

১৪. নিউ ক্যালিডোনিয়া পিজিন (New Caledonia Pidgin) 'প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিউ ক্যালিডোনিয়ার লোকেরা ফরাসী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ভাষায় কথা বলে।'

১৫. ফ্রাংকো আমেরিভিয়ান (Franco Amerindian) পিজিন: 'মন্ট্রিল (Montreal)-এর আশেপাশে বসবাসকারী ফরাসীরা ১৭শতকে এ ভাষার জন্ম দেয়।' এখন আছে কি না, তা বলা হয়নি।

উপরে ফরাসী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচিত ২৩টি পিজিন-ক্রিয়োল ভাষার ঠাই-ঠিকানার উল্লেখ করা হ'ল।

এবার স্পেনিশ ভাষার ভিত্তিতে পয়দা কতিপয় পিজিন-ক্রিয়োল ভাষারূপের পরিচয় দেয়া হবে।

গ. স্প্যানিশ-ভাষাভিত্তিক পিজিন ক্রিয়োল:

১. নাহুয়াতি-স্প্যানিশ ক্রিয়োল (Nahuati Spanish Creole): এই

স্প্যানিশ ভাষাভিত্তিক ক্রিয়োল ভাষারূপ ষোল শতকে নিকারাগুয়ায় প্রচলিত হয়। এখন বোধ হয় নেই।’

২. পাপলামেন্টু ক্রিয়োল (Paplamentu/Paplamento): ‘এ একটি স্প্যানিশ ক্রিয়োল। তবে ডাচ শব্দাবলী-প্রভাবিত একটি পর্তুগীজ পিজিন থেকে পয়দা। কুরাকো (Curacao), বোনায়ের (Bonaire), অরুবা (Aruba) কণ্ডমের লোকেরা এ ভাষায় কথা বলে। তাদের সংখ্যা প্রায় দু’লাখ।’

৩. পিজিন স্প্যানিশ (Pidgin Spanish): ‘পশ্চিম ভেনিজুয়েলার দু’টি ইন্ডিয়ান’ (আমেরিকান?) জনকণ্ড এই স্প্যানিশ ভাষা-ভিত্তিক ব্যবসায়ী ভাষা (trading language) ব্যবহার করে।’

৪. স্প্যানিশ ক্রিয়োল (Spanish Creole): উত্তর কলম্বিয়া (North Colombia)’র ‘ইন্ডিয়ান’র এ-ভাষার বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন রূপে (Varities) কথা বলে।’

৫. ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ক্রিয়োলস (Trinidad and Tobago Creole): ‘ইংরেজী ও স্প্যানিশ-এই দু’ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ-ক্রিয়োল ঐ সব দ্বীপের অধিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে। হিন্দী (উরদু)র মত বিদেশী ভাষার প্রভাবও এ সব ভাষারূপে দেখা যায়।’

৬. ইংলিস দ্য এক্কেরিলা প্যাটোইস (Engois de Escolerilla): ভূমধ্যসাগরীয় মালাগা (Malaga), লা-লিনি (La Lines) বন্দরের কিছু কিছু এলাকায় এই স্প্যানিশ-ইংরেজী মেশানো পিজিন ভাষারূপ ব্যবহার করা হয়।’

৭. ক্যাভিটেনো ও আরমিটানো (Caviteneno and Ermitano): ‘ফিলিপাইনের ম্যানিলা দ্বীপের চারপাশে এই স্পেনীয় ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ক্রিয়োল চালু রয়েছে।’

৮. বাম্বু স্প্যানিশ (Bamboo Spanish): ‘পহেলা জাপানী ও পরে চীনারা ফিলিপাইনের দাবাও এলাকায় এই স্প্যানিশ ভাষাভিত্তিক পিজিন ব্যবহার করে।’

এভাবে, স্পেনীয় ভাষাভিত্তিক পিজিন, ক্রিয়োল লোকভাষার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দশ-বারোটা নজীরের উল্লেখ করা হ’ল। অতঃপর পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অপরাপর কতিপয় পিজিন-ক্রিয়োলের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

ঘ. পর্তুগীজ ভাষাভিত্তিক-ক্রিয়োল:

১. নিকারি কারু পিজিন (Nikari karu Pidgin): ‘ব্রাজিলীয় সীমান্তের নিকটে গ্যুয়ানা (Gyuyana)’র লোকেরা পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে পয়দা এ ভাষায় কথা বলে।’

২. পর্তুগীজ বৃশ নিগ্রো (Portuguese Bush Negro) ক্রিয়োল: পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত এ ‘ডায়ালেট’ বা উপভাষা সুরিনাম (Suriname) এ চালু আছে। এ ভাষার ওপর ইংরেজী এবং আফ্রিকান-ভাষার প্রভাব দেখা যায়।

৩. ব্রাজিলীয়ান-পর্তুগীজ ক্রিয়োল (Brasilian Creole Portuguese): আফ্রিকানদের উত্তর পুরুষ মফঃস্বল এলাকায় বসবাসকারী ব্রাজিলীয়ানরা এ ভাষায় কথা বলে। এর একটা ইতালীয়-নিগ্রো (Italian-Negro) আলাদা রূপ- (Variety) এর নাম-ফাজান্দিরো (Fazandeiro) চালু ‘আছে সাওপাউলো- (Saopaulo)-তে।’

৪. কেপভার্ডি ক্রিয়োল (Cape Verde Creole): এটি একটি পর্তুগীজ ভাষা-ভিত্তিক ক্রিয়োল। কেপভার্ডি দ্বীপের দু’টি প্রধান উপভাষায় বিভক্ত লোকেরা ব্যবহার করে। ১৯ শতকে যে-সব অভিবাসী ম্যাসাচুসেটস (Massachusetts) ও ক্যালিফোর্নিয়া (California) থেকে এসেছে – এ ভাষা তাদের।’

৫. ক্রিয়োল (Kryol): ‘ক্রিয়োল’ নামের এই ভাষারূপটি পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে পয়দা। সেনেগালে কথিত হয়! লোক-সংখ্যা ৫৭ হাজার।’

৬. ক্রিয়োলো (Crioulo): গিনি (Guinea)-তে চালু এই ‘ক্রিয়োলো’ নামক ভাষাটি গিনিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা।’

৭. গিনি উপসাগরীয় পর্তুগীজ-ক্রিয়োল (Gulf of Guinea Portuguese): ‘আনোবন (Annobon) সাওতোম (Sao Tome) এবং প্রিন্সিপ (Principe) দ্বীপে চালু এক শুদ্ধ ক্রিয়োল।’ এগুলো পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে পয়দা।

৮. শ্রীলংকা পর্তুগীজ (Sri Lanka Portuguese) ক্রিয়োল: একসময় ইন্দো-পর্তুগীজ খৃষ্টান অভিবাসীরা শ্রীলংকায় এ ভাষা সৃষ্টি করে। এটি পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত ক্রিয়োল। শ্রীলংকার একাংশে এ-ভাষা আজও চালু আছে।’

৯. গোয়ানিজ (Goanese) ক্রিয়োল: ‘এটিও পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা একটি ক্রিয়োল ভাষারূপ। গোয়ায়-চালু ছিল। এখন হয়তো নেই।’

১০. ভারতীয়-পর্তুগীজ (Indian Portuguese) ক্রিয়োল: ভারতীয় উপকূল বরাবর পর্তুগীজ ভাষাভিত্তিক নানা ভিন্ন ভিন্ন রকম পিজিন ক্রিয়োল এখনকার লোকেরা ব্যবহার করতো। এ ভাষারূপগুলো বন্দর এলাকায়ও চালু ছিল। এখন বেশীর ভাগ-ই লোপ পেয়েছে।’

১১. মাকিস্তা (Makista-Macauenho) ক্রিয়োল: এ ‘পর্তুগীজ ভাষাভিত্তিক তৈরী ভাষারূপ ম্যাকাও-(Macau)-এ বিশেষভাবে প্রচলিত। এ ভাষার ওপর চীনা শব্দাবলীর প্রভাব বেশী।’

১২. মালাক্কা-পর্তুগীজ (Malacca Portuguese) ক্রিয়োল: ‘পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে তৈরী এ ভাষারূপে পশ্চিম মালয়েশিয়া (Malaysia)’র প্রায় তিন লাখ লোকে কথা বলে।’

১৩. সিঙ্গাপুর পর্তুগীজ (Singapore Portuguese) ক্রিয়োল: এ ‘ভাষারূপটিও পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। সিঙ্গাপুরের নানা এলাকায় প্রচলিত। এ ভাষার ওপর মালয় ও ইংরেজী ভাষার প্রভাব আছে।’

১৪. জাকার্তা-পর্তুগীজ (Jakarta Portuguese) ক্রিয়োল: ‘পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত আগে জাকার্তা ও তার আশপাশ এলাকায় চালু ছিল। এখন বোধ হয় নেই।’

যাহোক, উপরে পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত নানা কিছিমের মোট ১৪টি ক্রিয়োল ভাষারূপের ‘নাম-ঠিকানা দেওয়া হ’ল।

এবার আফ্রিকান ভাষার ভিত্তিতে গঠিত কতিপয় পিজিন-ক্রিয়ল ভাষারূপের কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা হবে।

৬. আফ্রিকান ভাষা-ভিত্তিক পিজিন ক্রিয়োল:

১. এওন্ডো পপুলার (Ewondo Populaire) পিজিন: ব্যবসায়ীদের ভাষারূপে আফ্রিকান-ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। এ ভাষায় কথা বলে, ক্যামেরুনের যাউন্ডো (Jaounde) এলাকার লোকেরা।’

২. বারিকান্সি পিজিন (Barikanci Pidgin): হাউসা (Hausa) ভাষার ভিত্তিতে গঠিত এ পিজিন ভাষাটি লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা রূপে উত্তর নাইজেরিয়ার সামরিক বাহিনীতে চালু আছে। পিজিনীয় হাউসা-(Pidginized Hausa) ভাষা উত্তর ক্যামেরুন এবং মক্কাযী মরুভূমির পথপাশেও বলতে শোনা যায়।’

৩. কঙ্গো পিজিন (Congo Pidgin) : ‘কঙ্গোর নানা এলাকায় লোকাল আফ্রিকান ভাষার অনেক পিজিনীয় রূপ (Pidginized varieties), দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কিতুবা (Kituba) লিঙ্গলা (Lingola) লিঙ্গলায় চালু পিজিন-এর নাম-নাগালা (Ngala)। দ্বিতীয় ভাষারূপে ‘কিতুবায় কথা বলে প্রায় দু’লাখ লোক।’

৪. আছমারা পিজিন ইটালিয়ান (Asmara Pidgin Italian): ইতালীয় ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ ভাষারূপ এখনও ইথিওপিয়ার ইরিত্রিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়।’

৫. সোহাইলি পিজিন (Swahili Pidgin) : ‘সোহাইলি ভাষার নানা কিছিমের পিজিনীয় রূপ পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় চালু আছে। ‘যেমন

কিসেটিয়া (Kisettia) ও কেনিয়ার ইডকো-পীফ ও আফ্রিকানদের মধ্যে এ ভাষার চল আছে। কোন কোন এলাকায় এর ক্রিয়োলীয় রূপও দেখা যায়।

৬. আফ্রিকানস পিজিন (Afrikaans Pidgin) : ‘এ ভাষারূপে কথা বলে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামাল্যান্ড (Namaland) এলাকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ও আফ্রিকানরা (Afrikaners)। ভাষা-রূপটি কোন কোন এলাকায় ক্রিয়োলীয় রূপও লাভ করেছে।’

৭. কেপ ডাচ (Cape Dutch-Taal Dutch): এটি ‘আফ্রিকানস (Afrikaans) ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা আলাদা রূপ (Varieties)। দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তরীপ-এ চালু আছে।’

৮. ফানাগালো (Fanagalo) পিজিন: জুলু ভাষার ওপর ইংরেজী ভাষার আধিপত্যে গড়ে ওঠা এ পিজিন জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া ও জোহান্সবার্গের আমাপামা এলাকার প্রধানত: খনি মজুরদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। এর অন্যান্য নামও আছে। যেমন- ‘মাইন (খনি) কাফির: ‘কিচেন-কাফির’ ইত্যাদি।’

৯. জাম্বিয়া পিজিনস, (Zambia Pidgins) : ‘কতিপয় আফ্রিকান ভাষার ভিত্তিতে তৈরী এ-ভাষারূপ-বেম্বা শাহর (Town Bemba) এর মত জাম্বীয় তামা-এলাকায় (Zambian Copper belt)’র লোকজন ব্যবহার করে।

১০. বারাকুন (Barracoon) পিজিন: ‘১৯ শতকে প্রচলিত এ ভাষা মোজাম্বিক (Mozambique) এর বন্দর এলাকায় শোনা যায়। বারাকুন-এর ওপর আরবী সোহাইলী, পর্তুগীজ এবং মালাগীছি ভাষার প্রভাব দেখা যায়। এ সব ভাষার নানা উপাদান আলোচ্য ভাষা রূপে খচিত।’

১১. হিরি মতু (Hiri Motu) পিজিন: আগে ‘পুলিশ মতু’ (Police Motu) নামে পরিচিত, এ হ’ল ‘মতু’ ভাষার একটি পিজিনীয় ভিন্ন রূপ। এর ওপর ইংরেজী শব্দরাজির প্রচুর প্রভাব রয়েছে। একশ বছরেরও বেশী এই ব্যবসায়ী ভাষা-(Trade Language) রূপটি ব্যাপকভাবে পাপুয়া নিউগিনি (Papua New Guinea)’র মোর্সাবি বন্দরে (Port Moresby) চালু আছে।’

উপরে আফ্রিকান ভাষার ওপর অন্যান্য ভাষার মিশেলে গড়ে ওঠা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্ণিত তের-চোদ্দটি পিজিন-ক্রিয়লের নাম-ঠিকানা পেশ করা হ’ল।

এবার এশিয়ার কয়েকটি ভাষার ভিত্তিতে আধুনিক কালে পয়দা কতিপয় পিজিন-ক্রিয়লের নাম-ধাম তুলে ধরা হবে।

৮. এশীয় ভাষা ভিত্তিক পিজিন-ক্রিয়োল

১. টাকরুর (Takrur) পিজিন: ‘আরবী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এ

ভাষারূপটি লেক চাদ-(Lake Chad) এর পূর্ব পার্শ্বস্থ এলাকায় লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা রূপে ব্যাপকভাবে কথিত হয়। উত্তর-মধ্য আফ্রিকা (Lake Chad)-য়ও এর চল আছে।’

২. জুবা আরবী (Juba Arabic) পিজিন: এ হ’ল ‘একটি আরবী-ভাষাভিত্তিক পিজিন। ১৮ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ সুদানে এর জন্ম।’

৩. গলগইল্যা (Galgailya) পিজিন: এটিও ‘আরবী ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উত্তর পূর্ব নাইজেরিয়ার কালামালি (Kalamaoli) জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত পিজিন ভাষা।’

৪. বাজার-হিন্দুস্তানী (Bazar Hindustani) পিজিন: ‘হিন্দী (তথা উর্দু) ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ-ভাষারূপ উত্তর ভারতের মফঃস্বল এলাকায় ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা’ রূপে কথিত হয়।’

৫. বাজার মালয় (Bazar Malay) পিজিন: মান সম্পন্ন মালয়-ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ হ’ল একটা পিজিনীয় রূপ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপকভাবে চলে। ‘বাবা মালয়’-এলাকায় চীনা ভাষা প্রভাবিত এর একটা আলাদা রূপের প্রচলন আছে।’

উপরে কয়েকটি এশীয় ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্ণিত আট-দশটি পিজিন-ক্রিয়ালের ঠিক-ঠিকানা হাজির করা হ’ল।

এবার বিবিধ; শিরোনামে পৃথিবীর অপরাপর স্থানে গড়ে ওঠা আরও কিছু পিজিন-ক্রিয়াল ও তাদের উৎপাদনকারী ভাষার নাম-পরিচয় তুলে ধরা হবে।

ছ. আরও কিছু পিজিন-ক্রিয়ালের নাম-পরিচয়

১. চিনুক জারগন (Chinook): এ ভাষারূপটি ইংরেজী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত চিনুক ভাষার ভিত্তিতে গঠিত। ফরাসী, নুটকা (Nootka), স্যালিমানি (Salishan) উপভাষার প্রভাব ও এর ওপর আছে। ১৯ শতকের শেষেও প্রায় এক লাখ লোক এ-ভাষায় কথা বলত। এখন প্রায় লোপ পেয়েছে।’

২. পিজিন এক্সিমো (Pidgin Eskimo): এক্সিমো ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক গোছা পিজিন। শ্বেতাঙ্গদের সাথে ব্যবসায়ে এবং আথাবাস্কান-(Athabaskan) দের সাথে মেলামেশায় এ-ভাষায় কথা বলা হয়।’

৩. প্যাচুকো (Pachuco-Pochismo) পিজিন: আরিজোনা ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু এলাকায় স্প্যানিশ-ইংলিশ ভাষার মিশেলে এ-ভাষারূপের জন্ম। ব্যবহার সীমিত।’

৪. ট্রেডার নাভাহো (Trader Navaho) পিজিন: নাভাহো ভাষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এ ভাষারূপ ইন্ডিয়ানদের সাথে কথা বলতে ব্যবসায়ী-(শ্বেতাঙ্গ?)রা ব্যবহার করে। কিন্তু বিপরীত ক্রমে নয়।’

৫. নিউ জার্সি আমেরিভিয়ান (New Jersey Amerindian): এক সময় ইংরেজ এবং ডাচ বনিকদের মধ্যে ব্যালাপে এ ভাষা ব্যবহার করা হত। এতে ইংরেজী ব্যাকরণের প্রভাব থাকলেও অ্যালগনকুইয়ান (Algonquian) ভাষার শব্দাবলী-ই বেশী।’

৬. মগিলিয়ান (Mogilian) পিজিন: চোকতাও (Choctaw) ভাষার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এ ভাষারূপ মিসিসিপি নদী ও উপসাগরীয় উপকূলে বসবাসকারী অনেক ‘ইন্ডিয়ান’ উপজাতি ব্যবহার করত।’ এখন বোধ হয় নেই।’

৭. মস্কিটো উপকূলীয় ক্রিয়োল (Meskito Coast Creole): ‘কতিপয় ক্যারিবীয় ক্রিয়োল উপভাষার (dialects) পিজিনীয়রূপ। নিকারাগুয়ার মস্কিটো উপকূলে-এ ভাষারূপে কথা বলা হয়।’

৮. ভার্জিন দ্বীপ ডাচ ক্রিয়োল (Virgin Islands Dutch Creole): ১৯ শতকে ঐ দ্বীপগুলোয় ব্যাপকভাবে এ ভাষা চালু ছিল খৃষ্টান মিশনারীরা ১৮১৮ সালে এ ভাষায় বাইবেল তরজমা করে।’

৯. গায়ানা-ডাচ পিজিন (Guyana Dutch Pidgin): ‘গায়ানার আবাস্তরীণ নদী বন্দরে এ ভাষা চালু থাকার খবর পাওয়া গেছে। দক্ষিণ গায়ানায় এর একটা ক্রিয়োলীয় রূপ এখনও লোকেরা ব্যবহার করে।’

১০. লিংগোয়া-জেরাল পিজিন (Lingoa Geral Pidgin): এটি তুপি-গুয়ারানী (Tupi-Guarani) ভাষা-ভিত্তিক পিজিন। ব্রাজিলে চালু ছিল। এখন পর্তুগীজ ভাষা তাকে সরিয়ে দিচ্ছে।’

১১. রাসেনর্ক (Russenorsk) পিজিন: রাশিয়ান ও নরোয়েজিয়ান ভাষার মিশেলে উৎপন্ন এটি যোগাযোগের ভাষা (Contact Language) এখন প্রায় লোপ পেয়েছে।’

১২. শেলড্রু (Sheldru-Sheltr) ক্রিয়োল: এ হ’ল ‘একটা অ্যাংলো-আইরিশ ক্রিয়োল। প্রধানত: ইংলন্ডের আইরিশ ভ্রমণকারীরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা এ ভাষায় কথা বলত।

১৩. সাবির (Sabir) পিজিন: ‘প্রভেন্সাল (Provençal) ভাষার একটা পিজিনীয় রূপ। অনেক ভূমধ্য সাগরীয় বন্দরে কথিত হয়। ক্রুসেডের সময় মধ্য প্রাচ্যে এ ভাষা চালু ছিল। ঐ এলাকার নানা ভাষার প্রভাব সে-ভাষায় পড়েছিল। এখন আর নেই।’

১৪. টার্নাটেনো (Ternateno) পিজিন (?): ‘এক সময় এ ভাষা টার্নেট (Ternate) এ স্প্যানিশ-মেক্সিকান সৈনিক ও পর্তুগীজভাষী লোকাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে চালু ছিল। উপরে নানা স্থানের ১৫-১৬টি পিজিন-ক্রিয়োল ভাষার নাম-ঠিকানা দেওয়া হল।

বলা দরকার যে, ইতোপূর্বে সাতটি বিভাগে নানা ভাষার যে পিজিন ও ক্রিয়োল রূপের অসংখ্য পরিচয় ও নাম, নিশানার উল্লেখ করা হল- তাই সব নয়। নানা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এরকম আরও পিজিন-ক্রিয়োলের নমুনা দুনিয়ার আরও অনেক এলাকায় পাওয়া যায়- যা আয়ান এফ হ্যানকক-এর তালিকায় আসেনি। হ্যানকক ভারতীয় উপমহাদেশ ও মায়ানমার-এর বিশাল উপকূলীয় এলাকা ও শহর-বন্দরে ১৮-১৯ শতকে উরদু-হিন্দীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পিজিন, ‘ক্রিয়োলের খুব অল্পই উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে কোলকাতায় পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে বাঙালা-ইংরেজী নানা ভাষার মিশেলে যে ‘ফিরঙ্গী পিজিন’ সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ করেননি। তিনি ঐ আমলে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বন্দর এলাকায় নানা ভাষার মিশেলে গড়ে ওঠা পিজিন, ক্রিয়োল-ডায়ালেক্টেরও কথা বলেননি। ইছলাম-উস্তর সোমালিয়ায়- আরবী ভাষার ভিত্তিতে গঠিত ‘সোমালী-ভাষাটাই যে, পিজিন-ক্রিয়োল পর্যায় অতিক্রমকারী একটি ভাষা (Language) তাও না-বলা থেকে গেছে।

বাঙালা দেশ ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলে সতের-আঠারো ও উনিশ শতকে তৈরী এরকম আরও কিছু পিজিন-ক্রিয়োল-ভাষার পরিচয় দেওয়া হল:

১. ফিরঙ্গী পিজিন-কলকাতা

অনেকেই জানেন, কোলকাতায় ‘ফিরঙ্গী মহল’ বলে একটা এলাকা ব্রিটিশ আমলে গড়ে ওঠে। এ-এলাকায় পর্তুগীজ বনিক এবং মিশনারীদের সাথে বিভিন্ন ইউরোপীয় স্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ বাস করত। তারা পর্তুগীজ ভাষার ভিত্তিতে বাংলা ও পর্তুগীজ শব্দ ও উপকরণ মিলিয়ে একটি সংকর ভাষা-রূপ পয়দা করে। সে ভাষা রূপকে বলা হত- “পর্তুগীজ-বাঙালাঃ। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- “তখন কলকাতার স্বেতাঙ্গ সমাজে, বিশেষতঃ বনিক সমাজে পর্তুগীজ মিশ্রভাষা ‘লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা’ হিসেবে ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন ভাষী স্বেতাঙ্গ সমাজ নিজেদের মধ্যে এই ধরনের মিশ্র পর্তুগীজ ভাষা ব্যবহার করত।’

আধুনিক বিচারে এ ভাষাকেই ‘ফিরঙ্গী পিজিন’ বলা চলে; যা এখন আর নেই।

২. আরবী-উরদু পিজিন-কলকাতা

ব্রিটিশ আমলে কোলকাতায়, মুছলিম আরবী-উরদুবিদরা এরকম মিশ্রিত ভাষার জন্য দেন- ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে। এ-বিষয়ে ১৮৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে সি.এফ. ট্রেভিলিয়ন লিখেছেন-

“The Arabian Hindustane, which has grown up at Calcutta under the fostering patronage of government and is

spoken by the Moonshees of the collage of Fort William and the -Mouluvees and students of the Mohamedan Collage, is quite a different Language from that which prevails in any other part of India” এ-আরবী- উরদু বা আরবী, ফারসী ও উরদু মিশ্রিত ভাষা-রূপটি যে, আরবী পিজিন-তা মিথ্যা নয়।

৩. পোর্ট ব্লেয়ার-এর উরদু-ক্রিয়োল

মোটের ওপর বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক এক এলাকায় বসবাস করলে তাদের সবার ভাষা মিলে-মিশে একটা নতুন ভাষারূপ তৈরী হয়। তার একটা বিশেষ প্রমাণ পোর্ট ব্লেয়ারের উরদু ক্রিয়োল। এ কথা সবাই জানেন- এ দুটি এলাকায় বৃটিশরা ভারতীয় বিদ্রোহী-বিপ্লবী ও খুনী-ডাকাতদের আজীবন দ্বীপান্তর দিত। তারা আসত ভারতের নানা এলাকার এক-ই উরদু ভাষার নানা স্থানীয় রূপ-শব্দ ও উচ্চারণ বৈচিত্র্য নিয়ে। আন্দামানের প্রধান সমুদ্র বন্দর পোর্ট ব্লেয়ার ছিল এসব মানুষে পূর্ণ। তারা তাদের প্রত্যেকের -ভাষা, শব্দ, উচ্চারণ সব বুঝতে পারত না। কিন্তু সারা জীবন এক এলাকায় বসবাস করার কারণে সবার ভাষার কিছু না কিছু উপাদান নিয়ে তারা একটি আলাদা ভাষা গড়ে তুলেছিল। উরদুনির্ভর এই ভাষা এক নতুন রকম আন্দামানী ভাষা গঠন করে। সে-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আর সি. টেম্পল (R.C.Temple) লিখেছেন-

“The following note is taken out of the Gensus Report of the Andaman and Nicobar Islands, 1901, and is useful to show how new forms and words creep into Urdu owing to local conditions in different parts of India. At port Blair the conditions are of eourse most unusual, as a large number of conviets from every part of the Indian Empire are there collected, and it was naturally essential to select a lingua franca, which all would have to learn to a cortain extent. it was equally natural to select Urdu for that purpose, and it is accordingly now found to be spoken there in every possible variety of corruption and with every variety of accent. All the convicts learn it to an extent sufficient for their daily wants and the understanding of orders and directions. It is also the vernacular of the local born, whatever their descent. The

small extent to which many absolute strangers to it, such as the Burmese, inhabitants of Madras, and so on, master it is one of the safeguards of the Settlement, as it makes it impossible for any general plot to be hatched. In barracks, in boats, and on works where men have to be congregated, every care is taken to split up nationalities, with the result that, except on matters of daily common concern, the convicts are unable to converse confidentially together.

The Urdu of Port thus only exceedingly corrupt from natural causes, but it is filled with technicalities arising out of local conditions and the special requirements of convict life, Even the vernacular of the local born is loaded with them. These technicalities are partly derived from English and are partly specialised applications to new uses of pure or corrupted Urdu words.

The most prominent grammatical characteristic of this dialect of Urdu appears in the numerals, which are everywhere Urdu, but are spoken according to correct Urdu custom. Thus, the convicts and all dealing with them count up to 20 regularly, and then between the tens simply add the units, instead of using special terms, e.g., a convict, whatever his nationality or mother-tongue, will give his number, say, 12,536, as *bara hazar panch sau tis chhe*, twelve thousand five hundred thirty six. He would never say, even of born and bred in Hindustani proper, *bara hazar panch sau chhattis*. The convict must be addressed in the same manner, or he will most probably misapprehend what is said. There is an analogy to this custom in French Switzerland, where it is common to hear *septante* for seventy, and *nonnante* for ninety.”

লেখক এরকম কিছু শব্দের নজীর ও পেশ করেছেন। তা থেকে বোঝা যায়—পোট ব্রেয়ার বা আন্দামানের এ মিশ্রভাষা উরদুর ভিত্তিতে গঠিত ও ক্রিয়ালে পরিণত সেখানকার লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা।

৪. উরদু ক্রিয়োল-কলকাতা

১৮ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় ড. অসিত কুমারের ভাষায় “যে সমস্ত উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ী লালার এবং তাদের অনুচরেরা বাস করত, বিহার প্রদেশের যে-সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের খিদমতগার ছিল, তাদের হিন্দী (উরদু)-ফারসী মিশ্রিত জ্ঞান, যা হিন্দু-স্তানি (হিন্দুস্তানী-উরদু) নামে প্রচলিত ছিল, সেখানকার সাধারণ সমাজে এই টুটা-ফাটা হিন্দুস্তানী ব্যবহৃত হত। বাঙালীরাও ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্মে এই অপভ্রষ্ট হিন্দুস্তানীই ব্যবহার করত। সাহেব ও ভারতীয়দের কথোপকথনে এই হিন্দুস্তানীই থাকত বেশী। সাহেবরা তাদের সহিস, হুকাবরদার, পাংখাওয়ালা, ধোবী, পালকীবাহক বেহারার, খানসামা প্রভৃতির সঙ্গে এই মিশ্র হিন্দুস্তানীতেই কথাবার্তা বলতেন, এবং বুঝতেনও। তাই তারা নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্যই এ-ভাষা শিখতে চাইতেন। এই জন্যই বোধ হয় লেবেডেফ (রুশ নাট্যকার) সাহেবদের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে এই সমস্ত উপভাষা শিখে ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন বোধ করে, থাকবেন।’ অনেকেই জ্ঞানেন পর্তুগীজদের বলা হয় ফিরিন্দী। আর ইংরেজরা হল সাহেব। অসিত বাবুর শেষ বাক্য থেকে বোঝা যায়—উইলিয়াম লেবেডেফ; -ইংরেজী, বাঙালা, ফারসী, উরদু, বাজারী হিন্দী ইত্যাদি ভাষা মিলে মিশে কলকাতার ইংরেজ মহল্লায় তখন যে ক্রিয়োল ভাষারূপ গড়ে উঠেছিল, সে-ভাষার-ই ব্যাকরণ লেখার কোশেশ করেন। আর এ ভাষারূপটি ছিল উরদু ক্রিয়োল বা হিন্দুস্তানী ক্রিয়োল।

৫. সন্দ্বীপী ক্রিয়োল

সন্দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র-বন্দর হওয়ায় নবম-দশম শতক থেকে এখানে আরব দেশীয় বনিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে চট্টগ্রাম, আরাকান ও বাঙালা দেশের নানা স্থান থেকেও নাবিক, জেলে, মুচি, গীর-দরবেশরাও এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। কিন্তু সতের শতকে এখানে পর্তুগীজ হার্মাদরা আরাকানী মগদের সাথে মিলে একটা বোম্বটে রাজ্য গড়ে তোলে। তারা রাজ্য গঞ্জীলেশের অধিনায়কত্বে এখানে রাজ্য স্থাপন, সেনাবাহিনী গঠন, বাঙালা দেশের ঢাকা চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূলীয় ও আভ্যন্তরীণ এলাকা লুণ্ঠনসহ হাজার হাজার নারীপুরুষকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে তাদের দাস-দাসী রূপে ঘরে রাখা বা বিক্রি করাই ছিল তাদের আসল পেশা। স্থানীয় লোকজনের সাথে এসব মানুষের মেলা-মেশার ফলে, সন্দ্বীপে নানা কিছিমের ও পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন পিঞ্জিন ভাষারূপের সৃষ্টি হয়। পরে এসব পিঞ্জিন সন্দ্বীপের জন-ভাষার ভিত্তিতে একটি ক্রিয়োল লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে ড. রাজীব হুমায়ুন লিখেছেন— ‘সাধারণ বিবেচনায় সন্দ্বীপে কমপক্ষে ছটি, উপভাষা প্রচলিত আছে। সেগুলো হচ্ছে—(১) সন্দ্বীপী (২) চাইডতোরামী (৩) কুইচাঠার (৪) হালকিঠার (৫) জাহল্লার ভাষা ও (৬) মুচ্চাইর-রার ভাষা। বিদেশী

জাহাজে চাকরিরত সন্দীপের নাবিকগণ বিশেষ ধরনের কিছু শব্দ ব্যবহার করেন বলে কেউ কেউ তাদের ভাষাকে ‘জাহাজীআলার ভাষা’ বলে চিহ্নিত করেন। ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায় এতগুলো উপভাষা চিহ্নিত করা যাবে না। কেননা, প্রায় সব উপভাষাতেই সন্দীপী প্রত্যয়, বিভক্তি এবং এক-ই বাক্য-কাঠামো ব্যবহৃত হয়।’

এগুলো যে, উপভাষা নয়, তা সত্য। নতুন সোশিয়োলিঙ্গুয়িস্টিক পরিভাষা অনুযায়ী এ হল ছ’সাত রকম পিজিনের ক্রিয়োলীয় রূপ। তাই একে এখন সন্দীপী ক্রিয়োল (ছ’টি বিভিন্নতা -Variety সহ) বলা উচিত।

যাহোক, এভাবে সতের-আঠারো শতকে পর্তুগীজ জলদস্যু। নাবিক, সৈনিক, বোম্বেটে ও পাদরীরা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় নানা বন্দর ও শহর এলাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র ও বসতি গড়ে তোলে। তারা যেসব এলাকায় ক্ষমতা বিস্তার করে সেগুলো হল-গোয়া, দমন, দিউ, চন্দন নগর, চট্টগ্রাম, সন্দীপ, আরাকান, ঢাকা, কোলকাতা, হুগলী, পিপলি ইত্যাদি। এসব জায়গায় তারা পর্তুগীজ ও উরদু ভাষার মিশেলে নানা রকম পিজিন-ক্রিয়োল গড়ে তোলে। কারণ ঐ সময় ঐ সব বন্দর ও বসতি এলাকায় লোকাল ডায়ালেকট ছিল- উরদু বা হিন্দুস্তানী ভাষার-ই নানা স্থানীয় রূপ। তার সাথে আরবী-ফারসীরও যোগ ছিল বিস্তর।

ওলন্দাজরাও একইভাবে, মাদ্রাজের পুলিকেট, মহলিপত্তন, সুরাট প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। ডেনমার্কের অধিবাসী দিনে মাররা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। ডেনমার্কের অধিবাসী দিনে মাররা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে মাদ্রাজের ভ্যাংকুভার ও পশ্চিম বাংলার শ্রীরামপুরে। এরা ছিল প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টান। ফরাসীরা ঘাঁটি গেড়েছিল- চন্দন নগরে। আর ইংরেজ বনিকরা সুরাট, আহমেদাবাদ, আধা, ভরোচ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যার হরিহরপুর, বালেশ্বর, হুগলী, কাসিমবাজার, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে গড়ে তুলেছিল তাদের বাণিজ্য ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র। ফলে, ষোল থেকে ১৮ শতকের মধ্যে ঐ সব কেন্দ্র- তো বটেই, অপরাপর কুঠি এলাকায়ও ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি সংস্কৃতি-ভাষা-সমাজ সৃষ্টির কাজও অব্যাহত ছিল। আর তার-ই ফলে, সেকালে তৈরী হয়েছিল নানা কিছিমের নানা রকম ভাষা রূপ বা পিজিন-ক্রিয়োল; যার কোন অস্তিত্ব এখন আছে কি না সন্দেহ।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়- প্রধানত: ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ ও স্পেনীয় খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক জাতিগুলোই আধুনিক সমস্ত পিজিন-ক্রিয়োল-লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার জন্মদাতা। সারা দুনিয়ার যেসব জায়গায় ঐ সব জাতি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে (যেমন কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি), দখলদারিত্ব কায়েম করেছে (যেমন ইংরেজরা ভারতে, চীনে, আফ্রিকায়, আমেরিকায়, জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায়, ফরাসীরা- গায়োনা, ক্রিনিদাদ ও তার আশপাশের দ্বীপগুলো, উত্তর আফ্রিকা, আইভরি কোস্ট, হাইতি, মধ্য আফ্রিকা, ক্যামেরুন, চাদ, মরিশাস, রাড্রিগস, তাই, নিউ ক্যালিডোনিয়া পর্তুগীজেরা- গায়োনা, সুরিনাম, ব্রাজিল, কেপ ভার্ডি,

সেনেগাল, গিনি, শ্রীলংকা, গোয়া, ভারতের উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকা, মগকাও, মালাককা, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, কলকাতা, হুগলী, গোয়া, দমন, দিউ, পিপলি, চন্দননগর, আরাকান, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, ঢাকা (ভাওয়াল) ইত্যাদি স্থানে; স্পেনীয়রা-পশ্চিম ভেনিজুয়েলা, উত্তর কলাম্বিয়া, ক্রিনিদাদ, টোবাগো, মালাগা ফিলিপাইন ইত্যাদি এলাকায়; ডাচরা-বাটাভিয়া, চিনসুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এবং ডেনিশরা (ডেন) ভারতের বাশোর, গন্ডলপাড়া ইত্যাদি স্থানে); সে-সব জায়গায় তারা নিজেদের ভাষার ভিত্তিতে পিজিন-ক্রিয়োল-লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার জন্ম দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের তিনটি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। তাহল খৃষ্টধর্ম প্রচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও রাজা স্থাপন। পর্তুগীজরা চেয়েছিল জেসুইট ও অগাস্তিনীয় খৃষ্টধর্ম প্রচার ও লুটপাট-ব্যবসায়-বাণিজ্য। নান কারণে তাদের রাজ্যস্থাপন-প্রয়াস সফল হয়নি। আর ইংরেজদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বা প্রাচ্যে রাজ্য স্থাপন। ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা এ-উপমহাদেশে প্রথম ঢুকলেও, পরে 'বনিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে-পোহালে শব্দী'। বলা দরকার ক্যাথলিকখৃষ্টধর্ম প্রচার তাদের ও উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাঙলা দেশ ও গোটা হিন্দুস্তানে ইছলাম ধর্মের ও আরবী-ফারসী-উরদু ভাষার শক্ত প্রতিরোধের মুখে তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কিন্তু আমেরিকায় তেমন কোনো প্রতিরোধমূলক ধর্ম ও ভাষার অস্তিত্ব না থাকায় সেখানেখৃষ্টান ধর্ম ও ইংরেজী ভাষা স্থানীয় ভাষার সাথে মিশে কেবল পিজিন-ক্রিয়োল সৃষ্টি করেনি; গোটা ইংরেজী ভাষা এবং খৃষ্টধর্মই সেখানে চাপিয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় ইংলিশ-পিজিন-ক্রিয়োল আবশেষে, আমেরিকান ইংলিশ ল্যাংগুয়েজে এবং লিঙ্গুয়া-ফ্রাংকায় পরিনত হয়েছে। অতএব ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ডাচ ইত্যাদি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত আধুনিক প্রায় দেড়শ' পিজিন-ক্রিয়োল। ল্যাংগুয়েজ ভাষারূপ ঐ সব সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী রাজশক্তির আধিপত্য ও দখলদারিত্ব যেখানে যত দিন কায়ম থাকতে পেরেছে, সেখানে সেগুলো ততদিন টিকে থেকেছে।

অপরদিকে, আগের আলোচনা থেকে আরও দেখা যায়, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর রাজভাষার বিপরীতে; এশীয়, আফ্রিকান ও অস্ট্রেলিয়ান কিছু কিছু অ-উপনিবেশিক ভাষাও নানা কারণে অনেক পিজিন-ক্রিয়োলের জন্ম দিয়েছে। তবে সেগুলোর সংখ্যা সাম্রাজ্যবাদী রাজভাষার তুলনায় খুবই কম। এরকম ভাষার মধ্যে আরবী, উরদু, ইতালীয়, সোহায়লী, জুল, মালয়ী, নাডা-হো, চোকতাও, এক্সিমো, হাউসা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এসব ভাষা সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে দক্ষিণ সুদান, নাইজেরিয়া, উত্তর ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ক্যামেরুন, কঙ্গো, ইরিত্রিয়া, কিসেটিয়া, কেনিয়া, নামালান্ড, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া, জোহান্সবার্গ, জাম্বিয়া ইত্যাদি স্থানে পিজিন-ক্রিয়োল ভাষা রূপ সৃষ্টি করেছে; যা কোথাও কোথাও লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা (Language) রূপেও টিকে আছে।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে আরও যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হল-বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা জনকণ্ডম যে, সমাজ ভাষা বদল বা ভাষা-সৃষ্টি করতে পারে না, এককণ্ডম গ্রহণ-যোগ্য নয়। প্রাচীনকালের সেমিটিক, হ্যামেটিক ও জফেটিক ভাষা-নাম-ই তার নজীর। আর ইতোপূর্বে আলোচিত দেড় শতাব্দিক ‘পিজিন-ক্রিয়োল ভাষারূপ ও প্রমাণ করে; এক একটি জনকণ্ডমও অপরাপর জনকণ্ডমের সাথে মিশে; পারে, নতুন নতুন ভাষা-রূপ তৈরী করতে বা ভাষা-বদল ঘটাতে। বাঙালা ভাষার আদি স্ক্রমেশন (Formation) ও যে এভাবেই মুহলমানরা গড়ে তোলে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক-ই ভাবে মোগল-পূর্ব ও মোগল আমলের নব্য ভারতীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলো যে মুহলমানদের-ই আওলাদ তাও সত্য। সে-বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তথ্য-নির্দেশা

১. See- Ronald Wardhaugh. An Introduction To Sociolinguistics (Blackwell, 2nd edition, Great Britain, 1992), P. 207-'08.

২. Ibid, P. David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language (Cambridge University Press, U.S.A, 1991), P. 332.

3. Ibid, P. 334.

৪. Ibid, P. 336.

৫. Ibid, P.336.

৬. Ibid, P.336.

৭. Ibid, P.338.

৮. Ibid, P.339.No 97.

৯. Ibid, P.338-339.

১০. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৫ম খণ্ড, (মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি. কলি. ১৯৮৫), পৃ. ৯৭৪।

১১. See- C.F Trevelyan, The Application of the Roman Alphabet to All the Oriented Language. (Serampole Press-1834), P. 29.

১২. R.E. Temple, Indian Antiquary, (Index to Vol. LX- London. 1931) P. 38-39.

১৩. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৫ম খণ্ড (মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি. কলিকাতা-১৯৮৫) পৃ. ৯৭৪।

১৪. রাজীব হুমায়ুন। সন্দ্বীপের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি, (সন্দ্বীপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, ঢাকা-১৯৮৭), পৃ. ২৩৯।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত নজরুল-প্রফেসর, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও পরিচালক, নজরুল-গবেষণা কেন্দ্র, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জন্ম : ১২ অক্টোবর ১৯৪১, কাটরা, মাগুরা)

কাজী নজরুল ইসলাম : কেন বড় কবি

আবদুল মান্নান সৈয়দ



দশ বছর ধরে নজরুলচর্চায় লিপ্ত আছি। নজরুল-রচনাবলী প্রথমবার হাতে পেয়ে নজরুলের সাহিত্যের কিছু কিছু লুকোনো জিনিশ আবিষ্কারেই মগ্ন ছিলাম। এরকম বেশ কিছুকাল যাবার পরে আমার মনে এই জিজ্ঞাসা উদ্ভিত হয়— কেন নজরুল নিয়ে এরকম মগ্ন হয়ে আছি, কেন অনেক দিন নজরুল-চর্চা করবার পরে এখনো মনে হচ্ছে আরো অনেক-কিছু বলবার আছে, কেন নজরুল নিয়ে কেউ কেউ অত্যাশুচক আর কেউ কেউ অতি-নীরব। অধ্যাপনাসূত্রে ছাত্রদের নানারকম জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছি, অনেক সময় যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নজরুল সম্পর্কে বিচিত্র কৌতূহল লক্ষ্য করেছে। দেখেছি, তরুণ লেখকদের এক বড় অংশের নজরুল সম্পর্কে অনীহা, যে-অনীহার অনেকটাই হয়তো এসেছে অপরিচয় থেকে। লক্ষ্য করেছে, তাঁকে নিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও বিতর্ক। একদিকে লোকপ্রিয়তা, আর-একদিকে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিমুখতা। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি তাঁর ভক্তদের অসন্তোষ অগ্রাহ্য করে নজরুলকে নেহাৎ অল্প বয়সে গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। মোহিতলালের মতো কবি-সমালোচক নজরুলের প্রতিভার উষাকালেই তাঁকে সারস্বত মঞ্চে স্বাগত জানান। শুধু তাই নয়, নজরুলের উদ্দেশ্যে সাতটি কবিতায় তাঁর ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া জানান। নজরুলকে কেন্দ্র করেই প্রথমবারের মতো কয়েকজন বাঙালি-মুসলিম লেখকের হাতে সাহিত্য-সমালোচনা দানা বাঁধে। নজরুলকে কেন্দ্র করেই এক দুষ্ট নক্ষত্র জন্ম নেয়, যার নাম সজনীকান্ত দাস, যার বংশধররা কোনোদিন শেষ হবার নয়, সৃষ্টিশীল প্রতিভার সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পাশে পাশে এইসব দুষ্ট নক্ষত্রেরাও জ্বলে যায়। তিনি সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প আরো অনেকের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ঈর্ষার লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন। লক্ষ্য করেছে, বয়সে নজরুলের প্রায় সমকালীন কিন্তু কাব্যচর্চায় উত্তরকালীন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় ঘুণাক্ষরেও নজরুলের উল্লেখ নেই; কিন্তু বুদ্ধদেব বসু, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক সাহিত্যের অলিখিত কিন্তু অর্জনযোগ্য সিংহাসনে আরুঢ় হয়েছিলেন, তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত কবিতা পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা নজরুলকে লুপ্তির আঁধার ও আচ্ছাদন থেকে বের করে আনে; জীবনানন্দ দাশের মতো মহান কবি তাঁকে নিয়ে রচনা করেন তাৎক্ষণিক কিন্তু আলাদা দুটি নিবন্ধ। আমাদের দেশে ও পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতিমান অসংখ্য মনীষীর দ্বারা তিনি আলোচিত-সমালোচিত হতে থাকলেন; নীরব হয়ে যাবার পরে তাঁকে নিয়ে তাঁর

অসংখ্য বন্ধু ও পরিচিতদের অনেকেই নানারকমভাবে তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্থ্য সাজিয়ে দেন। ১৯৬৫ সালে দেখলাম মুখোমুখি দুই যুধ্যমান দেশ ব্যবহার করে চলেছে একজন কবির কবিতা। ১৯৭১ সালে দেখলাম যাকে বলা হতো ‘Topical poet’, সমকালীন হেঁচয়ের কবি, তাঁর নীরব হয়ে যাবার তিরিশ বছর পরে একটি রাষ্ট্রের জন্মে তাঁর উদ্দীপক-সন্দীপক কবিতা-গান-গদ্যরচনাসমূহের দীপ্ত ভূমিকা। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ এই দুই বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রে তিনি সম্মানিত হলেন শুধু বাংলা ভাষার কবি বলে নয়, এজন্যে যে, তাঁর রচনাতেই পাওয়া যাচ্ছে দুই বিরোধী আদর্শের উজ্জ্বল উপকরণ। মনে হচ্ছে এই কবি দশ-আয়তনবান, যার এক একটি আয়তন নিয়ে এক একটি ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী মুগ্ধ থাকতে পারে। তিনি কি সত্যিকার উত্তরারৈবিক কবি? রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিতার মধ্যখানে তাঁর প্রকৃত স্থান কোথায়? সব-মিলিয়ে, নজরুলকে কি আমরা বড় কবি বলব, বাংলা সাহিত্যের হিশেবে? বড় কবি Major Poet অর্থে বলছি। কেন বলব? নজরুল প্রসঙ্গে এই জিজ্ঞাসার মোকাবিলা একদিন করতেই হয়; উপায় নেই এই জিজ্ঞাসার পাশ কাটিয়ে যাবার।

দীর্ঘকাল ধরে অনেকগুলো দিক বিবেচনার পরে, আমি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, নজরুল আমাদের সাহিত্যের একজন বড় কবি বা Major poet। কেন, এক এক করে আমি তা বলছি। খুব বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই, বলছি সূত্রাকারে।

এক. কোনো সাহিত্যের ধারায় একজন কবি হয়ে ওঠেন দুভাবে— স্বাভাবিক পথে আর সম্ভাবনারক্ৰিম পথে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সবচেয়ে স্বাভাবিক কবি, সেজন্যে আশি বছর ধরে কবিতার নতুন নতুন দেশ দখল করেও তিনি যা সাধন করেন, তা হচ্ছে নীরব বিপ্লব। কিন্তু বাংলা ভাষার অন্তত তিনজন প্রধান কবির কথা আমরা বলব, যারা বাংলা ভাষার মূল স্বভাবকেই বদলে দিয়েছেন, কিংবা আরো ভালো হয় যদি বলি সম্প্রসারিত করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নজরুল ইসলাম ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত— বাংলা ভাষার প্রধান কবিদের অন্তত এই তিনজনের নাম উল্লেখ আমি করব, যারা কবি হয়ে উঠেছেন অস্বাভাবিক পথে, কিন্তু যাদের বিরাট সৌজন্যে ও কৃতিত্বে ঐ অস্বভাবও এখন বাংলা ভাষার স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, এঁরা একদিন বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন ও অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। আমাদের খণ্ডিত জীবনের মধ্যেই মহাকাব্যিক আততি জাহ্নত করেন মাইকেল, নজরুল শান্ত রসের দেশে আনেন রৌদ্র রসের দহন ও দীপ্তি, শিথিল ও অভিভাষী বাংলা ভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ দান করেন নির্মেদ ও নির্বহল এক টান-টান ছিলার সংহতি। লিরিকের সমতল দেশে মাইকেল আনেন মহাকাব্যিক সমুন্নতি; মধ্যযুগের রাশিরাশি কাহিনীকাব্যের নদী সমুদ্রে এসে পড়ে মাইকেলের

হাতে; বাঙালি জীবনে ও মানসে আসে সেই প্রবহমানতা যা একদাড়ি-দুইদাড়ি-নির্ভর মস্তুর মসৃণ ছন্দোযাত্রাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুধীন্দ্রনাথ শিখিল ও অতিভাষী বাংলা কবিতাকে এমন সংহতি ও দার্ঢ্য দেন, যা ছিল এতকাল-অভাবনীয়। নজরুল তাঁর ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়, ও অন্যান্য বিদ্রোহমূলক কবিতায়, এমনকি কোনো কোনো গদ্যরচনায়, নিয়ে আসেন এমন তেজ-জোশ-আলো-তাপ, যা নজরুলের আগে বাংলা ভাষায় কল্পনাই করা যেত না। মেঘনাদবধ কাব্য বা ‘বিদ্রোহী’ বা ‘অর্কেষ্ট্রা’ বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিষয়ে ও বিন্যাসে সেই নতুনত্বের সন্ধান দ্যায়, যা তার ছিল না। সুধীন্দ্রনাথের ঘন সংহতি বা নজরুলের বিদ্রোহের বেগ—এরা বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণ একটি নতুন আয়তন যুক্ত করে এবং এর ফলে ভাষার ব্যাপ্তি বাড়ে। ভাষার এই গোপন ও নিহিত সম্ভাবনাকে যিনি আবিষ্কার করেন ও পূর্ণ রূপ দেন, তিনি বড় কবি। গৌণ কবিরা ঐসব আবিষ্কৃত পথেই চলাফেরা করেন, নতুন কোনো সাহস ও সম্ভাবনাকে তাঁরা জামত করতে পারেন না।

দুই. এই নতুন সম্ভাবনা ও শক্তি সঞ্চারের সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা হয়ে যান নজরুল। রবীন্দ্রসমকালেই যাদের মধ্যে উত্তররাবীন্দ্রিক সুর সবচেয়ে সফলভাবে ঝংকৃত হয়েছে, নজরুল তাঁদের মধ্যে প্রধান। মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম—এই তিনজন সেই প্রথম বাঁশবাদক রবীন্দ্রনাথকে বিদীর্ণ করে বেজে উঠেছিলেন যারা। কিন্তু এঁদেরও মধ্যে নজরুলই সবচেয়ে সোচ্চার; এমনকি বিশ্বয়কর ব্যাপার এই যে, এঁদের দুজনকেই তিনি খানিকটা প্রভাবিতও করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ‘কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হতো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রা-ভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের জাদু—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার, আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না ‘বিদ্রোহী’ কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।’ (‘রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক’) হ্যাঁ, মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথ যতই রবীন্দ্র-বিরোধী সুর সৃষ্টি করুন-না কেন, নজরুল ইসলামই প্রথম রবীন্দ্রজাল ভেঙেছিলেন। আজকের দিনে সেই কোমল-কঠিন জাল যে কী-দুশ্চৈদ্য তা অবশ্য কল্পনাই করা যায় না; কিন্তু বুদ্ধদেব ও অন্যদের সাক্ষ্য থেকে, অসংখ্যের কবিতাচর্চা থেকে, তা বেরিয়ে আসে। এই মায়াজাল যিনি ভেঙেছিলেন, তিনি নিজে গৌণ কবি তথা অসংখ্যের অন্যতম হলে, তা কি সম্ভব হতো? তাঁর থাকত কি সেই জোর? কিন্তু ঐ উক্তির পর-মুহূর্তে বুদ্ধদেব যখন উচ্চারণ করেন, ‘নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন’ (ঐ), তখন তাতে বিচলিত বোধ করি আমরা। যিনি তাঁর প্রথম কবিতাম্পর্শের প্রথম

কবিতার প্রথম স্তবকেই লিখেছিলেন, ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর! তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!/ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়!’ (‘প্রলয়োল্লাস’, অগ্নি-বীণা) তাঁকে কি অতটাই অনাশ্রুচেতন বলা চলবে? আর বাক্যবিচারে ঐ প্রশ্নও আসলে অনাবশ্যক আক্রমণ, আমরা কবির সচেতনতা বা প্রতিশ্রুতির চেয়ে কবিকর্মেই কি অধিক আস্থা রাখব না? রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই যিনি নতুন যুগ এনেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাকে নেহাৎই অল্প বয়সে বই উৎসর্গ করে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাঁর কাছে বাংলা সাহিত্যের তরফ থেকে দাবি জানিয়েছেন, তাঁকে অস্বীকার করে লাভ নেই। বুদ্ধদেবের পরবর্তী উক্তি আরো মারাত্মক, ‘তাঁর রচনায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।’ (ঐ) যদি নজরুলের রচনায় কেবল সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ থাকত, তাহলে আজ তাঁকে নিয়ে এত আলোচনা-সমালোচনার দরকার হতো কি? কেননা আজ তো আমরা সেদিনকার থেকে একেবারে অন্য সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবশে এসে পৌঁছেছি। বস্তুত সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নজরুল সাহিত্যিক বিদ্রোহটিই সম্পন্ন করেছিলেন, কেননা এতকাল বাংলা কবিতায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ এরকম সাহিত্যচরিতার্থরূপে আসেনি। কিন্তু, এই তথ্যটিও এই সূত্রে স্বরণীয় যে, সমকালীন বা তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নজরুল চিরন্তনের মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, সেজন্যেই তা কেবল সমকালেই আলো জ্বালিয়ে ফুলিঙ্গের মতো পর্যবসিত হয়ে যায়নি। বুদ্ধদেবের ঐ প্রবন্ধ লেখা অবশ্য ১৯৫২ সালে, তখন নজরুল কিছুটা আচ্ছাদিত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নজরুল সে সাহিত্যিক বিদ্রোহই সম্পন্ন করেছিলেন নজরুল-সাহিত্যের কালের দেয়াল ডিঙানো চলিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তা তখনো পরীক্ষিত-প্রমাণিত হয়নি এবং এর মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হলো, রবীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্যবিবেচনায় ভুল ছিল না, নজরুলকে তুচ্ছার্থে Topical poet বলে সরিয়ে রাখার যতই চেষ্টা করা হোক তিনি নন সাময়িক কবি, ঈশ্বর গুপ্ত আর তাঁর কাব্যনিয়তি আলাদা, আসলে সাময়িক কবিতার কয়েকটি কুশলতা আয়ত্তে ছিল তাঁর, অন্য কুশলতা ও প্রবণতাও অর্জনে ছিল তাঁর, যা ছিল না ঈশ্বর গুপ্ত বা অন্য Topical কবিদের। না, নজরুল সাময়িক কবি নন, সেই-যে অসুস্থ হয়ে যাবার পরে আঁকাবাঁকা ও কল্শিত হরফে তিনি লিখেছিলেন ‘চির-কবি নজরুল’ তিনি তা-ই। কিন্তু ঐ আপাত-সাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক কবিতা রচনা করে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক দেশ জয় করে এনেছিলেন।

তিন. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দশজন কবিকে আমি প্রধান মনে করি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও

বিস্ম দে। মোটামুটি দেড়শো বছরের আধুনিক বাংলা কাব্যতিহাসে এই দশজন কবি দশ দিগন্তের একটি ভুলোক রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে রবীন্দ্রনাথ সন্দেহাতীতভাবেই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের পরেই কবিতায় যে-বহুমুখী প্রতিভার নাম করতে পারি আমরা, তিনি নজরুল ইসলাম। বৈপরীত্যকে আর-কোনো বাঙালি কবি এমন একসঙ্গে আমন্ত্রণ জানাননি। উত্তাল আবেগের কবিতা, সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ানুকল্পনের কবিতা, ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ কবিতা; সামাজিক কবিতা, শ্রেমিক কবিতা, লিরিক কবিতা, নাটকীয় কবিতা, কাহিনীকাব্য- একজন কবি যেন জীবনের তাবৎ কবিতাকে এক বিরাট অর্কেষ্ট্রার মতো ধারণ করেছেন। কত বিচিত্র বিপরীত বিরোধী কবিতা তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আসে। ‘বিদ্রোহী’ (অগ্নি-বীণা), ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম’ (বিশের বাঁশী), ‘পূজারিণী’ (দোলন-চাঁপা), ‘আপন-পিয়াসী’ (ছায়ানট), ‘রৌদ্র-দধের গান’ (ছায়ানট), ‘ইন্দ্রপতন’ (চিন্তনামা), ‘সাম্যবাদী’ (সাম্যবাদী), ‘প্যাঠ’ (চন্দ্রবিন্দু), ‘ভাঙার গান’ (ভাঙার গান) প্রভৃতি। অতি পরিচয়ের ফলে এই কবিতাগুলি যে পরস্পরের কত বিরোধী ও বিপরীত, তা আমাদের নজরে পড়ে না। ধার্মিক ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম’-এর সঙ্গে কোনো মিল নেই আধ্যাত্মিক ‘আপন-পিয়াসী’ কবিতার; ‘বিদ্রোহী’ কবিতার উত্তাল ঝন্ঝনার সঙ্গে কোনো সাম্যজ্ঞা নেই সাম্যবাদীর স্থির প্রত্যয়ের, আবার ভাঙার গান-এর নগ্ন, direct উচ্চারণ ঐ দুই কবিতা থেকেই দূরব্যবহিত; আত্মবলয়িত ‘রৌদ্র-দধের গান’ থেকে ‘প্যাঠ’ কবিতার ব্যঙ্গনিষিদ্ধ সামাজিক হাস্যস্ফার মেরুদূর। আমরা এখন বুঝতে পারি, কেন অনেকের মন-খারাপ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের পরে এই নামটি বারবার উচ্চারিত হয়। মাইকেলে যেমন তেমন নজরুলেও সম্ভাব্য কিন্তু অনিবার্য কাব্যনাট্য অলিখিতই রয়ে গেছে। কিন্তু নজরুলে সেই ঋণশোধ ঘটেছে, আংশিক হলেও, ‘কামাল পাশা’ বা ‘আনোয়ার’ (অগ্নি-বীণা)-এর মতো নাট্য-কবিতায়, একগুচ্ছ গীতিনাট্যে। বলা বাহুল্য নজরুলের এই বহুমুখিতা স্রেফ বৈচিত্র্যপিয়াসার জন্যে ঘটেনি, ঘটেছে জীবনের স্থূল-সূক্ষ্ম বহু দেশ সম্পর্কে চেতনা ও অবহিতির কারণেই। বড় কবি যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপকও। আজকের দিনের কবিতার অতিপ্রকরণচেতনা আমাদের অনেকখানি বিষয়বিমুখ করে দিয়েছে। আধার নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আধেয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব তার হতে পারে না। নজরুলের এই বহুধা বিস্তৃতি তাঁকে বড় পটভূমিকায় এনে দিয়েছে।

কবিতার বাইরেও তাঁর বিরাট বিচিত্রতাও নিশ্চয় অবিস্মরণ দ্যুতিময়। তাঁর গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধচর্চা; পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা; অভিনয় ও চলচ্চিত্র পরিচালনা; গীতিকার, সুরকার, গায়ক ও বক্তা হিশেবে দক্ষতা- সমস্ত মিলেই নজরুল। বিশেষ করে তাঁর গানের কথা বলব, যে-গানের অনেকগুলি কবিতা হিশেবেই বিবেচ্য এবং যে-গানের বিষয় ও সুরের বিচিত্রতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের তুল্য। না-মেনে উপায় নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে আর-কোনো

লেখকের মধ্যে এত বিচিত্র বিষয়ে এত বিপুল সাফল্য অর্জিত হতে দেখা যায়নি।

চার. কবিতায় বিচিত্রপথগামী বলেই নজরুলের প্রভাব নজরুল-পরবর্তী কবিতায় পড়েছে বিপুলভাবে। নজরুল নিজে বড় কবি নাহলে এত বিশাল প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন কি?

তার পরবর্তী কবিতায় নজরুলের প্রভাব মোটামুটি তিনটি ধারায় অগ্রসর হয়েছে : ১. স্বপ্নকল্পনাচেতন ইন্দ্রিয়ঘনত্ব : জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ফররুখ আহমদ প্রমুখ; ২. লোকায়ত উন্মেষ : প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে-র প্রথম পর্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, মঈনুদ্দীন, দিনেশ দাস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ; ৩. ইসলামচেতন কাব্যোচ্চারণ : গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসানের প্রথম পর্যায়, সৈয়দ আলী আশরাফ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ। যিনি বাংলা কবিতার তিনটি ধারা খুলে দিলেন, যিনি জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো পরস্পরবিরোধী উজ্জ্বল কবিদের উজ্জীবিত-প্রভাবিত করেছেন, তিনি নিজে বড় কবি না হলে তা কি সম্ভব হতো? এই তিনটি ধারার যে-কোনো একটির স্রষ্টা হিসেবেই তিনি অমর হয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনটি ধারার স্রষ্টা বলেই তিনি নিজে বিরাট ও মহান হয়ে উঠেছেন।

পাঁচ. বড় কবি হন একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ। নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি-মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ নন, প্রথম সাহিত্যিক স্রষ্টাও। বাঙালি-মুসলমানদের জীবনাচরণ ও ধর্মাচার, আবেগ ও স্বপ্ন এই প্রথম ছন্দোবদ্ধ হলো বাংলা ভাষায়। বাঙালি-মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ এই প্রথম মার্জিত সাহিত্যে স্থান পেল, শুধু স্থান পাওয়াই যথেষ্ট ছিল, নজরুল এমনকি তার কাব্যিক ব্যবহার করলেন। তার ইসলামি গান অসম্ভব লোকপ্রিয়তা অর্জন করল। ইসলামি পুরাণ এই প্রথম ব্যবহৃত হলো বাংলা কবিতায়। মুসলিম দেশ ও জননেতা বন্দিত হলো, বাঙালি-মুসলমান এই প্রথম পেল তার কবিকে। প্রথম বলে, পাঠকের অচেনা বলে নজরুল ইসলামকে মুসলিম পুরাণের উল্লেখ করতে হলো ফুটনোটে শব্দার্থ বুঝিয়ে দিয়ে, কবিতায়, এমনকি গদ্যরচনায়ও। এই একটি কীর্তি সুসম্পন্ন করতে পারলেই তো নজরুল বড় কবি বলে পরিগণিত হতে পারতেন।

ছয়. কিন্তু নজরুল আরো-বড় কবি বলেই শুধু বাঙালি-মুসলমানের কবি হয়েই রইলেন না, হয়ে উঠলেন বাঙালির কবি। বাঙালি-হিন্দু জীবনাচরণ ও ধর্মাচার কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল বটে, কিন্তু নজরুল তাকে দিলেন আরো গাঢ় প্রত্যক্ষতা। নজরুলের কবিতায়- এবং কবিতায় এই প্রথম, ফলত আলাদা হয়ে

উঠল- নজরুলের কবিতায় পাশাপাশি ব্যবহৃত হলো সংস্কৃত শব্দ ও আরবি শব্দ, ও হিন্দু পুরাণের পাশে জেঁকে বসল মুসলিম পুরাণ। হিন্দু-মুসলমান এদেশে পাশাপাশি বাস করলেও এই একবারই বাংলা কবিতায় এই একজনেরই কণ্ঠে বেজে উঠল ইসলামি গান আর শ্যামাসংগীত। কোন আশ্চর্য নৈপুণ্যে এ সম্ভব হলো তাতে আমরা কেবল অবাধই মানতে পারি। এই একবারই। আগেও না, পরেও না। নজরুলের পরে আমরা পেলাম বিষ্ণু দে ও ফররুখ আহমদের হিন্দু ও মুসলিম পুরাণের ও ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন চর্চা।

সাত. নজরুল আমাদের ঐতিহ্যের প্রথম স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গত তিরিশ বছর ধরে বিরামহীন, জটিল ও বহুধাবিভক্ত তর্ক চলেছে। বস্তুত এই গিট খুলতে পারলে আমাদের অনেক সমস্যারই তল খুঁজে পাওয়া যেত, পাওয়া যেত তার স্বস্তিকর সমাধান। পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচেতনা এমন তীব্র, দীপ্ত ও সর্বব্যাপী ছিল না। বাঙালি-মুসলমানের সার্বিক আত্মচেতনা আমরা জানি যে, আরো পরে জেগেছে। গৃহবিবাদ তখনো ছিল, নজরুল ইসলামকে তার দণ্ড দিতে হয়েছে। যিনি ইসলামি বিষয়কে প্রথমবার কবিতায়-গানে-গদ্যরচনায় সফল সাহিত্যিক রূপদান করলেন, তাঁকে দেওয়া হয়েছে ‘কাফের’ অভিধা। কিন্তু নজরুল কেবল ইসলামি গান লেখেননি, শ্যামাসংগীতও রচনা করেছেন। পৌরাণিক যে-চরিত্রটি তাঁর কবিতায় ও গদ্যরচনায় সর্বাধিকবার এসেছে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের দেবতা শিব। এই নজরুল ইসলামই হযরত মুহাম্মদ স.-কে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করেছেন মরুভাঙ্গুর কাব্যগ্রন্থে, চিন্তনামা গ্রন্থে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে ‘নবি’ বলে সম্বোধন করেছেন, তিনিই এক নিশ্বাসে হিন্দু ও মুসলিম পুরাণকে ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি, ইতস্তত করেননি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেও। এর ফলে প্রিয় যেমন হয়েছেন অনেকের, অপ্রিয়ও কম হননি। মূলত অস্তিবাদী বলে তার প্রকাশ ঘটেছে কম, চিঠিপত্রে কিছু সাক্ষ্য আছে। সে যাই হোক, বাঙালি-মুসলমান যে এক বিমিশ্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক, নজরুলের সাহিত্য তারই সাক্ষ্য দ্যায়। নজরুলকে এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বোধের জন্যে কোনো গ্রন্থের কাছে পাঠ নিতে হয়নি, এ তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর সরল ও অকৃত্রিম চেতনাতাই। নজরুলের ঐ চেতনাকে আমি বলব ‘অপূর্ব স্বজ্ঞাবল’। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিমিশ্র ও জটিল, সেজন্যেই ধনী। নজরুলের কবিতা এই বিমিশ্র ও জটিল ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যে ঋদ্ধ। তাঁর নিজস্ব ধর্ম-সমাজ বিষয়ে নিঃশব্দ থাকলে নজরুল এত বড় কবি হতেন না: আবহমান বাংলা সাহিত্যের ও দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিস্মৃত হলে নজরুল এত বড় কবি হতেন না। বাঙালি-মুসলমান যেদিন এই বিমিশ্র ও জটিল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে একক ও সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য প্রতীতি অর্জন করবে, সেদিন নজরুল ইসলামকে বরণ করে নেবে তাদের আদিপিতা হিশেবে।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা

আবদুল মান্নান তালিব



সাহিত্যের গোড়ার কথা

ইসলামের নবী কেবল আরব দেশে আসেননি, দুনিয়ার সব দেশেই এসেছেন। আল্লাহর পাঠানো সব নবীই ছিলেন ইসলামের নবী। সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই নবী প্রসঙ্গে এলাম কেন? কারণ নবীরাই মানুষের প্রথম শিক্ষক। নবীরাই সমাজ সংগঠক। নবীদের যোগ মানুষের সাথে তৃণমূল পর্যায় থেকেই। মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য নবীদের ভূমিকা ছাড়া কল্পনাই করা যেতে পারে না। নবীর আশ্রয় পক্ষ থেকে সঠিক পথের সন্ধান এনেছেন এবং সে পথ মানুষকে দেখাননি এমনটি হতে পারে না। সাহিত্য মানুষের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অংশ আর নবীর এ অংশে কোনো অবদান রাখেননি একথা কেমন করে ভাবা যেতে পারে? নবীর যেসব সহীফা ও কিতাব এনেছেন সেগুলোও সাহিত্যরস সমৃদ্ধ। নিছক কাটখোঁটা আলোচনা কোনো কিতাবেই নেই। জীবনকে উপলব্ধি করে আলোচনাগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জীবনরস সমৃদ্ধ করে। তবেই তা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। মানুষ তার সাহায্যে উন্নতি করে উন্নত জীবন সমাজ সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে এবং তার ভিত্তিতে মানুষ করেছে সাহিত্য সাধনা। এটাই হচ্ছে মানুষের সাহিত্য সাধনার গোড়ার কথা।

আজ যেন সাহিত্য বলতে নবুওয়াতী খাতের ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত একটা স্রোত বুঝায়। এটা মানুষের জীবনের অন্যান্য খাতে ভুলের মতো একটা ভুল। ‘রাধাকৃষ্ণের লীলা’ এই ভুলেরই একটা ফসল। সাহিত্যকেও নবুওয়াতী ধারায় সম্পৃক্ত হতে হবে। নয়তো তা মানুষের জন্য উপাদেয় ও উপযোগী হতে পারে না। সাহিত্য রস ও সাহিত্যের আশ্রয় মানুষের জীবন গঠনে সাহায্যতা না করে যদি ক্ষতি সাধন করে তাহলে কে এমন মানুষ আছে যে তা গ্রহণ করবে? শেষ নবীর কিতাব আল কুরআনে জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে : ‘দুনিয়ার জীবনটা তো খেলা-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং অর্থ সম্পদ ও সম্ভান সম্ভ্রতিতে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হলো, বৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে গেলো এবং তোমরা দেখতে পেলে তা হলুদ বর্ণ

ধারণা করছে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব এবং আত্মাহর ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ (আল হাদীদ : ২০)

এ জীবনকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং জীবনকে উৎকর্ষিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জীবনের প্রতারণা জালে জড়িয়ে আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলতে পারি না। আমাদের সামনে রয়েছে আখেরাতের জীবনের কামিয়াবী। এই আখেরাতের জীবনের জন্য দুনিয়ার জীবন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াকে বলা হয়েছে আখেরাতের কৃষিক্ষেত (হাদীস)। এখানে যেমন পরিশ্রম করা ও যত্ন নেয়া হবে তেমনি আখেরাতে তার ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতারণা জালে যদি আমরা ফেঁসে যাই, দুনিয়ার আসল কাজে জড়িত না হয়ে যদি তার প্রতারণামূলক খেলা-তামাশায় মেতে উঠি এবং দুনিয়ার সম্পদ আহরণ ও ভোগ বিলাসে লিপ্ত হই, তাহলে আমাদের আখেরাতের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়া আমাদের সামনে আছে এবং আখেরাত সামনে নেই। তবে আখেরাত আমাদের কল্পনা জগতের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সকল বাস্তবতার সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। কাজেই তাকে আমরা জীবন কর্ম ও জীবন চিন্তা থেকে আলাদা করতে পারি না।

জীবনকে খেলা তামাশা বলা হয়েছে কোন্ অর্থে? স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের অর্থে। একশো বছরের জীবনের বাস্তব কঠিন কর্মক্ষেত্রে খেলা তামাশা মাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার আনন্দ বিনোদন। এই স্বল্পস্থায়ী ক্ষণটুকুর পর আবার বাস্তব কঠোর কঠিন জীবন শুরু। ঠিক তেমনি এই স্বল্পস্থায়ী জীবনটা খেলা তামাশা এবং আখেরাতটাই বাস্তব ও অনন্তকালীন জীবন। কাজেই আমাদের যা কিছু কাজ চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য। জীবনটা শুধু দুয়ুঠো খাদ্য গ্রহণ, শরীর ঢাকার জন্য বস্ত্র আহরণ এবং শারীরিক, জৈব ও যৌন চাহিদা পূরণ করার নাম নয়। বরং এই স্বল্পকালীন দুনিয়ার জীবনকে অনন্তকালীন আখেরাতের জীবনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই জীবনটাকে আমাদের বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে।

জীবনের সাথে সাহিত্য, জীবনকে পরিশীলিত ও বিকশিত করার জন্য সাহিত্য। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। জীবনকে বিকৃত করেও সাহিত্য নয়। সাহিত্য আমাদের জীবনেরই নির্ঘাস।

সাহিত্য আমাদের সুন্দর করবে। আমাদের পরিশীলিত ও পরিশ্রুত করবে। আমাদের জীবনকে ক্রেদমুক্ত অপাপবিদ্ধ করবে। সাহিত্য আমাদের সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী করবে। জীবনের ঘটনাবলী থেকে আমরা সত্য ও ন্যায়কে বাছাই করে নিতে পারবো। জীবন সংগ্রামে সাহিত্য কেবলমাত্র একজন দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। বরং একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক ও দক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি হবে সাহিত্যের দৃষ্টি।

এই স্বল্পকালীন পৃথিবীর জীবনে মানুষকে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে অর্থাৎ কিভাবে মানুষ যথার্থ মানবতার আধারে পরিণত হতে পারে এবং নিজের নফসের ও জীব-জড়ের কৃত্রিম শক্তির অনুগত না হয়ে বিশ্ব জাহান ও বিশ্ব প্রকৃতির মালিক একমাত্র আল্লাহর অনুগত হতে পারে, তাই হবে সাহিত্যের সাধনা।

গাংগেয় বধীপে ইসলামের ভিত

বাংলাদেশে ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকালেই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেই ইসলামের দাওয়াত বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রাকৃতিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে এখানকার পরিবেশ ছিল অনুকূল। এই অনুকূল পরিবেশে ইসলামের দাওয়াত সহজে বিস্তার লাভ করে। উপমহাদেশের কেন্দ্র দিল্লী থেকে বহু দূরে থাকায় বিদেশী আক্রমণকারীদের দৃষ্টি কমই এদিকে পড়েছে এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরাও এখানে কম সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া সবুজ শ্যামল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত ও প্রাকৃতিক বন জংগলাকীর্ণ সমতলভূমি এমন এক ধরনের নৈসর্গিক গুরু গম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেছিল যা নিরিবিলা নিচ্চিন্তে সত্য দীনের দাওয়াত ছড়াবার পথে সহায়ক হয়েছিল। ফলে স্থানীয় বৌদ্ধ, জৈন ও আর্থ ধর্ম প্রভাবিত জনগোষ্ঠী ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সংগে আর একটি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার মতো। কয়েক হাজার বছর থেকে এ এলাকায় বিপুল সেমেটিক জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল তৌহীদবাদী। কালের আবর্তনে তাতে মরচে পড়ে গিয়েছিল। আর্থ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধবাদী ও জৈনবাদী ধর্মীয় সংস্কার যেভাবে এ এলাকায় ব্যাপক বিস্তারলাভ করতে পেরেছিল ঠিক একই ধারায় ইসলামী তৌহীদবাদ সমগ্র বাংলার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়েছিল অতি অল্প সময়েই। যেন এটা ছিল তাদের প্রাণের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। সকালে হারিয়ে গিয়েছিল আবার সন্ধ্যায় তাকে ফিরে পেয়েছিল, এভাবে তারা এটাকে গ্রহণ করেছিল। তাই হিন্দুস্তানের অতি প্রাচীন মুশরিকী আবাসভূমির মধ্যে গড়ে উঠতে পেরেছিল একটি বিশাল তৌহীদবাদী জনগোষ্ঠী।

আলেম উলামা ও কাজীদের জ্ঞানচর্চা

মুসলিম বিজেতাদের পূর্বে সমুদ্র ও নদীপথে আরব বণিকদের সাহায্যে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে ইসলামের প্রথম যুগেই। এরপর ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটতে থাকে। মুসলিম বিজেতাদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ ধারা বলিষ্ঠতা অর্জন করে। এ সময় এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য

মুসলিম আইনজ্ঞ তথা ফকীহ ও কাজীদের আগমন ঘটতে থাকে। তাঁরা ছিলেন ইসলামী শাস্ত্রে সুদক্ষ ও পারদর্শী। মুসলিম বিশ্বে যে বিপুল জ্ঞান চর্চা হচ্ছিল তার ঢেউ এখানেও এসে পড়ে। ফলে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকেই এখানে গৌড়, পাণ্ডুয়া, মাহিসুন (মাহিসন্তোষ), সোনারগাঁও ইত্যাদি এলাকায় বড় বড় ইলমী তথা ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখানকার মাদরাসাগুলিতে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করার জন্য সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে ছাত্রদের আগমন ঘটতো। শায়খ তাকীউদ্দীন আরাবী, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী, শায়খ আলাউল হক, হযরত শায়খ নূর কুতবুল আলম ইত্যাদি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানসাধকগণ এসময় এসব জ্ঞানকেন্দ্র আলোকিত করেছিলেন। তাই বলা যায় ইসলামী শাসনের প্রথম যুগেই বাংলাদেশ ইসলামী জ্ঞানচর্চার পাঠস্থানে পরিণত হয়। এখানে এর পরিবেশও ছিল। তখন জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল আরবী ও ফারসী। ফলে বিদেশাগত মুসলমান এবং এদেশীয় শিক্ষিত, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে মূলত এ জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের মূল কেন্দ্র দিল্লীতে শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান সাধনার এই কেন্দ্র বাংলা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

সাধারণ মুসলমানের ভাষা ছিল বাংলা। ইতিপূর্বে পাল যুগে বৌদ্ধ শাসনামলে সাহিত্যের ও রাজভাষা সংস্কৃত থাকলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা যা একটু আধটু হয়েছিল সেনযুগে হিন্দু শাসনামলে এসে তা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যায়। সংস্কৃতের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা ও রাজকার্য চলতে থাকে। এজন্য একটা দরবারী জগাখিচুড়ি মার্কী সংস্কৃত ভাষাও গড়ে ওঠে। মুসলিম সুলতানদের শাসনামলে মূলত বাংলা ভাষার পুনরুজ্জীবন হয়। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দরবারী ও রাজভাষা ফারসী এবং ইলমী ভাষা আরবী রাখলেও মুসলিম এবং এদেশটার জনসাধারণের ভাষা বাংলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করেন। ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ইলমী ভাষায় রূপান্তরিত হবার পথ প্রশস্ত হতে থাকে।

সুফী সাধকদের ইসলাম প্রচার

মুসলমানদের মধ্যে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল একটি দল গড়ে উঠেছিল। তাঁরা ছিলেন সুফী নামে খ্যাত। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের যোগী, সন্ন্যাসী ও রাহেবদের মতো তাঁরা সংসার বিরাগী ছিলেন না। তাঁরা সংসার ধর্ম, জ্ঞানচর্চা এবং এমনকি জিহাদ চর্চাও করেছেন। এই সংগে আল্লাহর ইবাদত ও মানবতার সেবাই ছিল তাঁদের ব্রত। বাংলায় ইসলাম প্রচারে এই সুফীদের অবদানই

ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই বাংলার মুসলিম সমাজে সুফীদের জীবন চর্চার প্রভাব বেশী অনুভূত হয়েছে। কিন্তু সুফীগণ ইসলামী শরীয়তের বাইরে কোনো অভিনব ও কৃত্রিম জীবন যাপন করতেন না। তাঁরা ছিলেন আদর্শ মুসলিম এবং আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন কুরআনের সুরা আল কাসাসের ৭৭নং আয়াতে ‘আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আশ্বেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো, তবে সেই সংগে দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য অংশ ভুলো না।’ মর্মবাণীর যথার্থ আধার। তাঁরা সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করেননি। খিলাফতে রাশেদার চার পাঁচশো বছর পরে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক শাসকদের সাথে কোথাও তাঁরা কোনো আপোশ করেননি। বরং কবি ও দার্শনিক ইকবালের ভাষায় অনেক জায়গায় ‘সিকান্দাররা’ কালিন্দরদের কথায় ওঠাবসা করতেন। দিল্লীর খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী র., হযরত বু আলী কলন্দর র. আজমীরের হযরত খাজা মুইনউদ্দীন চিশ্তী র. এবং গৌড়ের হযরত শাহ নূর কুতুবুল আলম র. এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সুফীরা কখনো কোনো অন্যায়, জুলুম ও শোষণের সাথে আপোশ করেননি। তাঁরা ব্যাপকহারে জনগণকে ইসলামের তালিম ও তরবীযত দিয়েছেন এবং তাদের ইসলামী জীবন যাপনে সাহায্য করেছেন।

এই সুফীদের হাতে এক সাথে এত বেশী সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে যে, তাদের ইসলামী তালিম ও তরবীযত দেয়া এবং তাদের ইসলামী চরিত্র গঠন করা এই সীমিত সংখ্যক সুফীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যদিও পনের শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সুফী হযরত মীর সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর একটি পত্র থেকে জানা যায় ‘মোটকথা বাংলার বড় শহরের কথা বাদ দিলেও এমন কোনো ছোট শহর বা গ্রাম নেই যেখানে খোদাভীরু সুফীগণ আগমন ও বসতি স্থাপন করেননি’। তারপরও বলা যায় কুরআন ও সুন্নাহ চর্চার অবর্তমানে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারেনি। যার ফলে মুশরিকী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেড়া উপেক্ষা করে তারা ইসলামী মিল্লাতের আওতাভুক্ত হলেও গুদিক থেকে আসার সময় নিজেদের বহিরংগে মুশরিকী সভ্যতা সংস্কৃতির অনেক কিছু সাথে করে নিয়ে আসে। কালক্রমে এগুলো মুসলিম জীবন ধারায় জেঁকে বসে।

মূলত ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা ও জীবনাদর্শ যা মোটেই অনুষ্ঠান নির্ভর নয়। বরং কতিপয় বিশ্বাস ও বিশ্বাসভিত্তিক কর্মের ওপরই তা নির্ভরশীল। ইসলামের উৎস হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল। তৃতীয় কোনো সত্তার সাথে ইসলাম সরাসরি জড়িত নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সুফী দরবেশ বা উলামায়ে কেরামের যারাই জড়িত থাক না কেন সেক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও

সুন্নাহ চর্চার যতটুকুন কমতি থেকে গেছে তা ইসলামী ভিত্তির দুর্বলতা হিসাবেই চিহ্নিত হবে।

স্থানীয় কুকরী উপাদান

বাংলায় মুসলমানদে আগমন এবং ইসলামী আদর্শবাদের প্রসারের পূর্বে যেসব ধর্মমত বিস্তার লাভ করেছিল সেগুলির পেছনে কোনো পরিচিত ও পরীক্ষিত আসমানী কিতাবের সমর্থন ছিল না। বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ ও আর্থ ব্রাহ্মণ্যবাদেই এখানে প্রচলন ছিল বেশী। এই তিন বৃহৎ ধর্মমতের বাইরে কাল্পনিক দেবদেবীর পূজারও একটা ধারা প্রচলিত ছিল। মূলত সবগুলো ধর্মমতই ঈশ্বর আরাধনার নামে প্রকৃতি পূজা ও পুতুল পূজায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদিকে অশ্রান্ত মনে করতো। কিন্তু এর পেছনে কোনো শক্তিশালী ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারতো না। ফলে সেগুলো প্রায় গালগল্প, পুরাতন কাহিনী, নিছক নীতিকথা এবং দার্শনিক আলোচনার কচকচি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহর অস্তিত্বে বিভিন্ন জীব ও জড়কে শরীক করা এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাপক কুসংস্কারই ছিল ধর্ম। ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নানান বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রকৃত সত্যকে মেনে নেবার মতো মানসিকতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আর্থ ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতি বর্ণবাদের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে ফেলেছিল। মানুষ সরাসরি মানুষের দাসে পরিণত হয়েছিল। বরং একদল মানুষ সমাজে অন্ত্যজ ও মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। বিরোধী ধর্ম মত জৈন ও বৌদ্ধবাদও ধীরে ধীরে বর্ণভেদে প্রথার হাতে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছিল। অথবা কোথাও আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করে সহজিয়া ও তান্ত্রিক ইত্যাদি মতবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিল। অর্থাৎ ধর্মের নামে সমগ্র বাংলাদেশে ধর্মীয় অনাচার কুসংস্কার ও চারিত্রিক নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। এই ছিল তখনকার বাংলা সাহিত্য চর্চার পটভূমি বা পরিবেশ।

মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েকশো বছর পূর্ব থেকে ইসলাম প্রচারকদের এদেশে আগমন শুরু হয়। ইসলামের খালেস তৌহিদবাদ ও সামাজিক সাম্য বাংলার পৌত্তলিক সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সামাজিক অবিচার, জুলুম, নিপীড়ন এবং প্রশাসনিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী পরিবেশ হয়ে ওঠে। সর্বোপরি নিরাকার সর্বশক্তিমান একক স্রষ্টার আরাধনার ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকালে চতুরদিকে যখন ইসলামের

প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বেড়ে চলছিল তখনকার সমাজে ইসলামের শক্তির একটা অস্পষ্ট প্রভাব সমসাময়িক একটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। অজ্ঞতাবশত কবি রামাই পণ্ডিত তের শতকের শেষের দিকে লিখিত তাঁর এ কবিতায় ইসলামী আদর্শ ও সদ্যগঠিত মুসলিম সমাজের চিত্র সঠিক রূপে আঁকতে না পারলেও ইসলামের অসাধারণ ও যাদুকরী প্রভাব এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতাটির নাম নিরঞ্জনের রুম্মা। এ কবিতায় মধ্যযুগীয় ইউরোপের পোপ ও যাজকদের ক্ষমতার মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু পুরোহিতদের ক্ষমতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। জাজপুর তথা ওড়িশার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সঙ্ঘমীদের নিকট কর আদায় করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠী গলার পৈতা কানে বেড় দিয়ে বৌদ্ধ জনসাধারণকে শাপ শাপান্ত করে তাদের বাড়ি-ঘর আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। তাদের এ জ্বলুম উৎপীড়ন দেখে ধর্মদেবতা বৈকুণ্ঠে বসে এর প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করলেন। ধর্মরূপী মুসলমানরা জাজপুরে প্রবেশ করলো এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা রাতারাতি ধর্মাস্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। তারা দেউল ও দেব বিগ্রহ ভেঙে পুতুল পূজার অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণদের বিনাশ করলো। কবির কল্পনায় বিষয়টা এভাবে ধরা দিয়েছে :

ধর্ম হইল জ্বন রূপী মাথায়ত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান ।
চাপিয়া উত্তম হস্ত ত্রিভুবনে লাগে ড-এ
খোদায়ে বলিআ এক নাম ॥
(নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেষ্ট অবতার
মুখেত বলএ দম্বদার ॥
জথেক দেবতাগণ সভে হৈয়া একমুন
আনন্দেতে পরিলা ইজার ॥)
ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাষর
আদম্ব হইল শূলপানি ।
গনেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা ।
চন্দ্র, সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলে বাজাএ বাজনী ॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর ।

জথেক দেবতাগণ, সতে হয় একমন,
 প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
 দেউল দেহারা ভাঙ্গে, ক্যাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে,
 পাখড় পাখড় বোলে বোল ।
 ধরিআ ধর্মের পাএ, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
 ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

শব্দার্থ : দম্ভদার - দম-ই-মদার, বদরুদ্দীন মওলানা শাহ-ই মাদার, পনের শতকের লোক, এ অংশটি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত । আদম্ -আদম । পাখড়-পাকড়াও । কবির বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে: ধর্মদেবতা মাথায় কালো টুপি পরে ত্রিকচ অর্থাৎ তীরকাশ তথা তীরধারী কামান নিয়ে উন্নত জাতের অশ্বে আরোহন করে ত্রিভুবনে ভীতি সঞ্চারকারী ‘আল্লাহ্ আকবর’ ধ্বনি তুলে জবন তথা মুসলিম রূপ ধারণ করলেন । (নিরঞ্জন নিরাকার বেহেশতের অবতার হয়ে মুখে দম-ই-মাদার বলতে লাগলেন । সমস্ত দেবতা একমত হয়ে আনন্দে ইজার পরে নিলেন অর্থাৎ সবাই মুসলমান রূপ ধারণ করলেন ।) ব্রহ্ম মুহাম্মাদ হলেন, বিষ্ণু হলেন পয়গম্বর এবং মহাদেব হলেন আদম । পনেশ গাজী, কার্তিক কাজী এবং যত মুনি ঋষি ফকির দরবেশ সাজলেন । আপন বেশভূষা পরিত্যাগ করে নারদ শেখ ও পুরন্দর মওলানা সাজলেন । চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি আদি দেব পদাতিক হয়ে বাজনা বাজিয়ে তাদের সেবা করতে লাগলেন । চণ্ডিকা দেবী স্বয়ং হাওয়া বিবি হলেন আর পদ্মাবতী হলেন বিবি নূর, যত দেবতা ছিলেন সবাই এভাবে মুসলমান সেজে এক সাথে জাজপুরে প্রবেশ করলেন । তারা দেবালায় ও দেবগৃহ ভাঙলেন, মনের আনন্দে লুটতরাজ করে খেতে লাগলেন এবং সংগে সংগে অপরাধীদের ‘পাকড়াও পাকড়াও’ ধ্বনি তুললেন । এই দারুণ গণ্ডগোল দেখে রামাই পণ্ডিত ধর্মের পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং গান গাইলো ।

এতে বুঝা যাচ্ছে দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এবং ইসলামের ন্যায়ের দণ্ড তথা কথিত বর্ণবাদী সমাজের জুলুম, অবিচার ও উৎপীড়ন নির্মূল করে সমাজে শান্তি, সমতা ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনছে । মানুষ ইসলামের হক ও সাম্যের আহবান গ্রহণ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে ।

বাংলায় তুর্কীদের হাতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয় । তুর্কীরা পাঠান ও মোগলদের তুলনায় বেশি ইসলামী ভাবাপন্ন ছিলেন । ফলে বাংলায় আরব দেশের মতো না হলেও তাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটা ন্যায় ইনসাফ ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয় । ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল । সমাজে একটা ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হচ্ছিল ।

সেটা ছিল : মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই এক আদমের সন্তান। এক আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক। একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আরাধনা করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। সবাই তাঁর অনুগত। বাংলার বিশাল ভূখণ্ডে (অর্থাৎ বাংলা বিহার, ওড়িশা ও বৃহত্তর আসাম) এই তৌহিদী পরিবেশ দানা বেঁধে উঠছিল। কিন্তু যেহেতু বাংলা ভাষা তখনো স্থিতিশীলতা লাভ করেনি, তখনো সৃজ্যমান ছিল (কয়েকশো বছর আগের চর্যাপদের ভাষা দেখলে তা বুঝা যাবে) আর সৃজ্যমান ভাষায় বড় ও সৃষ্টিশীল কোনো কিছুর আশা করা যায় না, তাই এসময়কার সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থাকলেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবির রচনার সাক্ষাত পাওয়া যায় না। পনের শতক থেকে আমরা মুসলিম কবিদের একটা ‘ধারাবাহিকতা’ লক্ষ্য করি। শাহ মুহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, মুজাম্মিল তাদের অন্যতম। শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য ‘যুসুফ-জলিখা’ রচনা করেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০)। কবি জৈনুদ্দীন ছিলেন গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি। কবি মুজাম্মিল পনের শতকের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পনের শতক থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত যে অসংখ্য মুসলিম কবির সন্ধান পাই তাদের অন্যতম হচ্ছেন সৈয়দ সুলতান, (১৫৫০-১৬৪৮) শেখ ফয়জুল্লাহ, শুকুর মাহমুদ, (১৬৮০-১৭৫০) সাবিরিদ্দ খান, দোনাগাজী, বাহরাম খান, আফজাল আলী, মুহম্মদ কবীর, মুহম্মদ খান, (১৫৮০-১৬৫০) দৌলত কাজী, (১৬০০-১৬৩৮) আলাওল, (১৬০৭-১৬৮০) শেখ পরান (১৫৫০-১৬১৫) আবদুল হাকীম (১৬২০-১৬৯০) শাহ গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ ইয়াকুব, হায়াত মাহমুদ, মুহম্মদ মুকীম (১৭০০-১৭৭৫), সায়্যিদ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫) প্রমুখ।

মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিশেষ করে এদেশের অমুসলিম সমাজের সহযোগিতায় বিদেশী খৃষ্টান বণিক ইংরেজরা দেশের শাসন যন্ত্র দখল করে। ফলে উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে বাংলা ভাষার নিত্য ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দগুলো দুই হাতে বাদ দিয়ে মৃত সংস্কৃত ভাষার অপ্রচলিত ও অপরিচিত কঠিন শব্দসম্ভারে ভারাক্রান্ত করে একটা নতুন বাংলা গদ্য তৈরি করা হয়। অতপর এ ভাষায় গদ্য ও পদ্য লেখার কাজ চলে। ইংরেজের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকার কারণে মুসলমানরা প্রথমে এ বিষয়ে উদাসীন থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাদের এক ধাপ পিছিয়ে আসতে হয়। ইংরেজের সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বীণিত হিন্দু মনীষার কারণে হিন্দু ঐতিহ্য এই সাহিত্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। তবু ও এই উনিশ শতকে যেসকল মুসলিম কবি

সাহিত্যিকদের জন্ম হয়েছে তারা এর মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র পথটি তৈরি করার প্রচেষ্টা চালান। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকের নাম এখানে উল্লেখ করছি এঁরা হচ্ছেন ঔপন্যাসিক প্রবন্ধকার মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), প্রবন্ধকার শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক মণ্ডলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ((১৮৭৫-১৯৫০), কবি প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), প্রবন্ধকার ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), কথাশিল্পী এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ঔপন্যাসিক নজীবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), কবি শেখ ফজলুল করীম (১৮৮২-১৯৩৬), ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কবি কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কবি ও ঔপন্যাসিক শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫)।

মুসলিম সাহিত্যের উপাদান

মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা যখনই সাহিত্য ময়দানে পদার্পণ করেছেন তাদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ও সচেতনতা লক্ষ্য করা গেছে। তাদের একটা বিশিষ্ট অংশ নিজেদেরকে নিছক কবি সাহিত্যিক মনে করেননি। তাঁরা মনে করেছেন বাংলার এই কুফরী সমাজে যেমন তাদের একক তৌহিদবাদী হিসাবে টিকে থাকতে হবে তেমনি এখানে কুফরীর গলদ চিহ্নিত করাও তাদের দায়িত্ব। এজন্য তারা একই সংগে ভাষার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। যে ভাষায় ইসলামী আদর্শ ও আচরণ প্রকাশ এবং তার বিকাশ সাধন করা যায় সে ভাষা প্রয়োগ করার কথা তারা চিন্তা করেছেন। যেমন

দেশেত আলিম থাকি যদি ন জানায়।

সে আলিম নরকেত যাইব সর্বথায়॥

নর সবে পাপ কৈলে আলিমের ধরি।

আল্লাহর সাক্ষাতে মারিবেস্ত দণ্ড বেড়ি ॥

তোম্বারা সবের মেলে মোর উৎপন।

তেকারনে কহি আমি শান্ত্বের বচন ॥

আল্লায় বলিব তোরা আলিম আছিল।

মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ ন কৈলা ॥

আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব ।

পরের পাপের লাগি লাঘব পাইব ॥

(শব-ই-মিরাজ : সৈয়্যদ সুলতান)

কবি সৈয়্যদ সুলতান যেমন হিন্দু ধর্ম কাহিনী ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইসলামী কাহিনী ও প্রস্তাব বাংলায় লিখে প্রচার করেছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর শাগরিদ কবি মুহম্মদ খান পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘মকতুল হুসৈন’ এও এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন । এ গ্রন্থটি রচিত হয় ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে । এতে বলা হয় :

হিন্দুস্থানে লোকে সবে ন বুঝে কিতাব ।

ন বুঝি শুনি নিত্যি করে মহাপাপ ॥

তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালী রচিলুং ।

ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কিছু ন জানিলুং ॥

পঞ্চালী পড়িতে সবে মনে ভয় পাই ।

অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই ॥

কিভাবে আল্লার আজ্ঞা শুনিবেস্ত যবে ।

দান ধর্ম পুণ্য কর্ম করিবেস্ত তবে ॥

অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ ।

মহাজন আশীর্বাদ ঋণ্ডিবে প্রমাদ ॥

বিশেষ পীরের আজ্ঞা ন যায় লঙ্ঘন

রচিলুং পাঞ্চালিকা তাহার কারম ॥

শেখ মুত্তালিব (১৫৯৫-১৬৬০) লিখছেন :

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ ।

তেকারনে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥

মুছলমানী শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করলু ।

বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥

কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়া মনান্তরে ।

বুঝিয়া মুমিন দোয়া করিব আমারে ॥

মুমিনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক ।

অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক ॥

এসব জানিয়া যদি করয়ে রক্ষণ

তবে সে মোহোরে পাপ হইবে মোচন ॥

(কিফায়িতুল মুসল্লীন)

মধ্যযুগের মুসলিম কবি সাহিত্যিকরা তাদের জীবন ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা তাদের সাহিত্যে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কেবলমাত্র মানব মানবীর প্রেমোপাখ্যান লিখেই তারা নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেননি। এইসঙ্গে তারা ইসলামী শরীয়ত, হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিম পৌরাণিক কাহিনী, হিন্দুদের পৌরাণিক ও আজগুবি সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনায় সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন ও সুফীতত্ত্ব, মুসলিম ঐতিহাসিক কাব্য, রূপক সাহিত্য তথা একপ্রকার রূপকের মাধ্যমে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা, মর্সিয়া সাহিত্য, মারফতী ইত্যাদি ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন গান রচনা করেন। তাদের এতদসম্পর্কিত কিছু গ্রন্থের নামোল্লেখ করলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা আরো একটু সুস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়। যেমন

শরীয়ত নামা- নসরুল্লাহ খান

নসীহত নামা-শেখ পরান

কিফায়িতু-ল-মুসল্লীন-শেখ মুস্তলিব

হিদায়িতু-ল-ইসলাম-নজরুল্লাহ খান

নামাজ মাহাত্ম্য- মুহাম্মদ জান

শিহাবুদ্দীন নামা-আবদুল হাকীম

হিতজ্জান বাণী- হায়াত মাহমুদ

নবী বংশ- সৈয়দ সুলতান

রসূল বিজয়- ঐ

শব-ই-মিরাজ- ঐ

ওফাত-ই-রসূল- ঐ

ইবলিস নামা - ঐ

আশ্বিয়া বাণী- হায়াত মাহমুদ

কিয়ামত নামা -মুহম্মদ খান

নূর নামা (সৃষ্টিতত্ত্ব)- শেখ পরান

নূর নামা (সৃষ্টিতত্ত্ব)- আবদুল হাকীম

জ্ঞান প্রদীপ (সুফীতত্ত্ব) - সৈয়দ সুলতান

কারবালা (মর্সিয়া সাহিত্য) -আবদুল হাকীম

জঙ্গনামা - গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব

সায়াত্ননামা (জ্যোতিষ শাস্ত্র) - মীর মুহাম্মদ শফী

এ ধরনের ইসলামী জ্ঞান ও মুসলিম জীবন সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ তারা রচনা করেন। তাদের লেখনীর সাহায্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার একটা সাগর সৃষ্টি হয়।

তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মুসলিম কবিদের এই ইসলাম চর্চার সাথে খালেস তৌহীদের সম্পর্ক যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পর্ক সৃষ্টিাত্মিক মরমীবাদের। বাংলার কবিদের কাব্যচর্চার ওপর ইরানের প্রভাব ব্যাপকতর। সে তুলনায় আরবীয় প্রভাব অতি সামান্যই। আর ইরানী প্রভাব মানেই হচ্ছে ইরানী সাহিত্যে যে মাশশায়ী, ইশরাকী ও ইরফানী ইত্যাদি এরিস্টটলীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিবাদী দর্শন এবং তাসাউফের গূঢ় রহস্যভিত্তিক মরমীবাদের প্রসার ঘটে তারই প্রভাব বাংলার কবিদের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে।

আব্বাসীয় আমলে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে গ্রীক দর্শনের আলোচনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী ও ফখরুদ্দীন রাযীর আক্রমণাত্মক ভূমিকার ফলে মাশশায়ী দর্শন ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেললে ইশরাকী ও ইরফান তাসাউফ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইশরাকী তাসাউফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ শিহাবুদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে হাবস ইবনে আমীরাক সোহরাওয়ার্দী (৫৪৯হি: - ৫৮৭ হি:)। রেই, হামেদান, কাযভীন ইত্যাদি ইরানের বিভিন্ন শহরে তাসাউফের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা গড়ে ওঠে। ফারসী সাহিত্য মূলত তাসাউফের এই ভাবধারাগুলির মধ্যেই বিকশিত হয়। পনের শতকের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে শুরু করে উনিশ শতকের বাংলার কবিদের মধ্যে এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইরানী কবিদের সাথে তারা গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন 'ইউসুফ জুলিখা' সহ ইরানী কবিদের অনেকগুলি কাব্য তারা বাংলায় অনুবাদ করেন। এমনকি অনেকে তাদের আদলে কাব্য ও কবিতা চর্চা করেন। এখানে পীরের নির্দেশে গ্রন্থরচনার কথা অনেক কবিই বলেছেন। পনের শতকের কবি লিখেছেন:

শাহা বদরুদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি।

শতমুখে সে বাখান কহিতে ন পারি ॥

তাহান আদেশ-মালা শিরেতে ধরিয়া।

রচিলেন্ত মুজাম্মিলে মনে আকলিয়া ॥

(সায়াতনামা)

পীর শাহ দৌলার আদেশে কবি শেখ চান্দ লিখছেন :

ফতে মোহাম্মদ সুত শেখ চান্দ নাম।

গুরুর আঙ্জায় পঞ্চগলী রচে অনুপাম ॥

কাছাছুল আশিয়া এক বিতাবেত গুনি।

পঞ্চগলী বাঁধিয়া তাকে পুস্তকেত ভনি ॥

মূলত মধ্যযুগের বাংলা কবিতা তাসাউফের চত্বরে ঘোরাফেরা করে। ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান কবিরা যখন বাইবেলের মধ্যে ডুব দেয়, বাইবেল চর্চা করে এবং বাইবেল থেকে পথ নির্দেশনা নেবার চেষ্টা করে তখন এশিয়ার মুসলিম কবিরা ডুব দেয় তাসাউফের মধ্যে। তাসাউফের মধ্যে জীবন দর্শনের চিত্র অংকন করে। তাসাউফকে কুরআনের নির্ধারিত বিবেচনা করে। ফলে কুরআন থেকে পথ নির্দেশনা নেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা মধ্যযুগের কবিরা কুরআন ও ইসলামের নামে যা কিছু বলেছেন তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের চিন্তা থেকে নয়। বরং ইরানী সাহিত্যের মধ্যস্থতায় তাসাউফের জারক রসে সিক্ত করে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয়েছে -

‘হস্ত কুরআঁ দর যবানে পাহলভী’

মসনবী-ই-মানবী-ই মৌলভী

অর্থাৎ ‘পাহলবী তথা ফারসী ভাষায় মওলানা রুমীর মসনবীই হচ্ছে কুরআন মজীদ।’

অথচ অন্যদিকে ইমাম গাজ্জালী র. মওলানা রুমীর এই মসনবীর চিন্তা উজ্জ্বল (সাম্য) গান ও নাচের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ কোনো গ্রন্থই কুরআনের সমান্তরাল হতে পারে না।

তাসাউফের চিন্তার জটিলতার কারণে পনের ঘোল শতকের বাংলার কিছু মুসলিম কবি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসে আপুত হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেন। তারা এটাকে শির্ক মিশ্রিত এবং মুসলিম জীবন ধারা থেকে বিভিন্ন মনে করতে পারেননি। আশ্রয় যে খালস তৌহীদের কথা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, শিরক ছাড়া অন্য সমস্ত গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন, সেই শিরক থেকে আমাদের জীবনকে যেমন মুক্ত রাখতে হবে তেমনি সাহিত্যও হবে তা থেকে মুক্ত।

আধুনিক পরিবেশ ও আধুনিক সাহিত্য

উনিশ শতক থেকে এদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। এ আধুনিকতার সম্পর্ক ইংরেজী সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় চিন্তার সাথে কবিতার আংগিকে কাঠামোয় এবং চিন্তায় যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি নতুন গদ্যভংগী রচিত হয়। উপন্যাস, প্রহসন, নাটক ইত্যাদি কথাসাহিত্যের একটি ধারা সৃষ্টি হয়। সমগ্র সাহিত্য জগতে যেন নতুন জোয়ার আসে। মুসলিম সমাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় মুসলিম সাহিত্যিকরা প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা ভাষার ওপর থেকে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রভাব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে তাদের নিজেদের পৌরাণিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের মধ্যে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় বড় বড় প্রতিভার জন্ম হয়। যথার্থই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির উচ্চ সোপান অতিক্রম করতে থাকে।

এসময় মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে এগিয়ে আসেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। তিনি নতুন ভাষার ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর পরে শক্তিশালী লেখক হিসাবে এগিয়ে আসেন মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কবি ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ঔপন্যাসিক নজীবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কবি শাহাদত হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি ও প্রবন্ধকার গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪), ইত্যাদি অসংখ্য শক্তিশালী সাহিত্যিকবৃন্দ। তাঁরা সবাই নিজেদের সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিকভাবে প্রবল। তাই সাহিত্য জগতে তাঁরা প্রতিবেশীদের তুলনামূলক উন্নতমানের সাথে সহাবস্থান করেও মুসলমানদের জন্য একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।

এই সময় আগমন হয় বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬)। ভাষার ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক প্লাটফর্মের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি মুসলিম ঐতিহ্যে ফিরে যাবার সকল প্রচেষ্টা গুরু করেন। তাঁর প্রতিভা প্রতিপক্ষ প্রতিবেশীদের হৃদয়ও স্পর্শ করে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করে তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের বাগা সমুন্নত করেন। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংগীত তাঁর অমর কীর্তি। নজরুলের পরে কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৩) তাঁর সাহিত্যধারাকে আরো পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ফররুখ ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যকে পূর্ণরূপে বিকাশিত করেন।

১৯১৭ সালে বাশিয়ায় লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট বিপ্লব হবার পর এর প্রভাব সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ শতকের জার্মান চিন্তাবিদ কার্লমার্কস ও ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস ছিলেন এই বিপ্লবী চিন্তাধারার উদগাতা। তাঁরা অর্থনৈতিক বঙ্কন ও শোষণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের ডাক দেন। আসলে কমিউনিষ্ট ভাবধারা একটা

অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। একে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করেন। একদল সাহিত্যিকের মাধ্যমে শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তা এবং এই সংগে নিরীশ্বরবাদিতা ও ধর্ম আফিমের ন্যায় এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেন। এরি ভিত্তিতে তারা দুনিয়াব্যাপী একটি সাহিত্যের আবহ তৈরিতে মেতে ওঠেন। মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে তারা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ হয়ে যান। মার্কসবাদ একটা অলীক কল্পনায় পরিণত হয়। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যকে তারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এখন কয়েক প্রজন্ম ধরে। তারা সাহিত্য থেকে আল্লাহকে বিদায় দিয়েছেন। সাহিত্যের পরতে পরতে শ্রেণী সংগ্রাম প্রবেশ করিয়ে একটা হিংসাত্মক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা মানবতাবাদের কথা বলেন। কিন্তু তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সবচেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে মানবতা। তারা মানুষকে কোনো এক পর্যায়ে নিয়ে স্থিতিশীল করতে পারেননি। মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে কার কাছে আশ্রয় নেবে? এক আল্লাহকে ত্যাগ করলে অসংখ্য আল্লাহ এসে যায়। দেশ এক আল্লাহ, পাটি এক আল্লাহ, প্রেসিডিয়াম এক আল্লাহ— এভাবে ক্ষমতাধর প্রত্যেকেই এক এক আল্লাহ। এই স্বৈরাচারী আল্লাহদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা মার্কসবাদী সাহিত্যের নেই।

বিগত শতকের শেষার্ধব্যাপী এই মার্কসবাদী সাহিত্যের দাপাদাপি বাংলার মুসলিম সাহিত্য অংশে অশনি সম্পাতের মতো অনুভূত হচ্ছিল। মুসলিম ঘরানার বহু সাহিত্যিক ইসলামী আদর্শবাদ ত্যাগ করে এদিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। মার্কসবাদের পতনের পর তাদের পালে আর হাওয়া বইছে না। তবুও তারা মার্কসবাদের মূল ভিত্তি সেকুলাবাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। অনেকে ইসলামী আদর্শবাদের আওতায় ফিরে আসছেন।

তবে ইসলামী আদর্শবাদও বিশ্বাসের নতুন বলয় সৃষ্টি করে ময়দানে নতুন করে জেগে উঠছে। আমাদের পূর্বসূরীদের বিগত হ'সাতশো বছরের প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রবাহ এ বলয়কে শক্তিশালী ভিত্তিদান করেছে। কুরআন ও হাদীস অবিকৃত থাকার এবং তাদের সাথে আমাদের আবেগগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ গড়ে ওঠার কারণে আজ সেখান থেকে পথনির্দেশ লাভ করা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। ইসলামী সমাজ চিন্তা যেমন নতুন করে নব উদ্যমে বলীয়ান হচ্ছে তেমনি ইসলামী সাহিত্য চিন্তাও তার সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবে।

হাজার বছরের বাংলা কবিতা - একটি আলোচনা

মুহম্মদ মতিউর রহমান



হিমালয়ের পাদদেশে বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে নদী-বিধৌত পলিমাটির নরম আন্তরণের উপর গড়ে ওঠা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা উর্বরা বাংলাদেশ। এর বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, উপনদী-শাখানদী। অসংখ্য ডোবা-নালা, খাল-বিল-হাওড়ে পরিপূর্ণ এ দেশ। এ সব নদ-নদী, ডোবা-নালা, খাল-বিল-হাওড়ে আগে সংবৎসর পানি থাকতো। পানিতে ছিল নানা জাতের পর্যাপ্ত সুস্বাদু মাছ। জেলেরা মাছ ধরতো, ছোট ছেলেমেয়েরা পানিতে খেলা করতো, বৌ-ঝিরা কলসী কাঁখে পানি নিয়ে ঘরে ফিরতো, কৃষি জমিতে পানি সেচে সবুজ ফসলে তা পূর্ণ করে তুলতো। মাঝিরা গলা ছেড়ে ভাটিয়ালী গান গেয়ে হরেক রকম নৌকা বেয়ে চলতো, বিচিত্র বর্ণের পালতোলা নৌকার ভীড়ে নদী-নালা, ঘাট-বাট অপূর্ব শোভা ধারণ করতো। সওদাগরেরা বর্ষায় বিভিন্ন পণ্যের পশরা সাজিয়ে নৌকায় করে তা ঘরে ঘরে ফেরি করে বেড়াতো। বর্ষাকালে নৌকা বাইচ ও নাইওরের ধূম পড়ে যেত। ক্ষেত-খামার, পথ-ঘাট, সবুজ জনপদ তখন পানিতে ডুবে একাকার হয়ে যেত-যেন এক মহাসাগরের বুকে ভাসমান মহাজনপদ। ফারাক্কার কারণে সে সম্পন্ন বাংলার রূপ এখন যদিও অনেকটাই বিবর্ণ, তবু তা একেবারে অন্তর্হিত নয়।

১.১ নানা বর্ণের অসংখ্য সুবাসিত ফুল, নানা স্বাদের টসটসে সুমিষ্ট ফল, নানা জাতের ফসলে পূর্ণ মাঠ। অসংখ্য রঙ-বেরঙের পাখির কল-কাকলীতে মুখরিত সবুজ প্রকৃতি। আনন্দ-কোলাহলে-উৎসবে মেতে ওঠা বাঙালির কণ্ঠে তাই স্বভাবতই সুর আর ছন্দের দোলা। বাঙালি তাই জন্মগতভাবেই কবি।

১.২ বাংলা এক সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ। এই সমৃদ্ধির বৈভব, সবুজ প্রকৃতির মনলোভা সৌন্দর্য আর উর্বরা মাটির মাণ শুঁকে শুঁকে বহু কাল আগে থেকেই নানা দেশ থেকে নানা জাতি ও ধর্মের লোক এসে এখানে বসতি গড়ে তুলেছে। এসেছে শক-হুন-দ্রাবিড়, জৈন-ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-মুসলিম, আর্য-অনার্য, আরবি-তুর্কি-ইরানি ইত্যাদি সব জাতি-ধর্ম-বর্ণের লোক মিলে গড়ে উঠেছে বাংলা জনপদ। নদী ভাঙ্গনের মত এখানে যুগে যুগে যেমন বিভিন্ন ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিলয় ঘটেছে আবার তেমনি চর জেগে ওঠার মত নতুন ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির পত্তন ঘটেছে।

১.৩ অনার্য বাংলায় কখনো চলেছে আর্য শাসন, কখনো জৈন, কখনো বৌদ্ধ, কখনো আর্য-ব্রাহ্মণ্য, কখনো মুসলিম, কখনো ফিরিজি শাসন। কখনো অখণ্ড ভারতের অংশ, কখনো ঋগু-বিখণ্ড বাংলা। ১৯৪৭ সনে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। ১৯৭১ সনে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। বাংলাদেশ নতুন হলেও এর ভৌগোলিক অস্তিত্ব অনেক পুরনো, এর ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। বাংলা বহু ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির লালনক্ষেত্র হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে মুসলিম শাসন কায়েম হয়, তারই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বাংলা হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ। ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিই জনপদের বিশিষ্ট পরিচিতি ও ভবিষ্যত রূপরেখা নির্মাণ করে। এরই ফলে ১৯০ বছরের ফিরিজি শাসনের অবসানে এ জনপদ ১৯৪৭ সনে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে ১৯৭১ তে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

২.০ বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রাপ্ত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বৌদ্ধ-পাল যুগে সৃষ্ট এ ভাষার বয়স সহস্রাধিক বছর। বাংলার ভৌগোলিক সত্তা যতটা পুরনো, বাংলা ভাষা ততটা নয়। এদেশে প্রচলিত সর্বপ্রাচীন ভাষাকে বলা হয় প্রাচীন প্রাকৃত। প্রকৃতি থেকে প্রাকৃত অর্থাৎ সেকালে প্রাকৃতজন তথা সাধারণ গণ-মানুষের মধ্যে প্রচলিত যে ভাষা তাকেই বলা হতো প্রাচীন প্রাকৃত। এ ভাষার কোন নিদর্শন বা লিখিত রূপ নেই। বৈদিক যুগে এ প্রাকৃতজনের ভাষাকেই কিছুটা সংস্কার বা পরিমার্জিত করে যে ভাষার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সংস্কৃত ভাষা। এ ভাষায়ই মহাকবি বাণীকি 'রামায়ণ' এবং মহাকবি ব্যাস 'মহাভারত' রচনা করেন।

সংস্কৃতের পরে বহু শতাব্দীর বিবর্তনে জন্ম হয় পালি ভাষার। এ ভাষাতেই রচিত হয় গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব 'ত্রিপিটক'।

২.১ ভাষা নদীর মতোই প্রবহমান। পর্বত-শৃঙ্গ থেকে উৎসারিত হয়ে বন-জঙ্গল-জনপদ, মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে মহাসमुদ্রের বুকে অন্তর্গত হয়ে নদীর পরিসমাপ্তি ঘটে। স্রষ্টার অপরিসীম কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ ভাষার জন্ম তেমনি মানুষের মনে, তারপর মুখ দিয়ে তার উৎসার। এভাবে জনে জনে, কালে কালে, নানা জনপদে তার বিস্তার। নদী যেমন পর্বত থেকে উৎসারিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হওয়া পর্যন্ত বাঁকে বাঁকে রূপ বদলায়, নানা শাখা-প্রশাখার জন্ম দেয়-ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশও তেমনি মহাকালের পথ ধরে মানুষের মুখে মুখে। তাই কাল ও অঞ্চলভেদে এর রূপ বদলায়। কালক্রমে পালি ভাষাও তেমনি নতুন রূপে আবির্ভূত হয় 'আধুনিক প্রাকৃত' নামে। অঞ্চলভেদে এ ভাষাকে 'মাগধী প্রাকৃত' ও 'গৌড়ী

প্রাকৃত' নামে অভিহিত করা হয়। আধুনিক প্রাকৃত কালে কালে বিকৃতির শিকার হয়ে বা পরিবর্তিত হয়ে যে ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে তার নাম 'অপভ্রংশ'। অপভ্রংশ থেকে কাল-পরিক্রমায় জন্ম হয় বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া ও অহমিয়া ভাষার। তাই এ চারটি ভাষাকে বলা হয় 'Sister languages' বা পরস্পর দুহিতা। অঞ্চলভেদে অপভ্রংশ ভাষার যে রূপ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, সে ভিন্নতা ধারণ করেই উপরোক্ত চারটি ভাষার জন্ম। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অষ্টম থেকে একাদশ এবং কারো কারো মতে নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এ ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছে।

২.২ অবশ্য ভাষার জন্ম মানুষ বা কোন প্রাণীর জন্মের মত পঁজি-পুঁথির হিসাব মেনে চলে না। তাই বাংলা ভাষার জন্ম ঠিক কখন হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। কালে কালে মুখে মুখে প্রচারের ফলে কোন একটি ভাষার জন্ম-লগ্নু আস্তে আস্তে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলার জন্মও হয়েছে সেভাবে। তবে বৌদ্ধ পালরাজাদের শাসনামলে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে এবং সে আমলেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, এ ব্যাপারে সকল ভাষাতাত্ত্বিকেরাই একমত।

২.৩ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সনে নেপালের রাজ-দরবার থেকে কিছু পুরনো কাগজ-পত্রের সাথে 'চর্যাপদ', 'ডাকার্পব' ও 'দোহাকোষ' নামে তিনটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এ তিনটি স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি একত্র করে তিনি ১৯১৬ সনে 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ দোহা ও গান' নামে প্রকাশ করেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদসহ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এ নব-আবিষ্কৃত বইয়ের ভাষা বাংলা। অনুরূপভাবে আসামের লোক দাবি করলো এটাকে অহমিয়া বলে, উড়িয়ারা দাবি করলো ওড়িয়া বলে, মৈথিলী ভাষীরা দাবি করলো এটাকে মৈথিলী বলে এবং হিন্দি ভাষীরাও এটাকে হিন্দি ভাষার আদি রূপ বলে দাবি করলো। মূলত প্রত্যেকের দাবিই অংশত সত্য। কারণ এ সবগুলো ভাষার মূল এক অর্থাৎ অপভ্রংশ। তাই উপরোক্ত সবগুলো ভাষার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শব্দগত ও ব্যাকরণগত কিছু কিছু মিল এতে থাকাই স্বাভাবিক।

২.৪ যাইহোক, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসাবে আজ একমাত্র এটাই চিহ্নিত। আরো কিছু থাকলে এবং নিশ্চয়ই তা ছিল, তা সবই কালের কালো আঁধারে ঢাকা পড়ে গেছে অথবা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ সেন আমলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৌদ্ধ দোহা ও গান-যা সংক্ষেপে চর্যাপদ নামে খ্যাত- তাতে মোট ছেচল্লিশটি পূর্ণ ও একটি অর্ধ-ছেঁড়া পদ বা গান পাওয়া গেছে। সর্বমোট চব্বিশ জন পদকর্তা এর

রচয়িতা। কয়েকজন বিশিষ্ট পদকর্তা হলেন : লুইপাদ, কারুপাদ, সরহপাদ, শবরীপাদ, জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপা, চাটিল্পপাদ, ডোম্বিপাদ, কষলিপাদ, টেণ্টপাদ প্রমুখ। এদের মধ্যে সর্বাধিক পদের রচয়িতা হলেন কানুপা, কারুপা বা কারুপাদ। চর্যাপদের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময়তা বা ধাঁধার মাধ্যমে জীবনের চরম সত্যকে উদ্ঘাটনের প্রয়াস বিদ্যমান। এখানে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এক নম্বর চর্যাপদের নাম : ‘লুই পাদানাম’। রাগ পটমঞ্জরী। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মূলত গান হিসাবেই এটা রচিত। সবগুলো চর্যাপদই মূলত গান। লুইপা বা লুইপাদ লিখেছেন :

কাআ তরুণবর পাঞ্চ বিড়াল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ!
লুই ডনই গুরু পুছিঅ জান।।
সঅল সমাহিত কাহি কবিঅই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই।।
এড়িঅউ ছান্দ বান্ধ করণ কপটের আস।
সুনু পাখ ভিড়ি লাহরে পাস
ভণই লুই আমহে কানে দীঠা।
ধরণ চরণ বেগি পিণ্ডী বইঠা।।

৭ নম্বর চর্যাপদের রচয়িতা কানুপা, কারুপা বা কারুপাদ। এটিও পটমঞ্জরী রাগে গাওয়া গান। কবি বলেন :

আলিএ ‘কালিএ’ বাট রুঙ্কেলা।
তা দেখি কারু বিমনা ভইলা।।
কারু কবি গই করিব নিবাস।
জো মণ গোঅর সো উআস।।
তে তীনি তে তীনি তীনি হো ভিন্না।
ভণই কারু ভব পরিচ্ছন্না।।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কারু বিমণা ভইলা।।
হেরি সে কারু নিঅড়ি জিনউর বটই।
ভণই কারু মো হি অহি ন পইসই।।

২.৫ চর্যাপদের রচয়িতাগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মযাজক বা সিদ্ধাচার্য। তাঁদেরকে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী সন্ন্যাসীও বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের আচরণ-বিধির ছদ্মাবরণে এতে কোথাও কোথাও নিসর্গ বর্ণনা, মানবীয় সুখ-দুঃখ, লাঞ্ছনা-দুর্গতি ও প্রেমাণুভূতির

প্রকাশ ঘটেছে। ফলে মানবিক আবেদন ও সৌন্দর্যবোধের কবিত্বময় বর্ণনা আছে এতে। ২ নম্বর চর্যাপদে তৎকালীন সমাজে যে চোর-ডাকাতের উল্লেখ ছিল তার বর্ণনা আছে নিচের দু'টি লাইনে :

সসুরা নিদগেল বহুড়ী জাগঅ।

কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ।।

শাশুড়ি নিদ্রিতা, বউ জেগে আছে। চোর এসে তার কানের দুল, কাখই (চিরুণী) সব নিয়ে গেল।

পাঁচ নম্বর চর্যাপদের দু'টি লাইন :

ভবনই গবন গম্ভীর বেঁগে বাহী।

দুআস্তে চিখিল মাঝে পার ন থাহী।।

ভবনদী গহীন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত, দু'পাড়ে কাদা, মাঝে অথই পানি। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বর্ষার দু'কূল প্লাবনকারী প্রমত্তা নদীর বর্ণনা আছে। আবার এই গূঢ়ার্থে পার্থিব জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

নয় নম্বর চর্যাপদ থেকে দু'টি লাইন উদ্ধৃত করছি :

জিম জিম করিনা করিনিরে রিসঅ।

তিম তিম তথতা মদগল বরিসঅ।।

হস্তি হস্তিনীকে দেখে মদমত্ত হয়ে ছুটে যায়। নৈরাশ্রা সান্নিধ্যে তিনি তথ্যমদ বর্ষণ করেন। এখানে যেমন একটি সাধারণ অর্থ আছে, রূপকার্থেও এর তেমনি অন্য একটি অর্থ আছে।

দশ নম্বর চর্যাপদে নৃত্য-পটয়সী ডোমনী রমণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

নগর বাহিরে ডোমী তোহোরি কুড়িআ।

ছুঁই ছুঁই যাইসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।।

নগরের বাইরে ডোমনী তোমার কুঁড়ে ঘর। নেড়ে ব্রাহ্মণ তোমার আশপাশেই ঘোরাফিরা করে। কারণ—

একাস পদমা চৌষঠা পাখুড়ী।

তহিঁচড়ি নাচঅ ডোমী বাপুড়ী।।

একটি পদ্যে চৌষষ্টি পাপড়ি। তাতে চড়ে নাচে ডোমনী। এমন নৃত্য-পটয়সী রমণীর নৃত্য উপভোগের জন্য সাধারণ লোক তো বটেই নেড়ে ব্রাহ্মণও তার বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করে। এর দ্বারা সেকালে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও সংস্কৃতি চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। তেত্রিশ নম্বর পদের কয়েকটি লাইন :

টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেষী।।

বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ ।
দুহিল দুধ কি বেণ্টে ষামায় ।।
বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে ।
পিটা দুহি এ ভিনা সাঁঝে ।।

কবি বলছেন, টিলার উপর আমার ঘর, আমার কোন প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই, প্রত্যহ উপবাস করে কাটাই। বেঙের মত (লাফিয়ে লাফিয়ে) আমার সংসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দোহানো দুধ কি পুনরায় বাঁটে সাক্ষ্যায় (চুকে পড়ে)? বলদ প্রসব করলো অথচ গাভী বাঁঝা (বক্ষ্যা)। তিন বেলা সমানে দুধ দোহন করা হয়।

আটাশ নম্বর পদের রচয়িতা শবরীপাদের নিম্নোক্ত কয়েকটি লাইন কী অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ!

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী ।
মোরঙ্গিপিচ্ছ পরিহিন সবরী গীবত শুঞ্জরী মালী ।।
উমত সবর পাগল সবর ।
মাকর গুলী শুহাড়া তৌহোরী ।।
নিভ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী ।
নানা উরুবর মৌলিলরে গঅনত লাগেলী ডালী ।।
একেলী সবরী এ বন হিন্দি কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ।

কবি বলছেন, উঁচু উঁচু পাহাড় সেখানে শবরী বালিকার বাস। তার পরিধানে ময়ূরের বহু বর্ণ পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা। হে উন্মত্ত পাগল সবর, তুমি গোল বাঁধিও না, এ তোমার জ্বী, এর নাম সহজ সুন্দরী। গাছে মুকুল ধরেছে আর গগন স্পর্শ করেছে তাদের শাখা। একেলা শবরী এ বনে বিহার করে, সে কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী।

কী অপরূপ বর্ণনা! যেমন প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়, অপরূপ বেশে সজ্জিতা তন্ত্রী তরুণীর সৌন্দর্য বর্ণনায় আর তেমনি প্রেমমুগ্ধ কবির বিহ্বল চিন্ত-চাঞ্চল্যের অকপট প্রকাশে কবির বর্ণনা অসাধারণ হয়ে উঠেছে। কবিতার লালিত্যময় ঝংকৃত ব্যঞ্জননাও পাঠকের চিন্তকে আকর্ষণ করে।

কবি কঞ্চলিপাদের একটি কবিতার দু'টি লাইন উদ্ধৃত করে এ পর্যায়ে আলোচনা শেষ করতে চাই। কবি বলেন :

সোনে ভরিভী করুণা নাবী ।
রূপা থুই নাহিক ঠাবী ।

কবি বলছেন, আমার করুণা নামের নৌকা সোনায় সোনায় পূর্ণ। সেখানে রূপা ধারণের জায়গা নেই। এখানে পরিচিত রূপক-উপমা ব্যবহার করে যে মনোমুগ্ধকর কাব্য-কর্মের অবতারণা করা হয়েছে তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে

তেমনি এ চরণ দু'টি পাঠে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতার কথা স্বতঃই স্মরণ হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী/আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।' তখন চর্যাপদের এ বিখ্যাত দু'টি চরণের শব্দগত ও উপমাগত ব্যঞ্জনা ও অনুরণন স্বতঃই আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে। হাজার বছরের ব্যবধানে জন্ম নেয়া দুই বাঙালি কবির কল্পনা ও বর্ণনায় কী আশ্চর্য মিল!

চর্যাপদ ছাড়া পাল যুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের আর কোন নির্দশন পাওয়া যায় না। তার অর্থ এ নয় যে, এ যুগে আর কিছু রচিত হয়নি। পাল রাজত্বকালে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তখন অনেক উন্নতি হয়েছিল। 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র খ্যাতি ছিল জগৎ-জোড়া।

পালরা ছিলেন বৌদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির সুখ্যাতির জন্য আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণগণ তখন পাল তথা বাংলার প্রতি ছিলেন ঈর্ষাকাতর। এদেশ জয় করার জন্য তারা বহুবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। এ ব্যর্থতার কারণে পালদের বিরুদ্ধে ক্রমাগতই তাদের ক্ষোভ, আক্রোশ ও ঈর্ষা তীব্রতর হতে থাকে। বাংলাকে তারা স্বেচ্ছ বা অসভ্য-বর্বরদের দেশ বলে অভিহিত করে। আর্যাবর্তের কোন লোক এদেশে এলে স্বদেশে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করার পর তাকে গ্রহণ করা হতো। এসব প্রায়শ্চিত্তের বিধানও ছিল নির্দিষ্ট। আর্যদের তৎকালীন নীতিশাস্ত্রে এসব বিধান ও বঙ্গদেশ সম্পর্কে নানারূপ অপমানকর মন্তব্য রয়েছে।

পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজাকে পরাজিত করে কর্ণাটক থেকে আগত ব্রাহ্মণ সেনগণ বঙ্গভূমি দখল করার পর বিশেষভাবে পালবংশ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং সাধারণভাবে বাংলার প্রতি তাদের দীর্ঘ লালিত ক্ষোভ, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে পালদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়, অনেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে দেশের প্রান্তবর্তী এলাকার দুর্গম অঞ্চলে আবার অনেকে দেশত্যাগ করে নেপাল, বার্মা, থাইল্যান্ড, চীন, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। ঐ সময় বৌদ্ধদের শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ইত্যাদিও সমূলে ধ্বংস করা হয়। যারা পালাতে পারেনি তারা আত্মগোপনার্থে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। এভাবে বাংলার সমতল ভূমি বৌদ্ধ-শূন্য হয়ে পড়ে। পাল আমলের বিকাশমান বাংলা ভাষা-সাহিত্যও মুখ খুবড়ে পড়ে।

৩.১ সেন-রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাদের সাথে দাক্ষিণাত্য থেকে আগত কুলীন ব্রাহ্মণরাও ছিলেন দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ ও কৌলিগ্যবোধ সম্পন্ন। তাদের দৃষ্টিতে বঙ্গদেশের অন্য ধর্মাবলম্বী তো বটেই অধিকাংশ হিন্দুই ছিল অচ্ছত-স্বেচ্ছ

জাতের। জাতি-ভেদ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তাদেরকে শূদ্ররূপে আখ্যায়িত করে এবং তাদেরকে নগরবাসের অনুপযোগী বিবেচনা করে। শূদ্রদের ছায়া মাড়ালে ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়ে পড়বে এ আশংকায় ব্রাহ্মণদের বিচরণ-ক্ষেত্র থেকে দূরে নিভৃত পল্লী অঞ্চলে শূদ্রদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

সেন-আমলে এভাবে অসংখ্য জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে বাঙালি সমাজকে শতধা বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক মর্যাদা ও পেশাগত দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়। বলাবাহুল্য, সামাজিক প্রতিপত্তি ও আভিজাত্যের দিক থেকে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের স্থান হয় সবার শীর্ষে। রাজদণ্ড ও ধর্মীয় নেতৃত্ব থাকে একমাত্র তাদেরই করায়ত্ত। রাজ-দরবারের ভাষা হয় সংস্কৃত। দেশীয় পণ্ডিত ও কবিগণ যারা রাজ-দরবারে স্থান লাভ করেন তাঁরাও মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে দেব-ভাষা সংস্কৃতের চর্চায় যত্নবান হন। এভাবে “গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিতবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর-এর ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়।” (দীনেশচন্দ্র সেন)। বাংলা ভাষা তাদের নিকট ছিল ‘পক্ষীভাষা’ বা ইতর জাতীয় ভাষা সমতুল্য। দেশীয় ভাষা বাংলার চর্চা করলে ‘রৌরব’ নামক নরকে স্থান হবে বলে তারা ঘোষণা দেয়। তাই সেন আমলকে বলা হয় বাংলা ভাষা-সাহিত্যের জন্য ‘অন্ধকার যুগ’।

৪.০ বাংলা ভাষা-সাহিত্য তথা বাঙালির জন্য ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ এক মহা ঐতিহাসিক ক্ষণ। তুর্কি মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন মুসলিম বীরকে নিয়ে গৌড় আক্রমণ করে তা দখল করলেন ও বাংলায় মুসলিম রাজত্ব কায়েম করলেন। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। বাঙালি জাতিও মুক্তির মহানন্দে নেচে ওঠে। দলে দলে সকলে মুসলমান হয়ে ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মানবিক ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

৪.১ মুসলিম শাসনামলে রাজ-দরবারের ভাষা প্রথমে ছিল তুর্কি, তারপর ফারসী। এই তুর্কি, ফারসি এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি থেকে অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয়ে এ সময় বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সকল প্রাচীন উন্নত ভাষায় রচিত সাহিত্যের দ্বারাও বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় রাজ-পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ সময় ভাষা-সাহিত্য দ্রুত তরক্কী লাভ করে। তাই এ যুগকে বলা হয় ‘স্বর্ণযুগ’।

৫.০ মুসলিম শাসনামলে মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে সকল কবিই উদারভাবে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পান। কিন্তু মুসলিম ও হিন্দু রচিত বাংলা সাহিত্য সঙ্গতভাবেই

দু'টি সুস্পষ্ট ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিন্দুদের রচিত সাহিত্যকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যায় :

এক. বৈষ্ণব কাব্য। দুই. মঙ্গল কাব্য। তিন. নাথ সাহিত্য। চার. চরিত কাব্য। পাঁচ. অনুবাদ সাহিত্য [রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ] ছয়. লোক-কথা [ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি]। উপরোক্ত সব শ্রেণীর সাহিত্যই হিন্দুধর্ম, পুরাণ, লোক-কাহিনী ও লোকজ ধর্ম-ভাবনা কেন্দ্রিক।

৫.১ ঐ সময় মুসলিম-রচিত সাহিত্য ছিল ইসলাম ধর্ম, নবী-রসূল, বিশিষ্ট মুসলিম চরিত্র, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পুরা-কাহিনী ও কিছু কিছু সাধারণ মানবীয় কাহিনী সংবলিত। মানবীয় রসে জারিত মুসলিম সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগ-দর্শন। প্রাচীন মানসিকতা থেকে আধুনিকতায় উৎসারণের এটি প্রথম সোপান। শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনু ইত্যাদি মানবীয় কাহিনী কাব্য তো বটেই, আল-কুরআন, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী চরিত্র বিশিষ্ট বিভিন্ন কাহিনী কাব্য যেমন ইউসুফ-জোলায়খা, নবী-কাহিনী, বিজয় কাব্য, জঙ্গনামা, সত্যপীরের কাহিনী ইত্যাদি মুসলিম-রচিত সাহিত্যেও ধর্মভাবের সাথে সাথে মানবীয় আবেদন ও জীবন-বাস্তবতার দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে।

৫.২ মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুরা শুধুমাত্র রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক বিষয় ও চরিত্র, বিভিন্ন লোকজধর্ম ও বিষয় যেমন সাপের দেবতা, বাঘের দেবতা, ওলাউঠা ও বসন্তের দেবতা ইত্যাদি অলৌকিক কাহিনী ও বিষয় সংবলিত কাব্য রচনা করেছে। মুসলিম বিজয়ের পরে হিন্দুদের রচনার বিষয় ও মূল ভাব অপরিবর্তিত থাকলেও মুসলমানদের প্রভাবে তা অনেকাংশে মানবীয় সংরাগে পূর্ণ হয়েছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাই বলেন :

শুন হে মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই।

রাধার বিরহ বর্ণনায় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিও সম্পূর্ণ মানবীয় রসে অভিষিক্ত। বিদ্যাপতির বর্ণনা :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহভাদর

শূন্য মন্দির মোর।।

অথবা,

কত কত চতুরাণ মরি মরি যাওত

ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি গুণ তোহে মিলাওত

সাগরি লহরী সমানা ।।

বিদ্যাপতির আকেরটি কবিতার কয়েকটি চরণ :

জনম অবধি হম রূপ নিহারিল

নয়ন ন তিরপিত ভেল

সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল

শ্রুতি পথে পরশ ন গেল ।।

কত মধু যামিনী রভসে গমাওল

ন বুঝল কেসন কেল ।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রখিল

তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ।।

৫.৩ মধ্যযুগের অসংখ্য কবির মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি হলেন : চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, জৈনুদ্দীন, শাহ মোহাম্মদ সগীর, মালাধর বসু, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, শুকুর মাহমুদ, শেখ চাঁদ, সাবিরিদ্দ খান, সৈয়দ মোহাম্মদ হায়াত, দৌলত কাজী, আলাওল, আবদুল হাকিম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, ফকীর গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, রামনিধিগুপ্ত, লালন শাহ, ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখ ।

এবারে মধ্যযুগের বিশিষ্ট কয়েকজন কবির কবিতা থেকে কিছু কিছু চরণ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করছি। প্রথমে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বিশিষ্ট কবি বড় চণ্ডীদাসের (১৩২৫-১৪০৫ খৃ.) প্রাচীনতম বাংলা হরফে লেখা ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের দশম খণ্ডের বংশীখণ্ড থেকে কতিপয় চরণ উদ্ধৃত হলো :

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ কালিনী নইকুলে ।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ।।

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।

বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ।।

কে বা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।

দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ।

পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরের (১৪১৪-৯২) প্রখ্যাত ‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাব্য থেকে কয়েকটি চরণ :

ইউসুফ জলিখা জেবা মন দিয়া ঘুনে ।

আদি অন্ত গুনিলে সে ভাব হএ মনে ।।

এক চিত্তে ঘুনে জে এই সব পরস্তাব ।

পুন্য বাড়ে দুক্ষ হরে যস কৃতি লাভ ।।

পঞ্চদশ শতকের অন্যতম প্রধান কবি আমীর জৈনুদ্দীন খান। জাতিতে আফগান হলেও সৈনিক হিসাবে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি বাংলা, আরবি, ফারসি, পশতু ইত্যাদি ভাষা জানতেন। তিনি প্রখ্যাত ‘রসূল বিজয়’ কাব্যের রচয়িতা। অনেকে তাঁকে ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে’র কবি মালাধর বসুরও পূর্বকার কবি মনে করেন। তাঁর ‘রসূল বিজয়’ কাব্যের ক’টি লাইন :

‘রসূল-বিজয়’ বাণী অমৃতের ধার ।

গুনি গুণিগণ-মনে আনন্দ অপার ।।

শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্যবন্ত হৃদি ।

শাহা মোহাম্মদ খান সর্বগুণ বিধি ।।

তার পাদপদ্ম বন্দি’ ধ্যানে ধরি সার ।

হীন জৈনুদ্দীন কহে পাঁচালী পয়ার ।।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ‘কবিকঙ্কনের রচয়িতা। তাঁর কবিতার কয়েকটি লাইন :

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখ বাণী ।

ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী ।।

ডেরাভার খাম তার আছে মধ্য ঘরে ।

প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাস্ত্রে ঝড়ে ।।

অনল সমানে পোড়ে বৈশাখের খরা ।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকের কবি গোবিন্দ দাস। পিতা চিরঞ্জীব সেন ও মা সনন্দা। মাতামহ দামোদর শ্রীখণ্ডের ‘মহাকবি’। গোবিন্দ দাসের কবিতার কয়েকটি চরণ :

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি

পুলক না তেজই অঙ্গ ।

মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত

না শুনে আন পরসঙ্গ ।।

ষোড়শ দশকের অন্যতম কবি জ্ঞানদাসের (১৫২০-১৫৭৫) কবিতার কয়েকটি চরণ :

রূপ লাগি আঁখি বুঝে শুণে মন ভোর ।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ।।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে ।

পরাণ-পিরীতি লাগি থির নাহিবান্দে । ।

ষোড়শ শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান প্রখ্যাত ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের রচয়িতা । সেই কাব্যের কয়েকটি রচণ :

কএস লাইলী মেল শুভ দরশন ভেল

দোহানের জন্মিল পিরীত ।

অন্যে অন্যে দেখাদেখি মজিল দোহান আঁখি

ভাবেতে মোহিত হৈল মন ।

মনেত জন্মিল নেহা অস্থির দোহান দেহা

আকুল বিকল অচেতন । ।

ষোড়শ শতকের কবি মুহম্মদ কবির (১৫৮৮-৯৪) মনঝণের হিন্দী কাব্য ‘মধুমালতী’ অবলম্বনে উক্ত একই নামে কাব্য রচনা করেন । সেখান থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলো :

তবে কেহ সূর্যভান শুন পাত্র মতিমান

পুত্র মোর করিবারে রাজ ।

করি শুভ দিন ক্ষণ বসাই লঅ সিংহাসন

সবে সাজাও যে যুবরাজ । ।

মণিকলা পাগ শিরে ধোঁপা ধোঁপা মুক্তা ঝরে

বহু তারা চন্দ্র শোভে ক্রোড়ে ।

ষোড়শ শতকে প্রখ্যাত কবি সৈয়দ সুলতান (১৫২৪-৮৬) নবীবংশ, জ্ঞানপ্রদীপ, জয়কুম রাজার লড়াই এবং পদাবলীর রচয়িতা । তাঁর রচিত নবীবংশ থেকে এখানে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলো :

আদম সৃজন করি বহুল গৌরব ধরি

রাখিলেন্ত স্বর্গের মাঝার ।

স্বর্গ রক্ষিগণ সঙ্গে আনন্দ কৌতুক রঙ্গে

রহিলেন্ত সুখে আপনার । ।

মন্দ মন্দ বায়ু বহে কোকিলে পঞ্চম গাহে

পত্র সব বিজুলী প্রকাশ ।

চারিদিকে তরুগণ যেহেন গহন বন

নদী সব বহে চারি পাশ । ।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দৌলত কাজী ছিলেন আরাকান রাজ সভার কবি। ১৬৩৫-৩৮ সময়কালে রচিত তাঁর ‘সতীময়না’ (সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী) এবং তাঁর অনুবাদমূলক রচনা ‘রত্না-ময়নামতী-সম্বাদ’ বা ‘সাতন-ময়নামতী’। তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলো :

চৌদিকে সুন্দরী ফাগু আগুে ভরি,
 ধাবয় মদন পিয়াসা।
 ফাগুনে দেখ সখি, ফাগুনের রজ
 সবে মিলি ফাগু বসাই।
 রতি রস খেলাই খ্রিয়া পানে চাই
 আনন্দ উৎসব বহাই।।

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। একাধারে তিনি মৌলিক কবি, অনুবাদক ও সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। বাংলা, আরবি, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত ও উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন উপভাষায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদ পরগণার জালালপুরে নৌপথে পিতার কর্মস্থলে পিতার সাথে যাওয়ার সময় হার্মাদদের হাতে তাঁর পিতা নিহত হন আর তিনি পালিয়ে রোসাঙ্গে গিয়ে সৈনিক হন। পরে সঙ্গীত শিক্ষকরূপে রাজদরবারে স্থান পান এবং রাজসভা কবি হিসাবে ১৬৫১ সনে মালিক মোহাম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য পদ্যমাবলি তরজমা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘রতন-কলিকা-আনন্দবর্মা’ (১৬৫৯), ‘সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামাল’ (১৬৫৮-৬৯), ‘সপ্তপয়কর’ (১৬৫৩), ‘তোহফা’ (১৬৬৪), ‘সিকান্দরনামা’ (১৬৭৩)। ‘রাগতালনামা’ ও ‘পদাবলী’ তাঁর মৌলিক রচনা। তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ :

রত্নেসেন মহারাজ পৈর এ বিচিত্র সাজ
 বস্ত্র অলঙ্কারে ভায় তনু।
 মস্তকে কিরিটি শোভে দেখি সুরপতি লোভে
 জলদ উপরে যেন ভানু।।
 চন্দন শোভএ ভালে মুক্তলোর তাহে দোলে
 তারকা বেষ্টিত শশধর।
 রতন-কুন্ডল কানে তরুণ অরুণ বাণে
 বালক অরুণ নেত্রধর।।

সপ্তদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-৯০)। মৌলিক কাব্য ‘লালমতী সয়ফুল মূলক’ ছাড়াও ‘ইউসুফ জুলিখা’ (ফারসি কবি মোস্তা

জামীর বাংলা তরজমা), ‘দূরে মজলিশ’ ও ‘নূরনামা’ প্রভৃতি তাঁর ভাবানুমূলক কাব্য। ‘নূরনামা’ থেকে তাঁর কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ চরণ এখানে উদ্ধৃত হলো :

যে সবে বস্ন্তেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়।।

আঠারো শতকের কবি রামপ্রসাদ সেন ‘বিদ্যাসুন্দর’ ও ‘কালিকামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। আঠারো শতকের তৃতীয় দশকে পশ্চিমবঙ্গের হালি শহরে তাঁর জন্ম। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর সম্পর্কে বলেন : রামপ্রসাদী “গানগুলির সরল ও মর্মস্পর্শী সুর ঘরোয়া ভাব এবং হৃদয়গলা ভক্তি সহজেই মন টানে।” এখানে তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলো :

মন রে কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব-জমিন রইলো পতিত

আবাদ করলে ফলতো সোনা।।

আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে খ্যাত ভারতচন্দ্র (১৭১২-৬০)। ফারসি ভাষায় দক্ষ এ কবি ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ সভার প্রধান কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য ‘অন্নদামঙ্গল’। তাঁকে বলা হয় “বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং বাংলা কাব্যে নতুন ব্যঞ্জনার প্রবর্তক।” অন্নদামঙ্গল থেকে এখানে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো :

ধুধু ধুধু নৌবর্ত বাজে।

ঘন ভোরঙ্গ ভম্ভম্ দামামা দম্ভম্

বননু ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে।।

কত নিশান ফরফর নিনাদ ধর ধর

কামান গরগর গাজে।

সব জুবান রাজপুত পাঠান মজবুত

কামান শরযুত সাজে।।

আঠারো শতকের প্রখ্যাত পুঁথি-রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ। তাঁর কাব্য : ইউসুফ জোলেখা, আমীর হামজা (প্রথম পাঠ), জঙ্গনামা (মূল ফারসি কাব্যের ভাবানুবাদ), সোনাভান ও সত্যপীরের পুঁথি। এখানে তাঁর ‘জঙ্গনামা’ (‘মোজলি হোসেন’ নামেও খ্যাত) থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলো :

হোসেন বলেন বিবি না কান্দিও আর।

আমা বাদে ভাল হবে তোমা সবাকার।।

সহরবানু বলে ভাল কিসে হবে আর ।
না রাখিবে মোর বংশ এজিদি কুফর ।।
আপনি চলিল ফের করিতে লড়াই ।
কুফরে স্থাপিয়া যাহ কি হবে ভালাই ।।

এ সময়কার আর একজন বিশিষ্ট কবি হলেন মোহাম্মদ দানেশ । তাঁর প্রখ্যাত
‘চাহার দরবেশ’ কাব্যের কয়েকটি লাইন :

দরজায় দারোয়ান খাড়া নকীব চোপদার ।
দেওয়ালে দেওয়ালে দেখি ফানুস বেলোয়ার ।
গালিচা দুলিচা কত গের্দা সামিয়ানা ।
শাটিন মখমল শোভে জরির বিছানা ।
পান-দান পিক-দান গোলাব-পাশ ।
সুবাসে মোহিত মন হইল উদাস ।।

আঠারো শতকের কবি সৈয়দ হামজা । জন্ম ১৭৩৩ সনে । কবিতা, হেঁয়ালী,
ছড়া ও পাঁচালী রচনা করেন । তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো ‘মধুমালতী’
(১৭৮৮), ‘জৈগুনের পুঁথি’ (১৭৯৮) ও ‘হাতেম তাই’ (১৮০৪) । তাঁর বিখ্যাত
‘মধুমালতী’ কাব্যের কয়েকটি লাইন :

নানা হাস্য পরিহাসে মালতীর আসে পাশে
রূপসী গায়েন গান গায় ।
যুবগণ কুতূহলী কেহ দেয় করতালী
কেহ কেহ খঞ্জনী বাজায় ।।
লইয়া সুবর্ণ ঝারি আনন্দে কৌতুক করি
কেহ কেহ জলধার ।
নারীগণ আনন্দেতে অতি সরু গামছাতে
বদন মোছন করে তার ।।

‘নিধি বাবু’ নামে খ্যাত রামনিধি গুপ্ত (১১৪৮-১২৪৫ বঙ্গাব্দ) প্রণয়-বিষয়ক
টম্পা রচনা করেন । ‘রসিক মনোরঞ্জন’ নামে তাঁর একটি গীতিকা সংগ্রহ আছে ।
তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি লাইন :

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ।।
কত নদী সরোবর, কি বা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষ্ণা?

বাংলার বাউল কবিদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান লালন শাহ। ভাবের গভীরতা, রূপক, উপমা, ছন্দ তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সমাদর করেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনসহ অনেকেই তাঁর গান সংগ্রহ করেন। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আবু রুশদ মতীন উদ্দীন তাঁর গানের ইংরাজি অনুবাদ করে সংকলিত আকারে তা প্রকাশ করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের কয়েকটি লাইন :

বাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেড়ী
দিতাম তাহার পায়।

লালনের আরেকটি বিখ্যাত গানের প্রথম ক'টি লাইন :

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
(আমার) বাড়ীর কাছে আরশী নগর,
সেখা এক পরশী বসত করে।।

মধ্যযুগের শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯)। তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ছিলেন (১৮৩১ সনে প্রকাশিত)। স্বদেশপ্রেম, হিন্দু জাতীয়তাবাদ তাঁর কাব্যের মুখ্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও ছিলেন চরম মুসলিম-বিদ্বেষী উগ্র সাম্প্রদায়িক। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন :

কষিত কণক-কান্তি, কমণীয় কায়।
গাল ভরা গৌপ-দাড়ি, তপস্বীর প্রায়।।
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মনির প্রভা, নবীর শরীরে।।

তাঁর আর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল,
ব্রতধর্ম কোর্সা সবে
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে?

৫.৪ মধ্যযুগের সুসমৃদ্ধ সাহিত্য মুসলিম ও হিন্দু উভয় কবিদেরই মিলিত অবদান। মুসলিম সুলতান ও অমাত্যগণের অকুপণ পৃষ্ঠপোষকতায় উভয় সাম্প্রদায়িক কবিরাই স্বাধীনভাবে কাব্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। তবে মুসলিম কবিদের ভাব-ভাষা-বিষয়-অভিজ্ঞতা ও জীবনদৃষ্টি স্বভাবতই হিন্দু কবিদের থেকে ভিন্নতর ছিল। হিন্দু কবিদের রচনায় যেমন তাদের ধর্মীয় চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য

প্রাধান্য পেয়েছে, মুসলিম কবিদের রচনায় তেমনি ইসলামী চেতনা, মুসলিম চরিত্র ও ইতিহাস-ঐতিহ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিতও হয়েছেন। ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা সমন্বয়ের ধারাও লক্ষ্য করা গেছে।

৫.৫ ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা। হিন্দুদের রচিত সাহিত্যে প্রধানত সংস্কৃত তথা তৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য, অন্যদিকে, মুসলিম কবিদের রচনায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু প্রভৃতি শব্দের প্রাধান্য। আবার অনেক ক্ষেত্রেই উভয়েই উভয়ের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং একটা মিশ্র ভাষা-রীতি গড়ে উঠেছে। এরূপ মিশ্র ভাষা-রীতির ব্যবহারে কবি ভারতচন্দ্রের অনুভূতি তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।।

ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত ‘অনুদামঙ্গল’ কাব্য থেকে এ ভাষা-রীতির নমুনা। নিচের কয়েকটি লাইনে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত।

আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম।।
শয়তানে বাজি দিল নাপেয়ে কোরাণ।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ।।

...
বন্দেগী করিবে বান্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া।।
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া।।

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। তাঁর পূর্ববর্তী ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামের প্রখ্যাত ‘চল্লীমঙ্গল’ কাব্য রচনা (১৫৯৪-১৬০৩ খৃ.) থেকে কয়েকটি লাইন নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত হলো :

ফজর সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাতি
পাঁচ বেরি করয়ে নামাজ।
ছোলেমানী মালা করে জপে গীর পেগাম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাজ।।
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে

অনুদিন কিতাব কোরাণ ।
কেহবা বসিয়া হাটে পীরের শিরণী বাটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান ।।

মধ্যযুগের বিশিষ্ট মুসলিম কবি আলাওলের কবিতার কয়েকটি চরণ :

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরাশ আকার ।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ।।
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা ।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা ।।
তাহার পীরিতে প্রভু সৃজিল সংসার ।
আপনে কহিছে প্রভু কোরাণ মাঝার ।।

৫.৫ এভাবে, মধ্যযুগে আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু শব্দের সংমিশ্রণে বাংলা যেমন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, বাঙালি মুসলিম-হিন্দু নির্বিশেষে সে ভাষায় কাব্য চর্চা করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তোলেন। তবে স্বভাবতই মুসলিম কবিদের রচনায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু শব্দের ব্যবহার ছিল অধিক।

৬.০ পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে ১৭৫৭ সনে বাংলার স্বাধীন-সূর্য অন্তমিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে আবার পালা-বদল ঘটলো। নেমে এল সাময়িক বন্ধ্যাত্ব। কবিরাজ-পৃষ্ঠপোষকতা হারালেন। বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটলো। পুরাতন সামাজিক শৃংখলা ধ্বংস হলো নতুন শৃংখলা গড়ে উঠলো। যার ফলে মুসলমানরা শুধু ক্ষমতার আসন থেকেই নয়, সকল প্রকার সুবিধা-বঞ্চিত এক অসহায়, দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হলো। অন্যদিকে, হিন্দুরা শনৈ শনৈ তরক্কীর সোপান বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। মুসলমানদের বঞ্চিত করে সকল সুবিধা তারা করায়ত্ত করলো। মুসলিম আমলের সনাতন শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লো। ইংরাজ-সৃষ্ট নতুন ইঙ্গ-হিন্দু মার্কী শিক্ষা-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো। ফারসির বদলে নতুন রাষ্ট্রভাষা হলো ইংরাজি। ইংরাজির সাথে আসে ইংরাজের শিক্ষা-সভ্যতা-সাহিত্য এমনকি, ধর্মও। অনেক বাঙালি হিন্দু খ্রিস্টান হলো, গড়ে উঠলো নতুন ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতি।

৬.১ মূলত ইংরাজি ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবে ইংরাজি পড়া বাঙালির হাতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন। তবে এ নতুন সাহিত্যের জন্ম হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশো বছর। তবে ইংরাজ আমলের প্রাথমিক একশো বছরেও স্থানীয়ভাবে বাংলার সর্বত্র একশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এগুলোকে কবি গান, পাঁচালী, তরঙ্গা, হাফ আখড়াই, ভজন্ড যাত্রা, বাউল, মুর্শিদী, মারফতী ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়। রাজনৈতিক, পট-পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক অনিশ্চয়তার

কারণে সাধারণ মানুষের মনে শাস্তি-স্বস্তি ছিল না। তাই এসব রচনার মধ্যে জন-জীবনের সেই হতাশা, মর্ম-বেদনা ও বৈরাগ্যভাবের প্রতিফলন ঘটে। উল্লেখ্য, ইংরাজ আমলের প্রথম একশো বছরে কোন উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকের উদ্ভব ঘটেনি। কারণ তখন সাহিত্য-চর্চার উপযোগী কোন পরিবেশ ছিল না। পলাশী যুদ্ধের শতাধিক বছর পর ইংরাজ-সৃষ্ট শিক্ষা-সভ্যতার নতুন পরিবেশে আধুনিক ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব ঘটলো এবং তাঁরই হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নতুন যাত্রা শুরু হলো।

৬.২ মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩) প্রতিভা ছিল যেমন বিশাল, তাঁর অবদানও ছিল তেমনি ব্যাপক ও অসাধারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও ভাবধারার প্রভাবে তিনি বাংলায় প্রথম সার্থক মহাকাব্য, সনেট, গীতিকাব্য, নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। অমিত সম্ভাবনাপূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও তিনি প্রবর্তক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে তিনি বাংলা কবিতার রূপ-রীতিতে যেমন নতুনত্ব সৃষ্টি করেন, তেমনি ছন্দ-প্রকরণ, নিজস্ব কবি-ভাষা নির্মাণ ও বিষয়-বৈভবেও অভিনবত্ব আনয়নে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। মাইকেল সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে শেষ জীবনে রচিত তাঁর সনেটের ভাষা অনেকটাই সহজ-সরল ও বোধ্য হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর একটি অবিস্মরণীয় সনেট উদ্ধৃত হলো :

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ ভাষারে তব বিবিধ রতন—

তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,

পর-ধন-লোভে মস্ত, করিনু ভ্রমণ

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।

অনিদ্রায় নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—

কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;—

“ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,

এ ভিখারী দশা তব কেন তোর আজি?

যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে

মাতৃ-ভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মনিজালে।।

মধুসূদন বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতার প্রবর্তন করেন এবং তাঁর প্রবর্তিত কাব্য রূপাঙ্গীকে অনুসরণ করে যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন- রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১) প্রমুখ।

৬.৩ এরপর বাংলা কাব্যে যে যুগান্তকারী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি নানা বৈচিত্র্যে ও অভূতপূর্ব অবদানে বাংলা কাব্যকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেন। ভাব-ভাষা, বিষয়-বৈভব ও বিচিত্র রূপরীতিতে কাব্য-কবিতা রচনা করে তিনি বাংলা কাব্যের দিগন্তকে সীমাহীন করে তোলেন। তাঁর রচিত অসংখ্য অনবদ্য কবিতা থেকে এখানে মাত্র একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো—

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী
যখন শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাসো শুধু, মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কি আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিঙ্কু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হেথায়, চলেছি কিসের অন্বেষণে?।

রবীন্দ্র-যুগে কাব্য চর্চা করে যারা যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন— গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪) প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের দিগন্তকে শুধু নানাভাবে প্রসারিত ও অব্যাহত সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেছেন তাই নয়, তিনি বাংলা ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ, সহজতর ও অনবদ্য ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর সমকালের কবিরা প্রায় সকলেই তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

৬.৪ রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তিনি রবীন্দ্র-সমকালে কাব্যচর্চা করলেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বলয় অতিক্রম করে তিনি বাংলা কাব্যে এক নতুন ধারা ও যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন। নজরুল সর্বক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এক অসাধারণ কবি। তিনি স্বাধীনতার কবি, নবজাগরণের কবি, নিপীড়িত-বঞ্চিত-নিগৃহীত-মানবতার কবি। বাংলা ভাষার যে একটি ‘মুসলমানি ঢং’ আছে নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে সেটা উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন। শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টি নয়, ভাব-বিষয়-ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। নজরুল ইসলামের রচিত অসংখ্য অনবদ্য কবিতা থেকে এখানে তাঁর সুবিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো—

বল বীর-
 বল উন্নত মম শির!
 শির নেহারি’ আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
 বল বীর-
 বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’
 চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি’
 ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
 খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া,
 উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতর!
 মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজতীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
 বল বীর-
 আমি চির-উন্নত শির!

নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যে যে তেজস্বিতা, প্রাণময় উদ্দীপনা ও নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এলেন, তাঁর সমকালের অনেক কবি তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা কাব্যের নজরুল-উদ্ভাবিত ধারাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), সুফী জুলফিকার হায়দার চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৮৭), খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১), বে-নজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), মহীউদ্দীন (১৯০৬-১৯৭৫), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯), কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯) প্রমুখ।

৬.৫ নজরুল-সমকালে একদল নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আধুনিক কবির আবির্ভাব ঘটে। এঁরা সকলেই ইংরাজি সাহিত্যের ভাবধারা ও কাব্যকলার আধুনিক রীতির অনুসরণে তাঁদের স্ব-স্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা ত্রিশোত্তর যুগের কবি হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। এঁদের মধ্যে প্রধান কবি হলেন— জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস (১৯২০-), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে নিসর্গের কবি হিসাবে সুখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলো—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর; অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে

ভোরের দোয়েল পাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তম্ভ

জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের অশখের ক'রে আছে চূপ,

ফণীমনসার ঝোঁপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;

মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে

এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।

৬.৬ বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে যখন বাংলাকাব্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও ত্রিশোত্তর যুগের প্রতাপশালী কবিগণ বাংলা কাব্যে তাঁদের ক্ষুরধার লেখনি পরিচালনা করছেন, সে-সময় পশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারা বর্জন করে বাংলা কাব্যে কবি জসীমউদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) বর্ণাঢ্য আবির্ভাব। জসীমউদ্দীন বাংলার গ্রামীণ জনপদ, সাধারণ মানুষের জীবন ও অপরূপ নৈসর্গের বর্ণনা তুলে এনেছেন তাঁর সহজ-সরল গ্রামীণ ভাষায়। মানুষের হৃদয়কে তা স্পর্শ করেছে এবং এক অপরিণীত মমতায় তাঁকে বাংলার মানুষ অতি প্রিয় কবি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জসীমউদ্দীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলা কাব্যে অনেকেই বিশেষ অবদান রেখেছেন। জসীমউদ্দীনের একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলো—

কবর

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,

তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

এতটুকু তারে ঘরে এনেছি সোনার মতন মুখ,

পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক ।
 এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
 সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
 সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
 লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি ।
 যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
 এ কথা লইয়া ডাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত ।
 এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
 ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেলু দিশে ।

৭.০ গৃহীত ‘লাহোর প্রস্তাব’ (১৯৪০) (যা ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ নামে বিশেষভাবে খ্যাত), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), বিশ্বযুদ্ধজনিত পঞ্চাশের মনস্তর ও ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৬-এ অনুষ্ঠিত গণভোট এবং এরপর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও অবশেষে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ‘পাকিস্তান’-এর অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে পূর্বোক্ত কবিদের অনেকেই বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেন। এ সময়ে একদল তরুণ প্রতিভাবান কবিরও আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন- ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)। তিনি একাধারে স্বাধীনতা, নবজাগরণ, ক্ষুধা-মহামারী ও মানবতার অমর কবি হিসাবে পরিচিত। ফররুখ আহমদ রচিত একটি সুবিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলো—

সাত-সাগরের মাঝি

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ’ল জানিনা তা’ ।
 নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা ।
 দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা ।
 তবু জাগলে না ? তবু তুমি জাগলে না ?
 সাত-সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
 অচল ছবি সে, তস্বির যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ ।
 হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
 হে নাবিক ! তুমি মিনতি আমার রাখো :
 তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
 দেখবে তোমার কিশুতী আবার ভেসেছে সাগর জলে,
 নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,

মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙ্গে চলে সব বাঁধ ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝ'রেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তবু তুমি জাগলে না ?

৭.১ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমের সীমাহীন বৈষম্য দূরীকরণ ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ কবি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ সময়ে ভাষা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী চেতনা, নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রাণময় উদ্দীপনা ও মানবিক চেতনাবোধে অনুপ্রাণিত কবিতার মধ্যে কবিদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-১৯৮৬), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), আবদুল গণি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), আবুল হোসেন (১৯২২), সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩), আতাউর রহমান (১৯২৫-২০০১), আতোয়ার রহমান (১৯২৭-২০০৪), আবদুর রশীদ খান (১৯২৪-), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-), আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩২-২০০৩), জাহানারা আরজু (১৯৩২), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (১৯৩৩-), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-), ফজল শাহবুদ্দীন (১৯৩৬-), আল মাহমুদ (১৯৩৬-), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-), আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৭.২ শিক্ষা আন্দোলন (১৯৬১), ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, পরবর্তীতে ১১ দফা আন্দোলন ও আইয়ুব-ইয়াহিয়ার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকের কবিরা কাব্য-চর্চায় ব্রতী হন। এ সময়ে পূর্ববর্তী কবিদের অনেকেই যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনি একদল তরুণ প্রতিভাবান কবি বাংলা কাব্যে নানা বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, আফজাল চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ রফিক, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, আবু কায়সার, হুমায়ুন আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, সায্যাদ কাদির, রাজীব আহসান চৌধুরী, ফরহাদ মাজহার, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে আফজাল চৌধুরী ও আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁদের কবিতায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের ছাপ রেখেছেন। ষাটের দশকে নানা কারণে আমাদের সাহিত্য-

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভাজন সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক, বাঙালি সংস্কৃতির নামে এক ধরনের বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রচার, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি আমাদের জাতীয় জীবনে এক নতুন অনুসঙ্গ ও আপদ হিসাবে দেখা দেয়। এ সময় থেকেই সাড়ম্বরে পহেলা বৈশাখ, বসন্ত উৎসব, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি নানা আয়োজন শুরু হয়। দিন দিন তা আরও ব্যাপকতর হয়।

৮.০ সত্তরের নির্বাচন, নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, ব্যাপক গণ-অসন্তোষ ও নয় মাসের দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত সত্তরের বাংলা কবিতায় নানা বৈচিত্র্য ও জীবনধর্মী চেতনার প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও যুদ্ধজনিত নানা মানবিক বিপর্যয় এ সময়কার কবিতায় বিশেষভাবে স্থানলাভ করে। স্বাধীনতার পর নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, নব গঠিত রক্ষীবাহিনীর হাতে বিনা বিচারে অসংখ্য লোকের প্রাণহানী এবং সর্বোপরি ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ সমাজে এক ধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি করে। এ সময়ে একের পর এক সরকার পরিবর্তন, সামরিক আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি নানা কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এসব মানবিক বিপর্যয়ের দুঃখময় কাহিনী আমাদের অনেক কবিদের ভাষায় উঠে আসে। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে- হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আবিদ আজাদ, জাহাঙ্গীর হাবীবুল্লাহ, সৈয়দ মাহবুব, রবীন্দ্র গোপ, সাজ্জাদ হোসাইন খান, কাজী রোজী, আলী ইমাম, সৈয়দ হায়দার, দাউদ হায়দার, শিহাব সরকার, সুজাউদ্দীন কায়সার, সৈকত আসগর, নাসির আহমেদ, শাহাবুদ্দীন নাগরী, হাসান হাফিজ প্রমুখ।

৮.১ আশির দশকে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এ সময়ে পূর্বোক্ত কবিদের অনেকেই যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনি অনেক প্রতিভাবান তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে। বাংলা কবিতার দিগন্ত যেমন বিস্তৃত হয় তেমনি নানা বৈচিত্র্য ও অনুশীলনে তা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এ সময়কার কবিদের মধ্যে গোলাম মোহাম্মদ, খন্দকার আশরাফ হোসেন, মতিউর রহমান মল্লিক, আশরাফ আল দীন, আবদুল হালিম খাঁ, আবদুল হাই শিকদার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, বুলবুল সরওয়ার, মসউদ-উশ-শহীদ, মুকুল চৌধুরী, মোশারফ হোসেন খান, হাসান আলীম, সোলায়মান আহসান, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, আসাদ বিন হাফিজ, তমিজউদ্দীন লোদী, আহমদ আখতার, আহমদ মতিউর রহমান, কামাল মাহমুদ, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, খসরু পারভেজ, রেজানুর রহমান, লুৎফর রহমান রিটন, শাহীন রেজা, মানসুর মুজাম্মিল প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮.২ নব্বইয়ের দশকে অনেক প্রতিভাবান তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটেছে। তবে তাঁদেরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার জন্য আরো কিছু সময় অপেক্ষা করা প্রয়োজন বলে আমার ধারণা।

৯.০ হাজার বছরের বাংলা কবিতা আমাদের গৌরবময় সম্পদ। ধারাবাহিকভাবে এ দীর্ঘ সময়কালে রচিত কবিতার পূর্ণাঙ্গ ও সবিস্তার আলোচনা সংক্ষেপে সম্ভব নয়। তবে এখানে এ সম্পর্কে একটি রেখাচিত্র অংকনের প্রয়াস পেয়েছি। বিগত হাজার বছরে আমাদের কবিতার ভাষায় যেমন নানা পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি কবিতার ভাব-বিষয় ও রূপ-রীতিতেও উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য এসেছে। বাঙালি বহু ধর্ম-সংস্কৃতির জাতি। তাই দীর্ঘ সময়কালে রচিত বিভিন্ন কবির কাব্যে স্বভাবতই নানা ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষত, মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে নবজন্ম ঘটে ও সাহিত্য নানাভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। এ সময়ে বাংলা কবিতা আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু ইত্যাদি বিভিন্ন সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাবধারায় পল্লবিত হয়ে ওঠে। ইংরাজ শাসনামলে সাহিত্যে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। এ সময় আন্তর্জাতিক বিশেষত, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যের মেলবন্ধন রচিত হয়। পাকিস্তান আমলে বাংলা কবিতায় নতুন ভাব-বিপ্লব ও ধ্যান-ধারণা যুক্ত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যে আরও নানা পরিবর্তন ঘটে। আগামীতে আশা করা যায়, এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের সাহিত্য দিন দিন উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে উঠবে। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা, এ ভাষার জন্য আমরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছি, রক্ত দিয়েছি। এ সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারি আজ ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে স্বীকৃত। এটা যেমন গর্বের, তেমনি বাংলা সাহিত্যের চর্চায় তা আমাদেরকে আরও অধিকতর প্রেরণা যোগাবে।

সাহিত্য একটি জাতির দর্পণ স্বরূপ। আমাদের সাহিত্য আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-দর্শন ও জীবনের চিত্রকে তুলে ধরবে এবং তা যাতে আমাদের স্বকীয় পরিচয় নির্ধারণে, আত্মমর্যদাবোধ উজ্জীবনে ও জীবনে মহত্তম প্রেরণা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, সেদিকে আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণ অধিকতর যত্নবান হবেন বলে আশা করি।

(লেখক : এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রফেসর ও বাংলা বিভাগের প্রধান)

বাংলা সাহিত্যে পলাশী ট্রাজেডি

আব্দুল হাই শিকদার



জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের এক বছর আগে ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত বাংলা গদ্য এবং ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে ‘মাইল ফলক’ গ্রন্থ ‘সিরাজদৌলা’য় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লেখেন, ‘সিরাজদৌলা কলংককাহিনীতে স্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কলংকের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। কলংক সৃষ্টির ইতিহাস সেরূপ নহে।...সিরাজকলংক প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— প্রাচীন ও আধুনিক। এই সকল কলংক আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— লিখিত ও অলিখিত। প্রাচীন লিখিত কলংক সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু অলিখিত কলংকের নিকট লিখিত কলংকগুলি পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। লিখিত কলংকগুলি ইতিহাসে সীমাবদ্ধ। অলিখিত কলংকের আর সীমা নাই; তাহা এখনও থাকিয়া থাকিয়া জনগ্রহণ করিতেছে।’ এই কথাগুলি যখন লেখা হয়, তখন পলাশী বিপর্যয়ের পর পেরিয়ে গেছে ১৪১ বছর। অর্থাৎ এই ১৪১ বছর ধরেই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলার চরিত্র হননের কাজটি ‘অত্যন্ত নিষ্ঠার’ সঙ্গে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার। এই কাজে তারা লাগিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী, ভারত প্রবাসী সাদা চামড়ার সায়েব লেখকদের। আর সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তথাকথিত বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রভাষ্ট কলকাতাকেন্দ্রিক অর্থ, বিদ্যা, খ্যাতি ও পদোন্নতি ভিখারী বাবু-বুদ্ধিজীবীদের। তারও আগে মীরজাফরের সময় থেকে কিছু বেতনভুক্ত ‘ইতিহাস লিখিয়েদের’ দ্বারা কোম্পানি নিজ নিজ মনের মাধুরী মিশিয়ে উৎপাদন করিয়েছিল ইতিহাস। পাশাপাশি পথে প্রান্তরে সিরাজদৌলাকে হেয় করার জন্য, তার ভাবমূর্তি বিনাশ করার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছিল ভাড়াটে লোকজন। গুজব ও গল্প ইতিহাসের নামে তাই চলে আসছিল তখন পর্যন্ত, এমনকি এখনো।

এইসব তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, যে জটিল কুটিল ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বিদেশি ও দেশি বণিক, সমরনায়ক, রাজনীতিবিদ ও আমলারা পলাশীতে জয় পেয়েছিল এবং সিরাজদৌলাকে করেছিল নির্মমভাবে হত্যা, তাকে ভিন্নাধারে বইয়ে দিয়ে সিরাজকে ‘ভিলেন’ বানানো। কারণ সিরাজকে ‘ভিলেন’ বানাতে না পারলে নিজেদের পাপকেও যেমন জায়েজ

করা যাবে না, তেমনি ‘হিরো’ সাজাও হবে না। খুব সঙ্গত কারণেই বিজয়ী পক্ষ পরাজিতের ক্ষমকে নিজেদের পাপ স্থাপনের সুউচ্চ মঞ্চ বানিয়েছে। ফলে সত্য হয়েছে মিথ্যা, মিথ্যা পেয়েছে সত্যের সম্মান। আর এই মিথ্যাচার, লোককথা, গল্পকে হিতাহিত বাহ-বিচার না করে ইতিহাসের নামে, গল্পে-কবিতায়, মহাকাব্যে পরিবেশন শুরু করে বাংলাভাষী কবি, নাট্যকার ও গদ্যকাররা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের এই মনোবাঞ্ছা চরিতার্থকারীদের আদি নাম রাম রাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এই ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীর একজন তার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ‘রাজাবলী’ (১৮০৩)তে লেখেন, বিশিষ্ট লোকদের ভাষা ও বধু ও কন্যা প্রভৃতিকে জোর করিয়া আনাইয়া ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত গভিনী স্ত্রীদের উদর বিদারণ করানিতে ও লোকেতে ভরা নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানাতে দিনে দিনে অধর্ষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।’

এই ধরনের আরো ‘গাঁজা’ ইতিহাসের নামে ছেড়ে ধন্য হয়ে আছেন রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আরেক শাগরেদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনীকার ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বায়স্য চরিত্রং, (১৮০৫)। বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম জীবনী ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)-এর রচয়িতা রাম রাম বসুও একহাত নিয়েছেন সিরাজদ্দৌলার ওপর। ‘নব-নারী’র লেখক নীলমনি বসাকও অপবাদ প্রচারে যথেষ্ট হাত পাকিয়েছিলেন।

এদের প্রায় সবার চোখেই ক্লাইভ ‘বীরশ্রেষ্ঠ’, ‘ব্যারন অব প্লাসি’ ‘পুরুষোত্তম’, জগৎশেঠ ‘সন্তু’, মীরজাফর ‘সাধু’, ‘মহাধর্মপ্রাণ’। আর ‘দুরাচারী’, ‘পাপাত্মা’, ‘দুর্জন’, ‘পামর’ হলেন সিরাজদ্দৌলা।

এই মিথ্যাচারকে কাব্য করার ক্ষেত্রে যিনি সবচেয়ে বেশি নাম কামিয়েছেন তিনি হলেন নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। তার বহুল আলোচিত মহাকাব্য ‘পলাশীর যুদ্ধ’ (১৮৭৫)এ প্রধান ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠের মুখ দিয়ে সিরাজ সম্পর্কে বলেছেন:

‘কি বলিব আর
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তপুরে,
নিরমল কুল মম- প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্করসম, ভূভারত জুড়ে
প্রজ্বলিত,-সেই কুলে দুষ্ট দূরাচার
করিয়াছে কলংকের কালিমা সঞ্চার।’
অতএব রাজবল্লভ সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন।

‘চিন্তা সদুপায়! মম এই অভিপ্রায়-
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কতদিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়!)
সৈন্যধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার।’
মুহূর্তে ক্লাইভ যুদ্ধে হলে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্বাচীন।’

তথাকথিত জাতীয় জাগরণের রঙ মাখিয়ে ইতিহাস বিকৃতি করে কাব্য বানিয়ে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী নবীন সেন এই গ্রন্থের জন্য যথেষ্ট ‘বাহবা’ পাচ্ছিলেন সরকারি এবং তার সগোত্রীয় বাবু-বুদ্ধিজীবীদের কাছে।

গোল বাধালেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়। অব্যাহত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম কণ্ঠস্বর। প্রথম এবং অসাধারণ। চিঠি লিখলেন কবি নবীন সেনকে:, এই সকল কাঙ্ক্ষনিক সিরাজ কলংক প্রদর্শন করিবার হেতু কি? তার পক্ষ থেকে উত্তর এলো ‘সাহিত্য’ সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির: ‘নবীন বাবুর উত্তর এক লাইনও নয়। পলাশীর যুদ্ধ কাব্য, ইতিহাস নয়: আপনাকে ইহাই লিখিতে অনুমতি করিয়াছেন।

অক্ষয় কুমার যে তা জানেন না, তা নয়। তার বক্তব্য হলো, এটা যে ইতিহাস নয় সে কথা তো সবাই জানে না। তার মতো ‘কৃতবিদ্যা স্বদেশভক্ত সাহিত্য সেবক’ যে সর্বকথা স্বকপোলকল্পিত অযথা কলঙ্কে সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঙ্কিত করে কাব্যরসের অবতারণা করবেন, তা সহসা ধারণা করতে সাহস না পেয়ে অনেকেই যে তার পলাশীর কাব্যকে ইতিহাস বলে গ্রহণ করে থাকেন। তাইতো তিনি বললেন, ‘কবির পথ নিষ্কণ্টক হইলেও ঐতিহাসিক চিত্র চয়নে সর্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না।’

ক্ষুদ্র কণ্ঠে এরপর উচ্চারণ : ‘সে কালের ইংরাজ-বাঙালী মিলিত হইয়া, সিরাজদ্দৌলার নামে কত অলীক কলংক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট অপরিচিত নাই! অবসর পাইলে এককালের প্রতিভাশালী সাহিত্য সেবকগণ এখনও কত নতুন নতুন রচনা কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন ‘পলাশীর যুদ্ধ কাব্য’ তাহারই উৎকৃষ্ট নির্দশন। যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, যাহা সিরাজদ্দৌলার শত্রু দলও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না-এ কালের লোকে তাহারও অভাব পূরণ করিতে ইতস্তত: করিতেছেন না।’ (সিরাজদ্দৌলা, পৃষ্ঠা ২০৫)।

তিনি উপসংহারে উপনীত হন এই বলে: ‘যে দেশের কবি-কাহিনী ইতিহাস রচনায় ভার গ্রহণ করিয়াছে সে দেশে সিরাজ কালিমা উত্তরোত্তর দূরপন্যে হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিশ্বয়ের কি?’ (সিরাজদ্দৌলা-২০৬)। সংঘবদ্ধ চক্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দু’জন বিখ্যাত মানুষকে তার পাশে দেখতে পান। ‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আর এর ভেতর দিয়ে নতুন এক রবীন্দ্রনাথের সন্ধান আমরা পাই।

নবীনচন্দ্র সেনের কবির পথ ‘নিষ্কটক’, সুতরাং ‘তিনি ইতিহাস মানিতে বাধ্য নহেন’ এই বক্তব্যের ওপর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজের মত প্রদান করতে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের টেনিসনের উদাহরণ টেনে আনেন। টেনিসন তিনটি ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। এর মধ্যে Queen Mary (রানী মেরি) লেখার আগে যে শতাধিক ইতিহাস গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন, তার একটা তালিকা তুলে দেন। তারপর তাঁর মন্তব্য: ‘টেনিসন নিজের পথ নিতান্ত নিষ্কটক ভাবিলে প্রথমেই এতগুলি ঐতিহাসিক পুস্তক পাঠ করিতেন না। পরে আরও পড়িয়া তবে নাটক লিখিয়াছিলেন। আমাদের জানিতে কৌতুহল হয় কবি নবীনচন্দ্র কতগুলি ইতিহাস পড়িয়া তবে পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়াছিলেন।’

নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এই বক্তব্যে আক্রান্ত হন। কারণ বঙ্কিম বলেছিলেন, ‘ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামতো অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।’

অন্যদিকে গ্লাউস্টোন Queen Mary সম্পর্কে বলেছেন, ‘এ গ্রন্থ একটা Careful historie study রামানন্দ দেখান, বেরিং ফিল্ড Queen Mary নাটকের একটি চরিত্র সম্পর্কে আপত্তি করলে ন্যায়নিষ্ঠ টেনিসন সেই চরিত্রটিই নাটক থেকে বাদ দেন।’

টেনিসনের ‘বেকেট’ নাটক সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রিন বলেন, ‘আমার সমুদয় গবেষণা দ্বারা দ্বিতীয় হেনরির চরিত্র ও পারিষদগণের বিষয়ে আমার তদ্রূপ উজ্জ্বল জ্ঞান জন্মে নাই, যেমন টেনিসনের বেকেট পড়ে হয়েছে।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনো নোবেল পুরস্কারে অভিষিক্ত হননি। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে তার আর কোনো লেখারও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও মৈত্রেয় মহাশয়ের লেখা থেকে আমরা জানি যে ‘ভূতপূর্ব ‘সাধনা’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সিরাজদ্দৌলাকে’ প্রথম পাঠক সমাজে উপনীত করেন।’ তারপর এই গ্রন্থ যখন ইংরেজকূলে গোপ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন রবীন্দ্রনাথ কলম ধরলেন, ‘শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা পাঠ করিয়া কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাত্র ক্রোধ প্রকাশ

করিয়াছেন। স্বজাতি সম্পর্কে পরের নিকট হইতে নিন্দোক্তি শুনিলে ক্রোধ হইতেই পারে। সমূলক হইলেও। কিন্তু আমাদের সহিত উক্ত সম্পাদকের কত প্রভেদ! আমাদের বিদেশী লিখিত নিন্দোক্তি বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়।’

মৈত্রেয় মহাশয়কে কিঞ্চিৎ ‘অবৈধ আবেগের’ জন্য মৃদু অভিশ্রুত করার পরও রবীন্দ্রনাথ তার রচনার শেষে স্পষ্ট করে লেখেন: ‘সবল দুর্বলকে যেমন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত-চিত্তে বিচার করিয়া থাকে, দুর্বল সবলকে তেমন করিয়া বিচার করিতে গেলে সবলের জয়গল কুটিল এবং মুষ্টিযুগল উদ্যত হইয়া উঠিতে পারে। অক্ষয় বাবু হয়তো আদিম প্রকৃতির সেই রুঢ় নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন, কিন্তু বাংলা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সে জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।’

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ‘সিরাজদ্দৌলা’ প্রকাশের পর পলাশী ট্রাজেডি নিয়ে আমাদের সাহিত্যের অন্ধকার যুগ স্তিমিত হয়ে আসে। অন্ধকারের কুশীলবরা অন্তত এটা উপলব্ধি করলেন, যা তা লিখে, কান্ডজ্ঞানহীন বিদ্বেষ প্রচার করে, সাম্রাজ্যবাদের কঙ্কি হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু জনগণের মনের মণিকোঠায় জায়গা পাওয়া যাবে না।

আর যারা ব্যথিত ক্ষুদ্র হৃদয় নিয়ে নির্বিরাম ‘নান্দনিক’ অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছিলেন, তারা এবার জেগে উঠলেন। গুরু হলো পলাশী থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতীয় জাগরণের পথে এগিয়ে চলা। গুরু হলো ‘স্বাধীনতার যুগ’ প্রবর্তনের কষ্টসাধ্য দুঃসাহসী কর্ম।

দুই. বিদেশী ব্রিটিশ বেনিয়াদের সঙ্গে দেশি স্বার্থান্ধ উচ্চাভিলাষীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে অন্তিমিত হয় স্বাধীনতার সূর্য— যে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে প্রতীক ছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। পলাশীর পরাজয় এবং সিরাজের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতির জীবনে নেমে আসে পরাধীনতার অসহনীয়, অবমাননাকর গ্রানি। সেদিক থেকে পলাশী আমাদের লজ্জা ও কলংকের অধ্যায়। আবার একই সঙ্গে পলাশী আমাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণেরও ক্ষেত্র। পলাশী উন্মোচিত করে দেশি-বিদেশি বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ! আবার পলাশী আমাদের অপমানের শরশয্যা থেকে উঠে দাঁড়ানোরও ডাক দেয়। এ জন্য ইতিহাসের অন্য দশটি ঘটনার সঙ্গে পলাশীর রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণেই আজ ২৫২ বছর পরও পলাশীর ট্রাজেডিকে অনুধাবন করার তাৎপর্য ও গুরুত্ব যে অনস্বীকার্য দ্যুতি নিয়ে অনুভূত হচ্ছে-বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও সেভাবেই অন্তরে ধারণ করেছিল বাংলা সাহিত্য।

প্রথমেই নাটক প্রসঙ্গ। পলাশী তথা সিরাজদৌলাকে মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় আনার প্রথম কৃতিত্ব নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২)। তিনি ইংরেজ ও তাদের এ দেশীয় 'গৃহপালিত' ইতিহাসকারদের কাহিনীর ওপর ভরসা করেননি। গিরিশ ঘোষ বলেন: 'সুপ্রসিদ্ধ-ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ আসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খন্ডন করিয়া রাজনীতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি এই সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। ফলে 'সিরাজদৌলায় কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও : 'সিরাজদৌলার জীবনধারাকে অনুসরণ করে নাট্যকার স্বাধীনতার আবেগকে প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন সমাজে পরাধীনতার বেদনায় বাঙালীর যে চিন্তাবিক্ষোভ 'সিরাজদৌলা' নাটক তার পরিচয় বহন করছে।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহাম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান : পৃষ্ঠা ২৭০)। ১৩১২ সালের ২৪ ভাদ্র এ নাটক প্রথমবার মঞ্চে উপস্থাপিত হয়। ১৯১১ সালে এই নাটকের প্রচার ও অভিনয় নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার।

ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৪-১৯৩৭) 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' এই ধারার আরেকটি নাটক। পলাশীর ঘটনা নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটকটির নাম 'সিরাজদৌলা', নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১)। এই নাটকটি প্রথমবার মঞ্চে আসে ১৯৩৮ সালের ২৯ জুন। মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। পরবর্তীকালে মূলত এই নাটকের ওপর ভিত্তি করে খান আতাউর রহমান নির্মাণ করেন তার কালজয়ী চলচ্চিত্র 'নবাব সিরাজদৌলা'। এই নাটক জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তখন এই নাটকটি সম্পাদনা করে দেন। নাটকে ব্যবহৃত ৬টি গান, 'আমি আলোর শিখা', 'মায় প্রেম নগরকো জাউদী', 'কেন প্রেম যমুনা আজি হল অধীর', 'পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা', 'এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে এইত নদীর খেলা' ও 'পলাশী হায় পলাশী' নজরুলের লেখা। এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালকও ছিলেন নজরুল।

মঞ্চের পাশাপাশি ১৯৩৯ সালের ২৪ নবেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে একটানা ২ ঘণ্টা ধরে এই নাটক রেডিওতে প্রচারিত হয়। সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী। আলেয়ার সংলাপ দিয়েছিলেন উষাবতী, গান গেয়েছিলেন হরিমতী। অবশ্য মঞ্চে কণ্ঠ দেন নীহারবালা। রেডিওতে এ নাটক পরিচালনা করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১)।

এর পরপরই এইচএমভি কোম্পানি থেকে এই নাটকের রেকর্ড বের হয়। রেকর্ডে আলেয়ার গানে কণ্ঠ দেন পারুলবালা ঘোষ। মাঝির গানে কণ্ঠ দেন মৃণালকান্তি ঘোষ। নাটকের পাড়া অতিক্রম করে এই ‘সিরাজদৌলা’ অচিরেই জায়গা করে নেয় ‘যাত্রা’ দলে। সেই দিন থেকে অদ্যাবধি যাত্রার পালায় সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে পরিবেশিত হচ্ছে ‘সিরাজদৌলা’।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার মধ্যে নতুনভাবে উঠে আসে সিরাজদৌলা। এই পর্বের নেতৃত্ব দেন কবি নাট্যকার সিকানদার আবু জাফর (১৯৮১-১৯৭৫)। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হলো তার নাটক ‘সিরাজ-উ-দৌলা। সিকানদার আবু জাফর বাংলাদেশের একমাত্র কবি ও নাট্যকার যিনি কুখ্যাত ‘হলওয়েল মনুমেন্ট, অপসারণে রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কলঙ্কস্তুভটি চূর্ণ করার চাক্সাস সাক্ষী। সঙ্গত কারণেই তিনি তার নাটকের ভূমিকায় বলছেন: ‘কাছেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য ও প্রেরণার উৎস হিসাবে সিরাজ-উ-দৌলকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তার চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলিকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থাঙ্ক স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ ও মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি। (সিরাজ-উদৌলা ভূমিকা)

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে এ নাটক ঢাকায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫২ সালেও মধ্যে আসে এ নাটক। বাংলা একাডেমী জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার (বিএনআর) অর্থানুকূলে ১৯ এপ্রিল ১৯৬৩ তে আবার মধ্যে আসে এ নাটক। বাংলা একাডেমী এ নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে ১৯৬৩ সালে। একই সময়ে করাচিতে পূর্ব পাকিস্তান সমিতির প্রয়োজনায় ‘কন্ট্রাক’ হলে অভিনীত হয়। সে সময় সিরাজের ভূমিকায় নামেন খান আতাউর রহমান। আর মীরজাফরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রকলা শিল্পী এসএম সুলতান। সিরাজদৌলাকে নিয়ে লেখা বাংলাদেশের পর্বের একমাত্র নাটক নাট্যকার সাইদ আহমদের ‘শেষ নবাব’।

তিন. নবীন সেন, হেমচন্দ্রের সমগোত্রীয় কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫২) মূলত মহাকাব্যকার হলেও ‘অশ্রুমালা’ (১৮৯৪) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি। সিরাজদৌলাকে নিয়ে আধুনিক বাংলা গীতি কবিতার প্রথম কবি কায়কোবাদ।

‘অশ্রুমালা’ কাব্যে প্রকাশিত তাঁর ‘সিরাজসমাধি’ এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

‘এই সে সমাধি গৃহ-এই স্থানে হায়
বঙ্গের গৌরব-সূর্য চিরঅস্তমিত।
এই স্থানে-কি বলিব বুক ফেটে যায়,
স্মরিলে সে কথা প্রাণ হয় আকুলিত।
কত যুগ যুগান্তর গিয়াছে চলিয়া,
সিরাজের অস্থি লয়ে ব্যথিত অন্তরে
আজিও সে ম্লান বেশে আছে দাঁড়াইয়া
হেরিলে তা কার চক্ষে অশ্রু নাহি ঝরে?
নিখিলের এ সমাধি মুহূর্তের তরে,
অতীতের কত কথা পড়ে এই মনে!
কত ঝড় বয়ে যায় প্রাণের ভিতরে
কত চিত্র ভেসে উঠে নয়নের কোণে!

ক্রাইড এখানে ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ হলেও কবির বেদনার অন্তর্নিহিত নির্ধাস সহজেই অনুমান করা যায়।

শাহাদাত হোসেনের (১৮৯৩-১৯৫৩) ‘সিরাজ স্বপ্ন’ নিয়ে এসেছে ব্যর্থ ব্যাকুল রোমাঞ্চাচ্ছন্ন এক তরুণ নবাবের অন্তরঙ্করণের দহন। সিরাজ জীবনের শেষ দৃশ্যই এই কাব্যনাটকের মূল উপজীব্য।

তবে নজরুলের (১৮৯৩-১৯৭৬) আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলা কবিতায় পলাশী ট্রাজেডি কিংবা সিরাজদৌলার শাহাদাত বরণ নিতান্ত শোকের, ব্যর্থতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পলাশী যে কেবল অশ্রু ফেলার গোরস্থান নয়, এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতিকে যে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করা যায়-এ দিকটা অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত, যদি নজরুল তার যুগশ্রবর্তক প্রতিভা নিয়ে মাঠে না নামতেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন এবং সৃষ্টিশীলতায় অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে আছে পলাশী। পলাশীর বেদনার গোঙরানি তার অন্তরলোককে একদিকে যেমন করেছে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, অন্যদিকে যুগিয়েছে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বজ্রের মতো জ্বলে ওঠার প্রেরণা। ফলে তিনি পরিণত হয়েছেন জাতীয় জাগরণের প্রতীকে; পরাধীনতা, শোষণ, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার আমাদের প্রধান অবলম্বনে। এজন্যই নবাব সিরাজদৌলা তার কাছে মাতৃভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এক মহান স্বাধীনতাযোদ্ধা জাতীয় বীর।

তিনি ব্যথিত হয়েছেন, হয়েছেন উদ্বেলিত। তাঁর মানসলোকে পলাশী যে সবসময় ছিল, তার নজির ছড়িয়ে আছে অবিনাশী সৃষ্টি সম্ভারে। তবে এই অবস্থান সবসময় প্রত্যক্ষ তা নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরোক্ষ। তার ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ যেমন পলাশী আছে, তেমনি আছে ‘কান্তারী হুঁশিয়ার’ কবিতায়। আবার প্রত্যক্ষ হয়েছে ‘নবাগত উৎপাত’ কবিতায়। কিংবা শচীন সেনগুপ্তের নাটকে।

বাংলাভাষী কবিদের মধ্যে নজরুলই প্রথম এবং একমাত্র কবি যিনি গভীর শ্রদ্ধা দেশপ্রেম ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সিরাজের শাহাদাতবার্ষিকী পালনের জন্য বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের ২৯ জুন দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত হয়েছিল এই বিবৃতি। দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সেই মহার্ঘ বিবৃতির পুরোটাই তুলে দিলাম :

‘কবি নজরুল ইসলাম

সিরাজ স্মৃতি উদযাপনের আবেদন’

‘বীর শহীদের জীবনস্মৃতি হইতে প্রেরণা লাভ করুন’ ‘আগামী ৩ জুলাই সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি দিবস পালনের জন্য যে আয়োজন হইতেছে, সে সম্পর্কে বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিম্নরূপ আবেদন প্রচার করিয়াছেন:

‘আমি জানিতে পারিলাম যে, আগামী ৩ জুলাই সিরাজউদ্দৌলা দিবস পালনের আয়োজন চলিতেছে। একথা আজ সর্বজনসম্মত যে বাংলার শহীদ বীর ও শেষ স্বাধীন নৃপতি নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা রাজনৈতিক কোলাহলের উর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সর্বোপরি বাংলার মর্যাদাকে তিনি উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং বিদেশী শোষণের কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জীবন যৌবনকে কোরবানী করিয়া গিয়াছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ’র নেতৃত্বে কলিকাতার সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি কমিটি উক্ত অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতা কমিটিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদের জাতীয় বীরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার জন্য আমি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট আবেদন জানাইতেছি। বিদেশীর বন্ধন-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের জন্য আজ আমরা সংগ্রামরত। সিরাজউদ্দৌলার জীবন স্মৃতি হইতে যেন আজ আমরা অনুপ্রাণিত হই-ইহাই আমার প্রার্থনা। [নজরুল রচনায় পলাশী ট্রাজেডী: নজরুল ইনস্টিটিউট। পৃষ্ঠা-২]

এই ‘জাতীয় বীর’ ও স্বাধীনতার যোদ্ধাকে সম্মান জানাতে নজরুলের পরবর্তী কবিতাও পিছিয়ে থাকেননি। গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৫) ‘১৯৫৭ সালের বিপ্লব’, তালিম হোসেনের (১৯১৮-১৯৯৫) ‘সিরাজ স্মরণ’, ‘হায় সিরাজ’, ‘শহীদ

সিরাজ', ফখরুজ্জামান আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) 'মীর জাফরের কৈফিয়ত', আল মাহমুদের 'পলাশীর স্মৃতি ১৯৯৭', ফরহাদ মজহারের 'আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে', আবদুল হাই শিকদারের 'সিরাজদ্দৌলা', মতিউর রহমান মল্লিকের 'মীরজাফর', আসাদ-বিন হাফিজের 'হারজিত' কিংবা হাসান আলীমের কবিতা- একই চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত।

চার. পলাশীর ট্রাজেডি যে কেবল ইতিহাস এবং লিখিত সাহিত্যকেই বেদনার্ত এবং আলোড়িত করেছে তা নয়, আমাদের জনজীবনকেও করেছিল ব্যাপকভাবে ব্যথিত। রেখে গেছে গভীর প্রভাব। আজো মুর্শিদাবাদ, মালদহ কিংবা রাজশাহী অঞ্চলের লোককবির কণ্ঠে 'মর্সিয়া'র মতো করুণ রসে সিক্ত হয়ে গীত হয় পলাশীর হাহাকার। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মুর্শিদাবাদ এলাকা থেকে উদ্ধার করেছিলেন এমনই কয়েকটি লোকগীতি। যা পরে তিনি 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত করেন। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে পলাশীর গানটির কয়েকটি চরন এ রকম।

কি হলোরে জান।

পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরান।

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে,

একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।

ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়,

হাঁটু গেড়ে মারছে তাঁর মীরমদনের গায়।

কি হলো জান-

পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরান।

নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,

কলকেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটি।

কি হলোরে জান-

পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।'

-এই গানে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। পড়ার সময় মনে রাখতে হবে এ হলো আদি অকৃত্রিম লোকগীতি। লোককবিদের কাছে তথ্যের বড় হয়ে ওঠে পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য। ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে। এর মতো বিখ্যাত লোকছড়া কার লেখা তা যেমন জানার উপায় নেই, তেমনি এই গানটির রচয়িতার নামও চিরকালের জন্য আড়ালেই থাকবে।

পাঁচ. বাংলা সাহিত্যের পলাশী ট্রাজেডি সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত হয়েছে উপন্যাসে। যদিও দু' একটি লিখিত হয়েছে, সেগুলো ইংরেজদের 'খাস-দালালি' করার মতলবে। বাকিগুলো অখাদ্য। ফলে একদিকে যেমন ঘটেছে ইতিহাস বিকৃতি, অন্যদিকে দুষ্ট হয়েছে সাম্প্রদায়িকতায়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, পলাশী নিয়ে কবিতা, উপন্যাস কিংবা নাটকে আরো বড় আরো মহৎ কিছু করার সময় শেষ হয়ে যায়নি। তবে সে ক্ষেত্রে রচয়িতাকে হতে হবে টেনিসনের মতো সত্যনিষ্ঠ। গায়ের জোরে বদ মতলব তাড়িত হয়ে বাজে কিছু করার চাইতে না করাই তো ভালো।

টেনিসন তার ঐতিহাসিক নাটক 'বেকেট' এর ভূমিকায়, তার নাটকে স্থান পাওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে একটি চমৎকার চতুর্দশদী কবিতা লেখেন। তার শেষ কয়েকটি চরণ বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ :

‘আমি যদি তোমাদিগকে এমন কথা বলাই,

যাহা তোমরা বল নাই-

যদি তোমাদিগের সদগুণ বিলুপ্ত করিয়া ফেলি,

এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে গঠিত করি

তাহা হইলে, হে প্রাচীন প্রেতাঙ্গাগণ

আমার উপর ঝুঙ্ক হইও না।

কারণ, যিনি আমাদিগকে ঠিক জানেন,

তিনি জানেন, যে কেহই নিজের একদিনের

জীবনেরও যথার্থ বৃত্তান্ত-লিখিতে পারে না।

এবং পৃথিবীতে আর কেহই তাহার জন্য লিখিয়া দিতে পারে না।’

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অনুদিত]

যদি এইরকম দায়িত্ববোধ কারো মধ্যে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি যতো বড় লেখকই হন, নিজের পাপকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য, ঘাড় উঁচু করে বলবেন না, ‘উপন্যাস লেখক সর্বত্র সত্যের শৃংখলবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামতো অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।

সাম্রাজ্যবাদের মোহ ও বুদ্ধিজীবী মহল

ফাহমিদ-উর-রহমান



সাম্রাজ্যবাদ নানান রকমের মুখোশ পরে থাকে। সভ্যতার মুখোশ, উদার নৈতিকতার মুখোশ, গণতন্ত্রের মুখোশ, বিশ্বায়ণের মুখোশ। সাম্রাজ্যবাদের হাতে অনেক সম্পদ। সে জন্য সে খুবই শক্তিশালী তাবেদার সৃষ্টি করে। সে উৎপাদন ঘটায় নানাবিধ মোহের। ফলে তার মুখোশের অভাব হয় না। যখন যে মুখোশের প্রয়োজন সেটি পরে সে নিজেই আত্মগোপন করে রাখে।

সাম্রাজ্যবাদ জিনিসটা নতুন নয়। কিন্তু তার ভয়ংকর চেহারা এমনভাবে আর কখনো দেখা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদ এখন দ্রুত উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। উদ্যম হয়ে পড়ছে তার শরীর। কোন মুখোশেই আর কুলোচ্ছে না। হিটলারের কথা আমরা শুনেছি। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কলহ, লুণ্ঠন ও সেখানকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফাঁক গলিয়েই তৈরী হয়েছিল হিটলারের মত মানুষ। কিন্তু সেই হিটলারকেও আজ ব্যাপকতায় ও স্থায়িত্বে ছাড়িয়ে গেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। হিটলারের যত না দোষ ছিল, তার চেয়ে বেশী বদনামী জুটেছে। সেদিনের ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসী মিত্র জোটের প্রপাগান্ডার জোরে তাকে দানব বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই দানবের চেয়ে আজকের বুশ-ব্রেনার ও তার ছানাপোনারা নিষ্ঠুরতা ও জঘন্য অমানবিকতায় সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। মানুষের সমষ্টিগত অর্জন এমন সংকটে আর কখনো পড়েনি। কেবল মানুষ নয় এদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে প্রকৃতিও আজ বিপন্ন।

প্রগতিশীলতা বলতে আজ তাই বুঝাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এটা ঠিক প্রগতিশীলতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। উনিশ শতকে কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের কাছে প্রগতিশীলতার অর্থ দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের গোলামী করা। এক সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন সক্রিয় ছিল তখন এদেশে কমিউনিস্টদের প্রগতিশীল বলা হতো, মূলত তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধিতার কারণে। কিন্তু আজকে সেই কমিউনিস্টদের অনেকেই নানা রকম জাগতিক সুখ সুবিধার মোহে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন তাদের অবস্থান কি প্রতিক্রিয়াশীল?

এই আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রগতিশীলতার একটা মাত্রা আছে এবং সেটা হয়তো প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে অগ্রগামিতা। সেই অগ্রগামিতার পথে সাম্রাজ্যবাদই সবচেয়ে বড়

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। এ প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার বিরোধিতা নেই কিংবা তাদের সঙ্গে যারা আপোষ করে ফেলেছে তাদেরকে আর যাই হোক প্রগতিশীল বলা চলে না। ইতিহাস থেকে দু'একটা নজীর নেয়া যাক। রাজা রামমোহন রায়কে বলা হয় বড় মাপের মানুষ। তিনি হিন্দু ধর্ম সংস্কার করে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা নিবারণে তার বড় ভূমিকা ছিল। সবার উপরে বহুল আলোচিত উনিশ শতকীয় বাংলার যে নবজাগরণ তার প্রধান উদ্যোক্তা পুরুষ ছিলেন তিনি। বাংলা-ইংরেজি-সংস্কৃত-ফারসী প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এত কিছু পরেও এদেশে তিনি ব্রিটিশ কলোনাইজেশনকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশের ন্যায়পরায়ণতায় (৭) তার ছিল অগাধ আস্থা। ভারতীয়দের 'সভ্য' করার ব্যাপারে ইংরেজের ভূমিকার তিনি ছিলেন উৎসাহী সমর্থক। মোটকথা দেশাত্মবোধ বলতে তিনি ইংরেজের প্রভুত্বের সমর্থনকেই বুঝতেন। রামমোহন এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে মজবুত করার জন্য একদল শিক্ষিত ব্রিটিশ দালাল তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ির খিলদারকানাথ ঠাকুর। এরা ইংরেজের এত অন্ধ অনুগত ও ভক্ত ছিলেন যে রামমোহনের অনুরাগী প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বলেছেন : ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও, না ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও। আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করবো। (বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড : রমেশচন্দ্র মজুমদার)

অথচ এই সব মানুষ স্বদেশ প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছে বলে ইতিহাসে জয়ঢাক বাজানো হয়েছে। এর পিছনে যে ইংরেজের হাত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই সেদিন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। রাজা ও খিল না হয়েও ইংরেজের কৃপাধন্যে এরা সেই স্তরে উন্নীত হয়েছেন। রামমোহন ইংরেজকে জবর দখলকারী হিসেবে দেখেননি। দেখেছেন ঈশ্বর প্রেরিত মুক্তিদাতা হিসেবে।

তার ভাষায় : Divine Providence at last in its abundant Mercy stirred up the English to break the yoke of those tyrants and to relieve the oppressed natives of Bengal under its protection... your dutiful subjects have not viewed the English as a body of Conquerors but rather as deliverers and to look up to your Majesty not only as Rulers but also as father and protector. (English Works of Raja Rammohun Ray, Calcutta, 1921, p- 470)

এই যোহের কারণ কি? সাম্রাজ্যবাদ রামমোহন, দারকানাথের মত মানুষদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ তা কিন্তু এদের

দেখার কায়দাটিই পরিবর্তন করে ফেলেছিল। রামমোহনকে বলা হয় উদারনীতিক। কিন্তু উদারনীতিকদের অসুবিধা হচ্ছে তারা যতই আন্তরিক হোন না কেন চিন্তা ও বক্তৃগত স্বার্থের দিক দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের যে নিয়ন্ত্রণ তা তারা কখনোই ছিন্ন করতে পারেন না।

রামমোহনের কাল অনেকদিন গত হয়েছে। দুশ বছর পার হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ তার চেহারা পাষ্টায়নি। দেশে দেশে লুণ্ঠন, ভূমিদখল, গণহত্যার সেই পুরনো সিলসিলা আজও চলছে। ইরাকে, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে লাখ লাখ মানুষকে তারা মেরে ফেলেছে। জাতিসংঘ পরিণত হয়েছে আত্মবাহী প্রতিষ্ঠানে।

এখনও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে নিয়ে মোহের শেষ নেই। এখনও এরা ওসব দেশে যেতে পারলে বা ওদের কথা শুনেতে পারলে অহ্লাদিত বোধ করেন। তারা ভাবেন তাদের স্বর্গলাভ ঘটেছে। গত কয়েকশ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের মতো নির্যাতিত দেশগুলোতে শিক্ষিত মানুষের মনে যে মোহ সৃষ্টি করেছে এর দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করা যাবে না।

গত শতকের বিশের দশকে বাঙালি মুসলিম সমাজে রামমোহনের এক ভাবশিষ্য তৈরি হয়েছিলেন। তার নাম কাজী আবদুল ওদুদ।

ওদুদ সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও জীবনাদর্শই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐ ইউরোপীয় আয়নায় তিনি স্বসমাজ ও স্বসংস্কৃতিকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যেমন করে ইসলামকে একটি ‘বর্বর’, ‘অসভ্য’, ‘জঙ্গী’, ‘মধ্যযুগীয়’ ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছেন ওদুদ সাহেবের চিন্তাভাবনা তার থেকে খুব একটা পৃথক ছিল বলে মনে হয় না। তিনি আজীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করেছেন। তার বিখ্যাত বইয়ের নাম হচ্ছে ‘শাস্ত্রত বঙ্গ’। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি এ বইতে আলোকপাত করেছেন কিন্তু ইসলাম ও ইসলাম প্রধান জনগোষ্ঠী নিয়ে তিনি গৌরব করার মত কিছু লিখতে পারেননি। সর্বত্রই ইসলামের প্রতি এক গভীর ক্ষেদোক্তি। যেন ইসলামই বাঙালি মুসলমান তথা মুসলিম সমাজের অধঃপতনের কারণ। তার বহু সমালোচিত প্রবন্ধ ‘সম্মোহিত মুসলমান’ এ তিনি লিখেছেন : ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। সুতরাং এই ব্যর্থতার জঞ্জালকে অপসারণ করতে হলে ইসলামী নীতি ও শাস্ত্রের বোঝাকেই (১) সরিয়ে ফেলা হচ্ছে তার পরম আরাধ্য। ওদুদ সাহেবের ভাষ্য এরকম জ্ঞানি। প্রতিপক্ষের এখানে একটি শক্ত জবাব আছে। তার উক্তিতে দাঁড়াতে, ‘আমাদের যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অথবা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ, তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে। আর সে ধর্মশাস্ত্র যে অপৌরুষেয়- revealed-এরই পরিবর্তন হবে নাকি?’ সম্মানপূরঃসর প্রতিপক্ষকে নিবেদন করতে চাই,- হাঁ এই কথাটাও ভেবে দেখা দরকার।

ওদুদ সাহেবকে সমর্থন করবার মত লোকের অভাব নেই এদেশে। মুসলিম সমাজের এই অংশই সাম্রাজ্যবাদের সমব্যথী। মুসলিম সমাজে জনগ্রহণ করেও চেতনার দিক দিয়ে তারা পশ্চিমের আধিপত্যকে লালন করে চলেছেন। আজকের মুসলিম সমাজে সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন বিস্তারে এরাই হচ্ছে ভ্যানগার্ড।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলোনিয়াল ব্যবস্থাকে সংহত করবার জন্য বাংলার রেনেসাঁসের দরকার হয়েছিল ব্রিটিশরা ছিল এর প্রোডিউসার, বাঙালি বাবুরা ছিল কনজিউমার। এই রেনেসাঁসের সূত্র ধরেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত বড় মাপের বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, সংস্কারক ও সাহিত্যিকদের উত্থান আমরা দেখতে পাই। এরা সব রকম যোগ্যতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না। ইংরেজের পরাধীনতাকেই এরা স্বাধীনতা বলে চালিয়েছেন। শুধু পরাধীনতা নয়। সমাজে যে শোষণ চলছে তার ব্যাপারেও এরা ছিলেন নিষ্পৃহ। এদেশে ইংরেজ শাসনকে মজবুত করতে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও ইংরেজের প্রশ্রয়ে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। এদের একজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন। ঘৃণাকরেও তিনি চাননি ইংরেজ রাজের অবসান হোক। কেন চাননি সেটিও তিনি বলিষ্ঠভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন : ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদের নতুন কথা শিখাইতেছে, যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-স্বাভাবিক প্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না। (বঙ্কিম রচনাবলী, পৃষ্ঠা- ২৪০-৪১)

এই যে ব্রিটিশ শাসকরা আমাদের ‘সভ্য’ বানাবার কসরত করেছেন, নতুন কিছু শুনিয়েছেন বা বুঝিয়েছেন, নতুন আলো এনে উজ্জ্বল মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করেছেন এর জন্য কৃতজ্ঞতার কোন অভাব নেই। ভাবটা এমন ব্রিটিশরা না এলে আমরা ‘সভ্য’ হতে পারতাম না, একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যেতাম। ব্রিটিশরা আসার আগে এই উপমহাদেশে একটা উন্নত সভ্যতা ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা ঐ ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। যে সভ্যতা তাজমহল, ফতেহপুর সিক্রি গড়ে তুলেছিল, যেখানে তৈরী হয়েছিল আর্মীর খসরুর মত কবি, আবুল ফজলের মত পণ্ডিত, তা কি এসব নব্য আলোকপ্রাণ্ডদের মনে রাখা সহজ ছিল? মোটেই নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রও রাখতে পারেননি। তার উপলব্ধি স্থানীয় মানুষদের উপকারের জন্য এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক সাম্রাজ্যবাদী লর্ড মেকলের মত থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ইংরেজ আগমনের ‘মঙ্গলময়’ দিক সম্পর্কে রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথরা যা ভেবেছিলেন পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রও সেই ধারায় ভেবেছেন আর কি। মজার ব্যাপার হচ্ছে সুদূর ইউরোপে বসে কালমার্কস ভারতে ইংরেজ শাসনের ভয়াবহ রূপটি বুঝতে পারলেও ইংরেজের আলোয় আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি বাবুরা বুঝতে পারেননি। সেই ১৮৫৩ তে কালমার্কস লিখেছিলেন : The whole rule of Britain in India was swiuiinn, and is to this day.

বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় অগ্রসর চিন্তার মানুষ। তাকে বলা হয় ঋষি। এই সব বিপুল আয়োজনের মধ্যেও তিনি সাম্রাজ্যবাদকে যথাযথভাবে চিনতে পারেননি। এই না পারার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই তাদের হাঁচে ঢেলে এই ‘অগ্রসর চিন্তার মানুষকে’ নিজেদের মত করে তৈরি করে নিয়েছিল। না হলে হাতে পায়ে শিকল পরা এই গোলামীর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেতাম না : ‘১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃংখলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্ণের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন; এমন কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজের অমঙ্গলাকামী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকামী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব।’ (বঙ্গদেশের কৃষক)

ইংরেজ শাসনকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে এটা বঙ্কিমের একটা সুপরিচিত বক্তব্য। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে খোলাখুলি মাঠে নেমেছেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজের কীর্তি। তারাই চালু করেছিল এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই ছিল এদেশে ইংরেজের শক্তির উৎস আবার সব রকমের শোষণ-শাসন নীতি এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের সাধারণ মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকর হলেও এর উপর তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ গড়ে উঠেছিল, যারা ছিল ইংরেজের উচ্ছিষ্ট ভোজী। সেই বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিম সেই সমাজের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেননি। শুধু তাই নয় ইংরেজ প্রভুকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাস ভাজন বলে চিহ্নিত করাও স্বপ্নের বাইরে ছিল তার। কেননা তিনি ইংরেজের অমঙ্গলাকামী নন এবং এটাও তার উপলব্ধি বটে ইংরেজের মঙ্গল এবং ঐ বঙ্গ সমাজের মঙ্গল এক ও অভিন্ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথও প্রায় একই

রকম কথা বলেছেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদেরও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি লিখেছেন জমিদারী উঠে গেলে গাঁয়ের লোকেরা জমি নিয়ে লাঠালাঠি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে মরবে। (প্রথম চৌধুরীর ‘রায়তের কথা’ বইয়ের ভূমিকা)।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় সাম্রাজ্যবাদের মোহ থেকে মুক্তির ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এখনো তো ঐ মোহ আছে। তখনকার মোহ ছিল চাকরি বাকরি। কলকাতায় থাকা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিতরণ করা নানা রকম আলোয় আলোকিত হওয়া। এখন ঐই মোহের রূপ বদল হয়েছে, চরিত্র বদল হয়নি। নগদ নারায়ণ, বস্তুগত সুবিধা থেকে শুরু করে বৃটেন, আমেরিকায় বসবাস সবই এর মধ্যে বহাল ভবিষ্যতে মিশে আছে। সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য বৃটেনের আর একটা জিনিস দরকার ছিল। সেটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। ব্রিটিশরা আসার আগে ঐই জিনিসটা ভারতবর্ষে ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাই ‘ঋষি’ ও ‘সম্রাট’ বঙ্কিমের শিল্প নিপুণতা দিয়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার পথ খুলে দিল। ‘আনন্দমঠ’, ‘রাজসিংহের’ মতো উপন্যাসগুলো যে দেশাত্মবোধের জন্ম দিয়েছে তা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত না হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। ফলে ভারত ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে গেছে। আনন্দমঠের সেই বিখ্যাত ভাষ্য উদ্ধার করছি : মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহি ইংরেজের হইয়া লড়িল। হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে দিল। কেননা হিন্দুর ইংরাজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন ঘেব নাই। আজিও ইংরাজের অধীন ভারতবর্ষে হিন্দু অত্যন্ত প্রভুভক্ত।

ঐই যে ইংরেজকে মিত্র মনে করা এবং মুসলমানকে শত্রু জ্ঞান করা এর পিছনে যুক্তিটা কি? ঐই যুক্তির পিছনের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে ইংরেজের সহযোগিতা নিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন, যার লক্ষ্য ভারতবর্ষব্যাপি এক হিন্দু ধর্মীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। বলা বাহুল্য ঐই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ ও তার শিষ্যরা সশস্ত্র লড়াই করেছিলেন। বলা বাহুল্য ঐই লড়াইয়ের মধ্যে একধরনের দেশাত্মবোধের প্রকাশ রয়েছে কিন্তু উদার মানবিকতার অনুপস্থিতিও ভয়ানকভাবে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রচিন্তায় মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। এটাকে কোন সেকুলার চিন্তা বলা যাবে না। সাহিত্য সম্রাটের ‘মুসলমান প্রীতির’ নিদর্শন স্বরূপ তার একটা লেখার নমুনা দেয়া যেতে পারে : ঢাকাতে দুই চারিদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকদের নয়ন পথের পশ্চিক হইবে— কাক, কুকুর এবং মুসলমান। ঐই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়। অতি দুর্দম, অজ্ঞেয়। ক্রিয়া বাড়ীতে কাক আর কুকুর, আদালতে মুসলমান। (বাংলা ১২২৭ সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা ৪০১ দ্রষ্টব্য)।

ভারতবর্ষে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃত্ব করবে এরকম একটি ঘোষণাকে ফ্যাসিবাদী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা যায় না। এই একত্বয়ে মনোভাবের জন্য জিন্মাহর মতো উদারনৈতিক নেতাও কংগ্রেসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা ভারতবর্ষীয়দের জন্য কতটা ক্ষতিকর হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য কি পরিমাণ সুখকর হয়েছে তা পরিমাপ করা সত্যিই কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এতটুকু বলা যায় তিনিই বঙ্গীয় হিন্দু রেনেসাঁর মধ্যমণি, শ্রেষ্ঠতম ফসল। তার সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্যে বাংলা ভাষা বহির্বিশ্বে বিপুল পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু এদেশে যে সমস্ত ব্যক্তি বা পরিবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্থায়ী হতে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি তার একটি। সামন্ত জমিদার-বুর্জোয়ার মিশ্র পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়ে উঠেছিলেন। ব্রিটিশের জুলুম অবিচার তার কবিতাকে মাঝে মাঝে ক্রোধিত নাড়াও দিয়েছে সত্য, এমনকি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তিনি নাইটহুড ত্যাগের মতো সিদ্ধান্ত নেন। তার পরেও ব্রিটিশ অনুরাগ ছিল তার মজ্জাগত। বঙ্গ ভঙ্গ রদ করায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশ্যে ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে কৃতজ্ঞ কবি ‘জনগণ মন অধিনায়ক’ প্রশস্তিটি রচনা করেন।

২৩-১-১৩১৫ তারিখে নির্বাহিনী সরকারকে এক চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যথাযথ নয় বলে মত দেন। আবার রমারলার কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানান। রামমোহনের মোহের সাথে রবীন্দ্রনাথের মোহের তফাৎ নেই। রামমোহনের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক পরের মানুষ কিন্তু ব্রিটিশ আনুগত্যে ও ব্রিটিশের প্রসন্নতায় তার মন একই রকম রক্তিম হয়ে ছিল। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস পথের দাবী যখন ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চেয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : ‘তোমার পথের দাবী’ পড়া শেষ করেছে। বইখানি উন্মুক্তক। অর্থাৎ ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে...ইংরেজ রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করার এটাতে পৌঁছব নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলুম। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্য বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে নিয়ে কবির এই মুগ্ধতার যেন শেষ নেই। সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষীয়দেরকে শোষণ তো করেছেই, লাঞ্ছিত ও অপমানিতও কম করেনি।

ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষীয়দেরকে দাস হয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু সেই দাসত্বের বিরুদ্ধে কবি কথা বলতে পারছেন না, কারণ সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেদিনকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইংরেজরা এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। তাদের পক্ষে বড় মুখ করে তাই স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে সে আন্দোলন পরিহার করে ভূবন ডাঙ্গায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রথম দিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের তিনি নেতৃত্ব দেন এবং সেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য ‘আমার সোনার বাংলা, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ প্রভৃতি গানও রচনা করেন। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের এই মনোপরিবর্তনে ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল। এর পরেই আসে নোবেল প্রাইজ। তারপর থেকে তিনি বিশ্বমানবতার তত্ত্ব প্রচারে নিবিষ্ট হন। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে তিনি লেখালেখিও শুরু করেন। তার ‘রাজকুটুম্ব, ঘুঘোঘুঘি, স্বদেশী ও স্বাবলম্বন, স্বদেশী সমাজ’ প্রভৃতি প্রবন্ধ তার প্রতিক্রিয়াশীলতার নজীর। ব্রিটিশ শাসনের স্বপক্ষে তিনি লিখেছিলেন ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাস। এখানে স্বদেশী বিপ্লবীদের আন্দোলনের অন্যায়তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এর শত শত কপি কিনে নিয়ে বিভিন্ন জেলখানায় আটক স্বদেশী বিপ্লবীদের মাথা ধোলাই করার জন্য বিতরণ করত এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামেগঞ্জেও নাটক আকারে অভিনয় করাতো। সাম্রাজ্যবাদের এই বন্ধন মুক্তি আজও আমাদের ঘটেনি। সাংস্কৃতিক অর্থেও না। অর্থনৈতিক অর্থেও না, এমনকি রাজনৈতিক অর্থেও না। এর কারণ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি। সে দুর্দমনীয়। রামমোহনের কালে, রবীন্দ্রনাথের কালে সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তা আজও বহাল তবিয়ে টিকে আছে। সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা ও দর্শন আজও পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ঐ চিন্তার নাম হচ্ছে পুঁজিবাদী উদার নৈতিকতা। এই উদার নৈতিকতার জালে আটকে আছে দুনিয়ার তাবৎ নির্যাতিত দেশগুলোর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, শিক্ষিত শ্রেণী। এই উদার নীতিকরা সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষ শক্তি। আগেই বলেছি এই উদার নৈতিকতা একটা মুখোশ। এরা মানুষের অধিকারের কথা বলে বটে, কিন্তু স্বাধীনতার কথা বলে না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। কারণ সেখানে ঝুঁকি থাকে। আসলে পশ্চিমা উদারনীতির চর্চা সমাজের সুবিধাভোগী অংশের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর মহারথীদের উদারনৈতিকতা তাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় রূপ নেয়নি। বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের দশকে ও পরে আরো অনেক কবি সাহিত্যিক আধুনিকতার নামে নানা ধরনের হৈ হুল্লোড় করেন। পান্চাত্য উদ্ভূত নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা চেতনাকে নিজেদের মত করে সাহিত্যে উপস্থিত করেন

বটে কিছু তা কখনো জনগণের মুক্তির কিংবা সাম্রাজ্যবিরোধিতায় দাঁড়ায়নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের অনুমোদন এত শক্তভাবে বিদ্যমান যে এটি একটা স্ট্যাটাস সিম্বলে পরিণত হয়েছে। কারো পুত্র বা আত্মীয় যদি স্ট্যাটাসে থাকে তাহলে যেন জাতে উঠতে সুবিধা হয়। এই কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে সবাই তেড়ে আসবে। আজকালতো কাউকে ‘মৌলবাদী’, ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ আখ্যা দিতে পারলে কাজ অর্ধেক হাসিল। কারণ প্রতিপক্ষের মুখ আগেই বন্ধ করে দেয়া যাবে। এদেশে রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও একই বদনাম নিয়ে বিদায় হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিতুমীর। তাকে জীবন দিতে হয়েছিল। নজরুল কিছুটা এগিয়েছিলেন। তাকে কারাবাস করতে হয়েছিল। তাই বলতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেমে থাকবে না। কারণ ও জিনিসটা মানবতার শত্রু। মানবতার মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতেই হবে।

এ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলতে হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পূর্বতন অভিজ্ঞতা বলছে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদ ও তার ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্তি। এটা না হলে এক পাও এগুনো যাবে না। দ্বিতীয় কথা জনগণকে সাথে নিতে হবে। জনগণকে সাথে নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। লক্ষ্য থাকবে দেশের ভিতরে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার যে শাসক শ্রেণী তাদেরকে পরাভূত করে প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ হতে পারে ইরান। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যে রাজতন্ত্র বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা একালের একটা বড় দৃষ্টান্ত। তিনি যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন, যা ছিল একাধারে সাহসী, জনসম্পৃক্ত, মেরুদণ্ডসম্পন্ন, দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্তর্জাতিক, দেশের মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ থেকে বিছিন্ন নয়। অথচ নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অস্বীকারবদ্ধ। এখানে বোধ করি ছোট আকারে হলেও উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত আছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কেমন হওয়া উচিত এবং কোনপথে এগুনো দরকার।

আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশ

ও মুসলিম লেখকদের ভূমিকা

শরীফ আবদুল গোফরান



শিশু সাহিত্য কি

দেশ ও জাতির সীমানায় শিশুর জন্ম হয়। আসলে শিশুর কোন জাত নেই। তার মনটাই তার স্বদেশ। সবশিশুই এক। যুক্তি না মানাই তার স্বভাব। সম্ভব অসম্ভবের সীমা ডিঙিয়ে নিরুদ্ধেশ উড়ে বেড়ানোই তার প্রকৃতি। ভূগোল ইতিহাসের সে ধার ধারে না। তেপান্তরের অস্তিত্ব থাক বা না থাক তার উপর দিয়ে পংখীরাজ ঘোড়া ছোটাতে তার আনন্দের কোথাও কমতি পড়ে না। পংখীরাজ ঘোড়া সে জীবনে কখনো দেখেনি, দেখবেও না। তবুও তাতে উড়ে যেতে তার কি অসীম আনন্দ! এ আনন্দ মনের আয়নায় ছবি দেখার আনন্দ। এ আনন্দের কোন তুলনা নেই।

আসলে শিশু বাইরের চোখ দিয়ে যা দেখে তার হাজারগুণ বেশি দেখে মনের চোখ দিয়ে। আর মন ছবি দেখার কাক্সাল- নতুন নতুন ছবি; অসম্ভব আজগুবি সব ছবি। তাই শিশু সাহিত্য শিশুদের এত প্রিয়।

শিশু সাহিত্য সবাই লিখতে পারে না। আর ইচ্ছা করলেও লেখা যায় না। তাই বহু প্রতিভাবান লেখকও ভালো শিশু সাহিত্য লিখতে পারেননি। মনের একটা বিশেষ মুড়েই শিশু সাহিত্য রচনা করতে হয়। সে মুডটি সকলের সহজে আসে না। মন দিয়েই শিশু সাহিত্য রচনা করতে হয়। ফলে শিশুর মতোই হতে হয় একজন শিশু-সাহিত্যিকের মন। চাই শরতের আকাশের মতো সেখানে ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলানো যুক্তি আর অর্থের বাঁধন ছিঁড়ে উধাও হতে পারা। এক কথায় শিশু মনের স্বপ্ন, কল্পনা আর ইচ্ছার খুব কাছাকাছি নেমে এসে একজন লেখক যখন সাহিত্য রচনা করেন তিনি বয়স্ক হলেও শিশুর মতোই সরল হয়ে যান। তার হালকা, চটুল ও ক্ষিপ্ত উচ্চারণে আমরা স্পষ্ট একটি দোলা অনুভব করি। সেদিক থেকে বলা যায় বয়স্কদের শিশুপণা।

এ কথাটি ঠিক এ শিশুপণার জোরেই শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা ছোটদের খুব নিকটে পৌঁছে যাই। এক্ষেত্রে শিশু সাহিত্য রচনা করতে হলে, শিশু মনের কথা শিশুদের উপযোগী করে উপস্থাপন করতে হয়। এক্ষেত্রে সহজেই শিশুমনের জগতে প্রবেশ করে শিশুদের আগ্রহ, আনন্দ ও বেদনার কারণগুলো খুঁটে খুঁটে বের করে তা

তাদের উপযোগী করে উপস্থাপন করতে হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়— শিশু সাহিত্য রচনা করা একেবারে অতি সহজ নয়। এর জন্যে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। শিশু সাহিত্য রচনা করলেই চলবে না— তা হতে হবে শিক্ষামূলক ও তথ্যবহুল। কারণ শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষামূলক শিশু সাহিত্যের। শিশুরা যদি শৈশবকাল থেকে যথাযথ শিক্ষা না পায় তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ এক তমসান্ধ্রন অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

সাহিত্যের যে অংশ বা শাখা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত আমরা তাকেই বলতে পারি শিশু সাহিত্য। মানুষ যখন থেকে পড়তে শিখেছে, তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা শুরু করেছে, শিশু সাহিত্যের জন্ম তারও অনেক আগে। মায়ের কোল থেকেই শিশু পরিচিত হয় তার সাহিত্যের সঙ্গে। মুখে মুখে শোনা অঙ্কন গান ও ছড়াই তার এ সময়কার সাহিত্য। হোক না সেই ছড়া ও গান অর্থহীন, তবুও শিশুরা তা শুনে তৃপ্তি বোধ করে। দাদির কোলে শুয়ে শুয়ে ঐ সব ধ্বনি ও সহজ ছন্দের মাধুর্যে এক সময় তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, রাতে যখন কোন শিশু কান্না জুড়ে দেয়, তখন মা আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে শিশুর দৃষ্টি ঐদিকে ফিরিয়ে ছড়া কাটে, দেখা যায় এরই মাঝে শিশুটি কান্না বন্ধ করে দিয়েছে। শিশুটি হয়তো ছড়াটির মর্ম বুঝতে পারেনি কিন্তু মায়ের আদরমাখা কণ্ঠের ছড়াটি তার কাছে এত ভালো লেগেছে যে, এক সময় সে খিলখিল করে হেসে উঠছে। আবার নিজে নিজেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে চাঁদ মামাকে ডাকে আয় আয় করে। তার অবুঝ মন যেন কত কিছু না ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। শিশু সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে নিজেকে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যেতে হয়। হাওয়ার পাখায় ভর করে উড়ে যেতে হয় আকাশে। সন্ধ্যা গড়ে তুলতে হয় চাঁদের বুড়ির সাথে। এক সময় পরীর রাজ্যেও যেতে হয়। কল্পনায় ঘুরে বেড়াতে হয় সারা পৃথিবী। গভীর রাতে পথ চলতে চলতে জিন-পরীর সাথেও দেখা হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে তাদের সামনে কথা বলতে হয়। এক সময় জিন-পরীর সাথে সম্পর্কও হয়ে যায়। বন্ধুর মতো তারা পাশে বসে বসে কত দুঃখের কথাই না বলে। আমরা যখন বড় বড় মনীষীদের জীবনী পড়ি তখন দেখতে পাই তারাও ছোট বেলায় গল্পের রাজ্যে হারিয়ে যেতেন। দাদির কোলে মাথা রেখে কত গল্পই না তারা শুনেছেন। তারা সপ্তজিহ্বা সাজিয়ে চলে যেতেন হাতেম তাইয়ের দেশে। সেখানে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। ফেরার সময় অনেক মণি-মুক্তা নিয়ে পুনরায় নিজ দেশে ফিরে আসতেন। পরিণত বয়সে এসব মনীষীরা দাদুর কাছে শোনা ওসব কল্পকথাকে কত সুন্দর করে সাজিয়ে রচনা করেছেন শিশু সাহিত্য। সারা দুনিয়াব্যাপী এ ধরনের শিশু সাহিত্য রচনা হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের ভূভাগ ও রষ্টি সত্তার বিকাশ ঘটেছে এ এলাকার জনগণের শতশত বছরের অব্যাহত সংগ্রাম ও সাধনার মাধ্যমে। বাংলার শত বর্ষব্যাপী মুসলিম সংস্কৃতির জাগরণ ও দীর্ঘ সংগ্রামের গতিধারা থেকেই আজকের বাংলাদেশ। শুরু থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে লালন করে আসছে। অথচ আমাদের এ লালিত সংস্কৃতিকে গলা টিপে হত্যা করতে চায় এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। তারা প্রগতির নামে অপসংস্কৃতিকে চালিয়ে দিতে চায় আমাদের সমাজে। তাদের আচার আচরণে মনে হয় মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য বলতে কিছুই নেই। নেই কোনো আলাদা সংস্কৃতি। তারা কুরআনের ভাষা পর্যন্ত বদলিয়ে দিতে চায়। যেমন আল্লাহ না বলে সৃষ্টিকর্তা, ‘বিসমিল্লাহ’-এর অনুবাদ প্রভুর নামে শুরু করলাম। এ সব আমাদের নতুন প্রজন্মকে মুসলমানদের ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি থেকে অপসংস্কৃতির দিকে টেনে নেয়ার এক বিরাট ষড়যন্ত্র। কোন মুসলমান নিজের সংস্কৃতি কি তা বুঝার পর বিজাতীয় সংস্কৃতির দিকে নজর দিতে পারে না। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মনমানসিকতা এবং জীবন লক্ষ্যের চেতনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জীবনবোধ এবং তারই প্রকাশ সংস্কৃতি। সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃতি গোটা জীবনে পরিব্যপ্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে আদর্শিক চেতনাই সংস্কৃতি। কারণ সংস্কার, সংশোধন, বিশ্বাস, পরিশীলন, পরিমার্জন, ভদ্রতা, শিষ্টতা, রুচিশীলতা, সভ্যতা, মানসিক বিকাশ, জীবনধারা, রীতিনীতি, শিক্ষা, উন্নতি, উৎকর্ষ এ সবই আদর্শিক চেতনা এবং আদর্শিক জীবনবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। এগুলো সবই সংস্কার। আদর্শিক চেতনা থেকেই সংস্কৃতির প্রেরণা আসে। সংস্কারের প্রেরণা যদি হয় কুসংস্কার তবে সে সংস্কারটা সংস্কৃতি নয়। বাংলাদেশের জনসাধারণ ভাষার পরিচয়ে বাঙালি, ভৌগোলিক পরিচয়ে বাংলাদেশী। সংস্কৃতি ভৌগোলিক সীমানায় সব সময়ই আবদ্ধ থাকে না। ভাষাকে কেন্দ্র করেও এ সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। তবে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যের কারণে একই ভাষাভাষী লোকদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক বিভেদ আছে। বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষায় কথা বললেও তাদের সংস্কৃতি আলাদা। যেমন মুসলমানদের ঈদের উৎসব উদযাপন রীতিনীতি নিয়ম পদ্ধতি হিন্দুদের পূজার উৎসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলমানদের মধ্যে দেখা হলে আসসালামু আলাইকুম এবং ওয়াআলাই কুমুসসালাম কথা উচ্চারিত হয়। হিন্দুদের সাক্ষাতে উচ্চারিত হয় নমস্কার, আদাব। দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানদের খাদ্য তালিকায় গরুর গোশত স্থান পেলেও হিন্দুদের তালিকায় এর স্থান পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ধর্মীয় জীবনে মুসলমানরা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দোয়া, দরুদ, তাসবীহ করে থাকে। হিন্দুরা পূজা, জপতপ ইত্যাদি করে থাকে। পাশাপাশি বাস করেও একই পদার্থকে হিন্দুরা জল বলে, মুসলমানরা বলে পানি।

একদিকে পাঠ্য-পুস্তক রচনা অন্যদিকে বিবিধ শিশু-কিশোর পাঠ্য পত্রিকায় ছোটদের জন্য রচনা প্রকাশ শিশু সাহিত্যের ধারা উন্নয়নে সহায়তা করে।

প্রথমদিকে এককভাবে শিশু সাহিত্য রচিত হয়নি। এতে ছোট বড় সবার জন্য একই সাহিত্য রচিত হতো। যেমন সময়ফলমূলক বদিউজ্জামালের মতো কিছু উপন্যাস ছিল তখন মুসলিম সাহিত্যে এসব কাহিনীর দু' একটি আজো পুঁথির আকারে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে আছে। পুঁথি পাঠকালে শিশু শ্রোতার উপস্থিতি দেশের গ্রামে গঞ্জে দুর্লভ দৃশ্য নয়।

নবীকাহিনী আর জঙ্গনামার কাল থেকেই আমদানি হতে থাকে আরো কিছু শিশুশোভন বিষয়। জাতিতে আরবীয় বা ইরানীয়, এই বিষয়গুলোর কোনোটি এসেছে অনুবাদের মাধ্যমে, কোনোটি বা মৌলিক রচনার রূপ নিয়ে। চরিত্রে এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই রূপকথাধর্মী। সুতরাং শিশুভোগ্যতম নিঃসন্দেহে নবীকাহিনী আর জঙ্গনামার তুলনায় কল্পনার আকর্ষণে অধিকতর বলবান। হাতেম তাইয়ের কিসসা এবং লায়লী মজনু, শিরী ফরহাদ ও ইউসুফ জোলেখার প্রেমকথা এই শ্রেণীরই আমদানি। এমনকি, গুলে বকাউলি জাতীয় রূপকথাও। এর সাথে এসেছে আরব্য, পারস্য আর তুর্কী উপন্যাস এবং সা'দীর বুস্তা ও গুলিস্তার গল্প। এসব গল্প শিশুদের খুবই উপভোগ্য।

পাকিস্তান যুগে মুসলিম শিশু সাহিত্যাকাশে দুর্ঘোণের ঘনঘটা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়ের প্রকোপ অনেকটা স্তিমিত আবহাওয়া শান্ত, উজ্জ্বল। বাংলার মুসলিম লেখকরা বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্য সৃষ্টির নতুন সমৃদ্ধ এক রৌদ্রালোকিত প্রসন্ন সাহিত্যাকাশের পানে ফিরলেন। তাদের হাত পেকেছিল যে পাঠ্য বই রচনায় সেটাই সাবলীল, সুন্দর, মধুর শিশু সাহিত্যের সৃষ্টি করল।

কুরআন, হাদিস, ইসলামের চার খলিফা, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, মুসলিম বিশ্বের বিবিধ গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান, মুসলিম বীর, পীর, গাজী, শহীদ, মহাপুরুষ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি শিশু সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখার লেখকগণ লেখনী চালনা করলেন।

গল্প সাহিত্যে ইরান-তুরানের গল্প, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, শাহনামা, কুরআন, হাদিস, মসনভি, গুলিস্তা, বুস্তা, নবী, আউলিয়া, পীর-দরবেশের জীবনের বিচিত্র উল্লেখযোগ্য অংশ যা শিশু চিন্তে দাগ কাটে, তাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করতে পারে, এমন বিষয়বস্তু আনা হলো। উপন্যাস নাটকের বেলায়ও আদর্শ জীবনীভিত্তিক কাহিনী রচনা শুরু হলো। ঐতিহাসিক বিষয়াদি নির্বাচিত হলো, মুসলিম বিশ্বের হাস্যরসাত্মক গল্প, কৌতুক কথার সঙ্গে পরিবেশিত হলো গ্রাম বাংলার লোক কাহিনী। রসকথা। দেশ-বিদেশের রূপকথাগুলো বাংলায় অনূদিত হলো। মুসলিম উপকথা নতুন করে পরিবেশিত হলো।

মুসলমান শিশু সাহিত্যিকগণ মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশে আরো এগিয়ে গিয়ে ধর্ম ও ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিবেশনায় মূল লক্ষ্য জ্ঞান ঠিক রেখে ছড়া কবিতায় জগৎ, প্রকৃতি, মানুষ, ঋতুপরিক্রমা, মুসলিম অনুষ্ঠান পর্ব ইত্যাদি যোগ করলেন। মহাপুরুষদের জীবনী, মুসলিম জাগরণ, ইতিহাস ঐতিহ্যে নানভাবের সূচনা করলেন। তারা গল্প, উপন্যাস, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধের বিচিত্র শাখায় নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে বলার প্রয়াস পান। ফলে বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসের স্রোতধারায় আর একটি নতুন ফল্লুধারার সৃষ্টি হলো। মুসলমান খোকা-খুকুর দল সে ধারায় স্নাত হয়ে আদর্শ নাগরিকরূপে দেশবরেণ্য সম্মানের গৌরব অর্জনে সক্ষম হলো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত অজস্র শিশু পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছে। আর এ সব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি বিকাশে শিশুসাহিত্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। যেসব লেখক এতদিন কেবল বড়দের জন্য লিখেছেন, তারা পত্রিকার পাতায় শিশুদের জন্য শিশুসাহিত্যের সম্ভার নিয়ে এগিয়ে এলেন। বস্তুত শিশু পত্রিকাগুলোই এই মহৎ কর্মকে ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে প্রকাশিত হয়ে আসছে শিশু সাহিত্যের নতুন নতুন সংকলন। রাজধানী ঢাকার বাইরে মফস্বল শহর থেকেও এসব সংকলন প্রকাশিত হয়ে আসছে।

এক সময় হিন্দুদের সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ ছিল খুবই সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছা করলেই নিজেদের সংস্কৃতি বিকাশে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে কোনো লেখা প্রকাশের সুযোগ ছিল না। ফলে মুসলমানগণ নিজেদের মনমত পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভব করেন। আর এরই ফলে মুসলিম সম্পাদিত সুন্দর মনোলোভা যুগোপযোগী শিশু পত্রিকা প্রকাশ পায়। যার মাধ্যমে বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে মুসলমানদের নতুন পথ নির্দেশ করে। ইতিপূর্বে শিশু-কিশোরদের জন্য যা রচিত হয়েছে তার সাথে বিজ্ঞানের কোনো যোগসূত্রও আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের সম্পর্ক খুবই কম ছিল। বিশেষ করে প্রগতিবাদী লেখকদের হাতে যা রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই আমাদের সংস্কৃতি বর্জিত। যার অধিকাংশই অবাস্তব আঘাতে গুলে ভরা। মিথ্যার পাঁচালি দিয়ে সত্যকে ঢাকার অপপ্রয়াস মাত্র। এ জন্য যেমন দায়ী আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তেমনি দায়ী প্রগতিবাদী লেখকরা। তারা তাদের সামাজিক দায়িত্বটুকু ও মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে এসব অপকর্মের সাথে নিজেদের একান্ততা ঘোষণা করে ব্যক্তি সুবিধা লুটেছে মাত্র। তারা যে সব সাহিত্য রচনা করছে সেখানে আমাদের দেশ, দেশের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের শিশু-

কিশোরদের উপেক্ষা করা হয়েছে। তাদেরকে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চা থেকেও দূরে রেখেছে।

গল্প, উপন্যাস, ছড়া কবিতার ক্ষেত্রে কথাটি যেমন সত্য, নাটকের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তেমন সত্য। ফলে আজকের লেখকদের ভুল ভেঙেছে। তারা নিজেদের সংস্কৃতির ধারা বুঝতে পেরে মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন শিশু সাহিত্যে। শিশু সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি প্রসূন প্রস্ফুটিত হয়েছে। তার সৌরভে আমাদের শিশুদের মনোজগৎ ও কোমলচিত্ত মৌ মৌ গঞ্জে সুরভিত, আন্দোলিত। এ ক্ষেত্রে আমাদের যা অবদান তা দরিদ্র নয়। নয় অক্ষম বোবার আফালন। বর্তমানে যে সব শিশুসাহিত্য রচিত হচ্ছে তাতে নিত্য নতুন শিশু-মনোরঞ্জনী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে। তাতে অজস্র কালজয়ী শিশু-উপভোগ্য ঐশ্বর্যের শিক্ষা উদ্দীপ্ত হচ্ছে, যা আমাদের কাছে পরম গৌরব ও আনন্দের সম্পদ।

সংকট উত্তরণে কর্মতৎপরতা

দেশের শিশুরাই শিশু সাহিত্যের সাথে পরিচিত। দেশে দেশে, কালে কালে হয়তো শিশু সাহিত্যের কিছুটা রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করি, কিন্তু মূলে সারা দুনিয়ার শিশু সাহিত্য এক ও অভিন্ন।

বাংলাদেশের সাহিত্যের যে ক'টি শাখা সবচেয়ে পুষ্ট এবং জনপ্রিয়, শিশু সাহিত্য সেগুলোরই একটি। জন্মলগ্নে এর অবস্থা ছিল রীতিমতো করুণ। যেমন গুণের বিচারে তেমন পরিমাণের দিক থেকেও।

ভারত বিভাগের দরুণ উজ্জ্বল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংকট এই সাহিত্যের জন্ম এবং বিকাশ নানাভাবে বিঘ্নিত করে। কিন্তু ক্রমে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে এবং কিছু সংখ্যক সাহিত্য কর্মীর অদম্য উৎসাহ আর সৃষ্টির প্রয়াসে অল্পকালের মধ্যেই সংকটের নিরসন শুরু হয় এবং সাথে সাথে ঘটতে থাকে গুণে-মানে-পরিমাণে তার পুষ্টি লাভ আর অগ্রগতি। এ সংকট নিরসনের জন্যে যারা শিশু সাহিত্যকর্মী ছিলেন, তাদের নাম শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয় আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসেও তারা স্মরণীয়।

আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের জন্ম মূলত ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। উপমহাদেশের তৎকালীন শাসক ইংরেজদের প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্যোগের ফলে যে সৃজন কর্ম শুরু হয়। তাতে প্রধান ভূমিকা রাখেন কিছু ইংরেজ মনীষীর এবং সমকালীন বাঙালি লেখকদের। পরবর্তী পর্যায়ে, কয়েক দশকের

মধ্যেই ইংরেজ তথা খ্রিস্টান লেখকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে শূন্যে নেমে আসে। ততো দিনে বাঙালি মুসলিম লেখকরা নিজেদের জাতীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। শিশু সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ও তখন ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে উঠেন। যদিও শিশু সাহিত্য তখনও অনেকাংশেই ছিল শিশু এবং বয়স্কদের যৌথ ভোগের বিষয়। তবে বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকের মধ্যেই তার দ্রুত বিকাশ ঘটে। সে বিকাশের ফলে তার পরিমাণগত বৃদ্ধি অবশ্যই ঘটেছে। উক্ত বিকাশ তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন রচনাগত উৎকর্ষ, তেমনি বিশেষত বৈচিত্র্য সন্ধান আর লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তার অনুসরণে। বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে যাদের পরিচয় আছে, একটু খুঁজে দেখলেই বুঝা যাবে, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান ছিল না। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রথম পদচারণা দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, কিন্তু তারপরও প্রায় ছয় দশক তাদের সংখ্যা ছিলো অতিনিগণ্য এবং উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্যিক পাওয়া গেছে বস্তুত সামান্যই।

তবে এর বহুবিধ কারণও ছিল। মুসলমানরা শিশু সাহিত্যে যাত্রা শুরু করলেও তাদের চলার পথে প্রধান বাধা ছিলো পত্র-পত্রিকাও প্রকাশনা সংকট। তখন পত্র-পত্রিকার খুবই অভাব ছিলো। লেখালেখির ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানরা এগিয়ে গেলেও লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। তখন দু'একটি পত্রিকা যাও প্রকাশিত হতো বলতে গেলে সবগুলোই চালাতো হিন্দুরা। এসব পত্রিকায় লিখতেনও হিন্দু লেখকরা। মুসলমান লেখকদের লেখা ছাপার ব্যাপারে তারা খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। কাজেই মুসলমান লেখকরা তখন হিন্দু ছদ্মনামে এসব পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। শুধু নবীন নয়, বাঘা বাঘা কবিও ছদ্মনামে লেখা পাঠাতেন। এসময় প্রকাশিত হতো উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'সন্দেশ' পত্রিকা ও সেকালের কলকাতার অতি উন্নতমানের সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'নবযুগ'। 'নবযুগ' পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন 'হিমালী স্নোর' মালিকরা।

মুসলিম বাংলার তরুণ লেখকদের চিন্তা-চেতনার উপর এ আঘাতকে রুখে দাঁড়ালেন যুগস্রষ্টা মাওলানা আকরম খাঁ। জেগে উঠলেন তিনি। পরপর প্রকাশ করলেন কয়েকটি পত্রিকা। তাঁর উদ্যোগে ১৯০১ সালে প্রকাশিত হলো মাসিক ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী', ১৯০৪ সালে প্রকাশ করলেন 'দৈনিক লোক সেবক' 'দৈনিক জামানা' (উর্দুপত্রিকা) 'মোসলেম বঙ্গবাসী', অবশেষে ১৯৩৬ সালে আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রকাশ করলেন 'দৈনিক আজাদ'। সেকালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমান সকল লেখক সেখানে যোগ দিতেন। অবশ্য মুসলমান সদস্যরা বড় লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতোই মনমরা হয়ে

সভায় যোগ দিতেন। তখন তাঁরা মনে করলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক বিলুপ্ত না করে একটি নিজস্ব সাহিত্য সমিতি করতে হবে। ফলে ১৯১১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতার ৯নং আন্তনিবাগান লেনে মৌলভী আবদুর রহমান খানের বাড়িতে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এর সভাপতি করলেন মৌলভী আবদুল করিমকে।

১৯১৮ সালে এই সমিতির উদ্যোগে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। তারপর ‘বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য’ পত্রিকা নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

শিশু পত্রিকার ভূমিকা

বাংলা শিশু সাহিত্যের আধুনিক যুগের শুরু বিদ্যালয় পাঠ্য বা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী গ্রন্থসহ পত্র-পত্রিকা দিয়ে। আধুনিক মুসলিম শিশু সাহিত্য সাধনার সূচনায়ও সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাসের অবিকল পুনরাবৃত্তি কেবল কল্পনাতেই সম্ভব। আধুনিক মুসলিম শিশু সাহিত্য সাধনার সূচনা পর্ব সমগ্র বাংলা শিশু সাহিত্যের যে কাল-পর্বের অন্তর্গত, তা ছিলো এক নবজাগ্রত জাতীয় চেতনায় চঞ্চল এবং সে চেতনা ছিল দেশী-বিদেশী ইতিহাস আর মহাপুরুষ চরিত্রের প্রাণরস সন্ধান তৎপর। আধুনিক মুসলিম শিশু সাহিত্যের যখন জন্ম, তখন আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের গ্রন্থাবলি অনেক। কিন্তু মুসলিম শিশু সাহিত্যের বই একেবারেই নগণ্য, এর কারণ রয়েছে। সেকালে হিন্দুদের সম্পাদিত পত্রিকায় মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ ছিল খুবই সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। স্বকীয় চিন্তা-ভাবনার কথা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার কোন উপায় ছিল না সে পত্রিকায়। ফলে মুসলমান লেখকরা নিজেদের মনমতো পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভব করেন। আর এরই ফলে সেকালে হিন্দু শিশু পত্রিকার পাশাপাশি মুসলিম সম্পাদিত কয়েকটি সুন্দর মনোলাভা চিন্তাকর্ষক যুগোপযোগী শিশু পত্রিকা ও পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়েই প্রথম শিশু সাহিত্য রচনার পথ পরিষ্কার শুরু হয়। অন্যদিকে মুসলিম সম্পাদিত শিশু-কিশোরদের পত্রিকার পাতায় মুসলমান সাহিত্য সাধকের শিশু সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ বাংলা শিশু সাহিত্য জগতে মুসলমানদের নতুন পথ নির্দেশ করে। মুসলমান লেখক-লেখিকাবৃন্দ যেসব মুসলিম শিশু পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেকালে শিশু সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ লাভ করেন তাদের মধ্যে আমার সন্ধান মতে একে ফজলুল হক সম্পাদিত সাপ্তাহিক বালক (১৯০১), টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হতো মাসিক উৎসাহ (১৯১৩), একই সময় প্রকাশিত হয় মাসিক বালক নূর। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ১৯২০ সালে প্রকাশিত ‘আঙুর’ একদিকে যেমন আধুনিক

মুসলিম শিশু সাহিত্যের সূচনা করলো, তেমনি নবতর দিগন্তের সন্ধানী হিসেবে তার পরবর্তী পর্বের দ্বার উন্মোচন করলো।

তারপর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে শিশু পত্রিকাগুলো। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক ‘মকতব’। এই পত্রিকাটির সম্পাদকের নাম ছিল শাখাওয়াত হোসেন। একই বছর প্রকাশিত হয় ‘শিশুমহল’। সম্পাদক ছিলেন আফজাল-উল-হক। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় ‘জমজম’। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেখ ফজলুল করীম। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক ‘শিশু সওগাত’। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ‘শিশু সওগাত’ সম্পাদনা করতেন। এ পত্রিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। সেকালে সকল লেখকই এই পত্রিকায় লিখতেন। পত্রিকাটি মুসলিম বাংলা শিশু সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকাও রাখে। কারণ এর পাশাপাশি ‘সওগাত’ নামে একটি বড়দের বাংলা পত্রিকাও প্রকাশিত হতো। ফলে দুটি পত্রিকার পাশাপাশি প্রকাশনায় বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়। একই বছর ওহাব সিদ্দিকীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘গুল বাগিচা’, মুহাম্মদ শফীউল্লাহ সম্পাদিত ‘ফুলঝুরি’ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় ‘প্রভাতী’; এর সম্পাদক ছিলেন মৌলবী রজীউর রহমান (পরে শাহেদ আলী)। একই বছর এমাদউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘মাসিক সবুজ পতাকা’ প্রভৃতি।

বৃটিশ যুগে মুসলিম শিশু সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ পর্বে এই পত্রিকাগুলো মুসলমান লেখকদের শিশু সাহিত্য সাধনার সুযোগ ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করেছিল। তাছাড়া সেসময় অর্থাৎ ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ত্রৈমাসিক ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়’ ছোটদের জন্য একটি পাতা প্রকাশিত হতো। যার নাম ছিলো ‘কোরক’। পরবর্তীতে আজাদে মুকুলের মহফিল, নবযুগের আগুনের ফুলকি, এসব পাতায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিক এবং ভাবীকালের শিশু সাহিত্যিকরা শিশু সাহিত্য রচনার সুযোগ পেয়ে ইচ্ছা মতো নিজেদের চিন্তা-ভাবনার এক আনন্দময় জগৎ নির্মাণ করেছিলেন। বৃটিশ যুগে, ঊনবিংশ-বিংশ শতকে, মুসলিম শিশু সাহিত্য বিকাশে পাঠ্য-পুস্তকের ভূমিকাও কম ছিল না। আমি সে পর্বে এখন আসছি না, আসবো একটু পরে।

আলোচনা করছিলাম মুসলিম শিশু সাহিত্য বিকাশে শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকার ভূমিকা নিয়ে। ১৯৪৭ সাল থেকে অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর মুসলিম শিশু সাহিত্যের আকাশে কালো মেঘ অনেকটা কেটে যায়। অর্থাৎ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে অসংখ্য শিশু পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। একসময় যেসব শিশু সাহিত্যিক শুধু পাঠ্য পুস্তকের পাতায় সীমবদ্ধ ছিলেন তারা নতুন আঙ্গিকে শিশু সাহিত্য রচনার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় বাঙালি মুসলিম শিশু সাহিত্যিকগণ নতুন এদেশে নতুন নতুন বিষয়ে পত্রিকার পাতায় শিশু সাহিত্যের সঞ্চার নিয়ে

এগিয়ে এলেন। তৎকালীন শিশু পত্রিকাগুলোও আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের দ্বার উন্মোচনে সহযোগিতা করে। এ পত্রিকাগুলোর সারিতে পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত পাক্ষিক মুকুল। এ পত্রিকা ১৯৬৫ সালে মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে আরো যেসব শিশু পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে মাসিক ঝংকার, মাসিক মিনার, মাসিক আজান, পাক্ষিক নতুন আলো। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক দ্যুতি, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক হস্তোড়, ১৯৫১ সালে মাসিক সবুজ নিশান, ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক প্রতিভা ও মাসিক বিদ্যুৎ, ১৯৫৪ সালে মাসিক খেলাঘর ও মাসিক আলাপনী, ১৯৫৫ সালে পাক্ষিক শাহীন, পাক্ষিক সেতারা ১৯৫৬ সালে মাসিক বর্ণালী, মাসিক কিশোর সাহিত্য, ১৯৫৭ সালে মাসিক সবুজ সেনা, ১৯৫৯ সালে পাক্ষিক কিশলয়, ১৯৬০ সালে ষাণ্মাসিক ফুলকি, ১৯৬৪ সালে মাসিক নবাবু (সিলেট), মাসিক সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, মাসিক টরেটকা, ১৯৬৫ সালে দ্বিমাসিক পূরবী, মাসিক কচি ও কাঁচা, মাসিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় টাপুর-টুপুর, ১৯৬৭ সালে ত্রৈমাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ১৯৭০ সালে মাসিক নবাবু, মাসিক কিচির-মিচির, মাসিক কলকঠ, মাসিক সাম্পান প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনতার পর শিশু সাহিত্য আরো সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এতে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি না পেলেও এ সময়ে শিশু সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা হয়। নতুন সাজে নতুন আসিকে শিশু সাহিত্যের প্রতিটি শাখা হুটপুট হয়ে ওঠে। এগিয়ে এলেন অনেক তরুণ শিশু সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে। শিশু সাহিত্য ছড়িয়ে পড়লো শহরে, বন্দরে, রাজপথে। এ সময়ে আধুনিকতার ছোয়া নিয়ে এগিয়ে এলো আরো কয়টি শিশু পত্রিকা। এগুলোর মধ্যে সবুজ পড়া, ময়ূরপঙ্খী, সপ্তডিঙ্গা, সাম্পান, শিশু, ধানশালিকের দেশ, মাসিক ফুলকুঁড়ি, টাইটুসুর, কিশোর পত্রিকা, কিশোর জগৎসহ আরো অনিয়মিত বেশ কয়েকটি পত্রিকা।

মাসিক ফুলকুঁড়ি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে মুসলিম শিশু সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। দেশ স্বাধীন হবার পর উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর পত্রিকা বলতে ফুলকুঁড়ির কথাই সবাই বলে। কারণ এ পত্রিকাটি জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৩১ বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে ফুলকুঁড়ি একটি ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকা। মানের দিক থেকেও এর অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা। সব ধরনের লেখা এবং সব লেখকদের লেখা এ পত্রিকায় ছাপা হয়। এ পত্রিকাটি সর্বত্র পরিচিত এবং সবার প্রিয়। একমাত্র শিশু সাহিত্য বিকাশে এখন পর্যন্ত এ পত্রিকাটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন শিশু সাহিত্যিক মাসুদ আলী। এরপর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন

শিশু সাহিত্যিক জয়নুল আবেদীন আজাদ। ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শিশু সাহিত্যিক মাহবুবুল হক সম্পাদক ছিলেন। এরপর ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত জয়নুল আবেদীন আজাদ পুনরায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ফুলকুঁড়ি পত্রিকার পর আমরা স্বরণ করতে পারি মাসিক টাইটমুর পত্রিকাটিকে। এই পত্রিকাটিও শিশুসাহিত্যের জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিল্পী সবিহ-উল-আলম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও মরহুমা সেলিমা সবিহ এর সম্পাদনায় যাত্রা শুরু করে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

শিশু সাহিত্য বিকাশে এ যুগে নতুন এক সংযোজন মাসিক নতুন কিশোর কণ্ঠ। যতটুকু জানা যায়, প্রচার সংখ্যার দিক থেকে এই পত্রিকাটি সবার শীর্ষে। ইতিমধ্যে পত্রিকাটি শিশু সাহিত্যের রাজপথে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান শিশুদের জন্য সংযোজিত হয় শিশু সাহিত্য বিকাশে আর একটি ফলস্রোত। মুসলিম শিশুরা আশৈশব সে ধারায় স্নাত হয়ে আজ আদর্শ নাগরিকরূপে দেশ বরণ্যে সন্তানের গৌরব অর্জনে সক্ষম। এক সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশ করতেন তরুণ ছড়াকার আহমদ মতিউর রহমান ‘জিলেপি’ নামে একটি ছাড়া সংকলন। বর্তমান শ্রেষ্ঠ ছড়াকারদের এমন কেউ ছিলেন না যে এই সংকলনে লেখেননি। ১৯৮০ সালের দিকে মাসিক ফুলকুঁড়িকে কেন্দ্র করে ‘ফুলকুঁড়ি সাহিত্য আসর’ নামে একটি সাহিত্য সভা চালু হয় এবং ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ ‘মাসিক সাহিত্য সভা’ চালু করে। তা আজও অব্যাহত আছে। শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘরও একটি সাহিত্য সভা পরিচালনা করতেন। এই সমস্ত সাহিত্য সভা ও শিশু-কিশোর পত্রিকাকলার সহযোগিতায় প্রচুর শিশু সাহিত্যিকের জন্ম হয়। আজ ফুলে ফলে ভরপুর হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের বাঁকে বাঁকে। ইতিমধ্যে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে প্রচুর প্রকাশনা সংস্থার জন্ম হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে শত শত বই। পুরানো ধাঁচের সমাপ্তি ঘটিয়ে শিশু সাহিত্য আজ আধুনিক রূপ নিয়ে এক বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়েছে। তবে একটা কথা স্বীকার করতে হয়, তা হলো সত্তর দশকে শিশু সাহিত্যের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল আশির দশকে তার ছিটেফোঁটা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু নব্বই-এর দশকে একেবারে ভাটা পড়ে যায়। এর জন্যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অধঃপতন এসবও দায়ী। শুধু শিশু সাহিত্যে নয় এমন কি বড়দের সাহিত্যেও একটা ঝিমুনি ভাব এসেছে। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চলতি শতাব্দীতে আমাদের শিশু সাহিত্যে কোন দক্ষ তীরন্দাজের আবির্ভাব হতেও পারে। সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করার সময় তাই এখনো কিঞ্চিৎ বাকি।

তবে আমরা আশাবাদী, শিশু সাহিত্যে আগামী পৃথিবী আরো নতুনত্ব ভরে উঠবে। আমরা হয়তো সময়োত্তীর্ণ শিশু সাহিত্যিকদের লেখা পাবো আগামী দশকের প্রারম্ভে এবং সেটা পেলেই আমাদের শিশু সাহিত্যের মোড় ঘুরে যাবে। এক সময় আমাদের শিশুদের হাতে তুলে দেয়া হতো চীন বা রাশিয়ার বই-পুস্তক। বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু কিছু সংস্থা শিশুদের উপযোগী সাহিত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। তবে যে হারে আমাদের দেশে শিশু বাড়ছে, সে হারে শিশু সাহিত্য বাড়ছে না।

১৯৭১ সালের পর থেকে শিশু সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রকাশনা সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এই প্রকাশনাগুলো বর্তমান শিশু সাহিত্যের প্রয়োজন মিটাতে না পারলেও সময় অনুযায়ী যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা থেকে প্রচুর পরিমাণে শিশুদের বই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বইগুলো প্রকাশনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয়নি। সঠিক যত্ন নিয়ে ভাল ভাল লেখক বই প্রকাশ করলে এই প্রতিষ্ঠানটি শিশু সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে থাকতে পারতো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ আশির দশকে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাল ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীতে তা রক্ষা করতে পারেনি।

ঝড়ের আবির্ভাব ঘটানোর মতো কাজ করেছেন মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউর রহমানের। তিনি এসে শিশুদের জন্য অনেক বড় বড় কাজ করলেন। এ কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিশু একাডেমীর জন্ম। শিশু একাডেমীর মাধ্যমে শিশু সাহিত্যের উপর যথেষ্ট কাজ করা হয়। প্রকাশিত হয় বিভিন্ন লেখকদের লেখা নিয়ে নানা রকম বই ও ছোটদের পত্রিকা শিশু। ফলে শিশু সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে।

এক্ষেত্রে চট্টগ্রামের বইঘরের অবদানও কম নয়। বইঘর শিশুদের উপযোগী বই প্রকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। টাপুর টুপুর নামে সুন্দর একটি শিশু পত্রিকা প্রকাশ করতো তারা। সম্পাদনা করতেন শিশু সাহিত্যিক এখলাসউদ্দিন আহমদ। শিশু সাহিত্যের কথা মনে করলে ঢাকার মুক্তধারার কথাও মনে হয়। মুক্তধারাও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে শিশু সাহিত্য প্রকাশের ব্যাপারে এবং এখনও রাখছে। তাছাড়া শতদল প্রকাশনী, সৃজন প্রকাশনী, নওরোজ, আধুনিক, প্রীতি প্রকাশনসহ বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান শিশু সাহিত্যের উপর যথেষ্ট কাজ করছে।

বর্তমানে কিছু কিছু প্রকাশনা সংস্থা গড়ে উঠেছে। যা শুধু শিশুদের বই প্রকাশ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘সূচীপত্র’। এই সংস্থা থেকে সূচীপত্র নামে শিশুদের একটি নিয়মিত কার্টুন পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

শিশু সাহিত্যে হিন্দুদের মধ্যে যাদের ভূমিকা ছিলো তারা হলেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, অনুদাশংকর রায়, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুখলতা রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, অজিত দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শিবরাম চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বৃদ্ধদেব বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ, জ্যোতিষ্মনাথ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরেন ঘটক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মুসলমানদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিয়া, মোহাম্মদ নাসীর আলী, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী কাদের নেওয়াজ, রওশন ইয়াজদানী, খান মোহাম্মদ মইন উদ্দীন, সুফিয়া কামাল, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, আবদুস সাত্তার, হাসান জ্ঞান, আশরাফ সিদ্দিকী, আল কামাল আবদুল ওহাব, হোসনে আরা, মাহবুব তালুকদার, রোকনুজ্জামান খান, রফিকুল হক, শামসুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হুদা, এখলাস উদ্দিন আহমদ, আসাদ চৌধুরী, মোবারক হোসেন খান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আতোয়ার রহমান, মসউদ-উশ-শহীদ, আল মুজাহিদী, লুৎফর রহমান, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুল মান্নান তালিব, আফলাতুন, শামসুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, শাহাবুদ্দীন নাগরী, সাজ্জাদ হোসাইন খান, হোসেন মীর মোশাররফ, আতা সরকার, আবদুল হালিম খাঁ, রুহুল আমিন খান, ডাঃ মোরশেদ আলী, আহমদ মায়হার, মকবুলা মঞ্জুর, জাহানয়ারা আরজু, লুবনা জাহান, আনোয়ারা, সৈয়দ হক, আলী ইমাম, জাফর ইকবাল, জুবায়দা গুলশান আরা, নয়ন রহমান, বেগম রাজিয়া হোসাইন, আবদুল মুকিত চৌধুরী, মাসুদ আলী, মাহবুবুল হক, জয়নুল আবেদীন আজাদ, হাসনাইন ইমতিয়াজ, জহুর-উশ-শহীদ, মতিউর রহমান মল্লিক, আবদুল হাই শিকদার, মোশারফ হোসেন খান, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুল চৌধুরী, খালেদ বিন জয়েনউদ্দিন, আহমদ মতিউর রহমান, লুৎফর রহমান রিটন, আমিরুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন দিনাজী, আসলাম সানী, ফারুক নেওয়াজ, ফারুক হোসেন, বাপী শাহরিয়ার, গোলাম মোহাম্মদ, মহিউদ্দিন আকবর, আহমদ উল্লাহ, শরীফ খান, জাকির আবু জাফর, টিপু কিবরিয়া, ওবায়দুল গনী চন্দন, আহমদ সাকী, দেলওয়ার বিন রশিদ, মাহমুদ হাফিজ, সিকদার নাজমুল হক, আতিক রহমান, মাহফুজ মেহেদী, মহিউল আলম স্বাধীন।

শিশু সাহিত্য যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তার মানগত দিক ঠিক রেখে শিশু সাহিত্যিকরা সমন্বয়ের মাধ্যমে পথ চললে আগামীতে তা একটি শক্তিশালী সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হবে। যারা এক সময় শিশু সাহিত্যকে অবজ্ঞা করে পেছনে ফেলে রাখতে চেয়েছিল তারাও আগামীতে এই শক্তিশালী ধারার কাছে হার মানতে বাধ্য হবে। কারণ ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যের রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ঢাকা বাংলা সাহিত্যের রাজধানী তা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের একটি সভা

আল মাহমুদ



সম্প্রতি বাংলা সাহিত্য পরিষদের একটি সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। বলা বাহুল্য বাংলা সাহিত্য পরিষদের অনেকগুলো মাসিক এবং পাক্ষিক সভায় অনিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। ডাক পড়লেই আমি যাই। আমি যাই আমার স্বার্থে। অর্থাৎ নতুন উদীয়মান কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের চিন্তা-ভাবনা, ঐতিহ্যবাদী ও ইসলামী ভাবুকতার নতুন কোনো স্কুলিংয়ের ঝিলকিয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার যে পরিতৃপ্তি, সেই তৃপ্তির জন্যই আমি দেশের এই তৌহীদবাদী সাহিত্য সংগঠনের সভাগুলোতে যোগ দিয়ে আসছি। সন্দেহ নেই বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রত্যেকটি সভা বা সম্মেলনই অতিশয় শৃঙ্খলা ও সুরক্ষিতপূর্ণ। এদের একটি ছোটোখাটো প্রকাশনাও আছে। এদের প্রকাশিত প্রতিটি বইই সুচিন্তিত এবং সুসম্পাদিত। এদের সভায় যারা লেখা পাঠ করতে আসেন এরা যে সকলেই ইসলামী আদর্শের সাথে জড়িত এমন নয়। তবে সকলেই কমুনিজম বিরোধী। কমুনিষ্ট দেশগুলো যে মানুষের রোমান্টিক চিন্তা-চেতনার কবরস্থান এবং তৃতীয় বিশ্বের মার্কসবাদী সাহিত্যান্দোলন যে প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদেরই মাইনে করা তল্লাবাহকরদের দ্বারা পরিচালিত, এ ব্যাপারে যাদের কোনো দ্বিধা নেই বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভাগুলোতে অহরহই তারা জমায়েত হচ্ছেন দেখে আমার উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়। সাংবাদিক হিসেবে এই উদ্দীপনার অংশীদার হতে মাঝেমধ্যে ভালোই লাগে। এদের সাফল্য দেখে মনে হয়, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসা— এইসব কবিদের ঐতিহ্যবাদী লড়াইয়ের একটা পরিণাম সৃষ্টি হয়েছে। তথাকথিত প্রগতিবাদী সাহিত্যের ধুম্রকুণ্ডলী অপসৃত হওয়া মাত্রই ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদী নতুন লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব আসন্ন। বাংলা সাহিত্য পরিষদ তরুণতম কবি-সাহিত্যিকদের সামনে সেই সোনার তোরণই খুলে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে।

আমি বাংলা সাহিত্য পরিষদের ৬৯ তম সাহিত্য সভায় এসে বুঝতে পারলাম, এই সভাটিতে যে কয়টি লেখা পড়া হল, এর প্রায় সবগুলোই উপস্থিত

করেছেন নবীন কবি, প্রবন্ধকার ও কথাশিল্পীগণ। কিছুদিন আগেও যারা নিয়মিত লেখা পড়তেন এবং পড়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই এখন আলোচকের দলে। কেউ কেউ অনুপস্থিত থাকলেও তাদের অনুপস্থিতি ধরা পড়ছে না। মনে হচ্ছে সকলেই আছেন, সকলেই সদ্য আগত তরুণতম লেখক-কবিদের জমজমাট এই আসরের মধ্যেই বুঝি বসে আছেন।

আমি যেদিন আসরে উপস্থিত সেদিন সোলায়মান আহসান, মোশাররফ হোসেন খান, তমিজ উদ্দিন লোদী বা আসাদ বিন হাফিজের অনুপস্থিতি ঢেকে দিয়ে কবি মতিউর রহমান মল্লিক, বুলবুল সরোয়ার, কামরুজ্জামান এবং সালাহউদ্দিন নিয়ামী ও মাহফুজুল হক প্রমুখ তরুণ কাব্য সমালোচক আর ভাবুকগণের উপস্থিতি সভাকে সরগরম করে রাখে। নেতৃস্থানীয় অগ্রবর্তী মুসলিম আদর্শবাদী লেখক জনাব আবদুল মান্নান তালিব এবং জামেদ আলীও তাদের উপস্থিতি দিয়ে আসরটি জমিয়ে রাখেন। বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্য পরিষদের ৬৯তম সাহিত্য সভা আমার কাছে মনে হয়েছে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশক সাহিত্য সভা। আর প্রসঙ্গক্রমে ওপরে আমি যে কয়জন তরুণ কবি, কথাশিল্পী ও সমালোচকের নাম উল্লেখ করলাম, আমার বিশ্বাস তারা তাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব অনেক আগেই সমাপ্ত করে বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে তাদের তারুণ্যপূর্ণ প্রতিভার ঝলক নিয়ে পদচারণা শুরু করেছেন। বলা বাহুল্য, তাদের স্বাগত জানানোর জন্যই আজকের এই নিবন্ধ।

সত্তর ও আশির দশকের এইসব মুসলিম আদর্শবাদী লেখক ও কবির অনেকেরই এক বা একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যারা তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখক ও কবি ছাড়া বাংলাদেশে অন্য কোনো আদর্শবাদী লেখকের আগমন ঘটছে না বলে একদা আফসোস করতেন, এদেশের আগমন ও ভাবনার নতুন তরঙ্গে তারা অভিভূত হবেন। আমরা মনে করি, আমাদের ঐতিহ্যবাদী লেখক-কবিদের প্রতি এখন আমাদের পাঠকদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহুগত সমর্থন নিয়ে এগিয়ে আসা একান্ত দরকার। কারণ ইসলামী ঐতিহ্যের দৃঢ়মূল ভিত্তি নির্মাণ করতে হলে আদর্শের সাংস্কৃতিক লড়াইকে জয়যুক্ত করতে হবে। এদেশের ইসলামী রাজনীতি ক্রমাগত আত্মত্যাগ ও মানবিক তিতিক্ষার মধ্যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। এখন দরকার এই আস্থার ওপর সাংস্কৃতিক বিজয়ের আন্তর লাগানো। ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক সৈনিকদের সাথে ইসলামী আদর্শের মননশীল কবি-সাহিত্যিকদের অবিলম্বে মানসিক বিনিময়

একান্ত দরকার। এই দরকারী বিষয়টিই এবারকার বাংলা সাহিত্য পরিষদের ৬৯ তম সাহিত্য সভায় আমরা অনুভব করেছি।

তরুণ কবি মতিউর রহমান মল্লিক, সোলায়মান আহসান, বুলবুল সরোয়ার, তমিজ উদ্দিন লোদী, মোশাররফ হোসেন খান এবং কামরুজ্জামানের কবিতায় জীবনের বোধ খানিকটা ভাষার বঙ্কিম ব্যবহারে, বিশ্বাসের আদ্রুতায় এক ধরনের তীর্যক গতি লাভ করেছে। যা সমকালীন সাহিত্য ধারায় কিছু পরিমাণ হলেও নতুনত্ব সঞ্চারী। এই নতুনত্বকে যথাযথভাবে স্বাগত ও সমর্থন জানাবার সময় উপস্থিত। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী, ভাবুক ও সমর্থকের উচিত এদের সাহিত্যের ব্যাপক পঠন-পাঠন এবং গঠনমূলক সমালোচনা শুরু করে ইসলামী মননশীল সাহিত্যের এই আকস্মিক গতিকে আরো বেগবান করে তোলা। আমাদের ভুললে চলবে না, শুধু হাততালি আর মারহাবাতে কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী বাঁচে না। তাদের জন্য দরকার জাগতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য বস্তুগত সহায়তা। আবার শুধু বস্তুগত সহায়তা দিলেই যে লেখক-শিল্পীদের সৃজনক্ষমতা অব্যাহত থাকে এমন নয়। তাদের জন্য আধ্যাত্মিক সমর্থন ও বিশ্বাসী মানুষের দোয়ারও একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের জন্য এটা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে, তারা তাদের আদর্শের সমর্থনে একদল তরুণ সাহিত্যিককে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন।

আগে যেমন দেশের বামপন্থী প্রগতিবাদীরাই সাংস্কৃতিক মঞ্চের সবটুকু নিজেদের দখলে রাখার প্রয়াসে অগ্রগামী ছিলেন। এখন আর সেই অবস্থা নেই। আগে দেখতাম দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে যেসব বুলেটিন বা সাহিত্য সাময়িকী ইত্যাদি নানান উপলক্ষে বেরুতো এর সবগুলোর উদ্যোক্তাই থাকতেন তথাকথিত বামপন্থী ছাত্র-অধ্যাপকগণ। স্বীকার না করে উপায় ছিল না, এসব পত্র-পত্রিকার মুদ্রণসৌকর্য ও সাজসজ্জার আকর্ষণ তরুণ লেখক গোষ্ঠীর কাছে দুর্দমনীয় বলে বোধ হত। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আজকাল আমাদের তরুণ লেখক-শিল্পী ও ছাত্র-অধ্যাপকগণও সুরুচিপূর্ণ সাময়িকী প্রকাশ করে বিরোধী পক্ষকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। ফলে উদীয়মান কবি, কথাশিল্পী যারা এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অবস্থায় আছেন এবং এক ধরনের নিরপেক্ষতায় ভুগছেন তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি, সৃজনক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতার ওপর। এখন দায়িত্বশীল নেতৃস্থানীয়দের উচিত ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সর্বপ্রকার পৃষ্ঠপোষকতা দান।

একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। বর্তমান কালে বাংলাদেশের তথাকথিত প্রগতি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কেউ কেউ একদা ইসলামী

আন্দোলনের সাথেই জড়িত ছিলেন। তমদ্দুন মজলিসের এককালের সদস্যরা যারা একদা ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের গান গাইতেন তাদেরই কেউ কেউ পরে নানান কারণে আদর্শচ্যুত হয়ে বাম আন্দোলনের সাথে মিশে যান। আমরা এখানে কারো নাম উল্লেখ করতে চাই না। তাদের এই পদস্খলনের কারণ খতিয়ে বিশ্লেষণ করে এখনও দেখা হয়নি। তবে একটা সাধারণ কারণ হল, তারা ইসলামকে যতটা রোমান্টিকতার সাথে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, ততটা দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করার শিক্ষা পাননি। এমনকি শুনেছি, এদের কেউ কেউ দৈনন্দিন জীবনে সালাত আদায়েরও সুযোগ পাননি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। যে সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষা আন্দোলনের মত দুঃসাহসী আন্দোলনের দ্বারা সারা দেশে গণজোয়ার সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল, তাদেরই কেউ কেউ পরে মার্কসীয় আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ইসলামকে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে প্রাকটিসের মধ্যে না রাখলে এরকম হতে বাধ্য। আমরা তমদ্দুন মজলিসের মূল নেতৃত্বের কথা বলছি না। দু' একজন ব্যতিক্রমধর্মীর কথাই বলছি। আমাদের বরং তমদ্দুন মজলিসের নেতৃস্থানীয়দের প্রতি রয়েছে সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। তবে বিচ্যুতি ও ত্রুটিগুলোর উল্লেখ করলাম এজন্য যে, আমরা ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চাই।

বাংলাদেশে এখন একটা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় চলছে। আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক তৎপরতা আমাদের প্রতিটি প্রকাশ মাধ্যমকে কজা করে ফেলতে চাচ্ছে। এ অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মী ও কবি-সাহিত্যিকদের সংগঠনকে সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। এর প্রত্যেক সদস্যকে হতে হবে কঠোর আদর্শবাদী এবং জাগতিক মোহ সশব্দে অত্যন্ত সচেতন। এ সচেতনতার জন্য ইসলামী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সহমর্মিতা একান্ত দরকার।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ মূলত এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে উদ্যত হয়েছে। আমরা জানি তাদের সাধ্য ও সামর্থ্য খুবই সীমিত। তবুও এর প্রতিটি সদস্য ও সমর্থককে সমাজে পরিচিত করে তোলার দায়িত্ব পালনে তাদের শিথিল হলে চলবে না। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উদীয়মান কবি-সাহিত্যিকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(লেখক : জন্ম ১১ জুলাই ১৯৩৬ সাল, মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

সাহিত্য আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য পরিষদ

মাহবুবুল হক



বাংলা সাহিত্য পরিষদ ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। ১৯৮৩ সালে এর জন্ম। দেখতে দেখতে সিকি শতাব্দী পার হয়ে গেছে। এটা একটা সংগঠনের জন্য কম কথা নয়। যদি সেটা সাহিত্য সংগঠন হয়। কারণ আমরা সবাই জানি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠান এ দেশে খুব বেশি একটা টেকসই হয় না। এর উদয় এবং অন্ত যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী হয় এর অভিযাত্রা। বলতে গেলে অনেকটা “লিটল” ম্যাগাজিনের মত। আজ এক নাম তো কাল আর এক নাম।

সাহিত্য আন্দোলনের গুরুটা হয় তরুণদের হাতে। যখন তারা ছাত্র থাকে। ছাত্রত্ব শেষ হলেই সাহিত্য আন্দোলনেও ভাটা পড়ে। এর ব্যতিক্রম যে নেই তাও নয়। যেমন পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, শিখা গোষ্ঠী, পাক সাহিত্য সংঘ— এসব সংগঠন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই গড়ে তুলেছিলেন।

পাকিস্তানী আমলে দেশব্যাপী বা প্রদেশব্যাপী কোন সাহিত্য আন্দোলন ছিল না। তমদ্দুন মজলিস সাহিত্য ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখলেও এটা মূলত ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। তারা ছিলেন রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা জেলাভিত্তিক সাহিত্যের কিছু কাজ থাকলেও সামগ্রিকভাবে সাহিত্য আন্দোলন বলতে যা বোঝায় পাকিস্তান আমলে তা দৃষ্টিগোচর হয়নি। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর কর্ণধার ছিলেন ড. প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান ও ড. প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ। ভাষা আন্দোলনের ডামাডোলে এই সংসদের কার্যক্রম বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

মূলত সাহিত্য আন্দোলনের অস্তিত্ব বজায় ছিল পত্রিকাকেন্দ্রিক। দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইন্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইন্তেহাদ, দৈনিক বাংলা, সমকাল, পূবালী, দৈনিক পূর্বমেঘ, সওগাত, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক পয়গাম, বেগম, মাহে নও এসব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দুগুণের বিষয় হলেও সত্য যে মধ্যযুগে মুসলমানী ঢঙে যে সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকেনি।

চল্লিশ দশকে সমাজতন্ত্রের যে জোয়ার গুরু হয়েছিল এবং সে জোয়ার মুসলিম সাহিত্য মানসকে প্রায় গ্রাস করতে বসেছিল। আমাদের সাহিত্য আন্দোলনে আজও তা ম্লান হয়নি।

সমাজতন্ত্র শিক্ষিত মুসলিম মানসকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করলো যে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে তারা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার সাহস দেখালো। ইসলামী জীবনধারাকে পুরোনো ও পরিত্যাজ্য জীবনধারা হিসাবে গণ্য করা হলো।

আমাদের সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্বচ্ছ ও এককভাবে উপস্থাপিত হয়নি। ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুসলিম সাহিত্যিকগণ সনাতন ধর্মের আচার বিহার ও সংস্কৃতি এবং পাক্ষাত্যের অপরিণামদর্শী সাংস্কৃতিকে কোলে তুলে নিল। পশ্চিম বাংলার আধুনিক সাহিত্য থেকে রস গ্রহণ করলো আমাদের সাহিত্যিকগণ। ফলে আমাদের সাহিত্য এক খিচুড়ি সাহিত্যে পরিণত হলো। সে সাহিত্য মুসলিম মানস গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারলো না। মজার ব্যাপার হলো পাকিস্তান সরকার “রাইটার্স গিল্ড” বা লেখক সংঘ তৈরি করে এই জগাখিচুড়ি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাই করে গেছেন ষাট দশকের শেষদিন পর্যন্ত।

দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত যে ধারার সৃষ্টি করেছিল দৈনিক সংগ্রামের অভ্যুদয়ের ফলে তা হালে অনেকটা পানি পেয়েছিল। ড. হাসান জামান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার পরিচালক হওয়ার পর ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে সাহিত্য সৃষ্টির বিপুল প্রয়াস পেয়েছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর দু’দশকের গড়ে উঠা মুসলিম সাহিত্যকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করার দুর্মর প্রচেষ্টা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার মননশীল অংশটি ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন সাবেক সচিব ও মননশীল লেখক এ. জেড. এম. শামসুল আলম।

মরহুম আ.ফ.ম ইয়াহিয়া থেকে শুরু করে ইসলামী ফাউন্ডেশনের পরবর্তী মহাপরিচালকগণ ইসলামী সাহিত্যের মননশীল ধারার পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। সময় গড়িয়ে যায় মানুষ ও চলে যায়। থেকে যায় মানুষের অমল-ধবল কৃতি। আধুনিক যুগে বিশেষ করে সত্তর ও আশির দশকে ইসলামী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে যে দু’জন মনীষী অসামান্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন মনীষী প্রফেসর ড. হাসান জামান ও সাবেক সচিব ও আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা এ. জেড. এম. শামসুল আলম। ড. হাসান জামান নিজে লিখেছেন কম, কিন্তু লিখিয়েছেন অজস্র। তাঁর অনুপ্রেরণা, সহৃদয়তা, ভালবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতায় শত শত সাহিত্যিক তৈরি হয়েছিল। বি. এন. আর ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে অভাবনীয় কাজ করেছে তার তুলনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে বিরল। একথা সত্য যে তিনি বাংলা একাডেমীর মত উন্নতমানের কাজ করে যেতে

পারেননি। তাঁর লক্ষ্যও সেটা ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলিম সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্যিক গড়ে তোলা। আনোয়ারা ও মনোয়ারার যে ধারা শুরু হয়েছিল তাঁকে তিনি বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আমলে মফস্বলের লেখকগণ দারুণভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। অনিকেত সাহিত্যিকগণ নিকেতনের স্বপ্ন দেখেছিল, কেউ কেউ গড়েওছিল। লেখার সম্মানীর বিনিময়ে স্কুল গড়তে পেরেছে এমন কাহিনী কি খুব বেশি একটা আছে আমাদের সাহিত্যের জীবন ও জগতে? একটা উদাহরণ তো দেয়াই যায়। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন তাঁর লেখার বিনিময়ে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র তথা ড. হাসান জামানের কাছে একষট্টি হাজার টাকা চেয়েছিলেন। পল্লী কবি বলেছিলেন টাকাটা পেলো আমার পিতার নামে একটা মাধ্যমিক স্কুল গড়ে তুলবো। ড. হাসান জামান সে টাকা দিয়েছিলেন। কবি জসীম উদ্দীনও তাঁর কথা রেখেছিলেন। স্কুলটি তিনি ওয়াদা অনুযায়ী গড়েছিলেন। এখনও সেই স্কুলটি রয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থানে বিরাজ করছে। ষাট দশকের শেষ ভাগ থেকে সত্তর দশকের প্রথম অংশ পর্যন্ত মুসলিম সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষকতা চলে। মফস্বল ও ঢাকা শহরের অনেক লেখক ছোট ছোট হোটেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুম ভাড়া করে লেখার কাজ করতেন। পুরোনো শহর, শহরতলী এমনকি ফকিরাপুল, আরামবাগের কিছু হোটেলের রুম এভাবেই স্থায়ী ভাড়ায় থেকে সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল। এসবই কথার কথা, সাহিত্যের কথা। সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের কথা। কত জায়গায়ই তো সাহিত্য সভা হতো, যেমন— কবি গোলাম মোস্তফার বাসভবন, কবি জসীম উদ্দীনের বাসভবন এবং কবি ফররুখ আহমদকে ঘিরে সাহিত্যের মৌচাক! সমকাল, সপ্তগাত, পূবালী, মাহে নও, মাসিক মোহাম্মদী এসব অফিসে তো নিত্যই সাহিত্যের আড্ডা বসত। কিন্তু প্রথাগতভাবে মুসলিম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কোন আন্দোলনের অবস্থিতি দৃষ্টিগোচর ছিল না। আবদুল মান্নান তালিব ও অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমানের উদ্যোগে শুরু এবং কবি বেনজীর আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাক সাহিত্য সংঘ সাহিত্যের কিছুটা আয়োজন করলেও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তারা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন এই সংঘের উপদেষ্টা।

পাকিস্তান আন্দোলন যেমন ইসলামী সাহিত্যকে অগ্রসর করে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ ও সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের হৃদয়েও ঐতিহ্যিক আলোড়ন তুলেছিল। তখনকার সময় বামপন্থী কবি বলে খ্যাতিমান কবি শামসুর রাহমান খেমকারান সেট্টরে পাকিস্তানের জয়লাভের আনন্দে লিখেছিলেন :

‘এই দিন চিরদিন

জনতার চোখে জ্বলবে,

সোনারা আগামীর

রূপময় কথা বলবে।’

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রেডিও-টেলিভিশনে কিছু ফিচার ও গান প্রচার এবং পত্র-পত্রিকায় কিছু কবিতা ও নিবন্ধ প্রকাশের মাঝেই ঐ ঐতিহ্যিক প্রেরণা নিঃশেষ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই সময়কালে (১৯৬৫-৭০) নাট্যকার নূরুল মোমেন ও আশকার ইবনে শাইখ শতাধিক নাটক লিখেছিলেন, যা মূলত রেডিও থেকে প্রচার করা হয়েছে। রেডিওতে সে সময় চাকরি করতেন হেমায়েত হোসেন, কবি ফররুখ আহমদ, ফজল-এ-খোদা প্রমুখ, যারা মুসলিম ঐতিহ্যিক ধারাকে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

৬-দফা ও স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন বেগবান হওয়ায় ডানপন্থী সাহিত্য আন্দোলন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। এসবের মধ্যে ১৯৬৮ সালে মরহুম সানাউল্লাহ আখুঞ্জি ও শাহ আবদুর হালিম-এর নেতৃত্বে ও ড. হাসান জামান ও অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে ‘মুক্তিবুদ্ধি সাহিত্য সংঘ’। কর্মীদের মধ্যে ছিলেন ডা. শামসুদ্দৌলা, শেখ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হান্নান, মাহবুবুল হক প্রমুখ। ১৯৭০ পর্যন্ত এই সংঘ ঐতিহ্যিক ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার যে সংশ্লেষণ, সাহিত্য ক্ষেত্রে এই ধারার প্রবর্তন করে এই সংঘ। সংঘ প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন ‘কলকঠ’ সাহিত্যমোদি মহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

১৯৭২ সালে মাহবুবুল হক ও মুহম্মদ আবদুল হান্নানের উদ্যোগে গড়ে ওঠে স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ। এই সংসদের সাথে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক মতিউর রহমান, এম. এ রশিদ চৌধুরী, অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন, কাজী মো: মুরতুজা আলী, হাসানুল করিম, আজিজুর রহমান, শহীদুল আলম, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মিনহাজুর রহমান, মাহবুবুর রহমান মোরশেদ, ড. আবদুল লতিফ মাসুম, হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, আতাউর রহমান সরকার প্রমুখ। এই সংসদ নাটক প্রযোজনাসহ সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা বহুকাল অব্যাহত রেখেছিল।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকা ডাইজেষ্ট পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও সাহিত্যের একটা আড্ডা জমে উঠেছিল। এসবের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদের নেতৃত্বে গড়ে উঠে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। পরে আবদুল মান্নান তালিব এই হাল ধরেন। ইতোমধ্যে বাংলাসাহিত্য পরিষদের পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে। সাহিত্যিক, গবেষক অনুবাদক ও চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। পাক সাহিত্য, মুক্তিবুদ্ধি, স্বদেশ ও মৌসুমীতে যারা সক্রিয় ছিলেন এবং আশির দশকে যারা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়েছেন তাদের প্রায় সকলকে নিয়েই তিনি এই পরিষদ গঠন করেছিলেন। আবদুল মান্নান তালিবের খোলামেলা ও উদার মনোভাবের কারণে বিভিন্ন মনোভঙ্গির সাহিত্যিকদের নিয়ে এই পরিষদ গঠন ও এর

প্রসন্ন অভিযাত্রা সম্ভব হয়। গুরুত্রে পরিষদ সাহিত্য চর্চা ও গবেষণার দিকে মনোযোগ দেয়। পরবর্তীতে পরিষদের অস্তিত্ব রক্ষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রকাশনায় মনোযোগী হয়। এই প্রকাশনা পরিষদের জন্য জীবন কাটি হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সাহিত্য জগতে এ এক অতুল দৃষ্টান্ত। একটি সাহিত্য পরিষদ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী দীর্ঘকাল ধরে আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যেতে পারে— পরিষদ এ ক্ষেত্রে এক বিরল দৃষ্টান্ত। বর্তমানের ও আগামী দিনের সাহিত্য আন্দোলন এথেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে— ‘Slow And Steady wins the race’ বাংলা সাহিত্য পরিষদ যেটা প্রমাণ করেছে।

সাধারণত এই ধরনের সাহিত্য সংগঠন নিয়মিত কোনো কাজ করে না। মাঝে মাঝে সভা, সেমিনার ও সম্মেলন করে থাকে। পরিষদ এক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রম। পরিষদ নিয়মিতভাবে সাহিত্য সভা ও প্রকাশনা চালিয়ে গেছে এবং এক ঝাঁক শক্তিশালী লেখক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যেটা করতে পারেনি তাহলো মৌলিক গবেষণা, মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি ও নিয়মিতভাবে জাতীয় পর্যায়ে সাহিত্য সম্মেলন। আরও একটি বিষয়ে পরিষদ পিছিয়ে আছে, ‘তা হলো বিভাগীয় পর্যায়ে শাখা গঠন, একাজটি পরিষদ গুরুত্ব করতে পারেনি। অতীতে পরিষদ জাতীয় পর্যায়ে ৪টি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন সম্পন্ন করেছে। প্রতিটি সম্মেলনই ছিল জাঁকজমক পূর্ণ ও জাতীয় পর্যায়ের। এই সম্মেলনগুলোতে দল মত নির্বিশেষে জাতীয় পর্যায়ের কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক্ষমতাসীন দলের জাতীয় পর্যায়ের কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণও নিঃসংকোচে সম্মেলনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। ৪টি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ২টি গুণীজন সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। সম্বর্ধনায় আদর্শিক বা দলীয় মনোভাবকে উচ্চকিত করা হয়নি। উচ্চকিত করা হয়েছে জাতীয় মনোভাবকে, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে যারা উজ্জ্বল তারকা, দলমত ও আদর্শ নির্বিশেষে তাদেরকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় আমাদের মনন ক্ষেত্রে এও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে জাতীয় গন্তব্যের পথে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনকে ঘিরে আছে এক মহা সংকীর্ণতার দেয়াল। নিজেকে ছাড়া আমরা অন্যকে চিনতে চাইনা, জানতে চাইনা। এ দেয়াল ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য পরিষদ সব সময় দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে। অন্যকে জানার বুঝার এবং অন্যের মতকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখার প্রয়াস পেয়েছে। সবটুকু সার্থক হয়েছে বলা যাবে না। তবে উদারতার একটা অনুশীলন এখানে আছে, নির্দিধায় সেকথা বলা যায়।

আবদুল মান্নান তালিবের বয়স হয়েছে। তিনি আমাদের আর এক কীর্তিমান পুরুষ, সওগাতের নাসির উদ্দিনের মত হায়াত ও কর্মদক্ষতা অব্যাহত রাখতে পারবেন, এই আশা ও দোয়া আমরা করি। কিন্তু নাসির উদ্দিনের পরলোক গমনের পর সওগাত তো আর অব্যাহত থাকেনি। এখানেই আমাদের কষ্ট! এখানেই আমাদের আশংকা ও উদ্বিগ্নতা। আবদুল মান্নান তালিবের সফলতা অনেক। তিনি নিঃসন্দেহে একজন সফলও সার্থক ব্যক্তি। আমাদের মনন ও মনীষায় তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা অন্তত একটি জায়গায় আমরা লক্ষ্য করি। তাহলো তিনি সার্থক উত্তরসূরী গড়ে তুলেননি বা তুলতে পারেননি। এবিষয়ে তাঁর নির্দিষ্ট কোনো চিন্তা, চেতনা বা কর্মসূচী ছিল কিনা জানিনা। না থাকলেও এখনই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। বয়স্ক কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে পরিষদ আগলে রাখলে চলবেনা। অভিজ্ঞতার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু চলমানতার কোনো বিকল্প নেই। একটি সংগঠনের জন্য Mobility অনিবার্য বিষয়। বয়স্ক মানুষ সেই Mobility ধরে রাখতে পারেন না। তরুণদের এখানে স্থান করে দিতে হবে। সবাই সংগঠক হয়না। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যুৎসই সংগঠক পাওয়াও দুষ্কর। তাঁরা তাঁদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতা প্রকাশেই প্রায়শঃ ব্যস্ত থাকেন— এ ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকটা স্বার্থপর। আবার স্বার্থপর না হলে Productও হয় না। আমাদের তো Productও চাই। তা’হলে কী করা যাবে? কিছু সাহিত্য্যামৌদিকে ‘মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন হতে হবে। তারা কম লিখবে, কিন্তু লেখাবে, নিজেরা কাজ কম করবে, কিন্তু করাবে। বাংলা সাহিত্য পরিষদকে কেন্দ্র করে এখন কিছু নিঃস্বার্থ তরুণ সংগঠকের প্রয়োজন, যারা নানামাত্রিকতায় প্রতিষ্ঠানটিকে প্রসারিত করবে, সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ দেবে।

আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য স্থায়ীভাবে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট, ডাক্তারদের জন্য বি এম এ, অফিসারদের জন্য অফিসার্স ক্লাব এবং সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ক্লাব রয়েছে। কিন্তু পরিচালনার বিষয় হলো লেখক বা সাহিত্যিকদের জন্য স্থায়ীভাবে কোন ক্লাব বা ইন্সটিটিউট এখনও গড়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্য পরিষদ এ মহৎ কাজে হাত দিতে পারে।

আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী যত কাজ করতে সক্ষম হয়েছে, সম্পূর্ণ স্বাধীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা সাহিত্য পরিষদ তার তুলনায় কিঞ্চিত মাত্র কাজ করেছে। কথায় কথায় আমরা বাংলা একাডেমীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করি, কিন্তু কখনও ভাবিনা বা ভাবতে চাই না অন্যদেরও কিছু কাজ করার আছে। বাংলা একাডেমীর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য পরিষদও জাতীয় মননশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক, এটাই কাম্য।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি থেকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম



দেশ ও জাতির এক ক্রান্তিকালে ১৯১১ সালে জন্ম হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির। ২০১০ সালে তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূরণ হতে চলেছে। সমিতির শতবর্ষ পালন মুহূর্তে সে ধারায় গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্য পরিষদ তার সিকি শতাব্দী পূরণ করেছে। একটি প্রেরণাদায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে তাই এ মুহূর্তে স্মরণ করা উত্তরসূরী কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। এর মাধ্যমে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাগণের মহৎ এবং সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের মূল্যায়নের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সে বোধে অন্যদেরও উদ্দীপ্ত করার একটি সুযোগ রয়েছে। আর সে কারণেই বাংলা সাহিত্য পরিষদ তার ২৫ বছর পূর্তিতে মূল উদ্দীপনাদানকারী প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিকে বিশেষভাবে স্মরণ করছে।

বিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের জাগরণে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত ঝিমিয়ে পড়া পচাদপং বঙ্গীয় মুসলমানদের ঘোর দুর্দিনে অমানিশার ঘোর কাটাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। কলকাতায় তখন ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ নামে একটি সংগঠন কায়েম ছিল। প্রধানত হিন্দু স্বার্থ রক্ষাকারী এ প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদেরও যাতায়াত ছিল। কিন্তু নিজেদের দুর্বল অবস্থানের কারণে বড় লোকের বাড়িতে গরীব আত্মীয়ের মত অনেকটা মনমরা অবস্থায় মুসলমানরা সেখানে যাতায়াত করতেন। ঐ সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুসলমান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মৌলভী আহমদ আলী, মাইনুদ্দিন হুমায়ুন প্রমুখ। তারাই প্রথমে চিন্তা করলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করেও মুসলমানদের একটি নিজস্ব সাহিত্য সমিতি থাকা উচিত। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কলকাতার ৯ নং আশু নি বাগান লেনে ১৯১১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মোহাম্মদ

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মুনশী হাতিম আলী খান, মুনশী শেখ আবদুর রহীম, মুনশী রেয়াজ উদ্দিন আহমদ, রওশন আলী চৌধুরী, মোঃ মঈনুদ্দীন হুমায়ুন, মৌলভী মুজিবুর রহমান (দি মুসলমান সম্পাদক), মৌলভী আহমদ আলী, ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস মৌলভী আবদুল করিম কে সভাপতি এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে সম্পাদক নিযুক্ত করে ও অন্যান্যদের সদস্য করে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় এর উদ্দেশ্য ছিল (১) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টি সাধন (২) আরবী, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি ভাষা হইতে ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ প্রকাশ (৩) প্রাচীন মুসলমান বঙ্গ সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (৪) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের সাধু পুরুষদিগের (ওলীদিগের) জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ (৫) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের প্রাচীন বংশাবলীর ও প্রাচীন কীর্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ (৬) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মাসিক, সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রের বহুল প্রচার (৭) সদগ্রন্থের প্রচার কল্পে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ প্রদান (৮) সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন।

বলে রাখা ভালো, এর আগে ১৮৯৯ সনে বাংলার মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক মুসলমান সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। Muslim community in Bengal (১৮৮৪-১৯১২) গ্রন্থে ড. সুফিয়া আহমদ Muslim writings in Bengal শিরোনামে সমসাময়িক কালের আলোচনায় এ প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

“A Muhammadan society for vernacular literature was established at Calcutta in the year 1899, by the efforts of certain of the Bengali Muslim writers whose works have been discussed. In a meeting of the society held in 1904 under the chairmanship of Nawab Syed Amir Hossain, the achievements of the society were reviewed by Muzammel Huq. He reported that “two Muhammadan students were being educated at the cost of the society in the Art School and the Veterinary College. Some

Bengali books were published under the society's auspices and Muhammadan authors were encouraged. At this meeting Syed Nawab Ali Chowdhury promised to award a gold medal to the writer of the best essay in Bengali on the 'past and present condition of the Muhammadan community in Bengal'. In a speech in Bengali he "advocated the cause of Bengali Musalmans, and said that it was necessary to have religious books and pamphlets in Bengali for the instruction of the masses." The others present at this meeting included Maulavi Syed Shamsul Huda, Pleader, Khan Bahadur Maulvi Badruddin Haider, M. Hossain, Barrister, Maulvi Abdul Hamid editor of the Moslem Chronicle, Munshi Abdur Rahim, editor of the vernacular paper Mihir on Sudhakar, Maulvi Wahed Hossain, Pleader, Moulvi Syed Abdul Latif and Maulvi Syed Osman Ali.

"মুনশী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহরও এ সমিতির সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরের এ লেখা থেকে বুঝা যায় যে, 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক মুসলমান সমিতি' বাংলার জাগরণে এ সময় বিরাট ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে এ সময় হিন্দু লেখকগণ তাদের লেখা উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনায় কলংকিত এবং হীনবীর্য করে মুসলমান চরিত্র অঙ্কনের গভীর কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। তার মোকাবিলায় মুসলমানদের সত্যিকারের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস উদ্ধারে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে স্বর্ণপদক দেবার আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমিতি মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার মহান সাংস্কৃতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছাত্রদের পড়ার ব্যবস্থা, বই প্রকাশ, পত্রিকা প্রকাশ, পাঠ্যপুস্তক কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি বহুমুখী কর্ম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ১৮৯৯ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ১২ বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯১১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে এর বিলয় ঘটে। ফলে দেখা যায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' একটি ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সংগঠনের কাঠামোর উপরই তার অবয়ব গড়ে তোলে। ১৯১২ সালে সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে দিনাজপুরের মৌলভী একিন উদ্দিন আহমদ সভাপতিত্ব করেন। একই সাথে সমিতি মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করে। কলিকাতার মীর্জাপুর স্ট্রিটে জুবিলী ইনস্টিটিউশনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করে মৌলানা

মোহাম্মদ জামান ইসলামাবাদীর ডাকে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়ে যোগ দেন। ১৯১৫ সালের ৩ অক্টোবর খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর সভাপতিত্বে সমিতির এক অধিবেশনে ভোলায় মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বি.এ. কে সমিতির সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। ১৯১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৪৭/২ মীর্জাপুর স্ট্রিটে একটি হল ভাড়া করে সমিতির স্থায়ী অফিস, লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন করা হয়। একই বছর চট্টগ্রামে সমিতির তৃতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে মুসলমান ছাত্র সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে একটি দোতলা বাড়ির উপর তলায় মসিক ৬৩ টাকা ভাড়ায় সমিতির অফিস স্থানান্তর করা হয়। এ.কে. ফজলুল হক (শেরেবাংলা), সৈয়দ নাসিম আলী, মি. আমিনুর রহমান, কমরেড মোজাফফর আহমদ এর আগে থেকেই সমিতির সদস্য হন। ১৯১৮ সাল থেকে (১৩২৫বাংলা) ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র বের হতে শুরু করে। ১৯১৯ সালের জুন মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি ১৯১৮ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অন্য যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এই সাহিত্য পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যা করাচী থেকে পাঠানো হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের প্রথম লেখা ‘মুক্তি’ কবিতা ও ‘হেনা’ গল্প প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দিলে কাজী নজরুল ইসলাম কলিকাতায় এসে ওঠেন বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কমরেড মোজাফফর আহমদ, মোহাম্মদ আফজাল উল হক (মুসলিম পাবলিশিং হাউজ) এ সময় সমিতির অফিসে থাকতেন। নজরুলের আগমনে সমিতির অফিস সরগরম হয়ে ওঠে। ‘সওয়াত যুগে নজরুল ইসলাম’ বইয়ের লেখক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের ভাষায়, “এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, কলিকাতা থাকবেন কোথায়? নজরুল বললেন : আমাকে নিয়ে দু’তিন যায়গায় টানাটানি চলছে। হিন্দু বন্ধুরা বলছেন তাদের সাথে থাকতে আর মুসলমান বন্ধুরা ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র ওখানে থাকতে অনুরোধ করেছেন। গতবার এসে

ওখানেই গিয়েছিলাম। ওরা সকলেই আমাকে বলে রেখেছেন, ফিরে এসে যেন ওখানে ছাড়া আর কোথাও না থাকি। তাই সাহিত্য সমিতির অফিসেই থাকবো মনে করেছি।” ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখায় আমরা পাই নজরুলের জবানীতে সাহিত্য পরিষদের ঋণের কথা। “এই সাহিত্য সমিতিই যুদ্ধ ফেরত আমাকে তার স্বল্প পরিসর নীড়ে প্রথম আশ্রয় দেয়। সেদিন ওর আশ্রয় না পেলে কালস্রোত আমায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত জানিনা। এই সমিতি আমার জীবনের প্রধানতম সহায়ক, কাজেই এর কাছে আমি চির ঋণী।”

এভাবে সমিতি কলিকাতার বিরূপ পরিবেশে নজরুলকে তার বক্ষে ঠাঁই দিয়ে মুসলিম পরিবেশে গড়ে ওঠার সুযোগ না দিলে বাঙ্গালী মুসলমানের স্বাধীনতার কবি, জাতীয় কবি, বিশ্বখ্যাত বিপ্লবী নজরুলকে হয়তো আমরা এভাবে পেতাম না। হয়তো পেতাম আরেকজন ছায়া রবীন্দ্রনাথ হিসাবে।

১৯২৮ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল বশিরহাটে সমিতির চতুর্থ সাহিত্য সম্মেলন হয়। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মোকাররম আলী। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে সমিতির পঞ্চম অধিবেশন হয় কলিকাতার এলবার্ট হলে। কবি কায়কোবাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মৌলানা আকরম খাঁ। তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ এমদাদ আলী এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সম্মেলনে ইতিহাস শাখায় অধ্যক্ষ জহরুল ইসলাম, দর্শন শাখায় অধ্যাপক কাজী কাজেম উদ্দিন আহমদ, বিজ্ঞান শাখায় ড. কুদরত-ই-খোদা, সাহিত্য শাখায় কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ সেখানে সভাপতিত্ব করেন ও মূল্যবান অভিভাষণ পেশ করেন। সমিতির ষষ্ঠ সম্মেলন হয় ১৯৩৯ সালের মে মাসে কলিকাতায়। তদানিন্তন সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক (পরে শেরে বাংলা) এর উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক। সম্মেলনের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাব্য, কথাসাহিত্য, মনন সাহিত্য ও মহিলা শাখা- এ ছয়টি শাখায় যথাক্রমে মি.এস. ওয়াজেদ আলী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কবি শাহাদাত হোসেন, খান সাহেব হেদায়েতুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন এবং বেগম শামসুল্লাহর মাহমুদ সভাপতিত্ব করেন। সরোজিনী নাইডু এ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন করেছিলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

সভাপতিত্ব করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক ছিলেন হবীবুল্লাহ বাহার।

সমিতির মুখপত্র ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ ১৩২৫ সাল থেকে (১৯১৮) সালে পাঁচ বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। এর সৃষ্টিগুলো দেখলে অনুমান করা যাবে যে, আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণের মস্ত্র উজ্জীবন, বাংলা ভাষার সপক্ষে সমিতির প্রচারণা ও জনমত গঠন ইত্যাদি পরাধীন ভারতে একটি স্বাধীন জাতিরষ্ট্র গঠনের পটভূমি তৈরিতে কি মৌলিক অবদান রেখেছে।

ব্রিটিশ বেনিয়াদের অধীনে দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে তোলার পর আসে ভারত থেকে ইংরেজদের পাততাড়ী গোটানোর সময়। আশায় বুক বেঁধে কবি সাহিত্যিকগণ আরো একধাপ এগিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বাংলার সাহসী নেতা এ.কে. ফজলুল হক প্রস্তাব আনেন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার।

১৯৪০ সালের ২২-২৪ মার্চ তিনদিন ব্যাপী লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন অর্থাৎ ২৩শে মার্চের অধিবেশনে বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস হয়। রেজুলেশন-১ শিরোনামের প্রথম রেজুলেশনটি উত্থাপন করেন বাংলাদেশের নেতা এ.কে. ফজলুল হক। তিনি রেজুলেশন-১ এর তৃতীয় প্যারায় উল্লেখ করেন যে, “Resolved that it is the considered view of this Session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz., that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the North Western and Eastern zones of India, should be grouped to constitute Independent States in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.”

এ.কে. ফজলুল হকের এ রেজুলেশন উত্থাপনের পথ ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাসমূহে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের জোয়ার শুরু হয়। এ কাজে কবি সাহিত্যিকগণই যুগের নকীব হিসেবে এগিয়ে আসেন

প্রথম। আমাদের খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক, সকলেই। এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত এ লাহোর রেজুলেশনের বাস্তবায়নের ভার এসে পড়ে প্রধানত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সমাজহিতৈষী নেতৃবৃন্দের ওপর। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল সাংস্কৃতিক বিজয়ের। ১৯৪৩ এ সৈয়দ আলী আহসান সহ আরো বেশ কয়জন মিলে গঠন করলেন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। এ সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর কলাকুশলীগণ লুপ্তপ্রায় ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র আরম্ভ কার্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। শুরু হয় নতুন জাগরণ। ১৯৪৩ সালেই সংসদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে মহাকবি কায়কোবাদকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এ সংসদ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর কার্যক্রম আবার নেতিয়ে পড়ে।

পাকিস্তান আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারকারী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক অবয়ব গঠনে মনযোগ দিতে পারেননি। এতে করে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে চলতে থাকে। ভাষার বিরোধ নিয়ে গড়ে ওঠে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে বিরোধ। ফলে জাতিকে কাক্ষিত লক্ষ্যের পানে এগিয়ে নেবার কর্মউদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা অনেকটা স্তান হয়ে আসে। জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে নতুন করে যাত্রা শুরুর প্রয়োজন দেখা দেয়। আবদুল মান্নান তালিব, মুহম্মদ মতিউর রহমান, শাহ আবদুল হান্নান, নূরুল আলম রইসী প্রমুখ ১৯৬১ সালে কয়েম করেন ‘পাক সাহিত্য সংঘ’। পূর্ববর্তী সংগঠনগুলোর একটি ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা ছিলেন বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ও ইসলামী ভাবধারার উজ্জীবন প্রয়াসী। এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে ১৯৬৯ সাল অবধি। মাঝে ১৯৬৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘মুক্তবুদ্ধি সাহিত্য সংঘ’। এর উপদেষ্টা এবং কর্মকুশলতায় জড়িত ছিলেন ড. হাসান জামান ও অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান। সভাপতি ছিলেন শাহ আবদুল হালিম। অন্যান্য কুশিলবরা ছিলেন— সানাউল্লাহ আখুঞ্জি, মাহবুবুল হক, শেখ এনামুল হক, ডা. শামসুদ্দৌলা প্রমুখ। এ প্রতিষ্ঠানটি ‘কলকর্ষ’ নামে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতো। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সাল থেকে ‘স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ, মৌসুমি সাহিত্য গোষ্ঠী, সোস্যাল সাইন্স একাডেমী, সোনার বাংলা সাহিত্য সভা, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ইত্যাদি এ নামে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ ধারাবাহিকতা থেকেই ১৯৮৩ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ এর প্রতিষ্ঠা। এর উদ্যোক্তা অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ। তিনি ছিলেন সেক্রেটারি।

সভাপতি ছিলেন দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ। এর কর্মতৎপরতার মাধ্যমে পুনর্জাগরণের পথ ধরে ও ঐতিহ্যে অবগাহন করে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্রতী হয়। এ সময়পর্বে বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি নানা বাঁকে নানা ধারায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু একান্ত নিরলসভাবে কাজ করে গেছে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। এ ধারার সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদগুলো একটি দেশের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির লালনে যে ভূমিকা রাখে ওজনের দিক থেকে তা বিশাল। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাওয়ার কারণে এ পরিষদ হয়ে ওঠে আরো প্রতিশ্রুতিশীল। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভূগোল সৃষ্টি ও এর সীমান্ত রক্ষার কাজে দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠিকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান রক্ষা কবচ। এ কাজে ব্যাপৃত থেকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ তার পূর্বতন ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’ এর ঐতিহ্যই যেন বহন চলেছে।

১৯১১ সালের ডিসেম্বরেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদের মাধ্যমে কেড়ে নেয়া হয় ঢাকার রাজধানীর মর্যাদা। এর ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সমন্বয়ে গঠিত আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনও কেড়ে নেয়া হয়। এভাবে আমাদের মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি আমাদের পুনর্জাগরণের সমস্ত কার্যক্রম স্থবির হবার উপক্রম হয়ে পড়ে। কিন্তু সমিতি তাদের ব্যাপক অথচ দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম তৎপরতার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাভাব্য, জাতীয়তাবোধ, সর্বোপরি আলাদা মনন চেতনার বিনির্মাণে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক মুসলমান সমিতি’ (১৮৯৯) বা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১) যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শুরু হয়েছিল একশ বছরের অধিককাল কাটালেও কি আমাদের সে কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে? দেখা যাবে এ বিষয়ে যতটা কাজ হয়েছে তা মোট কাজের খুবই সামান্য অংশ মাত্র। কাজেই আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার স্বার্থে আরো নতুন নতুন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন এ শতাব্দীতে আমাদের আরও ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যক্রম সেক্ষেত্রে হবে আমাদের প্রেরণার উৎস। বাংলা সাহিত্য পরিষদের ২৫ বছর পূর্তি তথা রক্ত জয়ন্তী উদযাপনের এ মহাধর্মে এ প্রেরণাই সঞ্চারিত হোক সকল দেশপ্রেমী শেকড় সন্ধানী সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের।

প্রকাশনা জগতে বাংলা সাহিত্য পরিষদ

নাসির হেলাল

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো। বৌদ্ধ ও পাল রাজাদের আমল থেকে আমরা এ ভাষায় সাহিত্য চর্চার নিদর্শন দেখতে পাই। বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে চর্যাপদ। বৌদ্ধ ধর্মমত ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব এ চর্যাপদে প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়ে বৌদ্ধ গান, দোহা ইত্যাদি, যা চর্যাপদ বা চর্যার্চ্য বিনিন্চয় নামে সাধারণ্যে পরিচিত তা রচিত হয়েছিল বা হচ্ছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বা বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দ্বারা। কিন্তু হঠাৎ দীর্ঘস্থায়ী একটা ঝড় এসে সব কিছু লুণ্ঠন করে দেয়। এ ঝড়টি ছিল বাংলার শাসন ক্ষমতায় সেন রাজাদের আগমন।

সেন রাজারা ছিল দাক্ষিণাত্য থেকে আগত আর্য-ব্রাহ্মণ। এরা ছিল জাতিগতভাবে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার। ফলে তারা অনার্য বাঙালীদেরকে মোটেই সহ্য করতে পারেনি যে কারণে সাহিত্য সংস্কৃতিতে অগ্রসর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধদের উপর নেমে আসে সেন রাজাদের খড়গ। বৌদ্ধরা ছিল অত্যন্ত সাদা-সিধা শান্তি প্রিয় মানুষ। তারা রাষ্ট্রীয় আশ্রাসনের মুকাবেলায় টিকতে না পেরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় হিজরত করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বাস্তবহারা বৌদ্ধ জনগণ ও পণ্ডিতেরা তখন জীবন বাঁচানোর তাগিদেই ব্যস্ত ছিল। তাই দীর্ঘকাল আর তাদের দ্বারা উল্লেখ যোগ্য কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। তবে কিছু কিছু পণ্ডিত তাদের রচনা সাথে করে নিয়েছিলেন—যা পরবর্তী কালে নেপাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেনদের অত্যাচার নির্যাতন শেষ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আবারও বাংলার মানুষ শৃংখল মুক্ত হয়। রচিত হতে থাকে বিভিন্ন গ্রন্থ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাহিত্যিক, অনুবাদকগণ রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা লাভ করেন। এ সময় শেক শুভোদয়া থেকে রামায়ণ, মহাভারত পর্যন্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ মুসলিম নৃপতিদের সার্বিক সহযোগিতায় রচিত অনূদিত হয়। অথচ প্রতিবেশী ঐতিহাসিকগণ সাহিত্য-শিল্পকলার এ স্বর্ণযুগকে অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্য কোষ’ গ্রন্থে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় এযুগ সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘তুর্কীদের বঙ্গবিজয়ের পথ ধরে দেশে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল বলেই নাকি সাহিত্য-শিল্পের রাজ্যে এক

অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছিল। এমনি ধারণা থেকেই ‘অন্ধকার যুগ’ বা তমসায়ুগ কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। ইদানিং বিশিষ্ট গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তাতে একে অন্ধকার যুগ না বলে সন্ধিযুগ বলাই সমীচীন মনে করা যায়। এই যুগের লিখিত কোনো সাহিত্যিক নির্দশন হাতে না এলেও পরবর্তী যুগের প্রস্থাদিতে প্রদত্ত বিবরণী থেকে জানা যায় এই যুগের সাহিত্য ছিল প্রধানত লোকসাহিত্য। তার প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী। মনে হয় পাঁচালীর আকারে ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এমন কি মহা কাব্যের আদিরূপের সূচনা এই যুগেই হয়েছিল। নাথ গীতিকার আদিরূপও এই সময় সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় চৈতন্যের জন্মের অনেক কাল আগে থেকেই মনসার গীত, শিবেরগান, চণ্ডীর গান, যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত চালু ছিল। এইগুলো মৌখিক আকারেই সন্ধিযুগেই প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এর পরবর্তী যুগে এসব ধারার সাহিত্যের পূর্ণায়ত বিকাশ ঘটেছিল’ (বাংলা একাডেমী বাংলা সাহিত্যকোষ, পৃ. ৫৮)।

এ সম্পর্কে শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন ‘বঙ্গ ভাষার উপর মুসলমানদের প্রভাব’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, ‘মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গ ভাষা কোন কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লীকুটিরে বাস করিতেছিল।...বাঙ্গলা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথক্কিত আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাদার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া শিখা দোলাইয়া সংকৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছিলেন এবং ‘তৈলাধার পাত্র’ কিম্বা ‘পাত্রাধার তৈল’ এই লইয়া ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা হর্ষ চরিত হইতে ‘হাবং দেহিমে হরিনি’ প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে ছিলেন এবং কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি পদ্য রসাত্মক গদ্যের অপূর্ব সমাসবদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইতে ছিলেন।....সেখানে বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিত মণ্ডলী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে অপাংক্তেয় ছিল— তেমনি ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। কিন্তু হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাংলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল।...বঙ্গ-সাহিত্যকে এক রূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অতুক্তি হইবে না।’

এরপর খ্রীষ্টীয় ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষা থেকে আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দ বর্জন করে সংস্কৃত বাংলা

ভাষা চালু করা হয়। ফলে ছয়শো বছর ধরে মুসলিম শাসকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় যে শক্তিশালী বাংলা ভাষা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তা আবার মুখ থুবড়ে পড়ে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের ব্যাপক অবদান থাকলেও ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী সাহিত্য গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচিত ওই সব সাহিত্যকে ‘বটতলার সাহিত্য’, ‘দোভাষী পুঁথি সাহিত্য’, প্রভৃতি তুচ্ছাত্মক বিশেষণে বিশেষিত করে। তবে শত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান ঠিক এসময় থেকে তাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে এগিয়ে আসেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন মীর মশাররফ হোসেনদের মত কালজয়ী সাহিত্য প্রতিভা।

জাতি হিসেবে আমরা অগ্রসরমান। আমরা আমাদের বহনকারী জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নজীর পূর্বে বারবার পেশ করেছি। পিছনে যাওয়া আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ‘পাক সাহিত্য সংঘ’ নামে ইসলামী সাহিত্য ধারার একটি সাহিত্য সংগঠনের জন্ম হয়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন- জনাব আবদুল মান্নান তালিব এবং সেক্রেটারি ছিলেন মুহম্মদ মতিউর রহমান। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন শাহ আবদুল হান্নান (সাবেক সচিব), সালেহ উদ্দীন আহমদ, নূরুল আলম রইসী প্রমুখ। বেশ কয়েক বছর প্রতিষ্ঠানটি তৎপর ছিল। এরপর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে ৭১, নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বাংলা সাহিত্য পরিষদ’। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে জনাব আবুল আসাদ ও এ. কে. এম. নাজির আহমেদ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন সর্ব জনাব আবদুল মান্নান তালিব, হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, সিদ্দিক জামাল (মরহুম), জামেদ আলী (মরহুম), মাহবুবুল হক, কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ।

দেশে জাতীয় পর্যায়েই বেশ কটি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন থাকার পরও বাংলা সাহিত্য পরিষদ কেন নতুন করে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়লো সে বিষয়ে পরিষদের পরিচিতি’র শুরুতেই লেখা হয়েছে, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শুধু উপমহাদেশের নয় বিশ্বের সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যগুলোর অন্যতম। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম সবার অবদানে এ সাহিত্য পরিপুষ্ট। বিগত হাজার বছর ধরে এর সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির ধারা এগিয়ে চলেছে।

তবে ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের আগমনে বাংলা সাহিত্য নতুন দিক নির্দেশনা লাভ করে, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী

ভাবধারা ও মূল্যবোধ যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং শিল্প-সাহিত্য অংগনের নতুন দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তেমনি বাংলা ভাষাকেও করে তুলেছে সম্পদশালী। দীর্ঘকাল থেকে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের এই মূল্যবান সম্পদ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধ আমাদের সাহিত্য অংগনের সমস্ত এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। নাস্তিক্যবাদ, জাতীয় ঐতিহ্য বিরোধিতা এবং চিন্তা ও কর্মের নৈরাজ্য জাতীয় সাহিত্য অংগনে নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে। জাতীয় সাহিত্যকে এই সংকট মুক্ত করে জাতীয় ভাবধারা ও ঐতিহ্যানুযায়ী সুস্থ সাহিত্য ধারা সৃষ্টিই সাহিত্য পরিষদের ব্রত।”

বাংলা সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলা হয়েছে,

১. ইতিবাচক ও গঠনমূলক সাহিত্য চর্চার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা।
 ২. দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে অনাচার ও নৈরাজ্য মুক্ত করা।
 ৩. স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও সুস্থ জীবন কর্মের ভিত্তিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌল কাঠামো নির্মাণ করা।
 ৪. যে কোন পর্যায়ে ও যে কোন পরিস্থিতিতে স্রষ্টা বিঘোষিত সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে সাহিত্য কর্ম বিশ্লেষণ করা।
- সংগঠনটি জন্মলগ্নে নিম্নোক্ত কর্মসূচী হাতে নিয়ে কাজ শুরু করে,
১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন করা।
 ২. ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম প্রকাশনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
 ৩. বিদেশী বিশেষ করে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী ভাষাগুলো থেকে উন্নত সাহিত্য কর্ম বাংলায় অনুবাদ করা।
 ৪. দেশী-বিদেশী বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম পর্যালোচনা করা।
 ৫. সাহিত্য সংকলন ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা।
 ৬. নিয়মিত সাহিত্য সভা ও বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
 ৭. কবি-সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
 ৮. সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপন করা।
 ৯. ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা।
 ১০. সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধের উজ্জীবন প্রয়াসী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন এবং তাদেরকে আদর্শিক সহায়তা দান করা।

গৃহীত কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাসাপ বর্তমান কাজ শিরোনামে কয়েকটি কাজ প্রথমেই শুরু করে:

১. প্রতিমাসে একটি সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠান। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের সাহিত্য কর্ম পাঠ ও আলোচনা।
২. প্রতি বছর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠান।
৩. কবিতা ও ছড়া পাঠের আসর।
৪. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৫. মাসিক সাহিত্য সভায় পঠিত লেখাগুলোর একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন প্রকাশ।

হাতে নেয়া উপরিউক্ত কাজ গুলোর মধ্যে ১ ও ৩নং কর্মসূচী সূচাঙ্করূপে গত ২৫ বছর সম্পন্ন হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত নিয়মিত মাসিক ২৯১টি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ছন্দ বিষয়ক একটি ক্লাস পরিচালিত হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দের পরিচালনায়, সেখানে মোট ২৪টি ক্লাস নেয়া হয়।

২নং কর্মসূচীর আলোকে প্রতি বছর অনুষ্ঠেয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন হয়েছে ১৯৮৮ খৃ. একটি, ১৯৮৯ খৃ. একটি, ১৯৯১ খৃ. একটি এবং ১৯৯৭ খৃ. একটি। এই মোট ৪টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর বাসাপ-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৫ম সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

৪নং কর্মসূচী অনুযায়ী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা না হলেও কাজ চলিয়ে যাওয়ার মতো একটি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৫নং কর্মসূচী সাহিত্য সভায় পঠিত লেখা নিয়ে একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন প্রকাশের কথা থাকলেও তা প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখ্য ‘প্রতিশ্রুতি’ নামে ৩২ পৃষ্ঠার একটি সংকলনের একটি সংখ্যা আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। যাতে তার আগের মাসে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় পঠিত লেখা স্থান পেয়েছিল। এ পর্যন্ত ‘বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’ নামে বৃহৎ কলেবরে আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকার ৩টি সংখ্যা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ জন্মলগ্ন থেকেই পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছে। তবে যে গতিতে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল তা হয়তো হয়নি। অবশ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে সে অভাবটি কিছুটা হলেও সম্ভবত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত বাসাপ মোট ১৮৪টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে প্রবন্ধের বই ২৩টি, উপন্যাস ৪৫টি, অনূদিত উপন্যাস ৮টি, কাব্যগ্রন্থ ২৭টি, ছড়াগ্রন্থ ২টি, ছোটগল্পের বই ১৪টি, শিশু উপযোগী বই ৪টি এবং রহস্য সিরিজ সাইমুম ৪৯টি ও অন্যান্য ১২টি।

‘আমাদের সংস্কৃতি যেমন আমাদের নিজস্ব তেমনি আমাদের সাহিত্যও আমাদের নিজস্ব। অন্যের কাছ থেকে ধার করে, চেয়ে চিন্তে জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি

এ পুস্তিকায় যে সব বিষয়ে আলোচনা করে হয়েছে: ১. জীবন ও জগতের সম্পর্ক; ২. স্রষ্টা কে? ৩. জীবনের উদ্দেশ্য কি? ৪. সাহিত্য কি? ৫. সাহিত্যের উদ্দেশ্য; ৬. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; ৭. ইসলামী সাহিত্য কি? ৮. ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব; ৯. ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসংগ; ১০. ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা; ১১. ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য ; ১২. ইসলামী সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা এবং ১৩. ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন।

উপরিউক্ত সূচীপত্র থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় পুস্তিকাটি লেখক সমকালীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিক নির্দেশিকা হিসেবেই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটি তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে ২০০৭-এর ডিসেম্বরে। এর বিনিময় মূল্য রাখা হয়েছে ৫০ টাকা এবং প্রচ্ছদ ঐক্যেছেন বিশিষ্ট শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে –আসকার ইবনে শাইখ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১, প্রচ্ছদ: মোমিন উদ্দীন খালেদ, বিনিময় : ৫০ টাকা মাত্র, পৃ. ১০৩।

ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ সময়কালের রচনা দিয়ে মূলত এ গ্রন্থটি গ্রন্থিত। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে দেশের খ্যাতিমান নাট্যকার জনাব আসকার ইবন শাইখ ভাষা-আন্দোলনের জন্মদাতা প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিসের সাহিত্য ও লোক কলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। এ সময় তিনি তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত সাহিত্য পত্র মাসিক ‘দুতী’ পত্রিকার সম্পাদক-এর দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন। এই মাসিক ‘দুতী’তেই এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া পরবর্তী কালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ‘সাপ্তাহিক অগ্রপথিক’ এবং ‘দৈনিক ইনকিলাব’-এ প্রকাশিত প্রয়োজনীয় কিছু লেখাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

‘আসকার ইবনে শাইখ বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান নাট্যকার। তাঁর রচনা সংকলন ‘বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসংগে’ প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় একটি মূল্যবান সংযোজন। এতে সহজ সরল ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকালের রূপরেখা, স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের ধারা, একুশে ফেব্রুয়ারী, আমাদের সাহিত্য চর্চায় মহান একুশের তাৎপর্য বিধৃত হয়েছে।’

ফররুখ প্রতিভা –মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৯১, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, মূল্য : পঞ্চাশ টাকা, পৃ. : ১৫৪।

ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের পথিকৃত কবি হলেন ফররুখ আহমদ। যে জন্য তাঁকে ইসলামী রেনেসাঁর কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ‘তিরিশের কবি ফররুখ

গড়ে তোলা যায় না।

মুসলিম মিল্লাত দুনিয়ার বুকে যেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেখানেই তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সাহিত্য গড়ে তুলেছে। আর ইসলাম যেমন শুধু মুসলমানের একার নয়, সারা দুনিয়ার মানুষের এতে রয়েছে সমান অধিকার, দুনিয়ার যে কোনো দেশের, যে কোনো বর্ণের যে কোনো গোষ্ঠীর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যে কোনো সময় যে কোনো দেশে মুসলমানের সমান সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ করতে পারে, ঠিক তেমনি ইসলামের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ সমগ্র বিশ্ব মানবতার সম্পদ। এর সৌন্দর্য, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য বিশ্ব মানবতাকে আচ্ছন্ন করে।'

প্রবন্ধ গবেষণা

ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান- আবদুল মান্নান তালিব

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৩, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, দাম : ৫০ টাকা মাত্র,
বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৪৮।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবদুল মান্নান তালিব রচিত 'ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান' পুস্তিকাটি প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনা জগতে পা রাখে। এটি মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। কিন্তু আজ অবধি এ পুস্তিকাটি ইসলামী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি সেবীদের জন্য গাইড লাইন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক নিজেই পুস্তিকাটির প্রসঙ্গ কথায় বলেছেন, 'ইসলামী সাহিত্য যথার্থই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ- তেমনি ইসলামী সাহিত্যও একটি বিশ্বজনীন সাহিত্য।

আর একটু এগিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিকেই আমরা লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছি। সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া এদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা সম্ভবপর নয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যেমন সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণের বার্তাবহ তেমনি ইসলামী সাহিত্যও মানবতার আশা আকাংক্ষা পূরণের যথার্থ ধারক। ইসলামী সাহিত্য মানুষের সমাজকে কল্যাণ ও সফলতায় ভরে দেয়। বোধ হয় মানুষের প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য কল্যাণ ও সফলতা অর্জন। নিজের কল্যাণ ও ব্যর্থতা ডেকে আনার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই মানুষ কোনো কাজ করে না। আশা করি একথা সবাই স্বীকার করবেন। কাজেই সাহিত্য ক্ষেত্রে অকল্যাণ ও ব্যর্থতার প্রতিষ্ঠাকে আমরা উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ কাতে পারি না। সাহিত্য মানবতার জন্য, সাহিত্য জীবনের জন্য, সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের জন্য। ইসলামী সাহিত্যের এটিই হচ্ছে মৌল পরিচয়।

চল্লিশের দশকে এক নতুন অবস্থায় উদ্দীপিত। ইকবালের মর্দে মুমিন যেন তাঁর মধ্যে নতুন সাজে সজ্জিত। ‘সাত সাগরের মাঝি’ তাঁর মহামূল্যবান বাণিজ্য পসরা নিয়ে জাতির দুয়ারে হাজির। তারপর এসেছে একের পর এক ‘সীরাঞ্জাম মুনীরা’ এবং আরো অনেক। নজরুলের পর ফররুখ বাংলা কবিতায় তাঁর ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শুধু জাগরণ নয়, পথ-নির্দেশও। ‘হেরার রাজ তোরণ’ তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। নজরুলের পরে এটিই ফররুখের মূল বৈশিষ্ট্য।’

এই ফররুখ আহমদের জীবন ও কবিতা নিয়ে মুহম্মদ মতিউর রহমান রচনা করেছেন ‘ফররুখ প্রতিভা’ গ্রন্থটি। মতিউর রহমান দীর্ঘ দিন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তা’ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কবি ফররুখ আহমদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। যে কারণে তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে বাস্তবতার ছোঁয়া। গ্রন্থটির সূচী এরকম— ১. ফররুখ আহমদের কাব্য-স্বরূপ; ২. ব্যক্তি পরিচয়; ৩. কাব্য-কৃতি; ৪. হে বন্য স্বপ্নেরা; ৫. কাফেলা; ৬. সাত সাগরের মাঝি; ৭. সীরাঞ্জাম মুনীরা; ৮. ফররুখ-কাব্যে ঐতিহ্যানুসারিতা এবং ৯. ফররুখ-কাব্যে রোমান্টিকতা। এ ৯টি শিরোনামে তিনি ফররুখের কাব্য চিন্তাকে-বিশ্লেষণ করেছেন পারদর্শী শিল্পীর মতো। ফররুখ আহমদের কাব্যকৃতি ও কাব্য চিন্তার ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ বলে আমাদের ধারণা।

দরোজার পর দরোজা —আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ,
দাম: ষাট টাকা, পৃ. ১২০

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ। সাহিত্যের হেন কোনো দিক নেই যে দিককে তিনি স্পর্শ করেননি বা ছুঁয়ে যাননি। তিনি একাধারে, কবি, প্রবন্ধকার, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক, নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, কথাসিল্পী, শিক্ষাবিদ। আসলে কি মন তিনি! সেই আবদুল মান্নান সৈয়দের সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত প্রবন্ধের সংকলন হলো, ‘দারোজার পর দরোজা’।

এ সংকলন গ্রন্থটি সম্বন্ধে মান্নান সৈয়দ নিজে লিখেছেন—

‘এই বই-এর অধিকাংশ প্রবন্ধ ১৯৯০ সালে রচিত হলেও সমগ্রভাবে ১৯৮১-৯১ এই দশ বছরের সময় পরিসরের রচনা এখানে সংস্থিত হয়েছে। ‘দারোজার পর দরোজা’ শিরোনামে এই বইয়ের অধিকাংশ রচনা একটি দৈনিক পত্রিকার শুক্রবাসরীয় সাহিত্য সাময়িকীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। প্রত্যেকটির প্রথম প্রকাশকাল চিহ্নিত হলো। সবই তাৎক্ষণিক লেখা। এই তাৎক্ষণিকতার ভিতরেই ধরা আছে কোনো-কোনো উড়ে যাওয়া পাখির ডানার ঝাপটা। এই দ্রুতরচনাশুষ্ক সেই ডানার হাওয়ায় তৈরি। একটি লেখা ‘অনাবিষ্কৃত নজরুল’ নিয়ে যে-বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল,

তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঐ প্রবন্ধের ভূমিকায়। কয়েকটি প্রবন্ধ এখানে প্রদত্ত তালিকার আগে বা পরে মুদ্রিত বা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'কাফেলা' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল আজিজ আল-আমান একটি ব্যক্তিগত পত্রে আমাকে জানিয়েছেন, ঐ স্মৃতিকথাটি 'কাফেলা' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশিত হবে। আমি সংখ্যাটি দেখিনি। 'মফিজুন' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো 'শিল্পতরু' পত্রিকার ঈদসংখ্যা মে ১৯৮৮ সংখ্যায়। 'কবিতা নিয়ে বিতর্ক' এবং 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: একটি সেমিনারে প্রবন্ধদ্বয় আসলে ভাষণ; এ দুটি রচনা খান সারওয়ার মুরশিদ-সম্পাদিত 'সমকালীন বাংলা সাহিত্য' (১৯৮৯, এশিয়াটিক সোসাইটি) গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। শেখোক্ত ভাষণ-প্রবন্ধের পাদটীকাগুলি নতুন সংযোজন। 'দরোজার পর দরোজা' বাংলা সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বাংলা সাহিত্যের ধারা -মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৯১, প্রচ্ছদ : সরদার জয়নুল আবেদীন, মূল্য : ষাট টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১২০।

বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক মুহম্মদ মতিউর রহমান রচিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের ধারা'। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয়। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে উপযোগী।

এতে আছে, ১. বাংলা সাহিত্যের পটভূমি: প্রাচীন ও মধ্যযুগ; ২. হিন্দু বৌদ্ধ যুগের বাংলা সাহিত্য; ৩. চর্যাপদ-কর্তা কানুপা; ৪. বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশ; ৫. আমাদের লোক সাহিত্য; ৬. ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান ও মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-কর্ম; ৭. প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর সমাজমনস্কতা; ৮. রবীন্দ্র - প্রসঙ্গ; ৯. মুসলিম জাগরণে নজরুল; ১০. ফররুখ কাব্য ঐতিহ্যানুসারিতা এবং ১১. আমাদের সমকালীন সাহিত্য।

সূচীপত্রে বর্ণিত শিরোনামগুলির প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র রচনা। প্রাজ্ঞল ভাষায় রচিত এ গুরুগম্ভীর রচনাগুলি বিদগ্ধ পাঠক তো বটেই, সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ পাঠকদেরও ভালো লাগবে।

সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক, প্রেক্ষাপট -আবদুল মান্নান তালিব

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯১, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, দাম: চল্লিশ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১০৮।

ইসলামী সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আবদুল মান্নান তালিব রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট'। মান্নান তালিব তাঁর পাণ্ডিত্য, গভীর মনীষা দিয়ে রচনা করেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যশ্রয়ী

লেখাগুলো। এ গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলিও একই উৎস থেকে উৎসারিত। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চারই আর এক নাম। আর ইসলাম তার ব্যাপকতর পরিসরে এ জীবন চর্চার সুযোগ দিয়েছে সব চেয়ে বেশী। পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ যেখানে এ জীবন চর্চার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে রেখেছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, সীমা লংঘন করার প্রবণতা এবং অবশেষে পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। সেখানে ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরে জীবনচর্চা করে আসছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোথাও বিদ্রোহ করতে হয়নি। বরং ইসলামী আদর্শ নতুন নতুন সংযোজনকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। কোথাও বিরুদ্ধবাদিতার প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায়নি।’

এ গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি হলো— ১. শিল্প ও সাহিত্য এবং সাহিত্যের পরিসর; ২. সাহিত্যে সুন্দরের সাধনা; ৩. জীবন ও সাহিত্যে শ্রীলতা ও অশ্রীলতা; ৪. লেখক ও তার সামাজিক দায়িত্ব; ৫. সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন : ইসলামের দৃষ্টিকোণ; ৬. সাহিত্য অংগনে বিরূপতা; ৭. আমাদের সংস্কৃতি; ৮. বাংলাদেশের প্রভাব; ১০. সাংস্কৃতিক আত্মসন ও বাংলাদেশ; ১১. বিশ শতকের দাবী ও আমাদের সাংস্কৃতিক বিপর্যয়; ১২. ঈদুল ফিতরের সাংস্কৃতিক দিক; ১৩. আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সিনেমা; ১৪. নাটক ও অভিনয়: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী; ১৫. আমাদের ভাষা; ১৬. ভাষা বনাম জাতিসত্তা এবং ১৭. বাংলাভাষার ঐতিহ্যিক স্বাভাবিকতা।

সূচীপত্রে বর্ণিত প্রত্যেকটি শিরোনামই মুসলিম কবি-সাহিত্যিক সংস্কৃতি সেবীদের জন্য দিক নির্দেশনামূলক। আবদুল মান্নান তালিব শুধুমাত্র একজন লেখক-গবেষকই নন, তিনি উঁচু স্তরের একজন আলেমও। ফলে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা তাঁর জ্ঞান। অতএব যা কিছু তিনি রচনা করেছেন তা-কবি, সাহিত্যিক, গবেষক সর্বোপরি সর্বশ্রেণীর সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের কথা মাথায় রেখেই তা করেছেন। যে কারণে ‘সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট’ গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে এ অংগনের কর্মী বাহিনীর জন্য গাইড বুক।

বাক্সালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস –নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান

তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯২, প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, দাম : তিনশত টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৭০২।

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান রচিত ও প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘সোনালী স্বপ্ন’-এ লেখকের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, ‘নাজিরুল ইসলাম সাহিত্য আকাশে এসেছেন নব নক্ষত্রোদয়ের বিশ্বয় নিয়ে। কাজেই তিনি নবাগত হলেও নীহারিকাপুঞ্জ যে অনাগত রবি-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা পরিস্ফুট

হয়ে উঠেছে, নাজিরুল ইসলাম সেই নীহারিকা লোকচারী। তাঁর চোখে সেই অনাগত সৌরলোকের দীপ্তি, চন্দ্রলোকের স্বপন দেখেছি।’

কবি নাজিরুল ঠিকই বলেছেন, পরবর্তী কালে এই নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ানই রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, নতুনতর ইতিহাস ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস’ শিরোনামে একটি চমকপ্রদ সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থটির ভাব, ভাষা পূর্ববর্তী রচিত গ্রন্থ থেকে আলাদা ছিল, সাথে সাথে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আগেকার পণ্ডিত ও গবেষকগণ যা বলেছেন লিখেছেন তা তিনি অন্ধের মত গ্রহণ না করে যাচাই-বাছাই করেছেন এবং যা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, সঠিক মনে হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলিই তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলা ভাষার ব্যাপারে নিজস্ব মত প্রকাশ করলেন, তিনি লিখলেন, ‘বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নয়, আর্য ভাষাও নয়, ইহা প্রাচীন দ্রাবিড় (পুণ্ডরীক) দিগের ভাষা।’ ফলে পণ্ডিত মহল নড়েচড়ে বসেন। আনেকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেন—এমনকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক পণ্ডিত তাঁর পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

এ গ্রন্থটি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর এর দ্বিতীয় প্রকাশ হলেও গ্রন্থটি প্রায় ২৫ বছর বাজারে ছিল না। এমতাবস্থায় বাংলা সাহিত্য পরিষদ ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে এটি পুনরায় প্রকাশ করে। আগে এটি আলাদা আলাদা ৩টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কবি ছড়াকার সাজ্জাদ হুসাইন খান কবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে এর দ্বিতীয় মুদ্রণের দৃষ্টান্ত্য খণ্ড ৩টি সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্য পরিষদকে দেন। দ্বিতীয় মুদ্রণে ছিল প্রচুর ভুল। বলা যায় সম্পূর্ণ অযুক্ত অবহেলায় দ্বিতীয় মুদ্রণ মুদ্রিত হয়। যে কারণে তৃতীয় মুদ্রণের সময় ব্যাপক সংশোধনের পরও বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যায়। সে যাই হোক বাংলা সাহিত্য পরিষদ এ মূল্যবান গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশ করে তাদের কর্মসূচীর প্রথম দফা ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন করা’র কাজ বাস্তবায়ন করেছে। সাথে সাথে বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন বলে মনে করি।

এখানে একটি ইনফরমেশন দেয়া জরুরী মনে করছি। তাহলো বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত অখণ্ড ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস’ গ্রন্থের শুরুতে মোমিন উদ্দীন খালেদ অঙ্কিত একটি পোর্ট্রেট স্থান পেয়েছে। নাজিরুল ইসলামের একটি অস্পষ্ট ছবি থেকে বহু কষ্টে মোমিন উদ্দীন খালেদকে দিয়ে এটি আমি করিয়ে নিয়েছিলাম। কারণ ঐ সময় তাঁর কোন ভাল ছবি আমাদের হাতে ছিল না। এমনকি আজও নেই। এছাড়া এ অখণ্ড গ্রন্থটির শেষে যে পরিশিষ্ট, বিভিন্ন সূচী দেয়া হয়েছে তাও মূল গ্রন্থে ছিল না। এটি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক জনাব আবদুল মান্নান তালিবের নির্দেশনা মোতাবেক আমি করেছিলাম।

আসলে ‘বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস’ গ্রন্থটি শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নয় এটি বাংলা ভাষারও ইতিহাস।

বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন-মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯২, প্রচ্ছদ : শ্রীতি ডিজাইন সেন্টার, দাম : ৪০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৮০।

‘আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অবদান। ভাষা আন্দোলনে যারা প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন, অথচ এখনই ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে এমন সব তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি মাঝে মাঝে ভুল তথ্য পরিবেশন এবং একপেশে বিচার বিশ্লেষণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য সত্য যে বেশী দিন চাপা থাকে না, তার লক্ষণও ইতোমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ফলে গত কয়েক বছরে এমন কিছু বই- পত্র প্রকাশিত হয়েছে যার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন- সম্পর্কিত বহু নতুন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে বলা চলে, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান প্রণীত ‘বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন’ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন।’

ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি- মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৫, প্রচ্ছদ : গোলাম মোহাম্মদ, দাম : ত্রিশ টাকা মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৪৮।

মুহাম্মদ মতিউর রহমান একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক। দীর্ঘকাল তিনি লেখালেখির সাথে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক। জীবনের শুরু থেকেই উপমহাদেশের পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানদের ভাল-মন্দের চিন্তা তাকে আলোড়িত করে, তাড়িত করে। তাই তরুণ বয়সে সেই ১৯৬০ সালে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন পাক সাহিত্য সংঘ। উদ্দেশ্য ছিলো, ‘ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোকে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চার যত্নবান হওয়া এবং অন্যদেরকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা।’ এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে, ‘ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি’ পুস্তিকাটি।

রবীন্দ্রনাথ- মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৪, প্রচ্ছদ : রফিকুল্লাহ গায়ালী, দাম : ৪৫ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৮০।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের অন্য সকল কবির তুলনায় আলোচনাও হয়েছে সর্বাধিক। আলোচনা-সমালোচনার

ক্ষেত্রে পক্ষ-বিপক্ষ বা নানা মত ও যুক্তির অবতারণা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। এ গ্রন্থে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভিন্ন বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

কবি ফররুখ : তাঁর মানস ও মনীষা –শাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৪, প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, দাম : পঞ্চাশ টাকা মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০, পৃ. ৯৮।

কবি ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান একজন কবি। তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর মূল্যায়নধর্মী রচনা ‘কবি ফররুখ : তাঁর মানস ও মনীষা’। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও গবেষক মরহুম শাহাবুদ্দীন আহমদ এর রচয়িতা। তিনি লিখেছেন, ‘ফররুখ ধর্মের কথা যতই বলুন তিনি একজন শিল্প-সচেতন কবি। এবং খুব সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কবিতা লিখেছেন এমন মনে করার কারণ নেই। তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ইংরেজীর মাধ্যমে জার্মান ও ফরাসী ভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্বের আধুনিক কবিতা ও তার শিল্প আন্দোলনের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কাব্য রচনার সময়ে সেই শিল্প কৌশলকে যথারীতি প্রয়োগ করতে তিনি সাধ্যমত পরিশ্রম যে করেছেন সেটা তাঁর লেখার পংক্তিতে পংক্তিতে প্রতীয়মান। সে জন্যে একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাঁকে আবার পড়তে হয়েছে। এ সংকলনের প্রবন্ধগুলি সেই সতর্ক দৃষ্টির ফসল।

আমি দাবি করি না ফররুখকে আমি চুমুক দিয়ে খেয়েছি এবং ফররুখের এমন কিছু অবশিষ্ট নেই যা আমার পাকস্থলী শোষণ করেনি। কিন্তু আমি যে ফররুখের কাব্য-চরণগুলোর মধ্যে পদচারণা করতে আলস্য করিনি এ সংকলনের পাঠক তা অনুভব করবেন।

যে কোন কবিকে, এমনকি তিনি যদি খুব বড় কবি নাও হন, নিমেষে উপলব্ধি করা যায় না। একজন কবির কাব্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত্ব করতে মাসের পর মাস অনেক সময় বছরের পর বছর পার হয়ে যায়। বড় কবির আত্মার অন্তঃস্থল প্রবেশ ত আরও আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। সুতরাং মনে করার কারণ নেই এই মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধে আমি সমস্ত ফররুখকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। এই ‘সংকলন একটি সহায়ক গ্রন্থ হওয়ার দাবী করতে পারে।”

আসলে এ গ্রন্থটিতে ফররুখ আহমদের ভেতর-বাহিরের সমগ্র কবি-সত্তার পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। এতে আরও চেষ্টা করা হয়েছে ফররুখ মানস ও মনীষা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার এবং তাঁর কাব্য-শিল্প সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার। আমরা মনে করি গ্রন্থকার শাহাবুদ্দীন আহমদ এক্ষেত্রে যথার্থই সফল হয়েছেন।

অন্য আলোর দেখা -ফাহমিদ-উর রহমান

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০২, প্রচ্ছদ : ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক্স, বিনিময় : ৬০ টাকা
মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৯৬।

‘কালের স্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করা ইসলামের প্রকৃতি নয়। কারণ কাল তার নিজস্ব গতিতে চলে। ইসলাম এই গতির মুখে লাগাম দিয়ে নিয়ন্ত্রকের আসন দখল করে এগিয়ে চলে। ইসলাম তাকে নিজের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতি যুগে কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা কালকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কালের গতিধারার কাছে অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ না করে নিজের মতো করে এগিয়ে যাবার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশ শতকী চিন্তার প্লাবনে আমাদের জীবনে যে সব পরিবর্তন এসেছে এবং আমাদের চিন্তায় ও মননে যে সব ভাঙন ধরেছে মুসলিম লেখক ও চিন্তাবিদগণ সেগুলি চিহ্নিত ও সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।’

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রবন্ধ- শতবর্ষের মুসলমান; জ্ঞানের ইসলামী করণ; ইকবালকে আমাদের কেন প্রয়োজন; ইকবাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা; মদীনা সনদ; মোহাম্মদ আসাদ; কোরআনে মানুষের মন; গালিব; দিউয়ানে শামস-ই-তব্রীজ; ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম; দাস্তে ও ইসলাম; জামালুদ্দীন আফগানী; নজরুল পথিকৃত কবি; ফররুখ কাব্যে নান্দনিকতা; বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ; বঙ্গভঙ্গ ও সেকালের হিন্দু মানস; দি স্পিরিট অফ ইসলাম; নওয়াব আবদুল লতিফ স্মরণে; বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দ; শিক্ষা সংকট; ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : কিছু স্মৃতি কিছু অনুভূতি; ড: হাসান জামান; বখতিয়ার খিলজী যদি না আসতেন; প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : এক বিকেলের স্মৃতি-উপরিউক্ত বঙ্গব্যাকেই সমর্থন করে। গবেষক-চিন্তাবিদ ফাহমিদ-উর রহমান আর পাঁচজন লেখকের মত লেখেন না। তিনি মূল বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে প্রকৃত মাল মসলা সংগ্রহ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। যে কারণে তাঁর রচনাগুলো সব সময়ই গভীরতর মাত্রা পায়। কোন বিষয়ে আমরা যা জানি সে বিষয়ে তাঁর লেখা পড়লে-ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ফাহমিদ-উর-রহমান রচিত এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রবন্ধেও আমরা সেই ধরনের গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং রচনার সাবলীলতা দেখতে পাই। এ প্রবন্ধগুলি পাঠ করে পাঠক ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হতে পারবেন, নিজেদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃষ্ট বন্ধন- খন্দকার আবদুল মোমেন,

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৫, প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, দাম: ১৬০ টাকা,
বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৬৮।

খন্দকার আবদুল মোমেন লেখেন খুবই কম। যা লিখেছেন তা থেকে ২৯ টি নিবন্ধ প্রবন্ধ নিয়ে সংকলন করেছেন ‘প্রকৃষ্ট বন্ধন’ নামক গ্রন্থটি। তিনি একজন ভাল সম্পাদক। দীর্ঘদিন ধরে ‘প্রেক্ষণ’ নামক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশ করে তিনি এক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

উত্তর আধুনিকতা –ফাহিমদ-উর-রহমান

প্রচ্ছদ : ওয়ার্ড কালার গ্রাফিক্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬, বিনিময়: ২০০ টাকা মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ২৫৬, অফসেট পেপার।

‘সাহিত্য সংস্কৃতি সামাজিক পদ্ধতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে আধুনিকতা একটা প্রবল আকর্ষণ, শক্তি ও প্রগতির মাত্রা বহন করছে। কিন্তু আধুনিকতার হাজারো কারুকাজ তার পেছনে লুকানো সাম্রাজ্যবাদের চেহারা অস্পষ্ট করতে পারেনি। আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি এমন একটা দেশ বা জনগোষ্ঠীর নাম বলা যাবে না। তেমনি উত্তর আধুনিকতাও। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও জীবনের তাগিদে অগ্রসরতা- সবকিছু মেনে নিলেও তার পেছনের চেহারাটা ঝাপসা হয়ে যায়নি।

মানুষ এবং মুসলমান হিসাবে আমরা সত্যকে অকপটে স্বীকার করি এবং মানি তার চেহারা বদল হয় না। সত্য আধুনিক অত্যাধুনিক এবং উত্তর আধুনিকও। কিন্তু তার পেছনে কোনো কপট লুকিয়ে নেই। উনিশ ও বিশ শতকে যে প্রলোভন আমাদের তাড়িয়ে ফিরছে একুশেও তার খপ্পর থেকে কি আমাদের বাঁচোয়া নেই? সত্যের যে নিখাদ চেহারা কুরআনে পেয়েছি অতি উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে তার অংশ বিশেষও নেই। আধুনিকতার পরে উত্তর আধুনিকতাও আমাদের কোনো যাদুর পরশ দিতে পারছে না। একথা আমাদের অবশ্যই বিচার করতে হবে। নিজিতে আমাদের মূল্যমান ও জীবনবোধ বিচার বিশ্লেষণের মতো অন্যদেরগুলোও বিচার পর্যালোচনা করতে হবে। আবার কালেরও একটা নিজি আছে যেটাকে ইসলামের পরিভাষার বলা হয়েছে ফিতরাতে। এই ফিতরাতে দৃষ্টিতেও একে উতরে যেতে হবে। ইসলামকে নূর বা আলো এবং কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতকে জুলমাত বা অন্ধকার বলা হয়েছে। আলোর সন্ধান আমাদের করতে হবে। অন্ধকার থেকে দূরে থাকতে হবে।’

পরিশ্রমী প্রবন্ধকার ফাহিমদ-উর রহমান অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে উত্তর আধুনিকতার মতো জটিল বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এমনিতেই আমরা একটা ভয়াবহ, জটিল ও দুর্বোধ্য সময় পার করছি। বর্তমান সময়ের এবিষয়টি উপলব্ধি করে লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ‘আমরা একটি জটিল ও দুর্বোধ্য সময়ে বাস করছি, যে যুগের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বুঝতে আমাদের প্রতিনিয়ত

হোঁচট খেতে হচ্ছে। মরুভূমির মরিচীকা যেমন করে মুসাফিরকে বার বার বিভ্রান্ত করে তেমনি এযুগ আমাদেরকে রীতিমত এক সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এ যুগের প্রলোভন যেমন অতিক্রম করা কঠিন তেমনি এর মুখোমুখি হওয়াও রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার। এই বই আমাদের সময়কে বোঝার একটা প্রচেষ্টা। বিশেষ করে যে যুগে ইসলাম পাশ্চাত্যের প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বইয়ে আমি ইসলামের অবস্থান থেকে ঘটনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।’

লেখক বইটিকে উত্তর আধুনিকতা, ওরিয়েন্টালিজম এবং উত্তর আধুনিক ভাবনা এই তিনটি শিরোনামে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। উত্তর আধুনিকতা শিরোনামের অধীনে- উত্তর আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতার সংকট, উত্তর আধুনিকতার চোরাবালি, উত্তর আধুনিকতা : সাম্রাজ্যবাদের গোপন ইচ্ছা, আমাদের উত্তর আধুনিকতা, এবং ইসলাম ও উত্তর আধুনিকতা- সাব শিরোনামে আলোচনা করেছেন। ওরিয়েন্টালিজম শিরোনামের অধীনে- ওরিয়েন্টালিজম, ওরিয়েন্টালিজমের ভিন্ন পাঠ, ওরিয়েন্টালিজমের আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ উত্তর আধুনিক ভাবনা শিরোনামের অধীনে- সভ্যতার দ্বন্দ্ব, বিশ্বায়ন ও মৌলবাদ, সংস্কৃতির বিশ্বায়ন, ক্রুসেডের মুখ, সভ্যতার ক্রল-ইরাক যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ, তথ্য সম্ভ্রাসের যুগে ইসলাম এবং মেকলের ভূত ও ঔপনবেশিক মানসিকতা- সাব শিরোনামে আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের তরুণদের সাধারণ ধারণা-উত্তর আধুনিকতা নির্ভেজাল এক সাহিত্য আন্দোলন। লেখক ফাহমিদ-উর-রহমান এটি একটি বড় রকমের ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। জটিল এ বিষয়টির ভেদ চমৎকারভাবে লেখক ভেঙেছেন বলে মনে করি।

কবি গোলাম মোহাম্মদ রচনা সমগ্র- ১, সম্পাদক! আবদুল মান্নান সৈয়দ বাংলা সাহিত্যের দিকপাল কবি, প্রবন্ধকার, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় ‘কবি গোলাম মোহাম্মদ রচনা সমগ্র আগস্ট ২০০৫ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। ‘কবি গোলাম মোহাম্মদ রচনাসমগ্র কেবল একজন কবি ও লেখকের সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্যকৃতিই নয় বরং একই সাথে একটি সাহিত্যদর্শ ও একটি জীবনাদর্শেরও প্রতিনিধি। জীবন নিসঙ্গ নিভৃতচারী নয়। জীবন প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে একাত্ম একটি অবিমিশ্র কর্মধারা। জীবন একটি বিশ্বাসের প্রতিফলন। বিশ্বাসের ভিত্তিতে সচেতন ও অচেতন প্রয়াসের নামই জীবন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যখন এই প্রয়াসের শক্তি সঞ্চর করে তখন জীবন হয় সচেতন সৃষ্টি মুখর। কবি গোলাম মোহাম্মদের সাহিত্য কর্মের মর্মমূলে এই বিশ্বাস একটি সৃষ্টিমুখরতার সতত সক্রিয়।’

কবির ইন্তেকালের মাত্র ২ বছরের মধ্যে তাঁর রচনা সমগ্র-প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার জন্য বাংলা সাহিত্য পরিষদকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই।

স্মৃতিচারণ

সঙ্গ প্রসঙ্গ- মাফরুহা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৯৩, প্রচ্ছদ: মোমিন উদ্দীন খালেদ, দাম: পঞ্চাশ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১০৮।

মাফরুহা চৌধুরী মহিলাদের মধ্যে তো বটেই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে কথাশিল্পী হিসেবে তিনি তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি মান সম্পন্ন ছিল। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী মাফরুহা চৌধুরী ব্যক্তিগত জীবনে প্রখ্যাত কবি তালিম হোসেনের স্ত্রী ছিলেন। তিনি অখুলাপুট দৈনিক বাংলার নারী পাতার পরিচালক ছিলেন 'সঙ্গ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি তাঁর স্মৃতিচারণ মূলক লেখা। এ গ্রন্থে তিনি ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, উঠা-বসা, কথা-বার্তার বিষয়গুলো চমৎকারভাবে আটপৌরে ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এতে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ থেকে নাজমা আতহারের স্মৃতি আবেগময় ভাষায় পেশ করেছেন লেখিকা।

স্মৃতির সৈকতে- মুহম্মদ মতিউর রহমান

প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৪, প্রচ্ছদ: রফিকুল্লাহ গায়ালী, দাম: একশত টাকা মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৪৪।

সম্পূর্ণ-আত্মকথন বা স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ এটি নয়। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক নিজের প্রসঙ্গও এনেছেন অনেকটাই অনিবার্যভাবে অবলীলাক্রমে।

জীবনী সাহিত্য

আধুনিক মুসলিম মনীষা- অধ্যাপক মো: আবদুল লতিফ,

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০৪, প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, দাম: ১০০ টাকা মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ২০৭।

লেখক উপমহাদেশের ২০ জন প্রখ্যাত মনীষীর জীবনী এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'এই গ্রন্থভুক্ত মনীষী চিন্তাবিদগণ সকলেই ইসলাম ও মুসলমানের খেদমতে জীবনের মহার্ঘ আয়ুষ্কাল ব্যয় করে দিয়েছিলেন। এদের রচনাবলী ও কাজের পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে, এক একটি খণ্ড প্রবন্ধে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবুও লেখক মোহাম্মদ আবদুল লতিফ প্রতিটি প্রবন্ধে তাঁদের কাজের বিভিন্ন দিকের পরিচয় দিতে সচেষ্ট বলে মনে হয়েছে।'।

কবি সাহাবা লবিদ -আবদুস সাত্তার

প্রচ্ছদ : আবু শাওকী, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পেপার ব্যাক বাঁধাই,
পৃ. ২৪, দাম : ৮.০০।

‘সাব আ মু আল্লাকা’ খ্যাত কবি। শেষ জীবনে একশত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্মানিত সাহাবীতে পরিণত হন। এমন কি প্রথম জীবনে জাহেলিয়াতের এ শ্রেষ্ঠ কবি ইসলাম কবুলের পর কাব্য চর্চা ছেড়ে দেন। কবি লবিদের নিজের কথায়

‘যেহেতু পেয়েছি আমি পবিত্র কুরআন, এর চেয়ে
ভালো কোনো কাব্য-কথা চিন্তার প্রশস্ত পথ বেয়ে
আসবে, ভাবি না; তাই কবিতা আমার মন হতে
নির্বাসন দিয়ে আমি মগ্ন আছি কুরআনের পথে
এবং জীবন ধন্য পবিত্র বাণীর জলে নেয়ে।’

মরহুম কবি আবদুস সাত্তার ইসলামের প্রথম যুগের এ মহান কবির ব্যক্তি জীবন ও কাব্য প্রতিভা নিয়ে এ মূল্যবান পুস্তিকাটি রচনা করেন। কবি লবিদ যে মাপের কবি তাতে তাঁর কাব্য প্রতিভা ও ব্যক্তি জীবন নিয়ে অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত লেখা উপহার দেয়া যেত। তবে এ কথা ঠিক এ পুস্তিকাটি কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও এর গুরুত্ব অনেক। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা দরকার যে, ইসলামের প্রথম যুগের অর্থাৎ সাহাবা কবিদের কাব্য প্রতিভা ও ব্যক্তি জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্য পরিষদ সান্মিলিতভাবে হলেও অর্থাৎ একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করলে ভালো হতো।

ছোটদের হযরত ওমর- আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৩, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, পেপার ব্যাক বাঁধাই,
পৃ. ৯৬, দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যের নন্দিত কথাশিল্পী, কবি আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন-এর আবেগপূর্ণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ ‘ছোটদের হযরত ওমর’। হযরত ওমর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। এখনো যিনি সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে ‘ওমর দি গ্রেট’ নামে পরিচিত। সেই মহান ব্যক্তিত্বের চরিত্রের নানা-দিক লেখককে আকৃষ্ট করে। তাই তিনি প্রাজ্ঞ ভাষায়, হৃদয়ে গেঁথে নেয়ার মতো ভাষায় ‘ছোটদের হযরত ওমর’ লিখেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘বিভিন্নমুখী গুণাবলীর বিন্ময়কর সমাবেশ ঘটেছিল মহান খলিফা হযরত ওমরের (রা.) চরিত্রে। একদিকে কঠোর সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ, অপরদিকে এতিম, অসহায় ও নিরস্ত্রের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। ওমর চরিত্রের অপূর্ব সব কাহিনী উদ্ভূত করেছে তাঁর কথা লিখতে। আবেগময় ভাষায় নির্মাণ

করতে চেষ্টা করেছি তাঁর জীবনী। যাতে করে ছোট বড় সব বয়সের পাঠক অনুপ্রাণিত হয় তাঁর অনন্য আদর্শে।’

গল্প গ্রন্থ

মধুচন্দ্রিমা- জামেদ আলী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১, প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, মূল্য : ষাট টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১২৮।

মরহুম জামেদ আলী ছিলেন জীবন ঘনিষ্ঠ কথাসিদ্ধি। দেশের দিন আনা দিন খাওয়া সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কথা তিনি কলমের ডগা দিয়ে তুলে আনতেন অসাধারণ দক্ষতায়। ব্যক্তি জীবনেও তিনি হাসি-খুশী হৃদয়বান মানুষ ছিলেন। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক। কিন্তু ছোট গল্পে তাঁর হাত ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর দক্ষতা ও কথাসিদ্ধির দরদ দিয়ে মধুচন্দ্রিমা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো রচনা করেছেন। এতে আছে, অপরাজিতা, রঙিন ফানুস, মধুচন্দ্রিমা, স্বপ্ন, চরিত্রবতী, ফসল, শরাফত আলীর ব্যবসা, উত্তরাধিকার, উৎকণ্ঠা এবং বিপরীত প্রত্যয় নামের ১০টি গল্প। এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক জনাব মাহবুবুল হককে।

জীবন যেমন -মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯১, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, মূল্য : ষাট টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১২৮

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী সহজ সরল ভাষায় স্যাটায়ায় ধর্মী গল্প লিখে থাকেন। আমাদের সমাজ-জীবনের নানা অসংগতি, ক্রটি-বিচ্ছাতি, পতন, অবক্ষয়, সংকট তিনি চটুল-রসাত্মক ভাষায় তুলে ধরেন। বলা যায় হাস্য-রসের মধ্য দিয়ে তিনি নিত্য-নৈমিত্তিক সংঘটিত অন্যান্যগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। আমাদের ক্রৈদান্ত সমাজকে আবিলতা মুক্ত করার প্রয়াস রয়েছে তার এ গল্পগুলোতে।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃত ব্যক্তিত্ব জনাব আবদুল মান্নান তালিবকে।

বিশ শতকের চার দরবেশ -বদরে আলম

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯১, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, দাম : পাঞ্চাশ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৮৮।

‘প্রতীকী ব্যঞ্জনা জীবনের চিরসত্যকে তুলে ধরা হয়েছে গল্পে। চমৎকার গল্প বলার ঢং এবং ভাষা গল্পগুলোকে প্রাণ দিয়েছে। সভ্যতা কি সামাজিক বিশৃঙ্খলা? গণতন্ত্র কি পাশবিক স্বাধীনতা? পশ্চাত্যের জীবন ব্যবস্থা ও জীবনাচরণের অনিয়ন্ত্রিত

ব্যক্তি স্বাধীনতার দিকে তাকালে এসব প্রশ্ন মনে জাগে। তারই এক শিল্পসম্মত উত্তর গল্প সংকলন ‘বিশ শতকের চার দরবেশ’।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে যারা এদেশে নানা সেষ্টরে কাজ করে যাচ্ছেন ‘বিশ শতকের চার দরবেশ’ গ্রন্থের লেখক জনাব বদরে আলম তাদের অন্যতম একজন। বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু দায়িত্ব পালন করার কারণে তার পক্ষে সাহিত্য রচনায় তেমন সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার পরও যখনই একটু ফাঁক পান কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান। সেহেতু মাঝে মাঝে এ সাহিত্য বোদ্ধা, সচেতন মানুষটির কাছ থেকে বিদ্যুৎ চমকের মতো দু’চারটি রচনা আমরা পেয়ে যাই। ‘বিশ শতকের চার দরবেশ’ গ্রন্থের গল্পগুলিও সে ভাবেই রচিত। বদরে আলম রচিত এ গ্রন্থটি শিল্প সম্মত গল্পের সংকলন যা কথা সাহিত্যের সোনালী ফসল।

নতুন জমিনদার- শাহেদ আলী

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, দাম: পঞ্চান্ন টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১০৪।

‘শাহেদ আলী বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষ পুরুষ। সাতচল্লিশ উত্তর পূর্ব বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টির যে নবতর প্রয়াস বেগবান হয়ে উঠে, শাহেদ আলী তার অন্যতম কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব। দেশ মাটি বিশ্বাস ঐতিহ্য তাঁর সৃষ্টিতে হয়ে ওঠে সত্যিকার অর্থেই বৃহত্তর মানব গতির সংবাহন। তাঁর গল্প উপন্যাস চরিত্রের স্বধ্বস্রূত গোথিত এ দেশের মানুষ প্রকৃতি ও নিসর্গ চেতনা; শাহেদ আলীর এখানেই অদ্বিষ্ট পরিচয় ও বিশিষ্টতা। স্বল্পপ্রজ্ঞ শিল্পী শাহেদ আলীর প্রকাশনার বিস্তার সংযত ও সংহত। তবু শিল্পের আবেষ্টন তাঁর সময়কে অতিক্রম করে চলেছে কালাতীত সঁকো পেরিয়ে, আমাদের সকল দীনতা ঘুচিয়ে। ‘নতুন জমিনদার’ তাঁর পরিণত মানসের উজ্জ্বল আহরিত এক মূল্যবান মনিকাঞ্চন। স্বল্পপরিসরে গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেহাগ বাজায়, সুরধ্বনি তোলে এক অনুপম সুস্বাদ নিয়ে। বাংলা কথা শিল্পের সুদক্ষ কারিগর শাহেদ আলী এক নতুন ডাইমেনশান সৃষ্টি করেছেন। জিব্রাইলের ডানা, শা’নযর, একই সমতলে, ঐয়ে নীল আকাশ, আতসী, ছবি গল্পগুলিতে তার পরিচয় বিধৃত। তাঁর এ উজ্জ্বল সৃষ্টি সম্ভারে পুষ্ট করেছে আমাদের কথা সাহিত্য ধন্য হয়েছি আমরা।’

নির্বাচিত গল্প (প্রথম খণ্ড)- আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৪৬, মূল্য : ৩২.০০ (সাদা), ২৫.০০ (নিউজ)

বোদ্ধা সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নির্বাচিত গল্পের, প্রথম খণ্ডটি। নবীন-প্রবীণের লেখায় সমৃদ্ধ এ সংকলন গ্রন্থটির প্রায় সব গল্পই

উত্তীর্ণ। সম্পাদক বলেছেন, ‘এখানে দেশ কাল-জাতির কোন বেড়াঙ্কাল নেই। সমগ্র বিশ্বমানবতা এক আদমের সন্তান এবং প্রকৃতিগত দিক দিয়ে সবাই মানুষ। সারা পৃথিবীর মানুষকে যুঝতে হচ্ছে একটা শয়তানী শক্তির সাথে। কিয়ামত পর্যন্ত মানবিক শক্তির সাথে এ শয়তানী শক্তির সংঘাতের বিরাম নেই।’ এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় বাংলা কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও নতুনতর একটা কিছু ঘটতে চলেছে, এ ক্ষেত্রেও একটা বাক নিতে চলেছে বাংলা সাহিত্যের গতি। নির্বাচিত গল্প (প্রথম খণ্ড)-এ অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলো সত্যিই নতুন স্বাদের।

এক টুকরো মেঘ- মাহবুবুল হক

প্রথম পকাশ : মার্চ ১৯৯২, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, মূল্য : ৬০.০০ (সাদা), ৪৫.০০ (নিউজ), বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৩৪।

প্রতিনিয়ত সমাজ জীবনে কত ঘটনায় না ঘটছে, কে তার খবর রাখে। হয়তো সবাই রাখে না কিন্তু কেউ কেউ তো রাখে। এসব ঘটে যাওয়া ঘটনাকে উপজীব্য করে মাহবুবুল হক তাঁর স্বভাবজাত সরলতায় সহজ-সরল ভাষায় নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রাগ-বিরাগ ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পগুলোতে। ‘একটুকরো মেঘ’ গ্রন্থের গল্প গুলোতে তাই খুঁজে পাওয়া যায় সমাজের মানুষের জীবনাচার তথা আমাদেরই জীবনাচার।

রক্তের ঋণ- মিন্নাত আলী

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৮, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, বোর্ড-বাঁধাই পৃ. ১২৮, মূল্য : আশি টাকা মাত্র

অভিনয় কিছু মানুষের পেশা কিন্তু সব মানুষের নয়। তবু জীবন সংসারে মানুষকে কোন কোন সময় অথবা জীবনের অনেক সময়ই অভিনয় করতে হয় এবং তা বাধ্য হয়েই করতে হয়। ‘রক্তের ঋণ’ গল্প গ্রন্থের ‘রক্তের ঋণ’ গল্পে মিন্নাত আলী শিল্পিতভাবে সে কথা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী মিন্নাত আলীর লেখা ‘রক্তের ঋণ’ গ্রন্থে মোট ২০টি ছোট গল্প স্থান পেয়েছে। গল্প গুলোতে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনাচার, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-ঠাট্টা, রোগ-ব্যধিসহ জীবনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে, শিল্পিত সন্মতভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এর প্রতিটি গল্পই পাঠককে নাড়া দিবে, পাঠকের ভাল লাগবে।

ওগী এবং অন্যান্য- আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৮, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, দাম : আশি টাকা মাত্র, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৫২।

বাংলা সাহিত্যের কথা সাহিত্য শাখার অন্যতম প্রধান শিল্পী হলেন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন। তাঁর রচিত ছোট গল্পগুলো অনবদ্য, অসাধারণ। সে সব রচনা থেকে তিনি ২১টি গল্প এখানে সংকলন করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হওয়ার কারণে তিনি মানুষের জীবনের নানা অসংগতি, জালিয়াতি, ধাক্কাবাজি, মুনাফেকী, বেঈমানী, রাজনৈতিক ভণ্ডামী, ধর্মান্ধতা, অহেতুক ধর্মবিদ্বেষ ইত্যাদি নানাদিক স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তা থেকে তথ্য-উপাত্ত, রস, অভিজ্ঞাত আহরণ করে তবে লিখেছেন। এতে করে তাঁর লেখা হয়েছে জীবন ঘনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ এবং শিল্প সম্মত। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ২১টি লেখায় অত্যন্ত উচ্চমানের রচনা বলে মনে হয়েছে। এক একটি ছোট ছোট বিষয়ও যে কত অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে তা এ গল্পগুলো না পড়লে বুঝা যাবে না। শিল্পিত এ ছোট গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

উপন্যাস

সুদূরের ভাল বাসা- সোলায়মান আহসান

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৮০, দাম : পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

সোলায়মান আহসান মূলত কবি। কিন্তু কথা সাহিত্যেও তিন কম যান না। ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কম কথায় অনেক বেশি বুঝাতে পারেন। এটা একজন কথা সাহিত্যিকের বড় গুণ বলে মনে হয়। হয়ত তিনি কবি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি ‘সুদূরের ভাল বাসা’ নামক উপন্যাসটিতে সমাজ বাস্তবতার নিগূড় বিষয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। দূরে থেকেও যে দেশ মাটি মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসা যায় সে কথাও তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

মানুষ ও দেবতা- আবদুল খালেক

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৫, দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯২, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৪৪, দাম : ষাট টাকা (সাদা), পয়তাল্লিশ টাকা (নিউজ)

মানুষ তো মানুষই। জন্মগতভাবে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সব মানুষই একজনের বংশধর। অতএব মানুষের মধ্যে কোন তারতম্য থাকতে পারে না। সে কথাটিই এ উপন্যাসে লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে এ উপন্যাসটি উপমহাদেশের বিখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক নসীম হিজাজীর ‘ইনসান আওর দেবতা’র ছায়া অবলম্বনে রচিত। তবে হুবহু অনুবাদ নয়, এমনকি কাহিনীও এক নয়। ‘নসীম হিজাজী তাঁর উপন্যাসে

অনৈসলামিক সমাজে মানবতার অপমানজনক অবস্থা তুলে ধরেছেন। এ বইতে ইসলামী সমাজ মানুষকে কতটুকু মর্যাদা দান করতে পারে, তাই তুলে ধরা হয়েছে।’ উপন্যাসের ঘটনা সুখপাঠ্য-ও আকর্ষণীয়।

অরণ্যে অরুণোদয়- জামেদ আলী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৪, প্রচ্ছদ : আবুল কালাম আজাদ, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৯৬, বিনিময় : ৬০ টাকা মাত্র

‘অরণ্য পরিবেশে লালিত মেঘবতী আর ভবঘুরে হারানোর জীবনের সার্থক উত্তরণ ঘটেছে ‘অরণ্যে অরুণোদয়’-এ। অন্ধকার সমাজের উঁচু নীচু গুড়িয়ে পৃথিবীকে সমভাবে বাসোপযোগী করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন স্টেশন মাস্টার আনসার। জামেদ আলী’র ‘অরণ্যে অরুণোদয়’ কথা সাহিত্যের অঙ্গনে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস। নিঃসন্দেহে জামেদ আলী বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী। যে কারণে তাঁর প্রত্যেকটি গল্প, উপন্যাসে ভিন্নধর্মী উপস্থাপনা থাকে, থাকে ভিন্ন স্বাদ। ‘অরণ্যে অরুণোদয়’ উপন্যাসটি শুধু অরণ্যে লালিত মেঘবতী এবং হারানোর জীবন কাহিনীই নয় এটি বাংলা সাহিত্যে ‘অরণ্যে অরুণোদয়’ ও বটে।

লাল শাড়ী- জামেদ আলী

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ১৯৯০, প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, দাম: ৪৫.০০ টাকা (সাদা), বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৭২।

ভিন্ন ধাচের কথাশিল্পী জামেদ আলী’র অসাধারণ সৃষ্টি ‘লাল শাড়ী’ উপন্যাসটি। গ্রাম বাংলার চিত্র এ উপন্যাসে যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি-বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রধান এদেশের সেই ভয়াল মূর্তিও ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে মানব-মানবীর মধ্যকার চিরন্তন প্রেম, তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না শিল্পীত ভাবে লেখক পাঠকের সামনে পেশ করেছেন। লাল-শাড়ী জীবনধর্মী সার্থক উপন্যাস।

রায় নন্দিনী- ইসমাইল হোসেন শিরাজী

প্রথম, প্রকাশ: ১৯৯১, প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, দাম ৬০.০০ (সাদা), ৪৫.০০ (নিউজ), বোর্ড বাঁধাই, পৃ, ১২৮।

‘আনল প্রবাহের কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজীর ‘রায় নন্দিনী’ একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। হিন্দু লেখকদের বিশেষ করে বঙ্কিমী উপন্যাসের পাতায় পাতায় মুসলমানের অলীক কলঙ্ক, কুৎসা এবং বিজাতীয় বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পরিপূর্ণ। তারই জবাব ‘রায় নন্দিনী’ একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এতে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য, মহত্ব, উদারতা ও মহানুভবতার কথা আছে হিন্দুদের মহত্বের কথাও তেমনি বিধৃত।

জেগে আছি- নূর মোহাম্মদ মল্লিক

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১, প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৩৪, মূল্য : ষাট টাকা (সাদা), পঁয়তাল্লিশ টাকা (নিউজ)

‘এক অবস্থানে বা এক ভূমিকায় আমরা কেউই বেশী দিন থাকতে পারি না। শিশু থেকে কিশোর। কিশোর থেকে তরুণ। তরুণ থেকে যুবক। পৌঢ় থেকে বৃদ্ধ। সোজা কথা হ’ল কোন কিছুই স্থির নেই। সব কিছুই গতি আছে। গতি আছে বলেই জীবন আছে। জীবন আছে বলে যোগ বিরোগ আছে। লাভ-লোকসান আছে। লাভ-লোকসান মিলিয়েই জীবনের এই পথ চলতে হয়। না হলে ব্যালেন্স শীট মিলবে না।’ ঠিক তাই জেগে আছি উপন্যাস জীবনের ব্যালেন্স শীট। এতে যেমন আছে নির্দোষ প্রেম কাহিনী। তেমন আছে জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের কথা। জীবন ঘনিষ্ঠ এ উপন্যাসটি শিল্প সম্মত রচনা।

মুনীরা- জামেদ আলী

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১৯২, মূল্য : একশত টাকা

‘ইতি মুনীরা’ নামে একটি ছোট গল্প ১৯৮৫ সালের ঈদ সংখ্যা সাপ্তাহিক সোনার বাংলা’য় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পাঠকের তাগিদে লেখক এটি উপন্যাসে রূপ দেন। কিন্তু নামের ক্ষেত্রে ‘ইতি’ বাদ দিয়ে শুধু ‘মুনীরা’ রাখেন। ‘মুনীরা’ নিটোল প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ বাস্তবতাও এতে উঠে এসেছে। আসলে ঔপন্যাসিক জামেদ আলী একটি আদর্শ সমাজ গড়ার মানসিকতায় কলম ধরেছিলেন। তাঁর সেই মানসিকতার ফসল ‘মুনীরা’ উপন্যাসটি।

কাবিলের বোন- আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, বোর্ড বাঁধাই পৃ. ৩৬৬, বিনিময় : ১৫০ টাকা মাত্র

‘একটি বিপুল সংকটের সময় যখন বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘর্ষে মানুষ সত্যকে চিহ্নিত করতে পারছে না। সেই সময় কয়েকটি মানুষ দুটি ভাষার উচ্চারণের পরিধির মধ্যে নিজেদের পরিচয় নির্মাণের চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনের ইতিহাসে এই ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয় অথচ এ রকম ঘটনা আমরা সাহস করে পরীক্ষা করে দেখিনি। কবি আল মাহমুদ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়ে সফলতার পদপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব। সর্বাংশে দ্বিধামুক্ত হয়ে একটি সময়ের শাসনের মধ্যে দুটি ভিন্ন ভাষার জীবনকে পরস্পরের প্রতি মমতার আকর্ষণে একত্রিত করেছেন। এটা কম দক্ষতার পরিচয় নয়। ‘কাবিলের

বোন' উপন্যাসের মধ্যে জীবনের যে অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে তা দীর্ঘ কাল পাঠকের মনে রেখাংকন রেখে যাবে।' বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম কবি, কবি আল মাহমুদ মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের পেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি দুটি বৈরি ভাষা ভাষী সম্প্রদায়ের মানুষের একে অপরের প্রতি প্রকৃত প্রেম, ভালোবাসা ও মমতাকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'কাবিলের বোন' সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি উপন্যাস।

যে পারো ভুলিয়ে দাও- আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৬, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ১২৮, মূল্য : ৭০.০০ টাকা

কবি আল মাহমুদ জাত কবি হলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও রয়েছে তাঁর সমান দক্ষতা। কথা সাহিত্যে তাঁর অবদান জাতি চিরদিন স্মরণে রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর রচিত 'যে পারো ভুলিয়ে দাও' পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এক শিল্পিত দলিল। যতদূর মনে হয়, সহায় সম্পদ নিয়ে কবি আল-মাহমুদের নিজ পরিবারেরই ভেতরকার হা-পিত্যেশ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংঘাতের কাহিনী এ উপন্যাসে চমৎকারভাবে উঠে এসেছে।

ছাড়াও বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে নৈতিকতা, সাহিত্য ও শিল্পের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ বেশ কয়েকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- একবার ফিরে চাও- মোহাম্মদ আলী আজম, মন মণাস্তর- সুফিয়া হাফিজ মুক্তা, প্রত্যাবর্তন- সুফিয়া হাফিজ মুক্তা, ইট পাথরের অরণ্যে- এ কে এম ফজলুল হক, স্বপ্নের জন্য স্বপ্ন- এ কে এম ফজলুল হক, অলঙ্ঘ্য আগোচরে- সোলায়মান আহসান, লোহানিয়ার বাক- সোলায়মান আহসান, আয়নার ওপাশে- আবু বকর সিদ্দিকী। শেষ উপহার- সৌমিক আহমদ মেরিন, এযুগের সোনাভান- এস. এম. আবদুর রউফ প্রভৃতি।

শফীউদ্দীন সরদার ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে পাঠকের কাছে খ্যাত। এমন কি তিনি পাকিস্তানের অমর ঔপন্যাসিক নসীম হিজাজীর সমতুল্য বলেও অনেকে মনে করেন। ইতিহাসের বাক-বাক-যে সংঘাত-সংঘর্ষ, দুঃখ-বেদনা, উত্থান-পতন রয়েছে তা অত্যন্ত ঋদয়গ্রাহী ভাষায় পাঠকের কাছে তুলে ধরেন শফীউদ্দীন সরদার। বাংলা সাহিত্য পরিষদ এই শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের ব্রিডোহী জাতক, রোহিনী নদীর তীরে, ঝড়মুখী ঘর, ঈমানদার, শাহজাদী, দখল, বাহাগার প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ করেছে। বাংলা সাহিত্য পরিষদ দুটি কিশোর উপন্যাসও প্রকাশ করেছে। একটি প্রখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক মাসিক ফুলকুড়ি পত্রিকার সম্পাদক জয়নুল আবেদীন আজাদ এর 'ডুমুরের দিনগুলো' এবং অপরটি কথা শিল্পী মোহাম্মদ আলী আজমের 'আষাঢ়ের আগুন'।

কাব্যগ্রন্থ

সাহিত্য জগতে কবিতার অবস্থান সবার শীর্ষে। বাংলা সাহিত্য পরিষদ যে, কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়, কবি-সাহিত্যিকদের পরিচর্যা এবং সাহিত্য আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ায় যে তার মূল লক্ষ্য তা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা থেকে পরিষ্কার হয়। এ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান ২০ টির মত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছে, যা সত্যিই প্রশংসার্হ। কারণ অন্য সব গ্রন্থ দু'চারটা বিক্রি হলেও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে কখনো ব্যবসা হয় না এ কথা সকলেরই জানা।

বখতিয়ারের ঘোড়া- আল মাহমুদ

বাসাপ থেকে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয় বর্তমান বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রাণপুরুষ কবি আল মাহমুদের 'বখতিয়ারের ঘোড়া' নামক কাব্য গ্রন্থটি। সেই যে প্রকাশনা জগতে টগুবগু করে বখতিয়ারের ঘোড়া বাসাপ ছুটিয়েছিল আজও তা অব্যাহত আছে। এ কাব্য গ্রন্থটির ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয় এবং ২০০৮ সালে তৃতীয় প্রকাশ হয়েছে।

'বাংলা সাহিত্যের বিশ্বয়কর কবি প্রতিভা আল মাহমুদ। তিনি বাংলা কবিতার অঙ্গনে অভিনব ডাইমেনশন এনেছেন চিরন্তন বিশ্বাস ও আদর্শ ঋদ্ধ হয়ে। ত্রয়োদশ শতকের সেনাপতি বখতিয়ার ইতিহাস বিখ্যাত। তাঁর ঘোড়ার খুরের আঘাতে সমস্ত জরাজীর্ণ উড়ে যায় খড় কুটোর মতো, প্রতিষ্ঠিত হয় সোনালী সূর্যের রক্তিমাম্ব।' ৪৮ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই এ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে মূল্য ছিল ১৮ টাকা, তৃতীয় প্রকাশে এলে মূল্য রাখা হয়েছে ৬০ টাকা।

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য- ফররুখ আহমদ

অক্টোবর ১৯৯১ তে প্রকাশিত হয় ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের স্যাটায়ায়ধর্মী কাব্যগ্রন্থ 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য'। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। এ কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদ 'আমাদের ইতিহাস দিক্কৃত মীর জাফরকে চরিত্র হিসেবে এনে আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবেশের ছিদ্রপতন নির্দেশ করেছেন। আমাদের আগামী দিনের চলার নির্দেশিকাও এ কাব্যে বিধৃত।'

সামগীত দুঃসময়ের- আফজাল চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি প্রতিভা আফজাল চৌধুরী। বাসাপ প্রকাশ করেছে তাঁর ব্যতিক্রমী কাব্যগ্রন্থ 'সামগীত দুঃসময়ের'। 'ইসলামী ঐতিহ্য, আদর্শ ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থা কবির কাব্য জিজ্ঞাসা আমাদের পথ চলার এক দুরন্ত প্রেরণা।' ১৯৯১ সালের অক্টোবরে এ কাব্যগ্রন্থটি রাখা হয়েছিল পঁয়ত্রিশ টাকা।

শৈৱাচাৱেৰ ঐৱাবত- সাজ্জাদ হোসাইন খান

সমকালীন বাংলা সাহিত্যেৰ এপাৰ বাংলাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছড়াকাৰ জনাব সাজ্জাদ হোসাইন খানেৰ 'শৈৱাচাৱেৰ ঐৱাবত' নামক ছড়া গ্ৰন্থটি অক্টোবৰ ১৯৯১ সালে প্ৰকাশ কৰে বাসাপ। ব্যঙ্গ ছড়া ৰচনায় সাজ্জাদ খান বৰাবৰই সিদ্ধহস্ত। এ ছড়া গ্ৰন্থেও তিনি তৎকালীন সময়ে চেপে বসা শাসকগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে তাঁৰ স্বভাবজাত শ্ৰেষাঙ্কক বক্তব্য পেশ কৰেছেন, কিন্তু তা শিল্প সম্ভাৱে। ৪৮ পৃষ্ঠাৰ বোৰ্ড বাঁধাই এ গ্ৰন্থটিৰ দাম রাখা হয়েছিল ত্ৰিশ টাকা। উল্লেখ্য যে এ গ্ৰন্থে প্ৰতিটি ছড়াৰ সাথে শিল্প হামিদুল ইসলামেৰ নান্দনিক স্কেচ রয়েছে।

বুকেৰ ভেতৰ প্ৰতিদিন- আবদুল হালিম খাঁ

সহজবোধ্য, সহজপাচ্য কবি হলেন আবদুল হালিম খাঁ। তাঁৰ ৰচিত কাব্যগ্ৰন্থ 'বুকেৰ ভেতৰ প্ৰতিদিন' ১৯৯১ সালেৰ অক্টোবৰে প্ৰকাশ কৰে বাংলা সাহিত্য পৰিষদ। ৪৮ পৃষ্ঠাৰ বোৰ্ড বাঁধাই এ গ্ৰন্থটিৰ দাম রাখা হয়েছিল ত্ৰিশ টাকা।

নিসৰ্গেৰ প্ৰজ্ঞাপতি- মোৱশেদ আলী

প্ৰবাসী কবি মোহাম্মদ মোৱশেদ আলী ৰচিত 'নিসৰ্গেৰ প্ৰজ্ঞাপতি' কাব্য গ্ৰন্থটি ১৯৯১ সালে প্ৰকাশিত হয়। 'আদৰ্শ চেতনা, মুসলিম মানস, ঐতিহ্য, সমকালীন চিন্তা, জীবনেৰ নানা প্ৰসঙ্গ, প্ৰেম এসব কিছু নিয়েই ৰচিত 'নিসৰ্গেৰ প্ৰজ্ঞাপতি'। বোৰ্ড বাঁধাই, ৪০ পৃষ্ঠাৰ এ গ্ৰন্থটিৰ দাম ছিল ৪০ টাকা।

কৃষ্ণস্বৰ প্ৰত্ন্যষেৰ- সোলায়মান আহসান

আশিৰ দশকেৰ অন্যতম কবি, কবি সোলায়মান আহসান। 'কৃষ্ণস্বৰ প্ৰত্ন্যষেৰ' তাঁৰ দ্বিতীয় কাব্যগ্ৰন্থ এটি নভেম্বৰ ১৯৯১ সালে বাসাপ থেকে প্ৰকাশিত হয়। ৫৬ পৃষ্ঠাৰ বোৰ্ড বাঁধাই এ কাব্যগ্ৰন্থটিৰ দাম রাখা হয়েছিল ৩০ টাকা। এৰপৰ কবি সোলায়মান আহসান-এৰ ২০০৫ সালে 'শূণ্য ও শূণ্যতা' এবং ২০০৯ সালে 'যুদ্ধেৰ বিপক্ষে জিহাংসা' নামক কাব্য গ্ৰন্থটি বাসাপ থেকে প্ৰকাশিত হয়। অত্যন্ত হৃদয়বান এ কবিৰ কবিতায় শাস্ত আদৰ্শ, মানবতাবোধ, মানুষেৰ প্ৰতি দায়িত্ব বোধ, ভালবাসা, প্ৰেম, চিৰন্তন আশা-আকাংখা সাথে সাথে ভগ্নমী, চাতুৰতা, যুদ্ধেৰ প্ৰতি ঘৃণা বিধৃত।

বিৰল বাতাসেৰ টানে- মোশাৱৱফ হোসেন খান

মোশাৱৱফ হোসেন খান আশিৰ দশকেৰ অন্যতম প্ৰধান কবি। কবি হিসেবে ইতোমধ্যে তিনি তাঁৰ ভিত শব্দ কৰতে পেৰেছেন বলে মনে কৰি। তাঁৰ চতুৰ্থ কাব্য গ্ৰন্থ 'বিৰল বাতাসেৰ টানে' বাসাপ অক্টোবৰ ১৯৯১ সালে প্ৰকাশ কৰে। 'এ কাব্যগ্ৰন্থে

প্রেম, সহজাত মানবিক আকাঙ্ক্ষা, মানবতার প্রতি দায়িত্ব বোধ এবং জীবনের নানা প্রসঙ্গ অত্যন্ত সাবলীল ছন্দ মাধুর্যে রচিত।’ ৪৮ পৃষ্ঠার বোর্ড বাঁধাই এ গ্রন্থটির দাম ছিল ৩০ টাকা।

সবুজ গম্বুজের দ্রাণ- হাসান আলীম

ছন্দ সচেতন কবি, আশির দশকের অন্যতম কবি হাসান আলীম। ‘সবুজ গম্বুজের দ্রাণ’ তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। তিনি কিছুদিনের জন্য এক সময় সৌদি আরবে প্রবাসী হন। এ কাব্যগ্রন্থটি সে অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক। এমনিতেই তাঁর কাব্যগ্রন্থে শাস্ত্রত আদর্শ, ঐতিহ্যপ্রেম, মসুলিম মানস, চিরন্তন প্রেম, স্বপ্ন সবই উপস্থিত। কিন্তু এ কাব্যগ্রন্থে অতিরিক্ত যোগ হয়েছে নবী প্রেম এবং প্রবাস জীবনের যন্ত্রণা। এ কাব্যগ্রন্থটি ১৯৯১ সালে বাসাপ থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও পরবর্তীতে জানুয়ারী ১৯৯৮ সালে ‘যে নামে জগত আলো’ এবং ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী ‘দাও সে সোনার গাঁও’ নামে দু’টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অশ্পষ্ট বন্দর- মুকুল চৌধুরী

আশির দশকের অন্যতম কবি মুকুল চৌধুরী। ঐতিহ্যপ্রেমী এ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অশ্পষ্ট বন্দর’ বাসাপ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। ‘মানবতাবোধ, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, আন্তর্জাতিকতা মুকুল চৌধুরীর কবিতার উপজীব্য। প্রেম, বিরহ, নষ্টালজিয়া, প্রকৃতির বহমান সৌন্দর্যের অনুসঙ্গও এই শেকড়সন্ধানী উপজীব্যকে পরিপুষ্ট দিয়েছে। জীবনচেতনায় কবি আশাবাদী।’ ৫৬ পৃষ্ঠার বোর্ড বাঁধাই এ গ্রন্থের দাম রাখা হয়েছে ত্রিশ টাকা।

এক কণা সাহসী আগুন- তমিজ উদ্দীন লোদী

জানুয়ারী ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় কবি তমিজউদ্দীন লোদী’র কাব্যগ্রন্থ ‘এক কণা সাহসী আগুন’। ‘ছন্দ সচেতনতা, ঐতিহ্য প্রীতি ও আদর্শ চেতনা তমিজ উদ্দীন লোদীর বৈশিষ্ট্য। প্রেম, ভালবাসা, সমাজ জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, গ্লানি, আদর্শ চেতনা, নাগরিকজীবনে দুঃখ হতাশা এসব কিছুই আশির দশকের কবি তমিজ উদ্দীন লোদীর কবিতার বিশেষত্ব।’

ফিরে চলা এক নদী- গোলাম মোহাম্মদ

‘হিজল বনের পাখি’ নামে পরিচিত কবি গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন আশির দশকের অন্যতম প্রধান একজন কবি। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ সালে বাসাপ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর ফিরে চলা এক নদী’ নামক কাব্য গ্রন্থটি। ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি শত ভাগ নত এ কবির কাব্যগ্রন্থে আছে, প্রেম, বিরহ, মানবতাবোধ, প্রকৃতি প্রেম, সুখ-দুঃখ, সর্বোপরি আছে বিশ্বাস এবং দ্রোহ।

হৃদয়ে জ্বালাও নূর- গাজী এনামুল হক

আশাবাদী দ্রোহের কবি গাজী এনামুল হকের কাব্যগ্রন্থ ‘হৃদয়ে জ্বালাও নূর’ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে বাসাপ থেকে প্রকাশিত একত্ববাদের প্রচার কামী এ কবির কাব্যে রয়েছে-ঐতিহ্যপ্রেম, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না, বাদ-প্রতিবাদ, সর্বোপরি অন্যায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা। যেমন-

‘পাপের পেছনে আর ছুটবো না কোনদিন কভু

হৃদয়ে জ্বালাও নূর তোমার দিদার যেন পাই।’

তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা- মতিউর রহমান মল্লিক

আদর্শবাদী কবি ব্যক্তিত্ব কবি মতিউর রহমান মল্লিক আশির দশকের প্রধানতম কবি। আপাদমস্তক কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ‘তোমার ভাষায় তীক্ষ্ণ ছোরা’ কাব্যগ্রন্থটি জুন ২০০৫ সালে বাসাপ প্রকাশ করে। প্রচণ্ড আদর্শবাদী এ কবির বর্তমান কাব্য গ্রন্থে রয়েছে, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, মানবতাবোধ, আন্তর্জাতিকতা, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-কষ্ট, প্রকৃতি প্রেম, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি।

বিশ্বাসের দিওয়ান- আফজাল চৌধুরী

কবি ফররুখের পর যে কবি আমাদের আশস্ত করেন তিনি হলেন আফজাল চৌধুরী। ইসলামী রেনেসাঁর এ অকুতোভয় কবি সাহসের ডালি নিয়ে সগুদা করে গেছেন। ইসলামী বিষয় সচেতন, রাজনীতি সচেতন কবি আফজাল চৌধুরীর কাব্য গ্রন্থ ‘বিশ্বাসের দিওয়ান’ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় বাসাপ থেকে।

ছড়ায় ছড়ায় সুরের মিনার- গোলাম মোহাম্মদ

কবি গোলাম মোহাম্মদের শিশুতোষ ছড়া গ্রন্থ ছড়ায়-ছড়ায় সুরের মিনার প্রকাশিত হয় মে ২০০১ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে। ২৮টি মিষ্টি মিষ্টি ছড়া নিয়ে ছোটদের এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে ইব্রাহীম মণ্ডলের স্কেচ। গীতল ছন্দে লেখা ছড়া গুলো শিশু-কিশোর তো বটেই বড়দেরও ভাল লাগবে।

কবি গোলাম মোহাম্মদ আমাদেরই বন্ধু। কিন্তু মাত্র ৪৩ বছর বয়সে গত ২২ আগষ্ট ২০০২ সালে চলে গেলেন তিনি। আপদমস্তক কবি ছিলেন। অবশ্য গীতিকার হিসেবেই সম্ভবত বেশি সফল ছিলেন তিনি। তবে একথা সত্য যে তিনি শুধু কবি বা গীতিকারই ছিলেন না, তিনি নানাগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ ছিলেন। শিল্প হিসেবেও তাঁর খ্যাতি মোটেই কম নয়। বহু বইয়ের তিনি প্রচ্ছদ শিল্পীও ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নন্দন হাতের লেখা সবাইকে টানতো।

অনুবাদ সাহিত্য

‘বিদেশী বিশেষ করে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী ভাষাগুলো থেকে উন্নত সাহিত্য কর্ম বাংলায় অনুবাদ করা।’ এটি ছিল বাসাপ-এর ৩ নং কর্মসূচী। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বাসাপ এ পর্যন্ত আরবী ও উর্দু ভাষার সেরা সাহিত্যিকদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেছে। আমরা মনে করি বিশ্ব সাহিত্যের এ গ্রন্থগুলো অনুবাদ করার ফলে বাংলা ভাষা-আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

আব্দুল্লাহর পথের সৈনিক – নাজিব কিলানী, অনুবাদ: ড. আবদুল মাবুদ,

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮৫, প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, দাম: ৬৫.০০ (সাদা), ৪৮.০০ (নিউজ), বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ২৪২।

আব্দুল্লাহর পথের সৈনিক উপন্যাসটির আরবী নাম ‘রিহ্লাতুল ইল্লাদ্বাহ’। ইখওয়ানুল মুসলিমীন কর্মীদের বন্দী জীবনের অকথ্য নির্যাতনের বেদনাঘন করুণ কাহিনী এ উপন্যাসের পটভূমি। আধুনিক আরবী সাহিত্যের নন্দিত কথাসিঙ্গী নাজিব কিলানীর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় এ কাহিনী হয়ে উঠেছে অনবদ্য মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত। আধুনিক আরবী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল উপন্যাস ‘রিহ্লাতুল ইল্লাদ্বাহ’ বাংলা অনুবাদ

‘আব্দুল্লাহর পথের সৈনিক’ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই নন্দিত শিল্পীর প্রথম উপন্যাস-যার পাতায় বিধৃত আছে ত্যাগ, কোরবানী আর প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ।’ বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী মিশরীয় কথাসিঙ্গী ডা. নাজিব কিলানীর অনবদ্য রচনা ‘আব্দুল্লাহর পথের সৈনিক’ গ্রন্থটি বাঙালি পাঠকের ভাল লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রক্তরঞ্জিত পথ- নাজিব কিলানী

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৯১, প্রচ্ছদ: মোমিন উদ্দীন খালেদ, দাম: আশি টাকা (সাদা), পঞ্চানন টাকা (নিউজ), বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ২০৮।

‘আত-তরীক-আত-তারীল’-এর বাংলা অনুবাদ ‘রক্তরঞ্জিত পথ’। উপন্যাসটি ১৯৫৭ সালে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত। ‘রক্তরঞ্জিত পথ’-এর প্রতিটি ছন্দে ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আত্ম কুরবানী, প্রেম এবং জীবন সংগ্রামের তেজদীপ্ত সাহস। ‘রক্তরঞ্জিত পথ’-এ স্বাধীকারের স্বপ্ন নিয়ে ছুটে চলেছে জীবন সংগ্রামী এক দুর্দান্ত ঘোড়া সওয়ার।’

বিশ্বব্যাপ্ত মিশরীয় ঔপন্যাসিক নাজিব কিলানীর বাংলা ভাষায় অনূদিত দ্বিতীয় বই এটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবদুল মাবুদ অনূদিত তাঁর প্রথম বইটির বাংলা নাম ছিল-‘আব্দুল্লাহর পথের সৈনিক’।

মুজাহিদের তলোয়ার- নসীম হিজাজী, অনুবাদ আবদুল খালেক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬, ৩য় প্রকাশ : ২০০৮, প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম, দাম: ১৮০.০০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৩৮৫।

বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকের কাছে নসীম হিজাজীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। উর্দু কথা সাহিত্যে ইসলামের ইতিহাসের সফল রূপকার নসীম হিজাজীর প্রতিটি উপন্যাসই যেন ইসলামের এক একটি পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা। সেই নসীম হিজাজীর ‘ইউসুফ বিন তাসফীন’ নামক উপন্যাসের বাংলা নাম দেয়া হয়েছে ‘মুজাহিদের তলোয়ার’। বইটি অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক মরহুম আবদুল খালেক।

ভারত যখন ভাঙলো- নসীম হিজাজী, অনু: আবদুল মান্নান তালিব

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০০২, দ্বিতীয় প্রকাশ: ২০০৮, প্রচ্ছদ: গোলাম মোহাম্মদ, দাম: ২০০.০০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৩৯৬।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তখনো ভাইসরয় আর পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীসহ সারা ভারত জুড়ে তখনো চলছিল সহিংস দেবীর পূজারী গুণাদের রাজত্ব। এ সময় অহিংসার দেবতার প্রধান সহযোগী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন রাজ প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে খুনের তুফান প্রত্যক্ষ করছিলেন আর ইবলিস তার কানে কানে বলছিল, আমি এ দুনিয়ার বহু মানুষের রূপ ধরে এসেছি। তাদের বাগানে বহবার আন্তন লাগিয়েছি। সমরকন্দ ও বুখারায় চেংগিজ খানের রূপ ধরে নাযিল হয়েছি। বাগদাদে এসেছি হালাকু খানের বেশে। কিন্তু তুই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ভারত বিভাগের সময় উপমহাদেশ জুড়ে মুসলিম নিধনের যে তান্ডবলীলা চলেছিল তারই লোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে রচিত নসীম হিজাজীর অনবদ্য উপন্যাস ‘ভারত যখন ভাঙলো’।

প্রত্যয়ের সূর্যোদয়- নসীম হিজাজী, অনুবাদ: আবদুল মান্নান তালিব

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০৩, দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন ২০০৮, প্রচ্ছদ: গোলাম সাকলায়েন, দাম: ১৮০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৩৬৬।

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান কালের মুসলিম-হিন্দুর রাজনৈতিক সংঘাত এবং তার সাথে শিখদেরও জড়িত থাকা আর এই সাথে এসে গেছে অপরিহার্যভাবে কাশ্মীর সমস্যা এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের কাশ্মীরের প্রথম জিহাদ। হিন্দু ও শিখ চক্রান্তের মুখোমুখি হয়ে লাঞ্ছিত নিরপরাধ মুসলমানের জীবনাবসান ঘটেছে। পথে হাজার হাজার মুসলমান নিরোক্ত হয়ে বিন্মুতির অতলে তলিয়ে গেছে। তাই লেখক এর নাম দিয়েছেন ‘গুম গুদা কাফেলা’ অর্থাৎ যে কাফেলা গন্তব্যে পৌঁছার

আগে পথেই হারিয়ে গেছে। কিন্তু কাশ্মীরের জিহাদ মুসলমানদের মনে যে নতুন প্রত্যয়ের জন্ম দেয় তারই ভিত্তিতে বাংলায় এর নাককরণ করা হয়েছে ‘প্রত্যয়ের সূর্যোদয়’।

অপরাজিত- নসীম হিজাজী, অনুবাদক: আবদুল মান্নান তালিব

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৩, প্রচ্ছদ; ফরিদী নূ‘মান, দাম: ১৬০.০০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই, পৃ. ৩৬৮।

‘আল্লাহ আমার হাতে কলম দিয়েছেন এবং আমি আমার সম সময়েরও অনেক দূরে দেখতে পাই। আমি পূর্ণ গুরুত্ব ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লামা ইকবালের সোনালী স্বপ্নের তাবির লিখে যেতে থাকবো। যখন আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আমার হাত থেকে কলম পড়ে যাবে তখন এ দুনিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস নেবার সময় আমি পরম প্রশান্তি অনুভব করতে পারবো এই ভেবে যে, আমার জীবনের পবিত্র মিশন পূর্ণ করার কাজে আমি আমার দেহ-মন-মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে পেরেছি।’ হ্যাঁ ‘নসীম হিজাজীর এ বক্তব্য থেকেই বুঝা যায় এ শক্তিদ্র উপন্যাসিক তার সমস্ত ধীশক্তি দিয়েই এ উপন্যাস রচনা করেছেন।

সাইমুম সিরিজ

আবুল আসাদ সাহেবের বয়স তখন কত হবে- ২৫ বছর বা বেশি হলে ৩০ বছর। টগবগে তরুণ। তিনি ইচ্ছে করলেন বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী তথা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেবেন-হাসতে হাসতে, গল্পের ছলে, কথার ছলে। রহস্য-রোমাঞ্চ এমনিতেই সব বয়সেই মানুষকে আলোড়িত করে, আকৃষ্ট করে। তিনি দেখলেন আমাদের দেশের মানুষ দস্যু মোহন, দস্যু বনহর, কুয়াশা, মাসুদ রানা সেবা প্রকাশিনীর অন্যান্য বইগুলো গো-গ্রাসে পড়ছে। যদি ঠিক এমনি রহস্য-রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে মুসলিম দুনিয়ার কথা তুলে ধরা যায়, যদি বিভিন্ন অমুসলিম দেশে, বিভিন্ন দ্বীপদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে-থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা, নির্যাতিত মুসলিম নারী-পুরুষের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সমাজ-সংস্কৃতির কথা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর কথা, জীবন যাপন প্রণালী প্রভৃতি নানা বিষয় তুলে ধরা যায় তাতে কতই না ভাল হয়। এসব কল্যাণকর চিন্তা থেকেই তিনি হাতে কলম তুলে নেন।

আবুল আসাদ এখন পরিণত বয়সের একজন সাংবাদিক। তিনি দীর্ঘকাল ধরে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইতোমধ্যে তিনি ‘কালো পঁচিশের আগে ও পরে’, ‘একশো বছরের রাজনীতি’ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাইমুম সিরিজ হালকা মেজাজের বই-সাহিত্য মান বা গবেষণার দৃষ্টিতে দেখলে এসব বইয়ের তেমন কোন মূল্য নেই বললেই চলে। কিন্তু পাঠক সৃষ্টির ক্ষেত্রে, যে কোন বক্তব্য পৌছানোর ক্ষেত্রে এসব বইয়ের জুড়ি নেই। কারণ এর পাঠকরা আম-জনতা। এসব লেখায় সাহিত্যমান আছে কি নেই, শিল্পসম্মত কিনা এর পাঠকরা তা খুব একটা তলিয়ে দেখেন না। তারা দেখেন ঘটনা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, নায়ক-নায়িকার বিপদে আপদে তারা টেনশন ফিল করছে কি না।

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় সাইমুম সিরিজের প্রথম বই আপারেশন তেলআবিব-১ এবং অপারেশন তেল আবীব-২। সেই যাত্রা শুরু- এরপর অনেক চড়াই উত্থায় পেরিয়ে এ সিরিজের বই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯-এ। অনেকে হয়ত বলবেন ৩৫ বছরে ৪৯ টি বই এ আবার এমন কি। হয়ত তাই। কিন্তু যারা লেখক তারা জানেন এটা কতবড় কঠিন কাজ, কতবড় সাফল্য। আবুল আসাদ সাহেব এখনও যে সাইমুম সিরিজ লেখা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন এ সত্যি বিশ্বাসের ব্যাপার।

সাইমুম সিরিজের সাফল্য যে-এ সিরিজের কারণে হাজার হাজার পাঠক সৃষ্টি হয়েছে। হাজারো তরুণ-তরুণী এ সিরিজ পড়ে ইসলামের পাতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে এবং নিজেকে সে হিসেবে গড়ে তুলেছে।

সাইমুম সিরিজের পদাংক অনুসরণ করে একই ধাচের আরও কয়েকটি সিরিজ বের হয়েছে-যদিও এর কোনটিই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।

সাইমুম সিরিজের ১ম খণ্ড অপারেশন তেল আবীব-১ প্রথম প্রকাশ প্রকাশ ১৯৭৬ এং দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮০ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদের জনক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে। অপারেশন তেলআবিব-২ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৬ সালে ও তৃতীয় খণ্ড মিন্দানাওয়ের বন্দী ১৯৭৭ সালে ওই ইসলামিক সেন্টারই প্রথম প্রকাশ করে। এরপর এ ৩টি খণ্ড সহ সব খণ্ডই বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য যে এর সব খণ্ডই প্রথম প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে নিশেষ হয়ে যায়। আর এগুলো প্রায় প্রত্যেকটি খণ্ডেরই কয়েকটি প্রকাশ ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। কোন কোনটির তো নবম প্রকাশ পর্যন্ত হয়েছে। এই পর্যন্ত এ সিরিজের ৪৯টি বই প্রকাশ হয়েছে।

সাইন্স ফিকশন

বর্তমানে সাইন্স ফিকশন তরুণ পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয়। অনেক বিষয়ই আমাদের কাছে অবিস্বাস্য মনে হলেও বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় তা সত্য। এ রকম চমকপ্রদ ঘটনা নিয়েই গড়ে ওঠে সাইন্স ফিকশন-এর শরীর।

বিজ্ঞানমনস্ক লেখক যেভাবে লেখা গুলো গড়ে-পিটে তৈরি করে পাঠককে উপহার দেন-পাঠক তাইই পড়েন। সে কারণেই হয়ত জনপ্রিয় এ বিভাগটি বেছে নিয়েছে সাহিত্য পরিষদ অর্থাৎ কিনা সাইন্স ফিকশনের মাধ্যমে পাঠককে ইসলামমুখি করা আত্মাহুমুখি করা। এ সিরিজের ১টি মাত্র বই বের হয়েছে - টাইম জিনের তেলসমাতি।

সাইন্স ফিকশান-১, টাইম জিনের তেলসমাতি-হাসান আলীম, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর: ২০০৪, প্রচ্ছদ: ফরিদী নূ'মান, দাম: ১৫ টাকা মাত্র, পেপার ব্যাক, সাদা কাগজ, পৃ. ৬২।

জীবন জাগার গান

কিশোর পাঠকদের জন্য সাহিত্য পরিষদ 'জীবন জাগার গান' নামে একটি সিরিজ প্রকাশ করা শুরু করেছে। এতে সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে. তাবেয়ী বা পরবর্তীকালের মুসলমানদের মধ্যে যারা ইসলামের বাণী সমুন্নত রাখায় জন্য নানাভাবে কৌশল করেছেন, নানাভাবে নিজেদেরকে এ পথে বিলিয়ে দিয়েছেন, গায়ী বা শহীদ হয়েছেন তাঁদের কীর্তিগাথাকে সম্বল করে এ সিরিজের বইগুলো রচিত। এ সিরিজের প্রথম বই মোশাররফ হোসেন খানের- কিশোর-কমাণ্ডার। এতে বেশ কয়েকজন সাহাবীর জীবনের আকর্ষণীয় ঘটনা লেখক সহজ-সরল অথচ আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে এনেছেন।

জীবন জাগার গল্প-১, কিশোর কমাণ্ডার- মোশাররফ হোসেন খান, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০০৫, দাম: কুড়ি টাকা মাত্র: প্রচ্ছদ: ফরিদী নূ'মান, পেপার ব্যাক, সাদা, পৃ. ৬৪।

কাশ্মীর

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর এখন অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কাশ্মীর স্বাধিকার আন্দোলন থেকে বিরত হয়নি, বিদ্রোহ হয়নি। সেই সংক্রান্ত ঘটনার সাহিত্য রূপ হচ্ছে কাশ্মীর সিরিজ। এ সিরিজে দু'জন লেখকের ৯টি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। কাশ্মীরেরই অংশ-যেটি পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল, যাকে আজাদ কাশ্মীর বলে সেই আজাদ কাশ্মীদের প্রখ্যাত লেখিকা সায়েমা সিদ্দিকী'র রচনা ৩টি খণ্ড, অনুবাদ করেছেন ওয়ারেসুল হক। পাকিস্তানের জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ লেখক, ঔপন্যাসিক এ. হামিদের কাশ্মীর বিষয়ক ৬টি খণ্ড ও অনুবাদ করা হয়েছে। কাশ্মীর জেহাদ সিরিজের বই গুলোর অনুবাদ প্রকাশ করে সাহিত্য পরিষদ সত্যিই একটি বড় দায়িত্ব পালন করেছে বলে মনে করি।

ইসলাম প্রচার সিরিজ

বাংলা সাহিত্য পরিষদের মূলমন্ত্র সাহিত্যকে বাহন করে ইসলাম প্রচার। এ জন্য এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সব বইয়ের ভেতরগত যে দর্শন তা কিন্তু ইসলামের শাস্ত্রত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা। তা কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রিলার, ছড়া যাই বলি না কেন। এবার সরাসরি বাসাপ ইসলাম প্রচার সিরিজ নামে একটি ধারাবাহিক সিরিজ প্রকাশ করা শুরু করেছে। শুরুতেই এ সিরিজের তিনটি বই বের হয়েছে—খুন রাঙা প্রান্তর— জামান সাদী, দুই সুলতান— জামান সাদী, এবং শাহাজালালের জায়নামায আবদুল হালিম খাঁ। প্রভাতে সূর্যের অবস্থা দেখে যেমন দিনটি কেমন যাবে তা আন্দাজ করা যায় এ দুটি বই দেখেও তেমনি বুঝা যায় এ সিরিজের লেখক হবেন অনেকেই। গল্পের মাধ্যমে ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম উম্মাহর ঘটে যাওয়া নানা বিষয় তরুণ তথা সব পাঠকের সামনে তুলে ধরা এ সিরিজের মূল কাজ।

চমৎকার আইডিয়া। বাসাপ কতৃপক্ষ যদি আন্তরিকতার সাথে একাজটি করতে পারেন তবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বইরের প্রচ্ছদ ও গেটআপ মেকআপ আরও আকর্ষণীয় হতে হবে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনায় একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন ‘বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’ প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে এর প্রথম সংখ্যা, ২০০৮ সালের জানুয়ারীতে এর দ্বিতীয় সংখ্যা এবং ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। টাউস আকৃতির এ সাহিত্য সংকলন সমৃদ্ধ ও সু-সম্পাদিত। তবে এখানে আমাদের বক্তব্য হলো—সংকলনগুলো এতো টাউস আকৃতির না করে যদি-ত্রৈমাসিক অথবা ষান্মাসিক তাও যদি সম্ভব না হয় বার্ষিক একটা সংখ্যা পরিকল্পিত ভাবে প্রকাশ করতে পারলে ভাল হয়। আশা করি বাসাপ কতৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

উপসংহারে বলতে চাই সাহিত্য পরিষদ শুরুতে যে কর্মসূচী নিয়েছিল সবক্ষেত্রে তা শতভাগ বাস্তবায়ন করতে না পারলেও প্রকাশনা ক্ষেত্রে মোটামুটি সেটা পেরেছে। এমনিতে সাহিত্য সংগঠনগুলো সাধারণত স্বল্পায়ু হয়ে থাকে। সেখানে বাংলা সাহিত্য পরিষদ সাড়ম্বরে ২৫ বছর উদযাপন করছে এটাও কম পাওয়া নয়। তাছাড়া পরিষদের সব কর্মসূচীই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে কমবেশী বাস্তবায়ন হয়েছে এবং হচ্ছে। আশা করা যায় ২৫ বছর পূর্তি উৎসব পালনের পর পরিষদের কাজ আরো গতি পাবে। মূল লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের পঁচিশ বছর

খালিদ সাইফ



ইউরোপীয় রেনেসাঁ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের উত্থানের পর থেকে বিশ্বের অন্যান্য বিষয়ের মতো সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ভূগোলে ঘটে এক বিরাট পরিবর্তন। ইউরো-কেন্দ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ঘরানা পৃথিবীব্যাপী যত বিস্তৃত হয়েছে ততই বেড়েছে এই ভূগোলের পরিধি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত উন্নত হয়েছে ততই প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে গেছে এর আধিপত্য ও প্রভাব। এখন তো অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে এককেন্দ্রিকের মতো। জীবনের আর সকল দিক ও বিভাগের মতো সাহিত্যও এই প্রভাব বলয়ের আওতামুক্ত নয়। বড় মাছের ছোট মাছকে গিলে খাওয়ার মতো, ছোট সংস্কৃতি বড় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হবার মতো, অপেক্ষাকৃত উন্নত সাহিত্য কম-উন্নত সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এভাবে প্রভাবিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত—সত্য ও সুন্দরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটা দোষেরও কিছু নয়, ভালো প্রভাবে উৎকর্ষই বৃদ্ধি হয়, তাই এই প্রভাব একান্ত জরুরি। কিন্তু সব প্রভাব নয়, কিছু প্রভাব আছে বিধ্বংসী—যা তিলে তিলে ব্যক্তি সত্তা ও জাতিসত্তার পরিচয়কে সামনে থেকে মিলিয়ে দেয়। ব্যক্তি ও জীবনের উদ্দেশ্য থেকে স্বাধীন ব্যক্তি সত্তাকে নিয়ে যায় গোলকধাঁধার দিকে। ব্যক্তিও তখন আর নিজেকে নিজে চিনতে পারে না, অনেক ধরনের কৃত্রিম দেওয়াল আর বাধা তার সীমানাকে সংকুচিত কোরে তোলে। যে সমস্ত উৎস থেকে ব্যক্তি তার আত্মপরিচয়ের বর্ণাঢ্য আলো লাভ করতে পারত সেগুলোকে আর নিষ্কলুষ রাখা হয় না। অপপ্রচারের তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলা হয়, ব্যক্তি তখন সেটা সম্পর্কে লাভ করে বিকৃত ধারণা। বিষয়টির ব্যাপারে সঠিক কিছু জানা তখন আর ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় হয়ে ওঠে না।

এতক্ষণ যে কথাগুলো বলা হলো তা বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনের একটি সার্বিক পরিস্থিতি। অবশ্য এ পরিস্থিতিকে জীবনের অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে মেলালে খুব একটা ভিন্নতা হয়ত সেখানেও দেখা যাবে না। মোট কথা হলো বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাইরের প্রভাব বলয়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। এ প্রভাব দুর্বল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতি সবল সাহিত্য-সংস্কৃতির চরম আঘাত। সে-আঘাতে তিলে তিলে জাতির মানসিক ও কাঠামোগত দৃঢ়তাকে ক্ষয় করে ফেলা হচ্ছে। একটা জাতি যে মূল পরিচয়কে অবলম্বন করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পায় সেটাকে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশিদের জন্য সেই পরিচয়ের বিষয়টি ইসলাম। তাই মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে দূরে সরিয়ে

রাখার জন্য শুরু থেকে তৈরি করা হয়েছে প্রজেক্ট। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে এই প্রচারণায় মূল হাতিয়ার হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে এবং চব্বিশ ঘণ্টা নিরলসভাবে প্রচারণা চলেছে।

অবশ্য সারা বিশ্বের চিত্র বাদ দিয়ে শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একে দেখলে সেটা খণ্ডিতভাবে দেখা হবে। সেভাবে দেখলে প্রজেক্টের গুরুত্ব ও বিপুল তাৎপর্য খাটো হয়ে পড়ে। আত্মসনের কোন সমুদ্রের মধ্যে কিভাবে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে সেটা না দেখলে অনুধাবন করা যাবে না এবং অনুধাবন করতে না পারলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কিভাবে নেওয়া হবে?

বাংলা সাহিত্য পরিষদের জন্য

এই প্রশ্ন সামনে রেখে একত্রিত হয়েছিলেন কিছু ঐতিহ্য সচেতন মানুষ। তারা দেখছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে যে-চর্চার বন্যা বয়ে যাচ্ছে তা আমাদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তার পরিপন্থি। শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম হিসেবে যে-সমস্ত বিষয় গণমানুষের সামনে আনা হচ্ছে তার সাথে ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। অপর জিনিসকে আপন জিনিস বলে প্রচার করে সেটাকেই জনগণের মধ্যে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেললেন তারা ভাবলেন একটা কিছু করা প্রয়োজন। সেই চিন্তা থেকে শুরু হলো তাদের সাহিত্য- কেন্দ্রিক তৎপরতা। সেটাকে আরও প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্যই গড়ে তোলা হয় বাংলা সাহিত্য পরিষদ। রেকর্ডপঞ্জি যেভাবে বাংলা সাহিত্য পরিষদের যে জনের কথা ঘোষণা করেছে তা এই: ০৩.০৩. ১৯৮৩ ঈসাব্দী (১৮,১২, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) বিকেল ৫:৩০ মিনিটে ৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোডে কতিপয় সাহিত্যমোদী ব্যক্তির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির হয়:

(ক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন।

(খ) ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম প্রকাশনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

(গ) বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা।

(ঘ) সাহিত্য সভা ও কবি-সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠান।

(ঙ) সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনা।

(চ) ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য পুরস্কার প্রদান।

সভায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়:

ক. আবুল আসাদ, সভাপতি

খ. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, পরিচালক

গ. আবদুল মান্নান তালিব, সদস্য

ঘ. জামেদ আলী, সদস্য

ঙ. সিদ্দিক জামাল, সদস্য

চ. মাসুদ আলী, সদস্য

ছ. মতিউর রহমান মল্লিক, সদস্য

পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী সভায় ২৪.৩.১৯৮৩ বাংলা সাহিত্য পরিষদের খসড়া গঠনতন্ত্র গৃহীত নয়।

এভাবে হাঁটিহাটি পাপা করে এগিয়েছে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই দৈনিক সংস্থামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ সাহেব এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আজ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠা-লগ্নে এই সংস্থার পরিচালক ছিলেন জনাব এ. কে. এম. নাজির আহমদ। যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক। ইনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন একেবারে সূচনা থেকে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর জনাব আবদুল মান্নান তালিব ২৭. ১০. ১৯৮৮ তারিখে বাংলা সাহিত্য পরিষদের নতুন পরিচালক নির্বাচিত হন এবং এখন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের যাত্রা শুরু থেকে নিয়মিত প্রতি ২ বছর অন্তর পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সময় থেকে প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক: সংগঠক। বিভিন্ন সময় যারা পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন বা আছেন তাদের নামের তালিকা এরকম-আবুল আসাদ, আবদুল মান্নান তালিব, এ. কে. এম. নাজির আহমদ, জামেদ আলী, সিদ্দিক জামাল, মাসুদ আলী, মতিউর রহমান মল্লিক, সোলায়মান আহসান, আসাদ বিন হাফিজ, আবদুল কাদের মোস্তা, মাহবুবুল হক, ফজলে আজিম, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, হাসান আবদুল কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, জয়নুল আবেদীন আজাদ, হামিদুল ইসলাম, খন্দকার আবদুল মোমেন, মুহম্মদ মতিউর রহমান, সাজ্জাদ হোসাইন খান, সাইফুল্লাহ মানছুর, বদরে আলম ও মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম স.ম. রফিক, ড. হুমায়ুন কবীর, প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলা সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে এর গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, 'ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ।' (দ্রষ্টব্য : গঠনতন্ত্র ; ২য় সংস্করণ ১৯৯৫)। ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্যের আলোকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের এই লালন ও বিকাশ আজ সারা পৃথিবী জুড়ে দরকার। কারণ তাগতি চিন্তা ও অপসংস্কৃতির প্রধান স্রোত সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রবেশ করে

ব্যক্তির চেতনালোকে, পচন ধরায় ব্যক্তির মগজে। তৌহিদভিত্তিক কল্যাণময় জীবনচর্চা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এক উদ্ভাস্ত প্রান্তরে। সারা পৃথিবীর সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল প্রবাহে আজ যখন এই প্রবণতা প্রচণ্ড, তখন তার প্রবাহকে সুস্থ, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে ফেরানোটা কঠিন বটে কিন্তু অসম্ভব নয়।

কাজটা কঠিন কোনো সন্দেহ নেই, পরিকল্পনার আলোকে কাজ করার জন্য দরকার দীর্ঘ সময়। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিশ্বাসের আলোয় ঝলমল, বুদ্ধি ও মেধায় অতুলনীয়, প্রচণ্ড পরিশ্রমী ও সৃষ্টিশীল একঝাঁক লেখকের। লেখাটা হবে যাদের জীবনের একটি বিপ্লবী কর্ম। যাদের লেখা পড়ে মানুষের অসং চিন্তা মস্তিষ্কের কোটর ছেড়ে পালাবে; করবে তরতাজা চিন্তার চাষ যা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থের প্রভাবে থাকবে দীপ্তিমান। উদ্দেশ্য ছিল গঠিত হয়ে এমন লেখকদের পৃষ্ঠপোষক হবে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। সে কাজটিই তার প্রতিষ্ঠা কাল থেকে করে আসছে এ প্রতিষ্ঠান। যদিও যতটা সবলতার সঙ্গে এগিয়ে যাবার কথা ছিল সেভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে নি বাংলা সাহিত্য পরিষদ।

স্থায়ী কর্মসূচী

এ সংস্থা নির্দিষ্ট কিছু কাজকে তার প্রধান পালনীয় কর্তব্য বলে স্থির করেছে। এ কর্তব্যগুলোকেই প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে সে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কর্মপরিষদের সভার কথা উল্লেখের সময় যদিও এ কথাগুলি একবার উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু যেহেতু ভাষা কিছুটা পরিবর্তন করে সে কথাগুলিই গঠনতন্ত্রে স্থান পেয়েছে তাই সেগুলোর উল্লেখ জরুরি:

- (ক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন।
- (খ) কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা।
- (গ) সাহিত্য সভা, সাহিত্য সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজন।
- (ঘ) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান।
- (ঙ) সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন।
- (চ) সাহিত্যকর্ম প্রকাশনা।
- (ছ) সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনা।
- (জ) বিভিন্ন জাতীয় ও ঐতিহাসিক দিবস পালন এবং বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের স্মরণসভা আয়োজন।
- (ঝ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- (ঞ) দুঃস্থ কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের সাহায্য ও পুনর্বাসন।

এই কর্মসূচির আলোকেই বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৩ সাল থেকে এই ২০১০ সাল পর্যন্ত কেটে গেছে মোট সাতাশটি বছর। যদিও সাতাশ বছর কালের বিচারে কোনো বড় সময় নয়। তবুও সেটাকে কম সময়ও

বলা যাবে না। সুষ্ঠু পরিকল্পনার আলোকে কাজ করলে এই সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু করা সম্ভব। এই সময় পর্বে বাংলা সাহিত্য পরিষদের কাজ যদিও অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে একদম শূন্য অবস্থা থেকে শুরু করা এ সংস্থার কাজ একেবারে নগন্য নয়। কাজ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে এ সংস্থাটি ইতিমধ্যেই আলাদা যাত্রা অর্জন করেছে।

(ক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন: এই শিরোনামটি পড়ার পর অনেকের মনে হতে পারে ‘সঠিক ইতিহাস’ আসলে কী? তাহলে এতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা-সাহিত্যের যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সে ইতিহাস কি সঠিক ইতিহাস নয়? এ প্রশ্নটির উত্তর ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ যেটিই হোক না কেন প্রশ্নটি বিতর্ক তৈরি করে। আসলে ইতিহাস প্রণয়নের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার জন্য। বাংলা সাহিত্যের অনেক ইতিহাসগ্রন্থেই ইতিহাস চর্চার বস্তুনিরপেক্ষ অবস্থান লঙ্ঘন করা হয়েছে। সে-সব ইতিহাসের অজস্র বক্তব্যে প্রবেশ করেছেন ঐতিহাসিক স্বয়ং। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিগত মানদণ্ড দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন ঘটনা। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস-বিশ্লেষণে ব্যবহার হতেই পারে, সেটা কোনো সমস্যা নয়, কিন্তু সমস্যা তখনই সৃষ্টি করে যখন সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ না হয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। তখনই ইতিহাসের নামে রচিত হয় অপ-ইতিহাস। সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন – বক্তব্য দ্বারা ইতিহাস চর্চার এ বিষয়টিকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ অবশ্য নতুন করে সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন করতে পারেনি, তবে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে যে-দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে তা চিন্তার অনেক উপাদান সরবরাহ করে। ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

(খ) কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা: স্থায়ী কর্মসূচীর ভেতরের এই ধারাটি মনে হয় অবহেলায় পড়ে আছে। সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনায় উদ্যোগী কর্মসূচী হাতে নিলেই লেখকদের অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে।

(গ) সাহিত্য সভা, সাহিত্য সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজন: সাহিত্য সভা আয়োজনের ব্যাপারে বাংলা সাহিত্য পরিষদ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবিদার। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থাটি প্রতি ইংরেজি মাসের দশ তারিখে সাহিত্য সভা আয়োজন করে থাকে। এপর্যন্ত প্রায় ২৯১টি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; সাহিত্য সভাগুলোতে নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রত্যেক সাহিত্য সভাতেই আমন্ত্রিত মেহমান থাকেন। তারা পঠিত লেখার ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং লেখাগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন সেগুলো কেন দুর্বল কিংবা উত্তীর্ণমানের।

প্রতি মাসের দশ তারিখের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন তরুণ ও উদীয়মান সাহিত্যিকরা। বাংলা সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য সভা শুধু সাহিত্য সভাই নয় তা এক মিলন মেলাও বটে। চেনা-অচেনা মুখগুলির মাঝে এক সময় তৈরি হয় সেতুবন্ধন। পরবর্তীতে এরাই যুক্ত হয়ে পড়েন বাংলা সাহিত্যের স্রোতধারায়। বাংলা সাহিত্য পরিষদ কেবল সাহিত্য সভাই নয় সাহিত্য-সংস্কৃতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করে। সংস্থাটি এ পর্যন্ত চারটি জাতীয় পর্যায়ে সম্মেলনের আয়োজন করেছে। প্রথম সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। ঢাকার বেইলি রোডের গাইড হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক দিনব্যাপী এই সম্মেলন। সেই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব। অনুষ্ঠানে ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিধারা, বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি আফজাল চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক ও বাংলাদেশের প্রধান বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আলী আহসান। আলোচক ছিলেন শাহেদ আলী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সানাউল্লাহ নূরী, আল মাহমুদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, জামেদ আলী ও মতিউর রহমান মল্লিক। এটা ছিল অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন; এরপর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকেল তিনটায়। এ অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল ‘বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব’। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুস সাত্তার ও আলোচনা করেছিলেন কবি আফজাল চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও জয়নুল আবেদীন আজাদ। এরপর তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বাদ মাগরিব। এটি ছিল কবিতা পাঠের আসর। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ। সমাপ্তি অধিবেশনে কাজী নজরুল ইসলামের ‘আনোয়ার’ কবিতার নাট্যরূপ মঞ্চায়িত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন আবু মুস্তাফিজ। আবৃত্তি করেন ওবায়দুল হক সরকার। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আবুল আসাদ। সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

১. দুই বাংলার বইয়ের সমতা ভিত্তিক বাণিজ্যিক লেনদেন নিশ্চিত করতে হবে।
২. জাতীয় প্রকাশনাকে প্রয়োজনে প্রোটেকশন প্রদান করতে হবে।
৩. কবি-সাহিত্যিক ও প্রকৃত প্রকাশকদের স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের কাগজ সরবারহ করতে হবে।
৪. দুঃস্থ কবিদের ভাতা দ্বিগুণ করতে হবে।
৫. ঢাকাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
৬. ভিডিও ক্লাবের ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করতে হবে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসের ৯ ও ১০ তারিখে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেইলি রোডের গাইড হাউস মিলনায়তনে— দুই দিনব্যাপী।

কর্মসূচী ছিল, প্রথম দিন : সম্মেলন উদ্বোধন করেন কথাশিল্পী আবু রুশদ। স্বাগত ভাষণ দেন আবুল আসাদ। প্রথম অধিবেশনে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বিষয় ছিল সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা।’ প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবদুর রশীদ খান। আলোচক ছিলেন কবি আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ফারুক মাহমুদ, মোশাররফ হোসেন খান, হাসান আলীম, বুলবুল সরওয়ার ও সালাহউদ্দীন আইয়ুব। দ্বিতীয় দিনেও প্রথম অধিবেশনে ছিল সেমিনার। সেমিনারে ‘আমাদের সংস্কৃতি : বর্তমান প্রেক্ষাপট’ শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল আসাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সানাউল্লাহ নূরী ও প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিকদেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। আলোচনা করেন আসকার ইবনে শাইখ, আখতার-উল-আলম, ওবায়দুল হক সরকার, আল মুজাহিদী, মাহবুব আনাম, সবিহ-উল-আলম, সোলায়মান আহসান ও আসাদ বিন হাফিজ। দ্বিতীয় অধিবেশন বসে বিকাল তিনটায় এবং সেটি ছিল কবিতা পাঠের আসর। এতে সভাপতিত্ব করেন কবি আবদুস সাত্তার ও প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আল মাহমুদ।

সমাপ্তি অধিবেশন বসে সন্ধ্যা ৬ টায়। এতে মঞ্চস্থ হয় ‘প্রতিদিনের প্রতিধ্বনি’ নাটক। নাটকটি পরিচালনা করেন চৌধুরী গোলাম মাওলা। চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন সবিহ-উল-আলম, ইব্রাহীম মন্ডল, মোমিনউদ্দীন খালেদ ও ফরিদী নোমান। আবদুল মান্নান তালিবের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় সম্মেলন হয় ১৯৯১ সালের ৭ ও ৮ নভেম্বরে। গাইড হাউস মিলায়তনে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন। প্রথম দিন ৭ নভেম্বর বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও সভাপতি ছিলেন আবুল আসাদ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাহিত্য সংগঠক, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ জনাব আবদুল মান্নান তালিব। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য-বিষয়ক সেমিনার। সেমিনারে ‘সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য’ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান তালিব। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী ও প্রধান অতিথি গল্পকার শাহেদ আলী। আলোচনা করেন কবি আল মাহমুদ, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, ড. সিরাজুল ইসলাম, হাসান আলীম, মোশাররফ হোসেন খান ও আসাদ বিন হাফিজ।

দ্বিতীয় দিন সভা শুরু হয় সকাল নয়টায়। প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সাংস্কৃতিক সেমিনার দিয়ে। ‘বাংলাদেশের বহমান সংস্কৃতিধারা’ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আসকার ইবনে শাইখ। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন

যথাক্রমে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও ড. সৈয়দ আলী আশরাফ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবি আবদুস সাত্তার, আবুল আসাদ, ওবায়দুল হক সরকার, আল মুজাহিদী, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ডা. মোহাম্মদ মোরশেদ আলী, জয়নুল আবেদীন আজাদ ও সোলায়মান আহসান।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল চারটায়। এ অধিবেশনে গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে যাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয় তারা হলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ড. এম আবদুল কাদের, কবি তালিম হোসেন, আবু রুশ্দ, সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, কবি আবুল হোসেন, আসকার ইবনে শাইখ, মিন্নাত আলী, কবি আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ও অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালেব। সম্বর্ধিত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয় একটি মানপত্র, একটি ক্রেস্ট, একসেট বই এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের ১৩, ১৪, ও ১৫ জুন গাইড হাউস মিলনায়তনে। ১৩ জুন শুক্রবার সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান ও প্রধান অতিথি ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জনাব আবুল আসাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মাহবুবুল হক।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বাদ জুমা ৩টা ৩০ মিনিটে। এ অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। এতে ‘স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্য আন্দোলন : প্রেক্ষিত আমাদের ঐতিহ্য’ শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শাহেদ আলী ও প্রধান অতিথি ছিলেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ। সভার আলোচনা করেন কথাশিল্পী জনাব আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, ড. আবুল হাসান শামসুদ্দীন, কবি আফজাল চৌধুরী, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন ও জনাব আমিরুল ইসলাম। ৭টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশন। এতে ‘আধুনিক কবিতা : বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত’ নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. হুমায়ুন কবীর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি আল মাহমুদ ও প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ড. আলী আশরাফ ও কবি ফজল শাহাবুদ্দীন আর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, রফিক নওশাদ, সাজ্জাদ কাদির ও মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন সম্মানিত আলোচক।

১৪ জুন শনিবার সকাল ৯ টায় অনুষ্ঠিত হয় কবিতা পাঠের আসর। এপর্বে সভাপতিত্ব করেন কবি আফজাল চৌধুরী এবং অতিথিদ্বয় ছিলেন আল মাহমুদ ও

আল মুজাহিদী। অনুষ্ঠানে দেশের অসংখ্য প্রবীণ ও নবীন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

এদিনই বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় গুণীজন সম্বর্ধনা। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন শাখা ও উপশাখায় ১২ জনকে তাদের সৃজনশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়। সম্মানিত গুণীজনরা হলেন ১. আল মাহমুদ (কবিতা), ২. এম. আকবর আলী (বিজ্ঞান প্রবন্ধ), ৩. জনাব সানাউল্লাহ নূরী (সাংবাদিকতা), ৪. ড. এবনে গোলাম সামাদ (মননশীল প্রবন্ধ), ৫. আতিকুল হক চৌধুরী (নাটক), ৬. ড. মঈন উদ্দীন আহমদ খান (ইতিহাস গবেষণা), ৭. মাওলানা ওবায়দুল হক (ইলম ও ফিকহ চর্চা) ৮. ওবায়দুল হক সরকার (অভিনয়), ৯. সোহরাব হোসেন (সংগীত), ১০. কবি জাহানারা আরজু (কবিতা), ১১. ড. মালিহা খাতুন ও ১২. মাফরুহা চৌধুরী (কথাসাহিত্য)।

একই দিন ৭ টা ১৫ মিনিটে ‘আমাদের সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা’ নামে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আবদুল গফুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সানাউল্লাহ নূরী ও প্রধান অতিথি ছিলেন ড. এমাজউদ্দিন আহমদ। আলোচক হিসেবে ছিলেন জনাব ওবায়দুল হক সরকার, এ. কে. এম নাজির আহমদ, রুহুল আমীন খান, ড. আবদুল লতিফ মাসুম, জয়নুল আবেদীন আজাদ, আবদুল হাই শিকদার ও স. ম. রফিক।

১৫ তারিখ রবিবার সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সমাবেশ। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আবুল আসাদ। আলোচনা রাখেন জনাব মাহবুবুল হক, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, মতিউর রহমান মল্লিক, খন্দকার আবদুল মোমেন, স. ম. রফিক, ড. হুমায়ুন কবীর, সোলায়মান আহসান, আমিরুল ইসলাম, হাসান আলীম, আসাদ বিন হাফিজ, মোশাররফ হোসেন খান ও কামাল আহমদ শিকদার।

শেষ দিন ৭ টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক। ‘প্রজ্ঞা প্রতীতি উন্নত করে গড়ে তোল সংহতি’ নামক গীতি আলেখ্য গ্রন্থনা করেন সাইফুল্লাহ মানছুর ও শরীফ বায়েজীদ মাহমুদ। ‘মুকুট ও তার অংশবিশেষ’ শিরোনামের একটি নাটকও মঞ্চস্থ হয় সেদিন। নাটকটি রচনা করেন আ স ম শাহরিয়ার ও নির্দেশনায় ছিলেন আবু হেনা আবিদ জাফর। এভাবে বাংলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজন করেছে মোট চারটি সাহিত্য সম্মেলন এবং এবং এই চারটি সম্মেলনই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি

বাংলা সাহিত্য পরিষদ গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের ইসলামীকরণ। সারা বিশ্ব জুড়েই বর্তমানে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তাতে তৌহিদবাদী চেতনার কোনো

স্বরূপ নেই; চিন্তা-চেতনায় প্রায় অধিকাংশ সাহিত্যই আধুনিক জাহিলিয়াতের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সাহিত্য ছাড়াও শিল্পের অন্য প্রায় সব শাখাতেই সমসাময়িক পৌত্তলিকতাইয় ভাবাত্মক। এখানে ‘পৌত্তলিক’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে কিংবা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তৌহিদি চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রতিটি চিন্তা ও মতবাদই পৌত্তলিকতা। ইসলামী সাহিত্যের সঙ্গে এই পৌত্তলিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলা সাহিত্য পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল সব ধরনের বাতিল চিন্তা-চেতনার বিদ্রোহ-শূন্য, তৌহিদি-চেতনাপূর্ণ ইসলামী সাহিত্য জাতিকে উপহার দেওয়া। এ কাজই তার গঠনপর্ব থেকে নিরলসভাবে করে যাচ্ছে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। এ দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায়, এসংস্থার জন্য বাংলা ভাষাভাষী জনগণের জন্য রহমতস্বরূপ।

ইসলামী সাহিত্য কী ও কেমন? এ সম্পর্কে এ অঞ্চলের মানুষের তেমন কোনো ধারণা ছিল না বললেই চলে। আমাদের যতদূর জানা, এ সম্পর্কে তেমন কোনো বইও বাংলা ভাষায় ছিল না। বাংলা সাহিত্য পরিষদই প্রথম এ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করে এবং সুসাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব ‘ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান’ নামক গ্রন্থ লিখে এ সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ করে তোলেন। জনাব তালিবের এই কাজটি সাহিত্যের ইসলামী করণের ক্ষেত্রে প্রথম মৌলিক অবদান।

সাহিত্যিক সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ

ইসলামী চেতনা সম্পন্ন সাহিত্যিকরা যাতে বের হয়ে আসতে পারে তার জন্য শুরু থেকেই ছিল বাংলা সাহিত্য পরিষদের নানা কর্মসূচী। বিভিন্ন দিবস উদযাপন। কবি লেখক বুদ্ধিজীবীদের উপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরোক্ষভাবে তরুণ লেখক কবিদের জন্য অনুপ্রেরণা ও প্রশিক্ষণের কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্য পরিষদ অনেক সময় সরাসরি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীরও আয়োজন করেছে। এ সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এরকমই একটি অনুষ্ঠান ছিল আবদুল মান্নান সৈয়দ কেন্দ্রিক সাহিত্য আড্ডা। সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি পরিষদে এসে মধ্যাহ্নী হয়ে বসতেন। তাকে ঘিরে ধরত একঝাঁক রাগী, জেদী ও মেধাবী তরুণ।

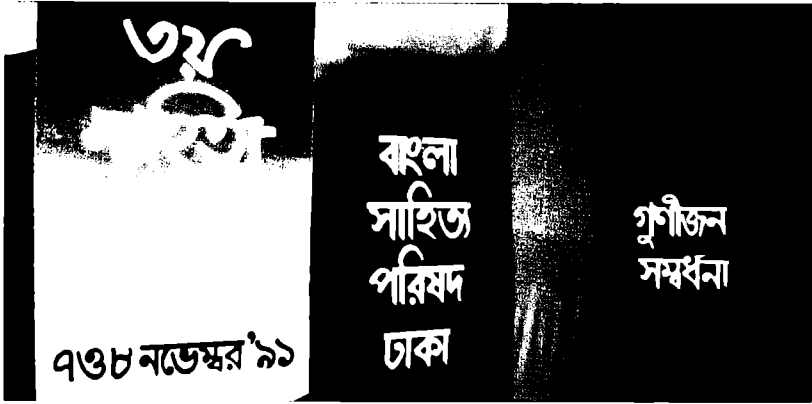
আবদুল মান্নান সৈয়দ তার অমৃত বচন মেলে ধরতেন আর সাহিত্যের জন্য পাগলপারা ঐ জ্ঞানপাত করা তরুণেরা তা গোত্রাসে গিলত। তাঁর হৃদয় শিক্ষণ আমাদের নতুন করে কবিতার পথে পথ চলা শিখিয়েছে। সবাইকে সাহিত্যের এক মনোমুগ্ধকর জগতে নিয়ে যেতেন সব্যসাচী এই লেখক। অধিকাংশ আড্ডাতেই নির্ধারিত কোনো বিষয় থাকত না। যে-কোনো একটা প্রসঙ্গ ধরেই শুরু হত আলোচনা। সেই আলোচনাতে ডুবে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতেন মান্নান সৈয়দ। নিজের জীবন, জীবনের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক, সাহিত্য নিয়ে তার নিজের উপলব্ধি- ইত্যাদি তিনি শেয়ার করতেন সেই আড্ডায়। তরুণদের কিভাবে

অনুপ্রাণিত করতে হয় সেই কৌশল বেশ ভালোই জানা ছিল তার। নিজের দেশ, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা। সেই আস্থাকেই তিনি সঞ্চার করে দেন তরুণদের ভেতর। ভালোবাসার কথা যেমন বলতেন তেমনি বলতেন ঘৃণার কথাও। কিন্তু অতি বড় মানুষের মতো বলতেন, এই আড্ডা থেকে বেরুনোর সাথে সাথে ভুলে যাবে একথাগুলো। যে সমস্ত কথা অমৃত সমান তা কী কখনও ভোলা যায়! নাকি কেউ কখনও ভোলে।

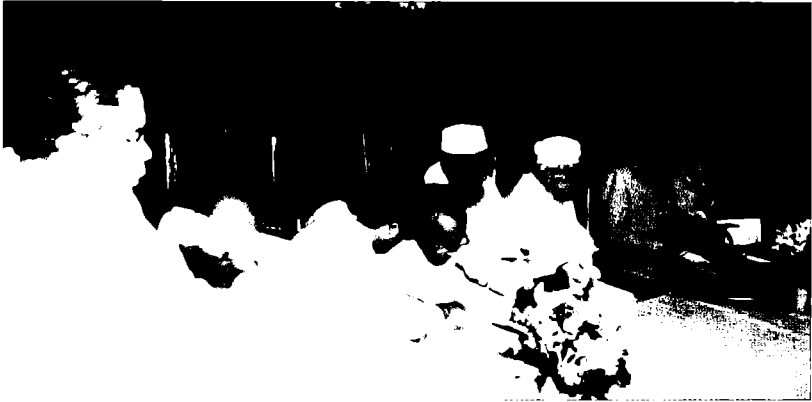
ঐ আড্ডা থেকেই বেরিয়ে এসেছে এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ। অসম্ভব শক্তিশালী ও প্রত্যয়নিষ্ঠ। তাদের নামগুলিও স্বপ্নের মতো : শাহীন হাসনাত, রফিক মুহাম্মদ, নিজাম সিদ্দিকী, নাইম মাহমুদ, নিয়াজ শাহিদী, ওমর বিশ্বাস, হাসান রাউফুন, মুখা আলাউদ্দিন, খালিদ সাইফ প্রমুখ। অতি অল্পদিনের মধ্যে এ তরুণেরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেয়।

ইতিকথা

১৯৮৩ সাল থেকে আজ ২০১০ সাল। কিন্তু বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেমে থাকেনি তার অগ্রযাত্রা থেকে। অত্যন্ত ঝঞ্ঝু কিন্তু স্থিরতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এ সংস্থা। যে-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ প্রতিষ্ঠান। তার সমতুল্য আর কোনো সংঘ একাডেমি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে নেই বললেই চলে। দীর্ঘ এ পঁচিশ বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে যথেষ্ট সম্ভাবনার কিছু করতে পারেনি এ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যেটুকু করেছে সে ভূমিকাকেও ছোট করে দেখার উপায় নেই। বাংলা সাহিত্য পরিষদকে আরও অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। এ সংস্থার পরিচালনা পরিষদের বিভিন্ন মিটিংয়ে দেখা গেছে যে সদস্যরা চমৎকার সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন করা যায়নি। যে-কারণে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে সব সময় সমতা বজায় থাকেনি। তবে আশা করতে দোষ নেই। বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাখবে অসাধারণ অবদান-এ স্বপ্ন দেখতে কোনো বারণ নেই। বাংলা সাহিত্য পরিষদ আমাদের প্রত্যাশার চাইতেও অধিক দূরে এগিয়ে যাক এই কামনা।



তৃতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন '৯১-এর মঞ্চের একাংশ।



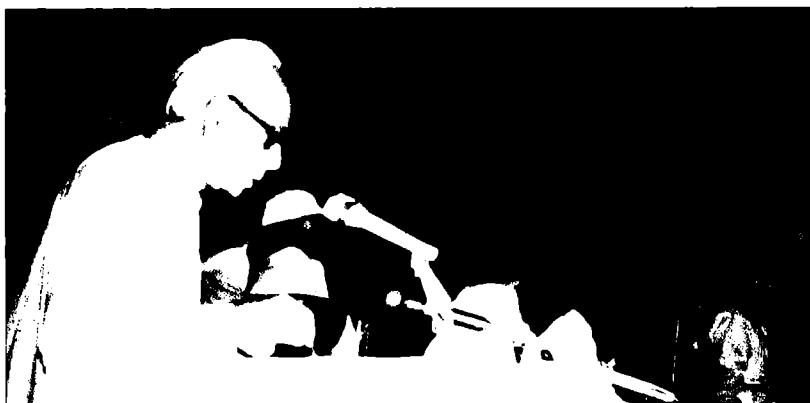
তৃতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন সেমিনারে সমাপনী বক্তব্য রাখছেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আবুল আসাদ



মুক্ত আলোচনায় সম্মেলনে আগত অতিথিবৃন্দ



সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ড. সৈয়দ আলী আশরাফ



গুণীজন সর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কবি তালিম হোসেন



বক্তব্য রাখছেন কথা-সাহিত্যিক অধ্যাপক মিন্নাত আলী



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ



বক্তব্য রাখছেন নাট্য অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার



সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ



বক্তব্য রাখছেন কবি আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন



বক্তব্য রাখছেন আশকার ইবনে শাইখ



বক্তব্য রাখছেন কবি আবদুস সাত্তার



মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনকে মানপত্র পড়ে ওনাচ্ছেন মাহবুবুল হক। ডানে বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আবুল আসাদ



কবি আবুল হোসেনের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আবুল আসাদ



সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনে গুণীজনদের সঙ্গে কবি সাহিত্যিকগণ



৪র্থ সম্মেলন স্থল গাইড হাউস মিলনায়তনের বহির্দৃশ্য



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান অতিথি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ



দ্বিতীয় সেমিনারে অতিথিবৃন্দ



সম্মেলনে দর্শকবৃন্দের একাংশ



সম্মেলিত গুণীজন ও প্রধান অতিথি



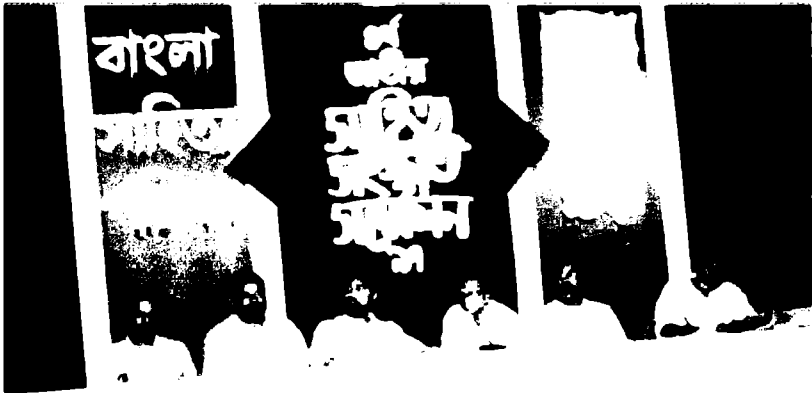
তৃতীয় সেমিনারে অতিথিবৃন্দ



প্রথম সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ



তৃতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন ড. এমাজউদ্দীন আহমদ



কবিতা পাঠের আসরে অতিথিবৃন্দ



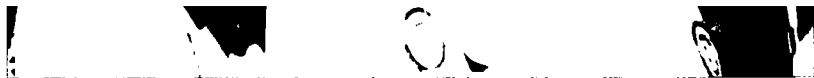
৪র্থ ঔণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কমেডর (অব.) আতাউর রহমান



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন কবি আল মাহমুদ



সম্মেলনের আয়োজকবৃন্দ (বাম থেকে) পরিষদ সভাপতি আবুল আসাদ, পরিচালক আবদুল মান্নান তালিব ও সম্মেলন সচিব স.ম. রফিক



প্রাবন্ধিকবৃন্দ (বাম থেকে) অধ্যাপক আবদুল গফুর, ড. হুমায়ুন কবীর ও মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম



আলোচকবৃন্দ (বাম থেকে) ড. আবুল হাসান সামসুদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ও কবি রুহুল আমীন খান
১০॥ এ্যালবাম



আলোচকবৃন্দ (বাম থেকে) মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, মাহবুবুল হক, জয়নুল আবেদীন আজাদ, মতিউর রহমান মল্লিক



আলোচকবৃন্দ (বাম থেকে) খন্দকার আবদুল মোমেন, ড. আবদুল লতিফ মাসুম, সোলায়মান আহসান ও হাসান আলীম



আলোচকবৃন্দ (বাঁ থেকে) আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ, আমীরুল ইসলাম, তমিজউদ্দিন লোদী এবং মোজাম্মেল হক



৪র্থ সাহিত্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ড. মঈনউদ্দীন আহমদ খান

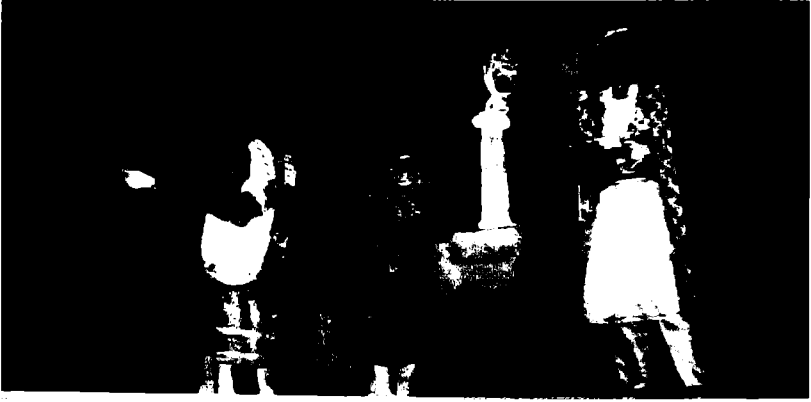


৪র্থ সাহিত্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কবি মাহফুজরা চৌধুরী



৪র্থ সাহিত্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক

১২। এ্যালবাম



সম্মেলনে মঞ্চস্থ নাটকের একটি দৃশ্য



সম্মেলনে একটি বিশেষ মুহূর্তে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মরহুম সিদ্দিক জামাল, কবি আসাদ বিন হাফিজ ও মোহাম্মদ নিয়াকত আলী



বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ



১৯৫তম সাহিত্য সভায় বক্তব্য রাখছেন শাহাবুদ্দীন আহমদ



১৬৩তম সাহিত্য সভায় বক্তব্য রাখছেন কবি গোলাম মোহাম্মদ



মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা চর্চায় রাজনৈতিক মতাদর্শ শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সাংবাদিক মহবুব আনাম
১৪॥ এ্যালবাম



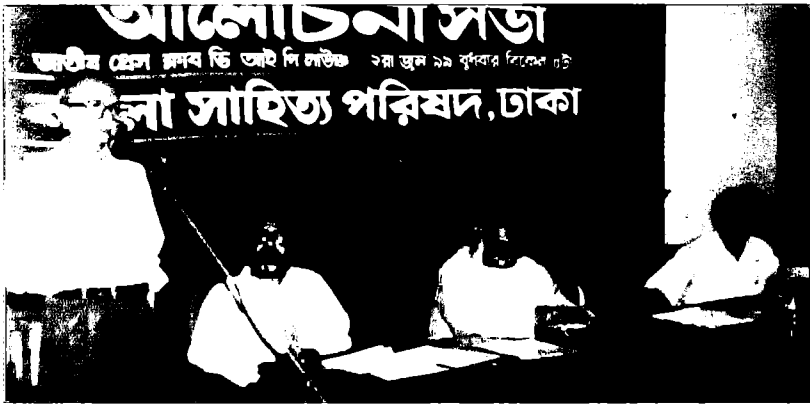
বিশিষ্ট গবেষক ড. এবনে গোলাম সামাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের রাজশাহী প্রতিনিধি ডা. নাজীব ওয়াদুদ



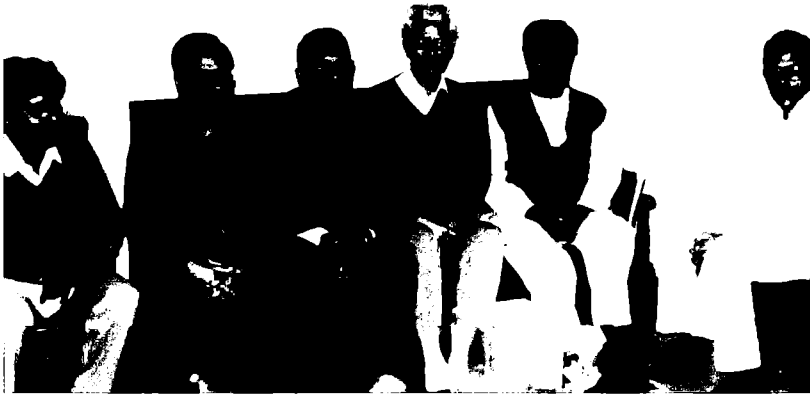
সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ড. মালিহা খাতুন



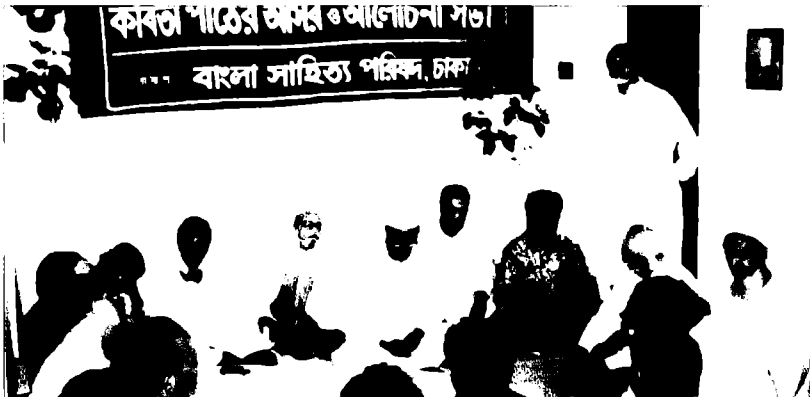
পরিষদ সভাপতি আবুল আসাদ-এর হাত থেকে ট্রফি গ্রহণ করছেন ড. এম. আব্দুল কাদের



বাংলা সাহিত্য পরিষদে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ



কবি আবুল হোসেন এর বাঁয়ে নাসির হেলাল, মাহবুবুল হক ও উপন্যাসিক জামেদ আলী ডানে আব্দুল মান্নান তালিব ও আবুল আসাদ



২০০তম সাহিত্য সভায় আলোচনা করছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক

স্বাধীনতার জন্য সাহিত্য

সম্পাদক

আবদুল মান্নান ভলিবি



বাংলা সাহিত্য পরিষদ